সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

অষ্টত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩৩৮

অষ্টত্রিংশ ভাগের

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[অষ্টত্রিংশ ভাগ]

রত্নাকরশান্তি

হিউয়েন-সাং যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন নালন্দা—বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান স্থান ছিল। নালন্দা—বুদ্ধদেবের প্রধান ছাত্র শারিপুত্রের জন্মস্থান, মগধের রাজধানী রাজগৃহ হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ উত্তরে। এখানে একটি বড় রাস্তা ছিল, তাহার এক ধারে বহুসংখ্যক বিহার, আর এক ধারে বহুসংখ্যক স্তূপ। অনেক বড় বড় পণ্ডিত এখানে থাকিতেন ; সকলেই বৌদ্ধ ভিক্ষু। চারি দিকে ছাত্রদের কুটীর ছিল ; তাহারা সেখানে বাস করিত, খাইত এবং বিহারে আসিয়া পড়িত। অনেকে নালন্দাকে ইউনিভার্সিটী বলেন ; এরূপ বলা সঙ্গত কি না, আমি জানি না ;—মঠ-সমষ্টি বলাই আমার মতে ঠিক।

নবম শতকে যখন ধর্ম্মপাল ও দেবপাল পেশোয়ার হইতে গোদাবরীর মুখ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বাড়ীর কাছে আর একটা বড় জায়গা, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান স্থান করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং ভাগলপুরের একটু উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার ধারে বিক্রমশিলা নামে একটা প্রকাণ্ড বিহার করিলেন। ক্রমে আরও অনেক লোক সেখানে বিহার করিতে লাগিলেন। বিক্রমশিলা নালন্দার মতনই জাঁকিয়া উঠিল। এখানে অনেক বড় বড় বৌদ্ধ ভিক্ষু, বড় বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রত্নাকরশান্তি একজন। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কথা কিছুই জানা যায় না। কিন্তু ভিক্ষু আশ্রমে তিনি একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, এবং বিক্রমশিলা-বিহারের তিনি দ্বার-পণ্ডিত ছিলেন। এখন যেমন বড় বড় রাজা-রাজড়ার বাড়ী সভা-পণ্ডিত থাকে, তেমনি সে কালে বড় বড় মঠের দ্বার-পণ্ডিত থাকিত। তিনি না বলিলে মঠে নূতন লোক প্রবেশই করিতে পারিত না। তিনিও নূতন লোকের বিদ্যা-বুদ্ধি, পড়াশুনা, স্বভাব-চরিত্র বিশেষরূপ পরীক্ষা না করিয়া তাহাকে যাইবার অনুমতি দিতেন না। দ্বার-পণ্ডিতদের পক্ষে ন্যায়শাস্ত্র লইয়া কথাবার্ত্তা কওয়াই সুবিধা ছিল। রত্নাকর-শান্তিও একজন বড় নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি দু'চারটা ফাঁকি করিয়া যদি দেখিতেন, লোকটার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তবে তাহাকে মঠে যাইতে দিতেন, নহিলে দিতেন না।

সেকালকার পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁহার খুব প্রভাব ছিল। যিনি ভোট-দেশে গিয়া মহাযান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাঁহার শিষ্য ; আরও অনেক বড় বড়

পণ্ডিত তাঁহার শিষ্য ছিলেন। ১০৩৫ সালে বিক্রমশিলা বিহারে এক মহাসভা হয়। দীপঙ্কর সে সভার সমস্ত ব্যবস্থা করেন ; কিন্তু সে সভায় কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইবে, কে কে আলোচনা করিবে, কি ভাবে আলোচনা হইবে—এই সমস্ত ব্যবস্থা রত্নাকরশান্তি করেন। এই সভায় নাঢ় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন ; তিনি তখন এত বুড়া হইয়াছিলেন যে, ডুলি ভিন্ন চলিতে পারিতেন না। দীপঙ্কর তাঁহাকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট উচ্চ আসনে বসাইয়া দিয়াছিলেন। এই নাঢ় পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রী নাঢ়ী—দু'জনের চেলারাই বাঙ্গালাদেশে—রাঢ়ে নাঢ়ানাঢ়ী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। নাঢ়ী, নাঢ় পণ্ডিত অপেক্ষাও পণ্ডিত ছিলেন। বৌদ্ধ সমাজ হইতে তিনি জ্ঞানডাকিনী উপাধি পাইয়াছিলেন। এ সভায় কিন্তু নাঢ়ী গিয়াছিলেন বলিয়া কোন উল্লেখ নাই।

বিক্রমশিলা হইতে ফিরিবার সময় ডুলিতে উঠিবার পূর্ব্বে নাঢ় পণ্ডিত দীপঙ্করকে ডাকিয়া বলেন,—আমাদের ত দিন ফুরাইয়াছে। এখন এই সব ধর্ম্মের ভার তোমার উপর। তুমি খুব হুঁসিয়ার হইয়া কাজ করিবে। গুরুজনের কথা কখনও অবহেলা করিও না। আহা! বেচারা ডুলি করিয়া যাইতে যাইতে পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে রত্নাকর ও দীপঙ্কর দু'জনেই অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন।

এই সময়ে ভোটদেশের রাজার একজন দূত অনেক লোকজন ও টাকাকড়ি লইয়া প্রায় তিন বৎসর বিক্রমশিলায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উপর রাজার হুকুম ছিল, তুমি যে করিয়া পার, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে ভোটদেশে আনিবে। দুই তিন বার যাইতে পারিব না বলিয়া এবার দীপঙ্কর একটু নরম হইয়াছিলেন। তাই একদিন রত্নাকরশান্তি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—দেখ, নাঢ় পণ্ডিত ত মরিয়া গেল। আমরাও কোন দিন যাইব। মগধে—এমন কি, সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের মঙ্গলামঙ্গল তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্রই মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। আমাদের ধর্ম্মের ভিতরও নানারূপ দলাদলি মতামতি হইয়া পড়িতেছে। এ সময়ে তোমার দীর্ঘ প্রবাসের জন্য ভোটদেশে যাওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে এ দেশে ধর্ম্ম লোপ হইবে। তুমি কি দেখিতেছ না যে, একটা ভীষণ জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম দুয়ারে ভীষণ আঘাত করিতেছে। উহারা যদি দেশের মধ্যে ঢোকে, বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। ধর্ম্মের এই ঘোর দুর্দ্দিনে সকলেই তোমার মুখ চাহিয়া আছে। তুমি এ সময়ে কিছুতেই ভোটদেশে যাইও না।

দীপঙ্কর সে কথা শুনিলেন না। পাছে গুরু বাধা দেন. তাই লুকাইয়া লুকাইয়া বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। নদীর উত্তর পারে যান-বাহন সব জড় হইতে লাগিল। একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় দীপঙ্কর গঙ্গা পার হইয়া একেবারে ৫০।৬০ মাইল দূরে গিয়া পৌছাইলেন। রত্নাকরশান্তি এই কথা শুনিয়া 'হায়! হায়!' করিতে লাগিলেন। তিনি যা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে। সেই দুর্দ্দান্ত জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম দুয়ার ভাঙ্গিয়া, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম পর্য্যন্তও লোপ করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষ যে এককালে বৌদ্ধপ্লাবিত ছিল, এ কথাটা খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের শেষে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। রত্নাকরশান্তির এই দূর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি হইতেই বুঝা যায়, তিনি কত বড় পণ্ডিত ছিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রে রত্নাকরশান্তির অনেক বই ছিল। এখন সব পাওয়া যায় না। একখানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানির নাম—অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুমান করিতে হইলে, সে ত বাহিরের ব্যাপ্তি দ্বারা হয় না। আমরা জানি, যেখানে ধূম আছে, সেখানেই বহ্নি আছে,—এখানে ত ব্যাপ্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইল। কিন্তু অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপ্তি ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না; তাহার জন্য একটা অন্তর্ব্যাপ্তি চাই। সেই অন্তর্ব্যাপ্তিকে তিনি খুব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িকেরা অন্তর্ব্যাপ্তি মানেন না; না মানার দরুণ তাঁহাদের কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী প্রভৃতি অনেক পদার্থ মানিতে হইয়াছে।

রত্নাকরশান্তি নৈয়ায়িক ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে বালশাস্ত্রের বই লেখেন নাই, তাহাও নহে। তাঁহার একখানি ছন্দের বই ছিল। উহার এক নকল ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে এবং সেই সঙ্গে উহার ভোটভাষায় তর্জ্জমাও আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ব্রাহ্মণ টীকাকারেরা বহু দিন অবধি রত্নাকরশান্তির এই ছন্দের বই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। রত্নাকর এখানে পিঙ্গলসূত্রকেই অবলম্বন করিয়া বই লিখিয়াছেন।

এগার শতকে বাঙ্গালাবিহারের বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন, পুরোহিতের বই লিখিতেন অর্থাৎ উপাসনার প্রয়োগ ও পদ্ধতি লিখিতেন এবং দেশী ভাষায় দুই চারিটা পদও লিখিতেন। টীকাটিপ্পনী লেখা ত তাঁহাদের কাজই ছিল। রত্নাকর-শান্তি হেবজ্রতন্ত্রের এক টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম মুক্তিকাবলী। হেবজ্র বলিতে বৌদ্ধদের এক যুগনদ্ধ দেবতা বুঝায়। যুগনদ্ধ মানে—জোড়া, যুগল। আড়ংঘাটায় কৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্ত্তি আছে,—সে কৃষ্ণ-রাধায় যুগল-মিলন। হেবজ্র কিন্তু আর একরকম যুগল; ‘হে’ বলিতে গেলে করুণা বুঝায়; ‘বজ্র’ বলিতে গেলে শূন্যতা বুঝায়। করুণা ও শূন্যতা—এই দুইটির যুগল মিলনের নাম হেবজ্র। একখানি তন্ত্রগ্রন্থ আছে,—তাহার নাম হেবজ্রতন্ত্র। রত্নাকরশান্তি তাহার এক পঞ্জিকা টীকা লেখেন। টীকা অনেক রকম আছে,—তাহার মধ্যে তিন রকম প্রধান—লঘু, বৃহৎ ও পঞ্জিকা। লঘু টীকা মানে—টিপ্পনী, এখানে একটু, ওখানে একটু নোট; বৃহৎ টীকা—দণ্ডান্বয় করিয়া প্রত্যেক শব্দের প্রতিবাক্য দেওয়া, আভাস দেওয়া ও তাৎপর্য্য দেওয়া; পঞ্জিকা সকলের চেয়ে বড় টীকা—উহার অর্থ সর্ব্বার্থভঞ্জিকা,—শ্লোকে যত রকম অর্থ হইতে পারে, সব অর্থ দিয়া দেওয়া—সামাজিক, সাংসারিক, দার্শনিক ইত্যাদি ইত্যাদি। পঞ্জিকা লেখা কিছু বেশী বিদ্যার দরকার; তাই রত্নাকর শান্তি হেবজ্রতন্ত্রের মুক্তিকাবলী নামে এক পঞ্জিকা টীকা লেখেন।

ইনি অনেকগুলি সাধনা লেখেন। কিন্তু সে সাধনাগুলি যে সব তাঁরই, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, তাহাতে ‘শান্তি’ নাম আছে, ‘রত্নাকরশান্তি’ নাই। তন্ত্রের কয়েকখানি ভাল ভাল বই রত্নাকরশান্তির নামে লেখা আছে, তাহার মধ্যে একখানির নাম সুখদুঃখদ্বয়পরিত্যাগদৃষ্টি, অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখ—দুয়ের কিছুই নাই। বৌদ্ধদের চারিটি ধ্যানে কেমন করিয়া প্রথমে বিতর্ক যায়, তাহার পর বিচার যায়, তাহার পর সুখ যায় ও তাহার পর দুঃখ যায়,—এ কথা যাঁহারাই বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। রত্নাকরশান্তি সে বিষয়ে একখানি নূতন বই লিখিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধাচার্য্য শান্তির নামে "বৌদ্ধগান ও দোহা"য় দুটি গান আছে (১৫,২৬)। প্রথমটি এই,—

সত্য সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলকৃখলকৃখণ ন জাই
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ ॥

এই গানটির টীকায় টীকাকার শান্তির একটি বিশেষণ দিয়াছেন,—"নির্ভরপরমানন্দ-মুদিতঃ"। এ গানের অর্থ এই যে, যে সোজাপথে গিয়াছে, তাহার রাস্তা শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়।

দ্বিতীয় গানটি—তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু ॥

ইহার অর্থ এই যে, তুলা ধুনিতে ধুনিতে কেবল আঁশ থাকে, আঁশ ধুনিতে ধুনিতে শূন্য হইয়া যায়।

এই দুই গানেরই ভাষা অন্যান্য গান হইতে একটু তফাৎ। আমার বোধ হয়, রত্নাকর-শান্তি বিহার অঞ্চলের লোক; কেন না, তিনি এক জায়গায় 'বলিতেছি' অর্থে 'বোলথি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এটা বাঙ্গালায় ব্যবহার হয় না, তখনও হইত না, এখনও হয় না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

———

বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব

(প্রথমাংশ)

(১)

Metrics বা ছন্দঃ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ rhythm বা ছন্দঃ-স্পন্দন সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। বাংলায় ছন্দঃ শব্দটি metre ও rhythm উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয় বলিয়া metre ও rhythm যে দুইটি পৃথক্ concept অর্থাৎ প্রত্যয় বা ভাব, তাহা সাধারণের ধারণায় সব সময় আসে না। কবি যখন লেখেন যে,—

"ছন্দে উদিছে তারকা, ছন্দে কনকরবি উদিছে
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে"

তখন তিনি ছন্দঃ শব্দটি rhythm অর্থেই ব্যবহার করেন। Metre বা পদ্যের ছন্দঃ rhythm বা সাধারণ ছন্দঃস্পন্দনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশমাত্র।

রসানুভূতির সঙ্গে ছন্দোবোধের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। মনে রসের উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃস্পন্দনে। যেথাই কোন ভাবে রসোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানেই ছন্দঃ লক্ষিত হয়। শিশুর চপল নৃত্যেও এক রকমের ছন্দঃ আছে, মানুষের শিল্পের অভিব্যক্তির মধ্যেও ছন্দঃ আছে। যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা বিশ্বের লীলাতেও ছন্দের খেলা দেখিতে পান। ছন্দোবোধের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুতে স্পন্দন আরম্ভ হয়, সেই স্পন্দনের ফলে মনের মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধ আবেশের ভাব আসে, "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু" এই রকম একটা বোধ হয়। এই অনুভূতিটুকু কবিতার ও অন্যান্য সুকুমার কলার প্রাণ।

এখন প্রশ্ন এই যে, ছন্দোবোধের উপাদান কি? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে কি লক্ষণ থাকিলে মনে ছন্দোবোধ আসিতে পারে? সূর্য্যাস্তের সময়কার আকাশে রঙের খেলায়, বাউল গানের সুরে বা তাজমহলের গঠনশিল্পের মধ্যে এমন কি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহার জন্য আমরা এ সমস্তের মধ্যেই ছন্দঃ বলিয়া একটা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারি? চক্ষু, কর্ণ বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আমরা রঙ্ বা সুর বা গন্ধ কিম্বা ঐ রকম কোন না কোন গুণ প্রত্যক্ষ করি। তাহাদের কি রকম সমাবেশ হইলে আমরা ছন্দোময় বলিয়া তাহাদের উপলব্ধি করি?

কেহ কেহ বলেন যে, ঘটনাবিশেষের পৌনঃপুনিকতাই ছন্দের লক্ষণ। তাঁহারা বলেন যে, সমপরিমিত কালানন্তরে যদি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় এবং তাহার দ্বারাই যদি সময়ের বিভাগের বোধ জন্মে, তবে সেখানে ছন্দঃ আছে বলা যায়। সুতরাং ঘড়ির দোলকের গতি, তরঙ্গের উত্থান-পতন ইত্যাদিতে ছন্দঃ আছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ছন্দের এই সংজ্ঞা খুব সুষ্ঠু বলা যায় না। কোন কোন প্রকারের ছন্দে অবশ্য পৌনঃপুনিকতাই প্রধান লক্ষণ; কিন্তু ছন্দের এমন সব ক্ষেত্র আছে, যেখানে পৌনঃপুনিকতা এক রকম নাই বা থাকিলেও তাহার জন্য ছন্দোবোধ জন্মে না। সূর্য্যাস্তের সময় আকাশে কিম্বা বড় বড় চিত্রকরের ছবিতে যে রঙের সমাবেশ দেখা যায়, তাহাতে ত পৌনঃপুনিকতা বিশেষ লক্ষিত হয় না, কিন্তু তাহাতে কি rhythm নাই? গায়কেরা যখন তান ধরেন, তখন তাহাতে কি পৌনঃপুনিকতা লক্ষিত হয়?

আসল কথা—rhythm-এর কাজ মানসিক আবেগের অনুযায়ী স্পন্দনের সৃষ্টি করা, কেবলমাত্র কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা নহে।

কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের উপর আঘাত করিলে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়গুলির গঠন-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা স্থিতিস্থাপক উপাদানে তৈয়ারি। বাহিরের জগতের প্রত্যেক ঘটনা ও পরিবর্ত্তন অক্ষিগোলক বা কর্ণপটহের স্থিতি-স্থাপক স্নায়ুতে গিয়া আঘাত করিয়া স্পন্দন উৎপাদন করে, এবং সেই স্পন্দনের ঢেউ মস্তিষ্কের কোষে ছড়াইয়া অনুভূতিতে পরিণত হয়। অহরহঃ বাহ্য জগতের সম্পর্কে আসার দরুণ নানা রকমের স্পন্দনের ঢেউয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় অভিভূত হইতেছে। যখন কোন এক বিশেষ রকমের স্পন্দনের পর্য্যায়ের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য অনুভূত হয়, তখনই ছন্দোবোধ জন্মে।

এই সামঞ্জস্যের স্বরূপ কি? যদি সমধর্ম্মী ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোন বিশেষ গুণের তারতম্যের জন্য মনে আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সেখানে ছন্দঃস্পন্দন আছে, বলা যাইতে পারে। কোন ঘটনা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে তজ্জাতীয় অন্য ঘটনার জন্য প্রত্যাশা জন্মে। কানে যদি 'সা' সুর আসিয়া লাগে, তবে মন স্বভাবতই তাহার পরে 'পা' কিংবা এমন অন্য কোন সুরের প্রত্যাশা করে, যাহাতে কানের স্বাভাবিক তৃপ্তি জন্মিতে পারে; তেমনি সিঁদুর (vermilion) রং দেখিলে তাহার পরে গাঢ় নীল (ultra-marine) রং দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনা না আসিয়া যদি অন্য ঘটনা আসিয়া পড়ে, তবে মনে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়; আবার যাহা প্রত্যাশিত, তাহা আসিলেও আর এক প্রকার আন্দোলন হয়। এবংবিধ আন্দোলনেই আবেগের ব্যঞ্জনা হয়। এইরূপে বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনের সমাবেশ-বৈচিত্র্য বা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব-জনিত আন্দোলনই ছন্দের প্রাণ। কোন রাগরাগিণীর আলাপে নানা সুরের সমাবেশ বা কোন চিত্রপটে রঙের সমাবেশ লক্ষ্য করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতীত হইবে। কেবল দেখিতে হইবে যে, বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনে স্পন্দনে যেন বিরোধ না থাকে, অথবা সঙ্গীতের ভাষায় বলিতে গেলে, তাহারা যেন পরস্পর 'বিবাদী' না হয়। নানা রকমের স্পন্দনের নানা ভাবে সমাবেশের দরুণ আবেগানুরূপ জটিল স্পন্দনের উৎপত্তি হয়। সেই জটিল স্পন্দনই মানসিক আবেগের প্রতীক।

কিন্তু বৈচিত্র্য ছাড়াও ছন্দে আর একটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক। সেটি হইতেছে,—ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে কোন প্রকারের ঐক্যসূত্র। সঙ্গীতে সুর আবেগানুযায়ী বৈচিত্র্য আনিয়া দেয়, তাল সেই সুরসমুদায়কে ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করে। যেখানে স্পন্দন, সেখানে সতত দুইটি প্রবৃত্তির লীলা দেখা যায়; একটি গতির ও একটি স্থিতির। বেগের বশে কোন এক দিকে গতির প্রবৃত্তি এবং স্থির অবস্থানে ফিরিবার প্রবৃত্তি—এই দুইয়ের পরস্পর প্রতিক্রিয়ায় স্পন্দনের উৎপত্তি। ছন্দেও এক দিকে বৈচিত্র্যের জন্য গতির এবং অপর দিকে ঐক্যসূত্রের জন্য স্থিতির মিলন ঘটে বলিয়া স্পন্দনের লক্ষণ অনুভূত হয়।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, যেখানেই ছন্দঃ, সেখানেই প্রথমতঃ সহধর্ম্মী ঘটনাপরম্পরা থাকা দরকার; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমস্তের মধ্যে কোন এক রকমের ঐক্যসূত্র থাকা দরকার; তৃতীয়তঃ, তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের তারতম্যের জন্য একটা সুন্দর বৈচিত্র্যের

আবির্ভাব হওয়া দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতে সুরের পারম্পর্য্যে তাল-বিভাগের দ্বারা ঐক্য এবং আপেক্ষিক তীব্রতা বা কোমলতার দ্বারা বৈচিত্র্য সাধিত হয়, এবং এইরূপে ছন্দোবোধ জন্মে।

পদ্যছন্দের মধ্যেও এই লক্ষণগুলি বিশিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বাক্যের সঙ্গে বাক্যের বন্ধনই পদ্যছন্দের কাজ। পদ্যছন্দের ক্ষেত্রে সমধর্ম্মী ঘটনাপরম্পরা বলিতে অক্ষর বা অক্ষর-সমষ্টি—এইরূপ কোন বাক্যাংশ বুঝিতে হইবে ; এবং পারম্পর্য্য বলিতে, কালানুযায়ী পারম্পর্য্য বুঝিতে হইবে। বাক্যাংশের কোন কোন গুণের দিক্ দিয়া ঐক্যের সূত্র থাকিবে ; অর্থাৎ সেই গুণের দিক্ দিয়া পর পর বাক্যাংশ অনুরূপ হইবে বা কোন obvious অর্থাৎ সহজবোধ্য pattern বা আদর্শের অনুযায়ী হইবে। এই আদর্শ বা নক্সাই সময়ে সময়ে অভীষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনা করে, এবং একাধারে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ করে। কিন্তু এ ধরণের বৈচিত্র্যে নিয়মের নিগড় অত্যন্ত বেশী, সুতরাং ঐক্যের বাঁধনই অধিক প্রতীত হয়। আবেগের অনুধর্ম্মী বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য অন্য কোন গুণের দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। কবি স্বাধীন ভাবে সেই গুণের তারতম্য ঘটাইয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন এবং অভীষ্ট আবেগের দ্যোতনা করেন। কেবলমাত্র নক্সা ধরিয়া চলিয়া গেলে ছন্দঃ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয় এবং তাহাতে আবেগের দ্যোতনা হয় না। এই সত্যটি অনেক কবি ও ছন্দঃশাস্ত্রকার বিস্মৃত হ'ন বলিয়া তাঁহারা ছন্দঃসৌন্দর্য্যের মূল-সূত্রটি ধরিতে পারেন না।

Metrics বা পদ্যছন্দের আলোচনা করিতে গেলে মুখ্যতঃ ছন্দের ঐক্যবন্ধনের সূত্রটি আলোচনা করিতে হয়। কবি ইচ্ছামত বৈচিত্র্য আনয়ন করেন, সে বিষয়ে মাত্র দিঙ্‌নির্ণয় করা যাইতে পারে, বাঁধা-ধরা নিয়ম করিয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু ছন্দের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের সূত্র কি হইতে পারে, তাহা ভাষার প্রকৃতি, ইতিহাস ও ব্যবহারের রীতির উপর নির্ভর করে, সে বিষয়ে ছন্দের ব্যাকরণ রচনা হইতে পারে।

কাব্যছন্দের প্রকৃতি বাক্যের ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রথমতঃ বাক্যের ধর্ম্ম কি কি এবং তাহাতে কি ভাবে ছন্দঃ রচনা হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝিতে হইবে।

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা Syllable। বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম আয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর। প্রত্যেকটি অক্ষর উচ্চারণের সময়, কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হইবার কালে কণ্ঠস্থ বাগ্‌যন্ত্রের অবস্থান অনুসারে কোন এক বিশেষ স্বরে পরিণত হয়, এবং পরে মুখগহ্বরের আকার ও জিহ্বার গতি অনুসারে উপরন্তু ব্যঞ্জন-ধ্বনিরও উৎপাদন অনেক সময়ে করে। বাগ্‌যন্ত্রের অঙ্গসমূহের পরস্পর অবস্থানের ও গতির পার্থক্য অনুসারে অক্ষরের রূপের বা ধ্বনির ভেদ ঘটে এবং বহুবিধ অক্ষরের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বর থাকিবে এবং সেই স্বরই অক্ষরের মূল অংশ। অতিরিক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সেই স্বরেরই একটি বিশেষ রূপ প্রদান করে মাত্র।

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধর্ম্ম—(১) তীব্রতা (pitch)—শ্বাস বহির্গত হইবার সময় কণ্ঠস্থ বাক্‌তন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অনুসারে তাহাদের দ্রুত বা মৃদু কম্পন সুরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে। (২) গাম্ভীর্য্য (intensity or loudness)—অক্ষর

উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণ শ্বাসবায়ু একযোগে বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতে ও স্পষ্টরূপে স্বর শ্রুতিগোচর হইবে। (৩) স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length or duration)—যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্‌যন্ত্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। (৪) স্বরের রঙ্ (tone colour)—শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও সৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা যায় স্বরের রঙ্।

এই ত গেল স্বরের স্বধর্ম্মের কথা। তাহা ছাড়া অক্ষরে গ্রথিত হইয়া যখন বাক্য সৃষ্টি হয়, তখনও আর দুই একটি বিশেষ ধ্বনিলক্ষণ দেখা যায়। কথা বলিবার সময় ফুস্‌ফুসে শ্বাস-বায়ুর অপ্রতুল হইলেই নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য থামিতে হয়, ঠিক্ নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় কোনও ধ্বনির উৎপাদন করা যায় না। এই জন্য বাক্যের মাঝে মাঝে pause বা ছেদ দেখা যায়। তদ্ভিন্ন যেখানে ছেদ নাই, সেখানেও জিহ্বাকে বারংবার প্রয়াসের পর কখন কখন একটু বিশ্রাম দিবার জন্য বিরামস্থল থাকে।

কথা বলিবার সময় নানা লক্ষণ ক্রান্ত অক্ষর ও অক্ষর-সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে থাকে। কিন্তু ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া দুই একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে। ছন্দোবদ্ধ রচনার ঐক্য এবং তদুচিত আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় বাক্যের কোন এক বিশেষ ধর্ম্মে। আবার ছন্দোবদ্ধ রচনায় আবেগের প্রকাশও হয় বাক্যের অপর কোন ধর্ম্মের মাত্রার বৈচিত্র্যে।—যেমন বৈদিক সংস্কৃতে ছন্দের ঐক্যসূত্র পাওয়া যায়—প্রতি পদের অক্ষর-সংখ্যায় এবং পাদান্তস্থ কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা সন্নিবেশের রীতিতে; সেই কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা সন্নিবেশের জন্য পাদান্তে একটা বিশেষ রকমের cadence বা দোলন অনুভব করা যায়। আবার প্রতি পাদের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্বরতীব্রতার দরুণ আবেগদ্যোতক বৈচিত্র্য অনুভূত হয়। লৌকিক সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত প্রাচীন ছন্দে প্রতি চরণের অক্ষর-সংখ্যার এবং তাহাদের মাত্রা-সংখ্যার দিক্ দিয়া ঐক্যসূত্র পাওয়া যায়; কিন্তু হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে অক্ষরের সাজাইবার রীতি হইতেই বৈচিত্র্যের অনুভূতি জন্মে। অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে এবং উত্তর-ভারতের চলতি ভাষাসমূহের ছন্দে আবার ঐক্যসূত্র অন্যবিধ; সেখানে প্রতি পর্ব্বের মোট মাত্রা-সংখ্যা হইতেই ছন্দের ঐক্য বোধ হয়। Measure বা পর্ব্বের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার অক্ষর সাজাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কবিকে দেওয়া হয়। ইংরেজী ছন্দে আবার accent বা অক্ষর-বিশেষের উচ্চারণের জন্য স্বাভাবিক স্বরগাম্ভীর্য্যই ধ্বনির প্রধান লক্ষণ। প্রতি চরণে কয়েকটি নিয়মিত সংখ্যার foot বা গণ থাকার দরুণ ঐক্যবোধ জন্মে; কিন্তু গণের মধ্যে accent-ওয়ালা এবং accent-হীন অক্ষরের সমাবেশ হইতে বৈচিত্র্য বোধ জন্মে।

এইরূপে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের প্রকৃতি ও আদর্শ বিভিন্ন। ছন্দের উপাদানীভূত বাক্যাংশের প্রকৃতি, ঐক্যবোধের ও বৈচিত্র্যবোধের ভিত্তিস্থানীয় ধর্ম্ম, ঐক্যের আদর্শ, ঐক্য ও বৈচিত্র্যের পরস্পর সমাবেশের রীতি—এই সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে। সময়ে সময়ে আবার এক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছন্দের পৃথক্ রীতি

পরিলক্ষিত হয়। যেমন, লৌকিক সংস্কৃতের বৃত্ত ছন্দের এবং অর্ব্বাচীন সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত বা জাতি ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দৈহিক বিশেষত্ব এবং সভ্যতার ইতিহাস অনুসারে এই পার্থক্য নিরূপিত হয়। সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে অনার্য্য-ভাষিত হওয়াতে এবং অনার্য্য ছন্দের প্রভাবে আসাতেই সম্ভবতঃ বৃত্তছন্দের স্থানে জাতিছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাক্যের নানা ধর্ম্ম থাকিলেও প্রত্যেক জাতির পক্ষে দুই একটি বিশেষ ধর্ম্মই সমধিকরূপে মন ও শ্রবণ আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ভাষায় ছন্দোবন্ধনের রীতি তুলনা করিলে বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

(২)

বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্বগুলি বুঝিতে গেলে, প্রথমতঃ বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির কয়েকটি বিশেষত্ব মনে রাখা দরকার। সেই বিশেষত্বগুলির সহিত বাংলা ছন্দের প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

প্রথমতঃ, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে খুব বাঁধাধরা লক্ষণ কোন দিক্ দিয়া নাই। অবশ্য সব দেশেই যখন লোকে কথা বলে, তখন ব্যক্তিভেদে এবং সময়ভেদে একই শব্দের ধ্বনির অল্পাধিক তারতম্য ঘটে। কিন্তু অনেক ভাষাতেই শব্দের কোন না কোন একটি ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রধান হইয়া থাকে, এবং সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃসূত্র রচিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতে অক্ষরের মধ্যে কোন্‌টি হ্রস্ব, কোন্‌টি বা দীর্ঘ হইবে, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট আছে, গদ্যে পদ্যে সর্ব্বত্রই তাহা বজায় থাকে, এবং তদনুসারে ছন্দ রচিত হয়। ইংরেজীতে যদিও অক্ষরের দৈর্ঘ্য সুনির্দ্দিষ্ট নয় এবং পদ্যে ছন্দের খাতিরে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কমাইতে বা বাড়াইতে হয়, তত্রাচ এক দিক্ দিয়া অর্থাৎ accent-এর দিক্ দিয়া উচ্চারণের যথেষ্ট বাঁধাবাঁধি আছে। শব্দের কোন্ অক্ষরের উপর accent বা একটু বেশী জোর পড়িবে, তাহা এক রকম নির্দ্দিষ্ট আছে এবং accent-অনুসারেই ছন্দ রচিত হয়। বাংলায় ছন্দ মাত্রাগত, কিন্তু বাংলায় অক্ষরের মাত্রা বা কালপরিমাণ যে কি হইবে, সে বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই।

চল্‌তি বাংলার একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক্ :—

"আর (,) টের পেলেই বা কি ? | ধরা কি মুখের কথা ! | স্থাখ্, শ্রীকান্ত, | কিচ্ছু ভয়
নেই ; | ব্যাটাদের চারখানা— | ডিঙি আছে বটে— | কিন্তু যদি দেখিস্ | ঘিরে ফেল্লে
ব'লে | আর পালাবার | যো নেই, তখন | ঝুপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ে | এক ডুবে
যত্‌দূর পারিস্ গিয়ে | ভেসে উঠ্‌লেই হ'ল। | এ অন্ধকারে আর | দেখবার জো-টি
নেই।" | ("শ্রীকান্ত," শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

"এই ত চাই | কিন্তু আস্তে ভাই | —ব্যাটারা ভারি পাজী। | আমি ঝাউবনের

॥ । । । । । । । । । । ।

পাশ দিয়ে মক্কা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এম্‌নি বার ক'রে নিয়ে যাব যে শালারা

॥ । । । । ।

টের্‌ও পাবে না ("শ্রীকান্ত", শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

(উপরের উদ্ধৃতাংশগুলিতে মোটা লম্বা দাঁড়ি দিয়া উচ্চারণের বিরামস্থল নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং ভারতীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানের চল্‌তি সঙ্কেত অনুসারে অক্ষরের মাথায় চিহ্ন দিয়া মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছি ; মাথায় ।, মানে একমাত্রা ; ॥ মানে, দুই মাত্রা ; ।।।, মানে তিন মাত্রা বুঝিতে হইবে।)

উপরে উদ্ধৃত অংশগুলির মাত্রা বিচার করিলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করা যায়,—

(১) সাধারণতঃ বাংলা উচ্চারণে প্রতি অক্ষর হ্রস্ব বা এক মাত্রা ধরা হইয়া থাকে।

(২) কিন্তু প্রায়শঃ দীর্ঘতর অক্ষর এবং কখন কখন হ্রস্বতর অক্ষরও দেখা যায়।

(ক) একাক্ষর হলন্ত শব্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ বা দুই মাত্রা ধরা হয় ; যথা—উদ্ধৃতাংশের 'আর্', 'টের্', 'থাক্' ; কিন্তু কখন কখন হ্রস্বও হইয়া থাকে ঃ—যথা, 'ঝুপ্'।

(খ) শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ হয় (যথা—'ব্যাটাদের' শব্দে 'দের্', 'দেখিস্' শব্দে 'খিস্'), আবার কখনও হ্রস্ব হইতে পারে (যথা—'ঝাউবনের' পদে 'নের্')।

(গ) পদ-মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (যথা—'শ্রীকান্ত' শব্দের 'কান্'), কখন হ্রস্ব (যথা—'কিছু' শব্দের 'কিছ্', 'যত্‌দূর' [=জদ্দূর্] পদের 'যৎ'), আবার কখন প্লুত—(যথা—'ফেল্‌লে' পদের 'ফেল্') হইতে পারে।

(ঘ) যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর প্রায়ই দীর্ঘ হয় (যথা—'নেই', 'গিয়ে (=গিএ), 'লাফিয়ে' শব্দের 'ফিয়ে' (=ফিএ) ; কখনও প্লুতও হয় (যথা—'চাই') ; আবার কখনও 'হ্রস্ব' হয় (যথা—'পেলেই' শব্দে 'লেই')।

(ঙ) মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর প্রায়ই হ্রস্ব হয়, কিন্তু ইচ্ছামত তাহাদেরও দীর্ঘ করা যায় ; যথা—'ধরা' শব্দের 'রা', 'জো-টি' পদের 'জো', 'ভারি' পদের 'ভা'।

চল্‌তি ভাষায় লিখিত পদ্য হইতেও ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। একটা উদাহরণ লওয়া যাক্—

। । । । । । । ।

(১) নিধিরাম চক্রবর্ত্তী শোণ কাটিছেন ব'সে,

। ॥ । । । । । । । । । ।

(২) খেলারাম ভট্টাচার্য্য উত্তরিল এসে।

। । । । । । ॥ । । । ॥

(৩) নিধিরামকে খেলারাম করিল সম্ভাষ।

। । ॥ । । । । । ॥ । ॥

(৪) নিধিরাম বলে তোমার কোথায় নিবাস।

(৫) কি বলিলে পোড়া মুখ কুল করিতে যায় ?

(৬) সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল অগ্নি দিল গায়।

(৭) ওর কপালে যদি অন্য মেয়ে হইত,

(৮) এথ দিন ওর ভিটেয় ঘুঘু চ'রে যেত ;

(৯) কখন বলিলে যে দিন গেল রে কিসে।

(১০) আমার থলিয়ায় রস আছে তাই খাচ্চে ব'সে ব'সে

এখানেও দেখা যায় যে,—

(ক) একাক্ষর হলন্ত শব্দ কখনও দীর্ঘ (যথা—১ম পংক্তিতে 'রাম'), কখনও হ্রস্ব (যথা—১ম পংক্তির 'শোণ', ১০ম পংক্তির 'রস'), কখন প্লুত (যথা—৭ম পংক্তির 'ওর') হইয়া থাকে।

(খ) শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর কখনও দীর্ঘ (যথা—৪র্থ পংক্তির 'নিবাস' শব্দের 'বাস্', ৩য় পংক্তির 'সম্ভাষ' শব্দের 'ভাষ'), এবং কখনও হ্রস্ব (যথা—৪র্থ পংক্তির 'তোমার' পদের 'মার', ১০ম পংক্তির 'আমার' পদের 'মার') হয়।

(গ) পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও হ্রস্ব (১ম ও ২য় পংক্তির যুক্তবর্ণবিশিষ্ট অক্ষর মাত্রেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে), কখনও দীর্ঘ (যথা—৬ষ্ঠ পংক্তির 'সর্ব্বাঙ্গ' পদে 'বাঙ্') ।

(ঘ) স্বরান্ত অক্ষর প্রায়শঃ হ্রস্ব, কিন্তু কখনও দীর্ঘও হইতে পারে (যথা—৯ম পংক্তির 'কখন' শব্দের 'ন')।

তা'ছাড়া স্থান-ভেদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে :—

(১) পঞ্চ নদীর তীরে | বেণী পাকাইয়া শিরে

(২) পঞ্চ ক্রোশ জুড়ি কৈলা | নগরী নির্ম্মাণ

এই দুই পংক্তিতে 'পঞ্চ' শব্দের উচ্চারণ এক নহে ; ১ম পংক্তিতে 'পঞ্চ' তিন মাত্রার এবং ২য় পংক্তিতে 'পঞ্চ' দুই মাত্রার ধরা হইয়াছে। তদ্রূপ,

(৩) এ কি কৌতুক করিছ নিত্য ওগো কৌতুক ময়ী

(৪) ফেরে ঘুরে, মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে

এই দুই উদাহরণেও 'কৌতুক' শব্দের উচ্চারণ একবিধ নহে।

নব্য বাংলার একজন ইংরেজী-শিক্ষিত কবির রচনা হইতেও উপরিলিখিত মতের প্রমাণ পাওয়া যায়—

| | | | | | |
কোথায় কৈশবী দল? বিদ্যাসাগর কোথা?
| | | ॥ | | |
মুখুয্যের কারচুপিতে মুখ
| | | | | | | | | | | | |
আস্‌বে রাজা রাজ্‌পরিষদ্‌ লাট্‌ সাহেবের মেয়ে,
| | | | | | | | | | | | | | |
মারবেল-মারা গিল্‌টি হলে | একবার দেখ চেয়ে।

("বাজিমাৎ", হেমচন্দ্র)।

এখানেও দেখা যায়, পদান্তের হলন্ত অক্ষর কোথাও দীর্ঘ (যথা—'মুখুয্যের' পদে 'য্যের্'), কোথাও হ্রস্ব (যথা—'বিদ্যাসাগর' পদে 'গর্') হইতেছে ; পদ-মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর সেইরূপ কখনও হ্রস্ব, কখনও দীর্ঘ হইতেছে।

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি যে কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতেও এই লক্ষণটি দেখা যায়। সঙ্গীতে গায়কের ইচ্ছামত যে কোন একটি অক্ষরের সিকি মাত্রা হইতে চার মাত্রা পর্য্যন্ত পরিমাণ হইতে পারে। সাধারণ কথাবার্ত্তায় মাত্রার এত বেশী পরিবর্ত্তন অবশ্য চলে না, তবু অর্দ্ধ মাত্রা হইতে দুই মাত্রা, এমন কি, তিন মাত্রা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন প্রায়ই লক্ষিত হয়। উচ্চারণের এই পরিবর্ত্তনশীলতার সহিত বাংলা ছন্দের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

বাঙালীর বাক্‌যন্ত্রের কয়েকটি অঙ্গের—বিশেষতঃ জিহ্বার—নমনীয়তা ইহার কারণ।

ইচ্ছামত যে কোন অক্ষরকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা বাঙালীর পক্ষে সহজ। প্রত্যেক অক্ষরকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করার প্রবৃত্তিই প্রবল, তবে পদান্তে যদি হলন্ত অক্ষর থাকে, সাধারণতঃ তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ হয় (যথা—'পাখী-সব করে রব', 'রাখাল গরুর পাল' ইত্যাদি উদাহরণে 'সব্' 'রব্' '-খাল্' '-রুর্' 'পাল্' ইত্যাদি একাক্ষর হইলেও দুই মাত্রা হিসাবে পঠিত হয়)। কিন্তু আবশ্যক-মত পদান্তস্থ হলন্ত অক্ষরও হ্রস্ব করা যায়। উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

(২ক)

বাঙালীর বাক্‌যন্ত্রের নমনীয়তার জন্য বাংলা উচ্চারণের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। বাঙালীর জিহ্বা ও বাক্‌যন্ত্র অবলীলাক্রমে অবস্থান ও আকার পরিবর্ত্তন করে।

সুতরাং প্রত্যেকটি স্বর অথবা অক্ষরের উচ্চারণের প্রয়াস বাংলা উচ্চারণের দিক্ দিয়া তত উল্লেখযোগ্য নহে। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষার অক্ষরই উচ্চারণের দিক্ দিয়া বাক্যের প্রধানতম অঙ্গ, এবং ছন্দঃ রচনার প্রত্যেকটি স্বরের ওজন এবং হিসাব ঠিক রাখিতে হয়। Inhumanity, Eternity ইত্যাদি শব্দের প্রত্যেকটি স্বরের হিসাব ছন্দের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং সেই জন্য পদ্যে Inhumanity শব্দটিকে পাঁচটি একস্বর শব্দের সমানরূপে ধরা হইয়া থাকে।

বাংলায় কিন্তু স্বরের সেরূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। Inhumanity আর what books can tell thee, ইহারা যে সমান ওজনের, তাহা বাংলা উচ্চারণের রীতিতে প্রতীত হয় না। কারণ, বাংলায় স্বর অন্যান্য বর্ণকে ছাপাইয়া রাখে না। স্বরের উচ্চারণের চেষ্টাই বাক্যের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা নহে। খুব অল্প আয়াসে বাংলায় স্বরের উচ্চারণ হয় এবং অবলীলাক্রমে তাহার মাত্রা-বৃদ্ধি, মাত্রা-হ্রাস কিংবা তাহার উপর উচ্চারণের জোর ফেলা যাইতে পারে। অনেক সময় এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া হয়। যথা—

(১) ঝিকিমিকি দেখে সাধুর বোন, পক্ষীয়ে ছাড়ে রা।
আঙিনায় ছড়া দেয় না কেন বৌ, কুঁজি আস্তে তুলে গা

। । । । । । ‖ ।
ই ই
ঝিক্ মিক্ দ্যাখে সাধুর্ বোন্ পক্ষীএ ছাড়ে | রা,

। । । । । । । । ।
ই
আঙ্ নায়্ ছড়া | দ্যায়্ না ক্যান্ বৌ (কুঁজি) আস্তে তুলে গা

(২) তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে

। । । । ।

তো মার্ খ্যা লায়্ রাং রূ পো হয়্ গোব্ রে শা লুক্ ফো টে

পূর্ব্বে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও অনেক জায়গায় এই রীতির দৃষ্টান্ত আছে; যেমন, 'লাফিয়ে'—'লাফ্ (ই) য়ে'—'লাফ্যে', 'থলিয়ায়'—'থল্ (ই) য়ায়্'—'থল্যায়্'। এই ভাবেই 'করিতে', 'চলিতে' প্রভৃতি রূপের জায়গায় এখন 'কর্তে' 'চল্তে' ইত্যাদি দাঁড়াইয়াছে।

আর এক দিক্ দিয়া ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন একটি স্বরের উচ্চারণ করিলে বা না করিলে ছন্দের কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ হয় না। যেমন, 'এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌতুক-ময়ী—এই পংক্তির প্রথম 'কৌতুক' শব্দটির শেষ বর্ণটিকে হসন্ত-ভাবে বা অকারান্ত ভাবে পড়িলে একই ছন্দ থাকে; পূর্ব্বের স্বর 'উ'কে দীর্ঘ ও শেষের 'ক'-বর্ণকে হসন্ত ভাবে পড়িয়া পংক্তির ঐ অংশটির মাত্রা পূরণ করিবার পরও একটু লঘুভাবে অন্ত্য অকারের উচ্চারণ করা যাইতে পারে (এ কি কৌতুক্ (‖ অ)...), তাহাতে কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, অক্ষর বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়। অক্ষরের সংখ্যা বা অক্ষরের কোন নির্দ্দিষ্ট গুণের উপর বাংলা ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে না। যদি করিত তাহা

হইলে, উপর্য্যুক্ত উদাহরণে 'কৌতুক' শব্দকে একবার দুই অক্ষর এবং একবার তিন অক্ষর ধরার জন্য ছন্দের ইতর-বিশেষ হইত।

বাংলা ভাষার আদিম কাল হইতেই উচ্চারণের এতাদৃশ পরিবর্ত্তনীয়তা লক্ষিত হয়। বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার প্রাচীন নমুনা ও তদ্ভব প্রাকৃত ভাষার পার্থক্য বুঝিবার একটি প্রধান চিহ্ন এই। সংস্কৃত, তথা পালি এবং অন্যান্য প্রাকৃত ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য বাঁধা-ধরা নিয়মের উপর নির্ভর করে, গদ্যে ও পদ্যে সর্ব্বত্রই তাহা বজায় থাকে। কিরূপে প্রাকৃত ভাষা হইতে ক্রমে আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হইল, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না; কিন্তু বাংলার ন্যায় আধুনিক ভাষার প্রাচীনতম অবস্থা হইতেই দেখা যায় যে, অক্ষরের মাত্রার কোন স্থির নিয়ম নাই। "বৌদ্ধ গান ও দোহা" হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

ধামার্থে চাটিল | সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥
টালত মোর ঘর | নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

উপরের শ্লোক দুইটির মাত্রা বিচার করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, পুরাতন মাত্রা-বিধি অচল হইয়া গিয়াছে, এবং পাঠকের ইচ্ছানুসারে যে কোন অক্ষরের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ চলিতেছে। শূন্যপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতেও তাহা প্রমাণ হয়,—

পচ্ছিম দুয়ারে | দা ন প তি ষা অ,
সোণার জাঙ্গালে | পথ বাঅ।

কিন্তু ইহা হইতে যেন কেহ এ ধারণা না করেন যে, বাংলা ছন্দে অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। নিয়ম আছে; পরে সে নিয়মের ব্যাখ্যা করা হইবে। এখানে শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতিতে কোনও অক্ষরের মাত্রার দিক্ দিয়া একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই, সুতরাং ছন্দের আবশ্যকমত মাত্রার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

ইহার কারণ বুঝিতে গেলে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা দরকার। বর্ত্তমানে বাঙালীদের আদিপুরুষের খবর ভাল করিয়া জানা নাই। খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে যাঁহারা বাংলায় বাস করিতেন, তাঁহাদের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই। তবে তাঁহারা যে আর্য্য ছিলেন না এবং তাঁহাদের ভাষাও যে আর্য্য-ভাষা ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ী ও কোলদিগের ভাষার সহিত তাঁহাদের ভাষার নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে যখন আর্য্য-ভাষা বাংলায় প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিল, তখন নূতন নূতন আর্য্য কথার চল হইলেও আর্য্যাবর্ত্তের উচ্চারণ বাংলায় ঠিক চলিল না। কতক পরিমাণে হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদ চলিল বটে, কিন্তু

বাঁধা-ধরা নিয়ম করা গেল না, ছন্দে খাঁটি দেশী রীতি অর্থাৎ সমান ওজনের শ্বাস-বিভাগের পুনরাবৃত্তি করার রীতি রহিয়া গেল।

(২খ)

কথা বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না, ফুস্‌ফুসে বাতাস কমিয়া গেলেই ফুস্‌ফুসের সঙ্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে সেই সঙ্কোচনের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হয়। সেই জন্য কিছু সময় পরেই পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে। নিঃশ্বাস-গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ করা যায় না। যখন উত্তেজক ভাবের জন্য ফুস্‌ফুসের পার্শ্ববর্ত্তী পেশীসমূহের সাময়িক উত্তেজনা ঘটে, তখন সঙ্কোচন-জনিত আয়াস কম বোধ হয়, এবং সেই জন্য তত শীঘ্র বিরতির আবশ্যক হয় না। সেই জন্য উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা বা কবিতায় বিরতি তত শীঘ্র শীঘ্র দেখা যায় না।

সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে এ রকম বিরতির নাম যতি ("যতির্বিচ্ছেদঃ")। আমরা ইহাকে 'বিচ্ছেদ-যতি' বা শুধু 'ছেদ' বলিব। কারণ, বাংলায় আর এক রকমের যতির ব্যবহার আছে, এবং বাংলা ছন্দে সেই যতিরই প্রয়োজনীয়তা অধিক। সে সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে।

খানিকটা উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে। প্রত্যেক অংশ একটি পূর্ণ breath-group বা শ্বাস-বিভাগ এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া breath-pause বা ছেদ আছে। ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রত্যেক sentence বা বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাসবিভাগ বা কয়েকটি শ্বাসবিভাগের সমষ্টি। বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, এবং ইহাকে major breath-pause অর্থাৎ পূর্ণচ্ছেদ বলা যাইতে পারে। বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন phrase বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টির মধ্যে সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে minor breath-pause বা উপচ্ছেদ বলা যায়। প্রত্যেক শ্বাসবিভাগে কয়েকটি শব্দ থাকিতে পারে, কিন্তু উচ্চারণের সময় একই শ্বাসবিভাগের মধ্যে ধ্বনির গতি অবিরাম চলিতে থাকে।

পূর্ণচ্ছেদের সময়ে স্বর একটু দীর্ঘ কালের জন্য বিরতি লাভ করে। তখন নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। ইহাকে শ্বাস-যতিও বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু, যেখানেই ছেদ আছে, সেখানেই অর্থের পূর্ণতা ঘটে বলিয়া ইহাকে sense-pause বা ভাব-যতিও বলা যাইতে পারে। উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক শব্দসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; উপচ্ছেদ থাকার দরুণ বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, তাহা বুঝা যায়—একটি বাক্য অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। 'রামগিরি হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত* প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া* মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে * জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে**, সেখান হইতে* কেবল বর্ষাকাল নহে*, চিরকালের মতো* আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি**।" ("মেঘদূত", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

উপরের বাক্যটিতে যেখানে একটি তারকা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার সময় সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে; এইটুকু না থামিলে কোন্ শব্দের

সহিত কোন্ শব্দের অন্বয়, ঠিক বুঝা যায় না এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যটী অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যেখানে দুইটি তারা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ বুঝিতে হইবে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা হইয়াছে, বাক্যের শেষ হইয়াছে, এবং সেখানে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং নূতন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। কথার মধ্যে ছন্দোবন্ধের জন্য যে ঐক্যসূত্র আবশ্যক, ছেদের অবস্থানই অনেক সময় তাহা নির্দ্দেশ করে। সমপরিমিত কালানন্তরে অথবা কোন নক্সার আদর্শ অনুযায়ী কালানন্তরে ছেদের অবস্থান হইতেই অনেক সময় ছন্দোবোধ জন্মে। বাংলা পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি সাধারণ ছন্দে ছেদের অবস্থানই অনেক সময় ছন্দের বিভাগ নির্দ্দেশ করে। যেমন—

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল* | ঈশ্বরী পাটনী ** ॥
একা দেখি কুলবধূ* | কে বট আপনি ** ॥ ("অন্নদামঙ্গল", ভারতচন্দ্র)।

গগন-ললাটে* | চূর্ণকায় মেঘ* |
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে** ॥
কিরণ মাখিয়া* | পবনে উড়িয়া* |
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে** ॥ ("আশাকানন", হেমচন্দ্র)।

উপর্য্যুক্ত দুইটি দৃষ্টান্তে যে ভাবে অর্থবিভাগ, সেই ভাবেই ছন্দোবিভাগ হইয়াছে, উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান দিয়াই ছন্দোবোধ জন্মিতেছে।

কিন্তু অনেক সময়েই পদ্যে ছেদের অবস্থান দিয়া ছন্দের ঐক্যসূত্র নির্দ্দিষ্ট হয় না। যে পদ্যে ছেদের আবির্ভাবের কাল অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট, তাহা অত্যন্ত একঘেয়ে ও স্পন্দনহীন বোধ হয়, সুতরাং তাহাতে ভালরূপে মানসিক আবেগের দ্যোতনা হয় না। ইংরজীতে Pope পোপ্-এর Heroic Couplet এবং বাংলা ভারতচন্দ্রের পয়ারে এই জন্য একটা বিরক্তিকর একটানা সুর অনুভূত হয়। যে পদ্যের ছন্দঃ সহজেই মনে কোনও বিশেষ ভাবের উদ্দীপনা করে, তাহাতে ছেদের অবস্থান অত নিয়মিত থাকে না। মাইকেল মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছেদের অবস্থানের যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে বলিয়া তাহাতে নানা বিচিত্র সুর অনুভূত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছন্দের প্রাণ বৈচিত্র্যে, বৈচিত্র্য-হেতু আন্দোলনে, আবেগের সঞ্চারে। ঐক্যসূত্র ছন্দের কাঠাম, বৈচিত্র্য তাহার রূপ। যদি ছেদের অবস্থানের দ্বারা ছন্দের ঐক্যসূত্র সূচিত হয়, তবে বাক্যের অন্য কোন লক্ষণের দ্বারা বৈচিত্র্যের নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্বনির বিচ্ছেদেই শ্রবণ ও মনকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অভিভূত করে, সুতরাং ছেদ যদি ঐক্যের বন্ধন আনিয়া দেয়, তবে বাক্যের অন্য কোনও লক্ষণের দ্বারা যেটুকু বৈচিত্র্য সূচিত হয়, তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই জন্য ভাবের তীব্রতা যে ছন্দে প্রবল, যতি সেখানে বৈচিত্র্যের উপাদান হইয়া থাকে।

কিন্তু ছেদ ছাড়াও বাক্যের অন্যান্য লক্ষণের দ্বারা ঐক্য সূচিত হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্চারণ-প্রণালীর পার্থক্য অনুসারে বাক্যের কোন একটি লক্ষণ ঐক্যের উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়। কোনও জাতির ভাষায় বাক্যের যে লক্ষণ বাগ্‌যন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রয়াসের উপর নির্ভর করে এবং সেই জাতির সমস্ত ব্যক্তির উচ্চারণেই যে লক্ষণটি পূর্ণ ভাবে বজায় থাকে, তাহাই ঐক্যের উপাদানীভূত হইতে পারে।

ইংরাজীতে কোনও কোনও অক্ষরের উচ্চারণের সময় স্বরের গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া যায়, তাহাকে accent-ওয়ালা অক্ষর বলা হয়। এই accent-এর অবস্থানই ইংরেজী ছন্দের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু বাংলায় কোনও অক্ষর-বিশেষের উচ্চারণে স্বর-গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধির স্বাভাবিক ও নিত্য রীতি নাই, অর্থাৎ বাংলা অক্ষরের উপর স্বরাঘাতের এমন কোন স্থির রীতি নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ছন্দের ঐক্যসূত্র রচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জে ডি এণ্ডার্সন্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বাংলা শব্দের প্রথমে একটু স্বরাঘাত পড়ে। এই জন্যই বাংলা শব্দের শেষের দিকের অক্ষরগুলিতে স্বর অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং বোধ হয় সেই কারণেই বাংলায় তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য 'অ'-কার প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। আর্য্যভাষা বাংলায় আসিবার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশে যে সমস্ত ভাষার প্রচলন ছিল, তাহাদের উচ্চারণ-প্রথা হইতে বোধ হয় এই রীতি আসিয়াছে। এখনকার সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও বোধ হয় অনুরূপ রীতি আছে।

কিন্তু বাংলা শব্দের প্রারম্ভে যেটুকু স্বাভাবিক স্বরাঘাত পড়ে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়,—তাহা শ্রবণ বা মনকে আকৃষ্ট করে না। জিহ্বা নমনীয় ও ক্ষিপ্র বলিয়া এক ঝোঁকে অনেকগুলি শব্দ আমরা উচ্চারণ করিয়া যাই, এবং সেই জন্য প্রত্যেক শব্দের অক্ষর-বিশেষের উপর বেশী করিয়া স্বরাঘাত দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছু দুরূহ। সমান ভাবে সব কয়টি অক্ষর পড়িয়া যাইবার প্রবৃত্তি আমাদের বেশী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, "গত কয় বৎসর বাঙালা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই পাঠ্যপুস্তক শ্রেণিভুক্ত" (প্রফুল্লচন্দ্র রায়)।—এই রকম একটি বাক্য পাঠের সময় প্রত্যেক শব্দে উল্লেখযোগ্য স্বরাঘাত অনুভূত হয় না। কথিত ভাষায় যখন কোন একটি শব্দকে পৃথক্ ভাবে পড়া বা উচ্চারণ করা যায়, তখন শব্দের প্রারম্ভে একটু স্বরাঘাত পড়ে বটে, কিন্তু ইংরেজী শব্দে accent-ওয়ালা অক্ষরের যে রকম প্রাধান্য, বাংলার শব্দের প্রথম অক্ষরের ধ্বনির দিক্ দিয়া সে রকম প্রাধান্য নয়। 'দেখ্‌বি', 'ভেতর' প্রভৃতি শব্দের প্রারম্ভে যে স্বরাঘাত হয়, dist´inctly, rem´ember প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের accent-ওয়ালা অক্ষরের উপর স্বরাঘাত তার চেয়ে ঢের বেশী।

বাংলা কথায় যে স্বরাঘাত স্পষ্টরূপ অনুভূত হয়, তাহা শব্দ-গত নয়, শব্দসমষ্টি-গত। কয়েকটি শব্দে মিলিয়া যে অর্থবাচক বাক্যাংশ গড়িয়া উঠে, তাহারই প্রথম দিকের কোন শব্দে স্পষ্ট স্বরাঘাত পড়ে। পূর্ব্বে "শ্রীকান্ত" হইতে যে অংশটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার বিভাগগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি বিভাগে বা প্রতি বাক্যাংশে মাত্র একটি শব্দের কোনও একটি অক্ষরের উপর সুস্পষ্ট জোর পড়িতেছে। যেমন—'এই´ত চাই; | কিন্তু আ´স্তে ভাই, | ব্যাটারা ভা´রি পাজী |' বাক্যাংশের মধ্যে অর্থের ও অবস্থানের দিক্ দিয়া প্রাধান্য পাইলে যে-কোনও শব্দে স্বরাঘাত পড়িতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক ও নিত্য স্বরাঘাত প্রত্যেক শব্দে স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় না। প্রতি বাক্যাংশে যে স্বরাঘাত দেখা যায়, তদ্দ্বারা বাক্যের ছন্দোবিভাগ সহজে প্রতীত হয় এবং ছন্দতরঙ্গের শীর্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই স্বরাঘাত ছন্দোবিভাগের ও অর্থবিভাগের ফল, হেতু নহে; সুতরাং স্বরাঘাত বাংলায় ছন্দোবিভাগের ঐক্যসূত্র নির্দ্দেশ করিতে পারে না।

পরিমিত কালানন্তরে বাক্‌যন্ত্রে নূতন করিয়া শক্তির সঞ্চারই বাংলায় ছন্দোবিভাগের সূত্র।

বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্র খুব ক্ষিপ্র ও নমনীয় বটে, কিন্তু ইহার ক্লান্তিও শীঘ্র ঘটে। নিঃশ্বাস-গ্রহণের পর হইতে পরবর্ত্তী পূর্ণচ্ছেদ না আসা পর্য্যন্ত এক রকম অনর্গল বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া চলিতে থাকে এই সময়ের মধ্যে অনেক অক্ষর উচ্চারিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বেই কিছু বিশ্রাম বা বিরামের আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে সমস্ত ভাষায় দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহার আছে, তাহাতে স্বর উচ্চারণের সময় জিহ্বা কিছু বিরাম পায়; সুতরাং ভিন্ন করিয়া "জিহ্বেষ্টবিরামস্থান" নির্দ্দেশ করার দরকার হয় না। কিন্তু বাংলায় দীর্ঘস্বরের ব্যবহার খুবই কম, সুতরাং ছেদ ছাড়াও জিহ্বেষ্টবিরামস্থান রাখিতে হয়। এক এক বারের ঝোঁকে জিহ্বা কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য এই বিরামের আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক ঝোঁকে পুনশ্চ কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ হয়। এই বিরামস্থলকে বিরামযতি বা শুধু 'যতি' নাম দেওয়া যাইতে পারে। যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি impulse বা ঝোঁকের শেষ এবং তাহার পরে আর একটি ঝোঁকের আরম্ভ।

আমরা ছেদ ও যতি অথবা breath pause অর্থাৎ বিচ্ছেদযতি ও metrical pause বা বিরামযতি এই দুইয়ের পার্থক্য দেখাইতেছি। সংস্কৃতে ছন্দঃশাস্ত্রে এ রকম পার্থক্য স্বীকৃত হয় না। সংস্কৃতে "যতির্জিহ্বেষ্টবিরামস্থানম্" এবং "যতির্বিচ্ছেদঃ" এই দুই রকম সংজ্ঞাই আছে। সংস্কৃত ছন্দোবিদ্‌দের ধারণা ছিল যে, যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটিবে, সেই সময়েই জিহ্বা বিরামলাভ করিবে এবং অন্য সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলিবে। কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, যখনই দীর্ঘস্বর উচ্চারিত হয়, তখনই জিহ্বা সামান্য কিছু বিরাম পায় এবং পায় বলিয়াই ২৮ মাত্রা বা ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসাইলে চলিতে পারে।

যাহা হউক বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতি—এই দুই রকম বিভাগস্থল স্বীকার করিতে হইবে। ছেদ যেমন দুই রকম—উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ, যতিও সেইরূপ মাত্রাভেদে দুই রকম—অর্দ্ধযতি ও ও পূর্ণযতি। ক্ষুদ্রতম ছন্দোবিভাগগুলির মধ্যে অর্দ্ধযতি এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগগুলির মধ্যে পূর্ণযতি থাকে।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় ছেদ ও যতি এক সঙ্গেই পড়ে। উপচ্ছেদও অর্দ্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি অবিকল মিলিয়া যায়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং হেমচন্দ্রের আশা-কানন হইতে পূর্ব্বে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেখানে এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু সব সময়ে তাহা হয় না। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের জন্যই তাহার শক্তি ও বৈচিত্র্য এত অধিক। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছাড়াও অনেক সময় ছেদ ও যতি ঠিক্ ঠিক্ মিলিয়া যায় না; অথবা, পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি মিলিলেও উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি মেলে না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

(*, * * এই সঙ্কেত দ্বারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং ।, ॥ এই সঙ্কেত দ্বারা অর্দ্ধযতি ও পূর্ণযতি নির্দ্দেশ করিতেছি)।

(১) কৈলাস শিখর * । অতি মনোহর * । কোটি শশী পর । কাশ * * ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর * । যক্ষ বিদ্যাধর * । অপ্সরোগণের । বাস * * ॥

(২) আর—ভাষাটাও তা | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়া * * ||
আর—ভাবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | দেয় না কো সে | সাড়া ; * * ||
সে—হাজারি পা | দুলাই, * গোঁফে | হাজারি দিই | চাড়া ; * * ||
—('হাসির গান', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

(৩) একাকিনী শোকাকুলা | অশোক কাননে ||
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা * | আঁধার কুটীরে ||
নীরবে। * * দুরন্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়া ||
ফেরে দূরে, মত্ত সবে | উৎসব-কৌতুকে || * *
—('মেঘনাদবধ কাব্য,' ৪র্থ সর্গ, মধুসূদন)।

(৪) এই | প্রেমগীতিহার * ||
গাঁথা হয় নরনারী | মিলন মেলায় * ||
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ | বঁধুর গলায় || * — ('বৈষ্ণব কবিতা,' রবীন্দ্রনাথ)।

যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে। পরিমিত কালানন্তরে কোন নক্সার আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই। কিন্তু ছেদ সময়ে সময়ে বিচিত্রভাবে ছন্দোবিভাগের মাঝে মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা স্রোতের স্থানে বিচিত্র আন্দোলন সৃষ্টি করে। যখন যতির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়, তখন যতিপতনের সময় ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে ; শুধু জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা drawl বা দীর্ঘ টানে পর্য্যবসিত হয়। আবার জিহ্বা যখন impulse বা ঝোঁকের বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়া থাকে ; তখন মুহূর্ত্তের জন্য ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্তু জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণ করে না, ঝোঁকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নূতন ঝোঁকের আরম্ভ হয় না। ছেদ sense বা অর্থ অনুসারে পড়ে ; সুতরাং ইহার দ্বারা পদ্য অর্থানুযায়ী অংশে বিভক্ত হয়। বাগ্‌যন্ত্রের সামর্থ্যানুসারে যতি পড়ে। ইহার দ্বারা পদ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক ছন্দোবিভাগ বাগ্‌যন্ত্রের এক এক বারের ঝোঁকের মাত্রানুসারে হইয়া থাকে। এক এক ঝোঁকে পরিমিত মাত্রার শ্বাস ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হয়। এই ঝোঁকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের ঐক্যের লক্ষণ।

কেহ কেহ বলেন যে, পরিমিত কালানন্তরে স্বরাঘাতযুক্ত অক্ষর থাকাতেই ছন্দোবিভাগের বোধ জন্মে। কিন্তু এ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অবশ্য যে শব্দ কয়টি লইয়া এক একটি ছন্দোবিভাগ গঠিত হয়, মিলিত ভাবে তাহাদের অনেক সময় একটি sense group বা অর্থবাচক বাক্যাংশ বলা যাইতে পারে, সুতরাং সেই শব্দসমষ্টির প্রথমে একটি স্বরাঘাত পড়িতে পারে। সুতরাং সময় সময় মনে হইতে পারে যে, স্বরাঘাতের অবস্থান হইতেই ছন্দোবিভাগ সূচিত হইতেছে। যথা,—

(১) বাঁ´শ বাগানে | মা´থার উপর | চাঁ´দ উঠেছে | ঐ´।—(যতীন্দ্র বাগচি)।

(২) ব´উমা ! বউমা ! | ঘু´মাও না আর ||
উ´ঠ অভাগিনি ! | দে´খ একবার !| —("চৈতন্য সন্ন্যাস", শিবনাথ শাস্ত্রী)।

কিন্তু সব সময়েই এ রকম হয় না। অনেক সময়ই ছন্দোবিভাগের শব্দ কয়টি লইয়া কোন

অর্থবাচক বাক্যাংশই হয় না। অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের ঠিক্ ঠিক্ মিল হয় না। পূর্ব্বে 'হাসির গান' হইতে যে কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের কোন মিল নাই। তা' ছাড়া বাক্যাংশের ঠিক্ প্রথম অক্ষরেও সব সময়ে স্বরাঘাত পড়ে না। সর্ব্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়াবিভক্তি ইত্যাদি দিয়া কোন বাক্যাংশ আরম্ভ হইলে, তাহাদের বাদ দিয়া পরবর্ত্তী কোন শব্দে স্বরাঘাত পড়ে। অর্থগৌরব অনুসারে বাক্যাংশের শব্দবিশেষে স্বরাঘাত পড়াই রীতি। তা' ছাড়া পদ্যের চরণে একেবারে স্বরাঘাত-হীন একটি ছন্দোবিভাগ অনেক সময় থাকে যেমন সঙ্গীতের তালবিভাগে স্বরাঘাত-হীন একটি অঙ্গ (খালি বা ফাঁক্) সময়ে সময়ে থাকে, স্বরাঘাতযুক্ত শব্দে যুক্তবর্ণ থাকিলে শব্দের প্রথম অক্ষরে স্বরাঘাত না পড়িয়া যুক্তবর্ণের পূর্ব্ব অক্ষরে পড়িয়া থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

(১) এ যে সঙ্গীত | কোথা হ'তে উঠে
এ যে লাবণ্য | কোথা হ'তে ফুটে
এ যে ক্রন্দন | কোথা হ'তে টুটে
অন্তর বিদা | রণ

(২) শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুঁই, | আর সবি গেছে | ঋণে
বাবু কহিলেন, | "বুঝেছ উপেন, | এ জমি লইব | কিনে
কহিলাম আমি | "তুমি ভূস্বামী | ভূমির অন্ত | নাই

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, স্বরাঘাতের অবস্থান দিয়া ছন্দোবিভাগের সূত্র নির্দ্দিষ্ট হয় না।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। বাংলার এক একটি ছন্দোবিভাগ সংস্কৃতের 'পাদ' বা ইংরেজীর foot নয়। সংস্কৃত ছন্দের পাদ মানে একটি শ্লোকের চতুর্থাংশ। তাহার মধ্যে কয়েকটি গণ, একাধিক ছেদ, এবং প্রতি গণে দীর্ঘস্বরের সমাবেশ অনুসারে বিরাম স্থল থাকিতে পারে। ইংরেজীতে foot, মানে accent অনুসারে অক্ষর বিন্যাসের একটি আদর্শ মাত্র। ইংরেজীতে foot-র শেষে কোনরূপ যতি বা বিরাম থাকার আবশ্যকতা নাই, শব্দের মধ্যে যেখানে কোনরূপ বিরামের অবকাশ নাই, সেখানেও foot-র শেষ হইতে পারে। বাংলা ছন্দের এক একটি বিভাগ এইরূপ একটি আদর্শ মাত্র নহে। ইংরেজী foot ও বাংলা ছন্দোবিভাগ, এক মনে করার দরুণ অনেক সময় দারুণ ভ্রমে পতিত হইতে হয়। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে জনৈক লেখক—

'হায় রে বন্ধু দুঃখ মোর সে বল্‌তে চক্ষে ঝর্‌ছে জল—

চরণটির ছন্দলিপি—এই ভাবে ক'রেছেন,—

হায় রে | বন্ধু | দুঃখ | মোর সে | বল্‌তে | চক্ষে | ঝরছে | জল্

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যাঁর বোধ আছে, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, ইহার ছন্দলিপি হইবে—

হায় রে বন্ ধু | দুঃখ মোর সে | বল্ তে চক্ষে | ঝর্ ছে জল

বাংলায় (অথবা কোন ভাষাতেই) এক চরণের আটটি বিভাগ হয় না। তা' ছাড়া লেখক যে রকম ঘন ঘন স্বরাঘাত দেখাইয়াছেন, বাংলায় তদ্রূপ হইতে পারে না। এক একটি

অর্থবাচক বাক্যাংশে মাত্র একটি স্বরাঘাত পড়ে। মাত্র এক অক্ষর ব্যবধানে স্বরাঘাত পড়া বাংলায় সম্ভব নয়। ইংরেজী *foot* ও বাংলা ছন্দোবিভাগ মিলাইতে গিয়াই লেখক এতাদৃশ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে তালের হিসাবে যাহাকে বিভাগ বলা হয়, তাহার সহিত ছন্দোবিভাগের মিল আছে। *সংস্কৃতে যাহাকে 'পর্ব্বন্' বলা যায়, তাহাই বাংলা ছন্দোবিভাগের অনুরূপ।* বর্ত্তমান প্রবন্ধে **পর্ব্ব** শব্দের দ্বারা ছন্দোবিভাগ নির্দ্দেশ করা হইবে। পরিমিত মাত্রার পর্ব্ব দিয়া বাংলা ছন্দ গঠিত হয়। এক এক বারের ঝোঁকে ক্লান্তি বোধ বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম পর্ব্ব। পর্ব্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন
ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী

আধুনিক সাহিত্যের প্রথম যুগে যাঁহারা বাঙ্গালা নাটক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে, নীলমণি পাল 'রত্নাবলী নাটিকা' (১৮৪৯), তারাচরণ শিকদার 'ভদ্রার্জ্জুন' [১] (১৮৫২) ও হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' [২] (১৮৫৩) লিখিয়াছিলেন, তথাপি এই তিনটি অধুনা-বিস্মৃত নাটক কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই। রামনারায়ণের প্রথম নাটক 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও মুদ্রিত, এবং বোধ হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়। ইহার পূর্ব্বে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার বাসভবনে স্থাপিত রঙ্গমঞ্চে, কোন অজ্ঞাতনামা লেখক কর্ত্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত একমাত্র 'বিদ্যাসুন্দর'-এর [৩] অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চ স্থায়ী হয় নাই, এবং নাটকখানি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের রীতি ও রুচি অনুযায়ী না হওয়াতে বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। ইহার পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে [৪] রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয় কলিকাতা নূতন বাজারে,

---

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২৪, পৃঃ ৪২—৫৮। নীলমণি পাল-রচিত 'রত্নাবলী নাটিকা' (পত্র সংখ্যা ২১৬) শ্রীহর্ষের নাটিকা অবলম্বনে গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহার পরিচয়-পত্রে কলিকাতা ১৭৭১ শকাব্দে—এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। যতদূর অনুসন্ধানে জানা যায়, ইহাই প্রথম বাঙ্গালা নাটক। ইহার ভাষা কিন্তু পণ্ডিতী ধরণের, এবং পুস্তকেই উল্লিখিত রহিয়াছে যে, পণ্ডিত চন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ ইহা সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে আছে।

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩৩৩, পৃঃ ১৪১—১৬২।

৩। প্রবাসী, ১৩৩৮, আষাঢ়, পৃঃ ৩০৮; শ্রাবণ, পৃঃ ৪৯১। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়ো বাগানবাটীতে যে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন বাঙ্গালা নাটক অভিনীত হয় নাই। সাধারণতঃ ইংরেজী নাটক ও হোরেস হেম্যান উইলসন-অনূদিত উত্তররামচরিত প্রভৃতির অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেইরূপ, হারমান জেফ্রয়ের তত্ত্বাবধানে ওরিএণ্টাল সেমিনারীতে সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' প্রভৃতির অভিনয় হয়। বাঙ্গালা নাটক বা নাট্যশালার সম্পর্কে ইহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৪। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ দাস দত্ত নামক ইংরেজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য কোন ব্যক্তি 'অনুতাপিনী নবকামিনী' (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২৪) নামক একখানি ষড়ঙ্ক নাটক গদ্যে রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। ইহা Rowe প্রণীত Fair Penitent নামক ইংরেজী নাটকের অনুবাদ মাত্র। মূলের বিদেশী নাম ইত্যাদি রক্ষিত হইয়াছে; ভাষা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট। ইহাতে ব্যভিচার, খুন, আত্মহত্যা প্রভৃতি যে লোমহর্ষণ ঘটনাবলী আছে, তাহাও ইংরেজী মূলের অনুযায়ী। হুগলী-জেলা-নিবাসী তারকচন্দ্র চূড়ামণির বহু-বিবাহ-বিষয়ক 'সপত্নী-নাটক' (প্রথম ভাগ, পত্রসংখ্যা ১৪৮; দ্বিতীয় ভাগ, বোধ হয়, আর প্রকাশিত হয় নাই) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যে 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' নাটকের একটি অক্ষম অনুকরণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক ভাষা (পুরুষদের ভাষা যেমন সংস্কৃত-বহুল, স্ত্রীলোকদের ভাষা তেমনি খেলো), চরিত্রবাহুল্য, শোকাবহ ঘটনায় আতিশয্য, তিন চার পৃষ্ঠাব্যাপী পদ্যে ও গদ্যে স্বগতোক্তি ও কথোপকথন প্রভৃতি দোষের জন্য এই নাটক মোটেই অভিনয়োপযোগী নহে, এবং কুত্রাপি ইহা অভিনীত হয় নাই। ইহার তিনটি অঙ্ক আছে, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে দৃশ্য-বিভাগ নাই। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটক বোধ হয়, ইহার কিছু পূর্ব্বে রচিত; কারণ, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের

পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয় যথাক্রমে বাঁশতলার গলিতে ও চুঁচুড়ায় হইয়াছিল। যদিও নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ৫ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি কলিকাতা সিমলার আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) ভবনে ৩০শে জানুয়ারী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার যে প্রথম অভিনয় (দ্বিতীয় অভিনয় ২২ শে ফেব্রুয়ারী) হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয়ের পরবর্ত্তী। ইহার প্রায় দুইমাস পরে, ৯ই এপ্রিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াসাঁকো বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীন রঙ্গমঞ্চ, রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় দ্বারা আরব্ধ হয়। এই রঙ্গমঞ্চ বোধ হয় ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয়। ইহাতে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্ব্বশী' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী-সত্যবান্' (১৮৫৮) ও 'মালতী-মাধব' (১৮৫৯) নাটকও অভিনীত হইয়াছিল। এই সমস্ত অভিনয় দর্শনে উৎসাহিত হইয়া, যখন পাইকপাড়ার রাজারা তাঁহাদের বেলগাছিয়ার উদ্যানবাটীতে নূতন নাট্যশালা স্থাপনের উদ্যোগ করেন, তখন রামনারায়ণের 'রত্নাবলী', ৩১ শে জুলাই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, এই নাট্যশালার সূত্রপাত করে। তারপর, দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্রনাথ তাঁহাদের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি' স্থাপন করেন; ৫ই জানুয়ারী ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহারও প্রথম অভিনীত নাটক রামনারায়ণের 'নবনাটক'। এইরূপ যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা ভবনস্থ রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'মালতীমাধব', 'রুক্মিণী-হরণ' ও তিনখানি প্রহসন ১৮৬৬ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অভিনীত হয়। তখনও বাঙ্গালায় স্থায়ী বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় নাই; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে এইরূপ নাটকাভিনয় হইতেই আধুনিক বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যশালার উৎপত্তি। সে সময় এই সকল নাটক রচনার অগ্রণী ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। অন্ততঃ তৎকালীন তিনটি সুপ্রসিদ্ধ অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চের সূত্রপাত হইয়াছিল তাঁহারই নাটকাভিনয়ের দ্বারা, এবং চতুর্থ রঙ্গমঞ্চটিতেও তাঁহার অনেকগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহার এরূপ খ্যাতি ছিল যে, তিনি সাধারণের নিকট 'নাটুকে রামনারাণ' এই নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

চব্বিশ পরগণা হরিনাভি গ্রামে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে (= ১২২৯ বঙ্গাব্দে) রামধন ভট্টাচার্য্য শিরোমণি নামক কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঔরসে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হরিনাভি বাসভবনে প্রাপ্ত স্বলিখিত কাগজপত্রে তিনি নিজের সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন,

---

তারিখ, ভবানীপুর, ১৮৫৭ ; কিন্তু ইহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির উদ্যোগে, যড়বাজার সিন্দূরেপটী গোলাপলাল মল্লিকের বাটীতে। এই সময় আরও দুই একটি অধুনাবিস্মৃত বাঙ্গালা নাটক রচিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়-রচিত 'বিধবোদ্বাহ নাটক' (শক ১৭৭৮ = খ্রীঃ অঃ ১৮৫৬ ; পাঁচ অঙ্ক, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫২), নারায়ণ চট্টোরাজ গুণনিধি-রচিত 'কলিকৌতুক', অর্থাৎ 'কলির আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ' (চার অঙ্ক, পৃঃ-সংখ্যা ১২৩ ; শ্রীরামপুর, ১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ। তৎকালীন হিন্দু-সমাজের চিত্র) এবং উমাচরণ দে-রচিত 'নল-দময়ন্তী' (কলিকাতা ১৮৫৯, পৃঃ সংখ্যা ৮+১৫০) প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য কিন্তু ইহাদের অভিনয়ের কোনও বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

৫। ইহার ইংরেজী পরিচয়-পত্রে প্রদত্ত বর্ণনা কৌতুককর। The Oviguan Sakantollah of Kalidass, translated into Bengalee from the original by Nundo Coomar Roy. Calcutta, 1855 (pp. 176), ইহার বাঙ্গালা নাম 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক'। নন্দকুমার 'ব্যাকরণদর্পণ' (১৮৫২) নামক পদ্যে একটি বাঙ্গালা ব্যাকরণও লিখিয়াছিলেন। ছাতুবাবুর ভবনে জুন, জুলাই ১৮৫৭ সালে (ভাদ্র ১২৬৪), 'মহাশ্বেতা' নামক নাটকও অভিনীত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অন্য আর কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না।

তাহা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'ভারতবর্ষে' ৬ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে রামনারায়ণ লিখিয়াছেন, "আমি বাল্যকালে দেশে ও বিদেশে চতুষ্পাটীতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ ও ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড অধ্যয়ন করি।" পরে, পিতৃমাতৃহীন রামনারায়ণ, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের আশ্রয়ে থাকিয়া, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (= ১২৫০ বঙ্গাব্দে) উক্ত কলেজে কিছুকাল অধ্যয়নের জন্য প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, দুই বৎসর হিন্দু মেট্রোপলিটন্ কলেজে হেড-পণ্ডিতী করিয়া, ১৮৫৫ সালের ১৭ই জুন তারিখে সংস্কৃত কলেজে কাব্য ও অলঙ্কারের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ সালে পেন্সন গ্রহণ করিয়া, ১৯ শে জানুয়ারী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে (৭ই মাঘ, ১২৯২ সনে) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইংরেজী ভাষা বা সাহিত্যে তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন না, কিন্তু 'নবনাটক' পাঠে বুঝা যায় যে, ইংরেজী ভাষাতেও তাঁহার কিছু দখল ছিল।

রামনারায়ণের প্রথম রচনা 'পতিব্রতোপাখ্যান' ৭ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে (= ১২৫৯ সনে) লিখিত, এবং পর বৎসর ২৩ শে জানুয়ারী তারিখে শোভাবাজারে ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার দুই বৎসর পরে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' লিখিয়া তিনি প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে যশোলাভ করেন। এই রচনার ইতিহাস তিনি স্বয়ং উক্ত নাটকের 'বিজ্ঞাপনে' এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন,—

৬। ভারতবর্ষ, ৪র্থ বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২৩, পৃঃ ৭১০—৭১২। অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'শিল্পকুসুমাঞ্জলী' (প্রথম খণ্ড, ১৮৮৬ খ্রীঃ অঃ) পত্রিকায় রামনারায়ণের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায় যে, রামনারায়ণ প্রথম মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন, পরে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন।

৭। ইহার দীর্ঘ পরিচয়-পত্র এইরূপ : নমো জগদীশ্বরায়। | পতিব্রতোপাখ্যান। | জিলা রঙ্গপুরান্তঃপাতি কুণ্ডীনিবাসি ভূম্যধিকারি | শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চতুধুরি মহাশয়ের আদেশে | কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষিত সুশিক্ষিত | শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য | রচিত | কলিকাতা শোভাবাজারীয় সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত | হইল। | ১২৫৯ শাল ১১ মাঘ। | ইংরেজী ১৮৫৩ শাল ২৩ জানুয়ারী। | Printed by Shibo Krist Mitter.] পুস্তকটি ঠিক উপাখ্যান নহে; পতিব্রতা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ (পত্র-সংখ্যা ৯৪)। পতিব্রতার লক্ষণ, পতিব্রতা-মাহাত্ম্য, মৃতপতিকার ধর্ম্ম, আধুনিক সময়ে প্রচলিত কৌলীন্য ইত্যাদি প্রথার দোষ, পুরাণাদি-প্রোক্ত অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত চরিত-কীর্ত্তন ইত্যাদি এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই রচনার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য ইহার "ভূমিকা" হইতে প্রতীয়মান হইবে :—"জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি কুণ্ডীস্থানীয় ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চতুধুরি মহাশয় ৫০ টাকা পারিতোষিক শিরোনামাঙ্কিত এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে লেখেন "পতিব্রতাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম পবিত্রতা চরিত্র চিহ্নাদি বিষয়ে 'পতিব্রতোপাখ্যান' নামে এক মনোনীত গ্রন্থ যিনি লিখিতে পারিবেন তাহাকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দিবেন", তাহা পাঠে অনেকে পতিব্রতোপাখ্যান লিখিয়া বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার সভাপণ্ডিত মহাশয়েরা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া সংস্কৃত কলেজীয় সুপরীক্ষিত সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের লিখিত এই গ্রন্থ মনোনীত করেন। পরে বাবুর অনুজ্ঞায় আদর্শ পুস্তক ভাস্কর যন্ত্রাগারে আসিয়াছিল, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ন্যূনাধিক ১৫০ দেড়শত টাকা ব্যয়ে ইহা মুদ্রাঙ্কিত করাইলেন। যে সকল স্ত্রীলোকেরা পাতিব্রত্যের অভিলাষ করেন এবং পুরুষগণ মধ্যে যাঁহারা পতিব্রতা নারীপরায়ণ হইতে অভিলাষী হয়েন তাঁহারা এই 'পতিব্রতোপাখ্যান' দর্শনীয় জ্ঞান করুন।"

"পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মর্য্যাদা মধ্যে স্বকপোল-কল্পিত কুল-মর্য্যাদার প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থা-গ্রস্থ হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম্, তন্নিমিত্ত "পতিব্রতোপাখ্যানে" প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে, [পৃঃ ১৬—১৯] পরে রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্ধুরীণ মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন্, তাহার মর্ম্ম এই যে "বল্লাল সেনীয় কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাঁহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" পরে আমি তাহা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাতে উক্ত গুণগ্রাহি দেশহিতৈষি মহোদয় তদ্দৃষ্টে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া অঙ্গীকৃত ৫০ টাকা আমাকে পারিতোষিক দিয়াছেন এবং অসামান্য বদান্যতাশালী উক্ত মহানুভব আমার প্রার্থনানুসারে পুস্তকও আমাকে দেন, আমি তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম॥

এই নাটক ১৮৫৪ সালে রচিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়[৮]। উল্লিখিত আত্মকথায় রামনারায়ণ স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, "এই নাটক কলিকাতা নূতনবাজারে ও বাঁশতলার গলিতে ও চুঁচুড়াতে অভিনীত হয়।" নূতনবাজার বলিয়া অভিনয়ের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার দ্বারা বোধ হয়, জোড়াসাঁকো চড়কডাঙ্গা জয়রাম বসাকের বাস-ভবন বুঝিতে হইবে,[৯] এবং খুব সম্ভব ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থলে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। পরে ২২শে মার্চ্চ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঁশতলার গলিতে গদাধর শেঠের বাটীতে দ্বিতীয় অভিনয় হইয়াছিল। তৃতীয় অভিনয় চুঁচুড়ার কোন স্থলে হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। রামনারায়ণের জীবদ্দশায় এই নাটকের পর পর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই নাটকের প্রথমেই সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিতে নান্দী, প্রস্তাবনা ইত্যাদি আছে, এবং নাটকের মধ্যে পটপরিবর্ত্তনাদি নাই। ইহার 'বিজ্ঞাপনে' গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার কথাবস্তুর এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন,—

এই নাটক ষড়্ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ির দোষোদ্-ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরিদেবন। ষষ্ঠে, বিবাহনির্ব্বাহ ও গ্রন্থসমাপ্তি।

৮। ইহার প্রথম সংস্করণের টাইটেল-পেজ বা পরিচয় পত্র এইরূপ। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব | নাটক: শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা | প্রণীত। | কলিকাতা শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ইষ্টার্নহোপ, | যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। | সম্বৎ ১৯১১ | পুস্তকের পত্রাসংখ্যা ৬+১১৭। তৃতীয় সংস্করণ কলিকাতা ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ (পৃঃ ২+২+১১৯); পঞ্চম সংস্করণ (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৮), কলিকাতা ১৮৭৯।

৯। তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'বেণীসংহার' সম্বন্ধে রামনারায়ণ আরও স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে, ইহার দ্বিতীয় অভিনয় "নূতন বাজারে বাবু জয়রাম বশাখের বাটীতে" হইয়াছিল। ইহা হইতে বোধ হয় যে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয়ও এইস্থানে হইয়াছিল।

কিন্তু নাটকের এই ছয়টি বিভিন্ন অংশ পরস্পরাপেক্ষী নহে, বরং পঞ্চমটি অপ্রাসঙ্গিক। সমস্ত নাটকের মধ্যে একটি বাঁধুনীর অভাব লক্ষিত হইবে। কৌলীন্য-মর্য্যাদাভিমানী কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া পরদিন অতিবৃদ্ধ কুলীনপাত্রে কন্যা-চতুষ্টয় সম্প্রদান করাই ইহার স্থূল তাৎপর্য্য; কিন্তু এই সামান্য আখ্যান-বস্তু নির্ম্মাণে কোন নিপুণ নাট্য-কৌশল দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা নাটক নহে; কথোপকথন ও রঙ্গচিত্রের ছলে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া প্রবন্ধ মাত্র রচনা করা হইয়াছে। বিবিধ অবান্তর বিষয়ের অবতারণা, অনর্থক অভিমত প্রকাশ, ভাঁড়ামী, ব্যঙ্গোক্তি, বক্তৃতা এবং ত্রিপদী-পয়ারাদি ছন্দে দীর্ঘবর্ণনা [১০] ইত্যাদি ইহার নাট্যবস্তুর অবাধ গতিকে ব্যাহত করিয়াছে। আখ্যান-বস্তুর সাহায্যে বা ঘটনাপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রগুলি ফুটাইয়া তোলা অপেক্ষা, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ চরিত্র লইয়া, সামাজিক চিত্র বা প্রসঙ্গের একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। কোন dramatic action বা plot নাই বলিলেও চলে। কুলপালক, অনৃতাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র সুন্দর অঙ্কিত হইলেও, চরিত্রগুলির নামকরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, সেগুলি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতীকরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। নাটকের অনেকগুলি প্রসঙ্গ মূল-বিষয়ের সহিত সম্পর্করহিত। তৃতীয় অঙ্কে দেবল ও রসিকার প্রসঙ্গ, অথবা চতুর্থ অঙ্কে মহিলা মাধুরীর কথোপকথন যে কেবল সুরুচি-বিগর্হিত তাহা নহে, এগুলি বাদ দিলেও নাটকের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হইত না। তেমনি সুমতি ও উদরপরায়ণের রহস্য উপাদেয় হইলেও, স্থূল ও অবান্তর। মোট কথা, এই নাটকটি একটি সামান্য কৃত্রিম মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া, তৎকালীন সমাজ-বিশেষের চিত্রস্বরূপ সংলগ্ন বা অসংলগ্ন দৃশ্য ও প্রসঙ্গের সমষ্টিমাত্র। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সামাজিক বিষয় লইয়া এই প্রথম নাটক রচনার চেষ্টা; ইহা ঠিক নাটক না হইলেও, সামাজিক রঙ্গচিত্র হিসাবে সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকারের স্বভাবাঙ্কন শক্তি, ভাষার উপর অধিকার, জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর, নিত্যদৃষ্ট পরিচিত ঘটনা বা চরিত্র অঙ্কনে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও প্রাঞ্জলতা, অঙ্কিত দৃশ্যের স্পষ্টানুভূতি ও তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এই হিসাবে, বাঙ্গালা সাহিত্যে রামনারায়ণের এই প্রথম নাটকের মূল্য যথেষ্ট।

প্রহসন ও পৌরাণিক নাটকগুলি ছাড়িয়া দিলে, রামনারায়ণের অন্যান্য অধিকাংশ নাটক সংস্কৃতের ভাবানুবাদ। অবিকল অনুবাদ করিলে অনুবাদকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না, এবং রচনাও বাঙ্গালায় সুপাঠ্য বা অভিনয়োপযোগী হইত না। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে (১৮৫৭) অক্ষরানুযায়ী অনুবাদের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই জন্য রামনারায়ণ এই সকল নাটকে যথেষ্ট স্বাধীনতা লইয়া অনেক স্থলে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদি করিয়াছেন। 'বেণী-সংহার' নাটকের বিজ্ঞাপনে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, "এ অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহে, স্থান বিশেষে কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।" শুধু তাহাই নহে, অনেক স্থলে নূতন দৃশ্যের বা চরিত্রের সমাবেশ এবং স্বকল্পিত

১০। যথা, 'ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু'চারি আদার কুচি' ইত্যাদি ফলারের বর্ণনা। ভাষা প্রায় সরস ও প্রাঞ্জল, কিন্তু স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ বক্তৃতার ভাষায়, পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃতের মায়া একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী কোন নাটক এতটা সংস্কৃত-ঘেঁষা নহে। পুস্তকখানি আধুনিক সময়ে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং দুষ্প্রাপ্য নহে; সেই জন্য এখানে নমুনা উদ্ধৃত করিবার দরকার নাই।

বাক্যেরও প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে প্রায় কোথাও মূলের বিরুদ্ধ বা অসমঞ্জস ভাব ব্যক্ত হয় নাই। মূলের শ্লোকগুলি পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে অনুবাদ না করিয়া তাহাদের ভাবার্থ গদ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। কোন স্থলে সমস্ত শ্লোকটি অনুবাদ না করিয়া, নাট্যবস্তুর জন্য যেটুকুর প্রয়োজন, সেইটুকু মাত্র দেওয়া হইয়াছে। যথা 'বেণীসংহার' নাটকের "অন্যোন্যাস্ফালভিন্নদ্বিপরুধির" ইত্যাদি শ্লোকটির সমুদয় অনুবাদ না করিয়া, শুধু শেষপদের ভাবার্থ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে,—"যুদ্ধস্বরূপ সমুদ্র দুস্তর, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহা উত্তীর্ণ হইতে অত্যন্ত পণ্ডিত, তা ভয় নাই চল্‌লেম" ইত্যাদি। রসের পুষ্টির জন্য, সংস্কৃত নাটকের কাব্য-সৌন্দর্য্যের আধার-স্বরূপ ইহার শ্লোকাংশ অপরিহার্য্য; সুতরাং সর্ব্বত্র শ্লোকগুলির গদ্যে অনুবাদ করিয়া বা ভাবার্থ সঙ্কলন করিয়া মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দ সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বা উপযুক্ত নহে; তাহা ত্যাগ করিয়া অনুবাদক ভালই করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার পরবর্ত্তী 'মালতী-মাধব' (১৮৫৯) নাটকে এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। রঙ্গভূমিতে পয়ারে রোদন, ত্রিপদীতে রাগ বা মালঝাঁপ ছন্দে বীরত্ব প্রকাশ করিলে কিরূপ হাস্যাস্পদ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

রামনারায়ণের দ্বিতীয় নাটক 'বেণীসংহার', ভট্টনারায়ণের তন্নামধেয় সুবিদিত সংস্কৃত নাটকের এইরূপ ভাবানুবাদ। ইহা ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, এবং সেই বৎসরই কলিকাতা সত্যার্ণব যন্ত্রে প্রথম মুদ্রিত [১১]। পর বৎসরে ৯ই এপ্রেল কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনয় উপলক্ষে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয় [১২]। ইহার বিবরণ কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী'-র 'বিজ্ঞাপনে' (১৮৫৭) দিয়াছেন,—

> এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসীগণ পুনরায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গালা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতা বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, ফলে মান্যবর নটগণ যথাবিহিত নিয়মক্রমে অনুরূপ করায় দর্শকমহাশয়দিগের প্রীতিভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

এই নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত; কিন্তু মূলের প্রস্তাবনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের পত্রসংখ্যা (এক পৃষ্ঠা শুদ্ধিপত্র সমেত)—২৩ + ৯৬; প্রথম ২৩ পৃষ্ঠায় উপক্রমণিকা

১১। ইহার পরিচয় পত্র এইরূপ,—বেণীসংহার নাটক।। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক। গোড়ীয় চলিত ভাষায়। অনুবাদিত।। কলিকাতা। সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত।। সংবৎ ১৯১৩। দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃঃ-সংখ্যা ১০৩) কলিকাতা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

১২। এই নাটকের সমালোচনা উপলক্ষে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' (ভাদ্র, ১৭৭৯ শক) এই অভিনয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে,—"কয়েক মাস হইল শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের সাতিশয় প্রযত্নে প্রস্তাবিত অনুবাদ গ্রন্থের অভিনয় হইয়াছিল।" রামনারায়ণের উপাধি এই সমালোচনায় 'তর্কসিদ্ধান্ত' এইরূপ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পুস্তকে 'তর্করত্ন' আছে। তাঁহার 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধি একমাত্র 'পতিব্রতোপাখ্যানে' পাওয়া যায়; অন্যত্র 'তর্করত্ন' উপাধিতে তিনি অভিহিত।

স্বরূপ গদ্যে ইহার আখ্যান ভাগের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদকের একটি সংক্ষিপ্ত 'বিজ্ঞাপন' আছে ; তাহার তারিখ "কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়, ২৮ জ্যৈষ্ঠ সংবৎ ১৯১৩"। মৌলিকতা বা নূতনত্ব না থাকিলেও, নাটকটি সুলিখিত। ইহার ভাষা বীররসাশ্রিত গুরুগম্ভীর নাটকের উপযোগী ; কিন্তু উৎকট নহে, প্রাঞ্জল। কেবল স্থানে স্থানে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ হাস্যাস্পদ না হইলেও মনোরম হয় নাই। যাত্রার ধরণের আস্ফালন ও হাহুতাশ একেবারে যায় নাই, কিন্তু সমকালীন নাটকের অনর্থক বাগাড়ম্বর বেশী নাই। ইহার ভাষার ও ভঙ্গীর একটি নমুনা এখানে উদ্ধৃত হইল (প্রথম অঙ্ক, পৃঃ ৭),—

সখী। শুনুন তবে, আজি দেবী কয়েক জন স্বতিনের (sic) সঙ্গে গান্ধারীকে প্রণাম কত্যে গিছিলেন।

ভীম। হাঁ তারপর ?

সখী। তার পর ফিরে আসবের সময় ভানুমতীর সঙ্গে দেখা হলো।

ভীম। (আক্ষেপ পূর্ব্বক) আঃ শত্রুর স্ত্রীর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইল। তবেই তো ক্রোধ হইতেই পারে, তার পর ?

সখী। তার পর সে দেবীকে দেখে হেসে হেসে অহংকারে আপনার সখীর প্রতি বল্যে।

ভীম। (সক্রোধে) আবার বিদ্রূপ করিল! আঁ, বল কি! কি বল্যে ?

সখী। বল্যে, অলো দ্রৌপদি, শুন্তে পাচ্যি না কি, তোর ভাতারেরা পাঁচখানি গ্রাম চাচ্যে, তবে তোর চুল বেঁধে দেয় না কেন ?

ভীম। সহদেব, শুনিলে ?

সহ। হাঁ, শোনাই আছে, সেও তো দুর্য্যোধনের স্ত্রী, না হবে কেন, সর্ব্বদা একত্র থাকায় স্ত্রীর মন স্বামির মনেরি সদৃশ হয়, এ তো প্রসিদ্ধই আছে ; মধুর লতা যদি বিষবৃক্ষ আশ্রয় করে তবে অবশ্যই তার মারাত্মক শক্তি জন্মে, তার সন্দেহ কি!

ভীম। (সখীর প্রতি) তা দেবী তাতে কি উত্তর করিলেন ?

সখী। কেন, দেবী তার কথাতে উত্তর দিবেন কেন ? আমরা কি সঙ্গে কেউ ছিলেম না ?

ভীম। তুমি কি বলিলে ?

সখী। আমি বলিলেম, বলি ভানুমতি, তোমাদের চুল না খোলা হলে আমাদের দেবীর চুল কেমন করে বাঁধা হয় ?

ভীম। (সপরিতোষে) হাঁ উত্তম বলিয়াছ, ভাল উত্তরই হইয়াছে, না হবে কেন ? আমাদের পরিবার কি না। (আসন হইতে উঠিয়া) প্রিয়ে আর মনোদুঃখ করিও না। আমার প্রতিজ্ঞা, এই প্রচণ্ড যমদণ্ডতুল্য গদার প্রহারে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে নিধন করে তাহারি রক্ত হাতে মেখে এসে তোমার এই কেশ বন্ধন করে দিব।

দ্রৌপ। নাথ, তুমি মনে কল্যে কি না হয়, এখন তোমার ভাইদের অনুগ্রহ হলে হয়।

সহ। হাঁ আমাদের তো অনুগ্রহ আছেই।

(নেপথ্যে মহাশব্দ। সকলের বিস্ময়।)

ভীম। একি? এমন দুন্দুভি বাদ্য হঠাৎ কেন হইল। সমুদ্র মন্থন সময়ে মন্দর পর্ব্বতের আঘাতে সমুদ্রের জলে যেরূপ শব্দ হয়, মহাপ্রলয় কালে মেঘসমূহ পরস্পর আঘাত পেলে যেরূপ শব্দ তাহার ন্যায় অতি গম্ভীর, বোধ হয়, দ্রৌপদীর ক্রোধের অগ্রদূতই এ, কিম্বা কুরুকুল নির্ম্মূল করিতে উৎপাত বাতই আসিল।

রামনারায়ণের দ্বিতীয় অনূদিত নাটক 'রত্নাবলী', বেলগাছিয়া নাট্যশালার সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের সুপরিচিত। ইহা শ্রীহর্ষের তন্নামধেয় সংস্কৃত নাটিকা অবলম্বনে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। মার্চ্চ, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে (=২৮শে ফাল্গুন, ১৯১৪ সংবতে) পাইকপাড়া রাজাদের আনুকূল্যে এই নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত [১৩] হইয়াছিল। পর বৎসর (১৮৫৮) ৩১শে জুলাই তারিখে (=১৬ই শ্রাবণ, ১২৬৫ বঙ্গাব্দে) ইহার প্রথম অভিনয়ের দ্বারা পাইকপাড়ার জমিদার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া উদ্যানবাটীতে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়; এবং গ্রন্থকার ইহার জন্য উক্ত রাজাদের নিকট ২০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

> বিদ্যানুরাগি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ মহোদয় এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে সমূহ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার অনুকূলতার কোন প্রসঙ্গ না করিলে অপরিসীম দোষে দূষিত হইতে হয়। অতএব তাঁহার নিকটে সমধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তজ্জন্য অনন্তকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম, এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া এই স্থলে বিরাম করা গেল।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যোগীরা সকলেই কৃতবিদ্য ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন; এবং যাহাতে অভিনীত নাটক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয়, তাহার জন্য তাঁহারা পরিশ্রম বা অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই। রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে জানা যায় যে, 'রত্নাবলী' উক্ত রঙ্গমঞ্চে ছয় সাতবার অভিনীত হয়, "তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া এক্ষণে নানা স্থানে অভিনীত হইতেছে"। ইহার প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীচাঁদ মিত্র 'কলিকাতা রিভিউ' (1873, p. 255) পত্রে প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন:—The corps of *dramatis personae* was trained by Babu Keshub Chunder Ganguli, a born actor......It was accompanied by a band newly organised by Kshetra Mohan Gossain. There was a distinguished audience present on the occasion, including Sir Frederick Halliday, the then Lieutenant-

১৩। ইহার প্রথম সংস্করণের পরিচয় পত্র,—এইরূপ: রত্নাবলী নাটক।| শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন। কর্ত্তৃক| চলিত ভাষায় অনুবাদিত।| কলিকাতা।| শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।| সম্বৎ ১৯১৪।— পত্রসংখ্যা ৷৷৹+৯২। ইহার 'বিজ্ঞাপনে'র তারিখ যথা:—"কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়, ২৮ ফাল্গুন সম্বৎ ১৯১৪।" ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৯১৮ সংবতে (=১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণে নাটকের আরম্ভে যে যৌগন্ধরায়ণের প্রসঙ্গ আছে, তাহা বর্জ্জিত হইয়াছিল, এবং অন্যান্য পরিবর্ত্তনাদিও করা হইয়াছিল। ইহার তৃতীয় সংস্করণের তারিখ সংবৎ ১৯২৫ (কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত)=খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৮।

Governor of Bengal, the Judges and the Magistrates of Calcutta, and other high officials, as well as non-officials. The performance was a great success.

রামনারায়ণের অন্যান্য অনূদিত নাটকের মত, 'রত্নাবলী'ও অবিকল অনুবাদ নহে। ইহার নাতিদীর্ঘ 'বিজ্ঞাপনে' রামনারায়ণ স্বীয় উদ্দেশ্য ও অনুবাদের রীতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

> ......অশেষ আনন্দের বিষয় যে অধুনাতন লোকদিগের নাট্যব্যাপারে বিশেষ অনুরাগ জন্মিতেছে। সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটকসমূহের অতুলন রস-মাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মল সুধাকর-বিনিঃসৃত সুধাধারের আস্বাদন পাইলে কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিরুচি হয় না। কিন্তু সজ্জন সমূহের এরূপ প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন হওয়া যদিও নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় বটে, তথাপি বঙ্গভাষায় নাটকসংখ্যা অতি অল্পমাত্র থাকাতে তদ্বিষয়ে সকলের ঐ নবীন অনুরাগ সফল হইতেছে না।......
>
> সকলেই স্বীকার করিবেন যে অভিনব কোন নাটক প্রস্তুত করা অতীব সুকঠিন ; কিন্তু অন্যভাষা হইতে অনুবাদ করা যে তদপেক্ষা নিতান্ত সহজ এমতও নহে। যেমন কাশ্মীর দেশস্থ উপত্যকার স্বভাবোৎফুল্ল কুসুমনিচয়, অতি যত্নেও এতদ্দেশের নিম্নভূমিতে বিকশিত হয় না, তদ্রূপ অশেষ রসশালিনী সংস্কৃত ভাষার চিত্তরঞ্জক ভাবাদি আধুনিক ও সঙ্কীর্ণ বঙ্গভাষায় পরিক্ষিত হওয়া সুদূরপরাহত। তন্নিমিত্ত রত্নাবলী নাটকের অবিকল অনুবাদ করণে ক্ষান্ত থাকিয়া মূল গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করা গেল ; এবং কথোপকথনে এতদ্দেশে যেরূপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিলাম, তাহাতে স্থানে স্থানে কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও স্থানে স্থানে কোন কোন ভাব পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে।

মূলের প্রস্তাবনা বর্জ্জিত হয় নাই ; প্রথমেই সূত্রধারের নান্দীচ্ছলে গান ও পরে নটী বসন্ত বর্ণনা করিয়া একটি গান গাহিয়াছে। মূলের শ্লোকগুলি ছন্দে অনুবাদ করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নাটকে এরূপ ০টি গান আছে ; সেগুলি অনুবাদকের স্বরচিত নহে। সে সময়ের উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ও ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য ও বন্ধু গুরুদয়াল চৌধুরী এই গানগুলি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রামনারায়ণ 'বিজ্ঞাপনে' লিখিয়াছেন,—

> বিশেষতঃ এই ক্ষণে নাটকাভিনয় বিষয়ে যে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, তাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত থাকায় এ গ্রন্থ তদুপযোগী করণ মানসে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি, এবং তন্নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল চৌধুরী মহোদয় দ্বারা কতিপয় সঙ্গীতও সংগ্রহ করিয়া স্থানবিশেষে যোজনা করা গিয়াছে। যদিচ যাত্রার প্রতি আমারদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সঙ্গীত মাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সঙ্গীত সম্পর্ক নিতান্ত পরিবর্জ্জিত হইলেও তাহাতে রস ও সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানির সম্ভাবনা। বোধ করি পাঠকমণ্ডলীও এই অভিপ্রায়ে অসম্মত হইবেন না।

গানগুলি প্রায়ই প্রেমবিষয়ক; অনেকটা নিধুবাবুর টপ্‌পার ধরণের। সূত্রধার ও নটী ভিন্ন, চেটী ও বৈতালিকের মুখে এই গানগুলি দেওয়া হইয়াছে, এবং সাগরিকাও চারিটি গান গাহিয়াছেন। সাগরিকার একটি গান নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি,—

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

শুন রতিপতি করি হে তোমারে এই মিনতি।
এ রীতি কি রীতি তব হইয়ে ভূপতি।
অনঙ্গ হইয়ে কত, রঙ্গ কর মনোমত,
বধিতে যুবতী,
হরকোপানলে জ্বলে গেল না কুমতি।
তব শরে নিরন্তর জর জর চরাচর
অমর প্রভৃতি;
সে শর সন্ধান কেন অবলার প্রতি॥

ভাষা ও ভঙ্গীর নমুনাস্বরূপ বেশী উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের নাই। তৃতীয় অঙ্কে, কণ্ঠে লতাপাশ অর্পণের প্রসঙ্গে সাগরিকার স্বগতোক্তি এইরূপ ফেনাইয়া বিস্তৃত করা হইয়াছে,—

সাগরিকা। (স্বগত) আমি তো বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছি কেউ দেখত্যে পায় নাই—তা এখন যাই কোথা?—সে কথা স। রাজমহিষী টের পেয়েছেন, সকল সখীরে কাণাকাণি করচ্যে, কাকেও আর আমি মুখ দেখাতে পাচ্চি নে। (দীর্ঘনিশ্বাস) বরং প্রাণত্যাগ করব তবু তো লজ্জা ত্যাগ করত্যে পারবো না। (চিন্তা করিয়া সরোদনে) প্রাণত্যাগ করিল্যেই বা প্রাণ আমাকে ত্যাগ করে কৈ? যখন সমুদ্রে নৌকা ডুবেছিল তখন আমার মরণ হলো না, যদি সেই সময় মরত্যেম, তা হলে আর কোন যাতনাই থাকত্য না, তা বিধাতা আমাকে সে সমুদ্র থেকে রক্ষা কোরে এখন এই অকূল দুঃখসমুদ্রে ফেলে দিলেন (অধোবদনে রোদন)

রাগিনী বেহাগ। তাল একতালা।

ছিছি কি লাঞ্ছনা।
না পুরাতে সাধ বিষম প্রমাদ হরিষে বিষাদ, হইল ঘটনা॥
থাকিতে স্ববশে, পর প্রেমরসে, মজে নিজ দোষে দুখী হলাম শেষে;
পোড়া লোকে হাসে, অপযশ ভাষে, হলো একি বিড়ম্বনা॥
গেলো কুলমান, হলো অপমান, এখন এ দেহে কেন আছে প্রাণ;
পর যে আপন, হয় কি কখন, বৃথা সে প্রেম বাসনা॥
তেজি গুরুজন, আর পরিজন, কেন অকারণ সহিব গঞ্জন
বরঞ্চ জীবন, দিব বিসর্জ্জন, লাজ ভয় তেজিব না॥

(সদীর্ঘনিশ্বাসে সরোদনে স্বগত) হা পিতা মাতা! তোমরা আমাকে এত ভালবাসতো তা এখন আমাকে কোথায় বিসর্জ্জন দে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ? একবার তত্ত্বও করল্যে না! আমাকে কি তোমরা একেবারে পরিত্যাগ করেছ?

হায় অমাত্য বসুভূতি! তুমি কত স্নেহ কোরে আমাকে সঙ্গে কোরে আন্‌ছিলে —আমার অদৃষ্টে তুমিও গেলে, সঙ্গিগণও সকল গেল! হা পোড়া অদৃষ্ট! আমার আর কেউ নাই, চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখ্‌ছি! হে পৃথিবী! শুনিচি তুমি নাকি জগতের মা, তা মা, আমাকে তুমি একটু স্থান দেও। আমি আর দুঃখ সহ্য করতে পারিনে! আমি রাজার মেয়ে হয়ে পরের দাস্যবৃত্তি করছিলেম, করছিলেম করছিলেম বা, তা কেন মদনোৎসব দেখত্যে গেলেম? কেন দুর্লভ বস্তুর প্রতি অভিলাষ করল্যেম?—কেন চিত্রপট লিখল্যেম? কেনই বা সুসঙ্গতার কুমন্ত্রণায় সম্মত হলেম?—তা না হলে ত এত যন্ত্রণা হতো না! সে যা হবার হয়েছে, তা আর সে সকল ভাবলে কি হবে। এখন প্রাণত্যাগ করবারি উপায় দেখি। (চিন্তা করিয়া) হাঁ ঐ একটি অশোক গাছ দেখত্যে পাচ্চি, তা ঐ গাছেতেই গলায় দড়ি দে মরি গে (আগমন) .....

ইত্যাদি আরও এক পৃষ্ঠাব্যাপী এই ধরণের হাহুতাশ ও দীর্ঘ স্বগতোক্তির পর লতাপাশে গ্রন্থি দিয়া আবার একটি গান গাহিয়া সাগরিকা কণ্ঠে লতাপাশ অর্পণ করিবার অবসর পাইলেন। কিন্তু এই রকম যাত্রার ধরণে দীর্ঘায়ত বিলাপোক্তি বা হাহুতাশ ছাড়া অন্যত্র কথোপকথন ক্ষিপ্রগতি, প্রাঞ্জল ও অনেকটা অভিনয়োপযোগী। নমুনাস্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্কে কদলীগৃহে রাজা ও সুসঙ্গতার আলাপ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়।—

রাজা। (সুসঙ্গতাকে দেখিয়া ভয়ে শীঘ্র চিত্রপট আচ্ছাদন পূর্ব্বক) এস—এস সুসঙ্গতা :—তবে,—তবে আমি এখানে আছি মহিষী কি জান্‌তে পেরেছেন।

সুসং। হাঁ, মহারাজ! তিনি জেনেছেন, আবার আমিও ঐ চিত্রপটের কথা বলিগে।

বিদূ। মহারাজ! ও মাগি ভারি দুষ্ট, ও না পারে এমন কর্ম্মই নাই, আমি ওকে কিছু দিয়ে—

রাজা। (সভয়ে সুসঙ্গতার হস্ত ধরিয়া) সখি, তুমি এ কথা মহিষিকে বোলো টোলো না—আমার দিব্য।

সুসং। (সহাস্যমুখে) না মহারাজ! দিব্য দিবেন না, আমি পরিহাস করলেম্ —এ কি বলবার কথা?

রাজা। (সহাস্যমুখে) তাই তো বলি এ কর্ম্ম কি তোমার যোগ্য, এই আংটিটি পর্য্যো—(হস্তের অঙ্গুরীয়ক প্রদান)।

সুসং। (সহাস্যমুখে) মহারাজ! আমাকে কিছু দিতে হবে না—আমার সখী সাগরিকা আমার উপর বড় রাগ করেছেন, কথা কন না, আমি এত সাধ্যি সাধনা কল্যেম কিছুতেই হলো না, তা আপনি বরং তাকে এট্টু বলে কয়ে দিন, তা হলেই আমার পারিতোষিক পাওয়া হল্যো।

রাজা। (সোৎসুকে) কি বলল্যে? সাগরিকা কি তোমার সখী? কৈ? তোমার সখী কোথায়?

সুসং। ঐ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি এত ডাকলেম,—বলি ঘরের ভিতর আয়—তা কোন মতেই এলো না।

রাজা। (সত্ত্বর আসিয়া দেখিয়া, স্বগত) এই সেই সাগরিকা! আহা! মরি মরি! এমন রূপ! (প্রকাশে) সুসঙ্গতা তোমার কি অদৃষ্ট—তুমি এমন সখী কোথায় পেলে? আহা! রূপ দেখে আমার নয়ন জুড়াল, বোধ হয় বিধাতা এঁকে নির্ম্মাণ কোরে আপনিই মুগ্ধ হয়ে থাকবেন্।

সাগ। (রাজাকে দেখি ত্রাস, অভিলাষ ও অঙ্গবিলাস প্রকাশ পূর্ব্বক স্বগত) এই না সেই আমার চিত্তচোর? (অধোমুখে অবস্থিতি)।

সুসং। (সহাস্যমুখে) এঁর রূপও যেমন—গুণও তেমনি।

রাজা। হাঁ, তা তো প্রত্যক্ষেই দেখছি—একবার কটাক্ষ কোরেই আমার মন হরণ করলেন্—গুণ না থাকলে কি তা পারতেন?

সাগ। (সুসঙ্গতার প্রতি ঈর্ষাপূর্ব্বক) এই বুঝি তোমার চিত্রপট আন্তে যাওয়া? আমি এখান থেকে চল্লেম। (গমনোদ্যোগ)।

রাজা। কেন কেন? এত রাগ কেন?

সুসং। রাগ কেন—ঐ চিত্রপটে ইনি মহারাজকে লিখে দেখছিলেন, তা আমি অভাগী মর্‌তে উরির্ এক ধারে উঁরির ছবি লিখে দিছি—তাই রাগ।

রাজা। এই রাগ? (স্বগত) এতো রাগ নয়—এ যে অনুরাগ। (প্রকাশে) সুন্দরি! আমার কথা রাখ, এমন কোরে যেয়ো না, দ্রুত গমন করলে তোমার কোমল চরণে বেদনা হবে।

সুসং। মহারাজ উনি বড় অভিমানিনী—হাত না ধরিলে হবে না।

রাজা। (স্বগত) আমিও তো তাই চাই। (প্রকাশে) অবশ্য, তোমার অনুরোধে পায়ে ধরত্যে পারি—হাতে ধরা কি একটা বড় কথা? (সাগরিকার হস্ত ধারণ)।

সুসং। সখি! আর কেন? রাজা পর্য্যন্ত তোর হাত ধরলেন—তবু কি রাগ পড়ে না।

সাগ। (সুসঙ্গতার প্রতি) তোমার মরণ নাই?

রামনারায়ণের পরবর্ত্তী 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকও এইরূপ কালিদাসের প্রসিদ্ধ নাটক অবলম্বনে রচিত। ঠিক অনুবাদ নহে, পূর্ব্ববৎ স্বাধীনভাবে পরিবর্ত্তনাদি করা হইয়াছে। মূলের প্রস্তাবনা ও প্রথমাঙ্কের কিয়দংশ বর্জ্জিত হইয়া প্রথমেই রাজা ও বৈখানসের কথোপকথন। দু একটি ছোটখাট ভূমিকাও বিস্তৃত করা হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্রই ভাবাবলম্বনে গ্রন্থখানি নূতন করিয়া লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলেও [১৪],

[১৪]। ইহার প্রথম সংস্করণ আমাদের হস্তগত হয় নাই; দ্বিতীয় সংস্করণের তারিখ ও পরিচয়-পত্র এইরূপ, অভিজ্ঞান শকুন্তল | নাটক। | শ্রীরাম নারায়ণ তর্করত্ন | কর্ত্তৃক | চলিত গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া। শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা | দ্বিতীয়বার প্রকাশিত। | চতুষ্টয়েঽপি টীকানাং প্রাচীনানাঞ্চ তুষ্টয়ে। চমৎকৃতিকরী ভূয়ান্নবীনানাঞ্চ সংকৃতিঃ॥ | কলিকাতা। পটলডাঙ্গা মির্জ্জাফর্স লেন ২৪ নম্বর ভবনে | গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত। | সংবৎ ১৯২৬। |

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসের পূর্ব্বে ইহা অভিনীত হয় নাই। ইহার প্রথম অভিনয়ের স্থান শাঁখারীটোলা ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটী, এবং রামনারায়ণ স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে এই নাটক পাঁচবার অভিনীত হইয়াছিল। রচনা প্রাঞ্জল এবং মূলের গাম্ভীর্য্য ও ভাব অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। বেশী নমুনা দিবার প্রয়োজন নাই; শকুন্তলার পতিগৃহ গমন প্রসঙ্গ হইতে [১৫] একটু উদ্ধৃত করিলেই চলিবে,—

(কণ্বের প্রবেশ)

কণ্ব। শকুন্তলা আজ স্বামিগৃহে গমন করবেন—অন্তঃকরণ নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে—বাষ্পে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে আমার আর বাক্ নিঃসৃত হচ্চে না —একি!—আমি নির্ব্বিষয়ী বনবাসী—স্নেহে আমিও এত ব্যাকুল; এতে গৃহীদের কন্যা পাঠাতে কতই না জানি দুঃখ উপস্থিত হয়ে থাকে। (অল্পে অল্পে আগমন)।

গৌত। বাছা, এই যে তোমার পিতা এলেন, দেখ, স্নেহে ওঁর নয়ন বারিপূর্ণ হয়েছে, তা উঠে ওঁকে প্রণাম কর। (উঠিয়া শকুন্তলার প্রণিপাত)।

কণ্ব। বৎসে, যযাতি রাজার মহিষী শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় তুমি স্বামিসৌভাগ্যশালিনী হও, আর পুরুর ন্যায় সৎপুত্রও প্রসব কর।

গৌত। বাছা এ তোমার বর, আশীর্ব্বাদ নয়।

কণ্ব। (বিলক্ষণরূপ দেখিয়া) বৎসে, এই যে পিতৃদত্ত ভূষণ পরিধান করেছ, ভাল ভাল, কিন্তু মা তুমি ঐতি রাজার পুত্রবধূ, রাজা দুষ্মন্তের রাজমহিষী, তোমার উপযুক্ত এ অলঙ্কার নয়, তবে কিনা—পিতৃদত্ত সামগ্রীতে স্ত্রীজাতির বহুমান আছে, স্পর্দ্ধাও করে থাকে, তাই কিঞ্চিৎ দেওয়া গেল, আমরা বনবাসী—আমরা কোথা পাবো?

শকু। পিতঃ তোমার চরণধূলির কণামাত্রকেও আমি রাজসম্পত্তির অধিক দেখি।

কণ্ব। (সজল নয়নে) ঐ সকল গুণাবলিতেই তো আমার বিবেকি চিত্ত মুগ্ধ হচ্চে। (গৌতমীর প্রতি) ভগিনি, শুভ লগ্ন উপস্থিত, তুমি শকুন্তলাকে এই বেদীমধ্যবর্ত্তি ত্রিবিধ প্রকার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়ে যাত্রা করাও।

গৌত। হাঁ করাই, এস বাছা, এস। (সকলের অগ্নিপ্রদক্ষিণ)।

রামনারায়ণের অন্যতম সুপরিচিত মৌলিক নাট্যগ্রন্থ 'নব-নাটক' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে (=১২৭৩ সালে) রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল [১৬]। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের মত ইহাও

১৫। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।

১৬। ইহার প্রথম সংস্করণের টাইট্‌ল পেজ এইরূপ: বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন | প্রণীত। | কলিকাতা | বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্টানহোপ যন্ত্রে | শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক | মুদ্রিত। | শকাব্দাঃ ১৭৮৮। | মূল্য এক টাকা। |

একটি সামাজিক রঙ্গচিত্র, এবং এই দুইটি মৌলিক রচনার উপরই প্রধানতঃ রামনারায়ণের যশ প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থকার এই নাটকের [১৭] বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—"আমি জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই বহু বিবাহ বিষয়ক নব-নাটক প্রণয়ন করিলাম।" ইহার ইতিহাস এইরূপ,—পাথুরিয়াঘাটানিবাসী দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্রনাথ বহু-বিবাহ বিষয়ে একটি নাটক রচনা করিবার জন্য দুই শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ইহার উত্তরে প্রাপ্ত রচনাগুলির বিচারক ছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারা কোন রচনাই পুরস্কারযোগ্য বিবেচনা না করাতে, তাঁহাদের উপদেশে গুণেন্দ্রনাথ 'নাটুকে রামনারাণ'কে এই বিষয়ে একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। পরে, ২৩শে পৌষ ১২৭৩ সালে (=৬ই জানুয়ারী ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে) এক বৃহৎ সভা আহ্বান করিয়া, প্যারীচাঁদ মিত্রকে সভাপতি করিয়া রামনারায়ণকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহার পূর্ব্ব দিবসে, এই তারিখে, 'নব-নাটক' পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ীতে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতাদের মধ্যে ঠাকুর বাড়ীর অনেকেই ছিলেন, এবং সে সময়ের প্রথা অনুসারে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষে গ্রহণ করিয়াছিল। রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে জানা যায় যে, উক্ত স্থলে এই নাটক নয় বার অভিনীত হইয়াছিল। গুণেন্দ্রনাথ গ্রন্থখানির সমস্ত মুদ্রণ-ব্যয় বহন করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থস্বত্বও গ্রন্থকারকে দান করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ নাটকটি গুণেন্দ্রনাথকে এইভাবে উৎসর্গ করা হইয়াছে,—"অগণ্যসৌজন্যাদিগুণসম্পন্ন শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় মহনীয় চরিতেষু"। এই নাটকের অভিনয় ও সজ্জাদি এরূপ সুন্দর হইয়াছিল যে, গ্রন্থের যাহা কিছু দোষ তাহা লক্ষ্য-পথে আসে নাই, কিন্তু কিশোরীচাঁদ মিত্রের মত সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক [১৮] ইহার ঘটনা-বিরল নাট্যবস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার অভিনয়ে অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিয়া রামনারায়ণ স্বয়ং মনের আনন্দে এইরূপ সমালোচকদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন; "যারা পলাট্ (plot) নাই, পলাট্ নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্।"

বাস্তবিক, এই নাটকের আখ্যানভাগ অতি সামান্য ও বৈচিত্র্যবর্জ্জিত। পরিচয়-পত্রের বর্ণনা অনুসারে ইহা "বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক", এবং ইহার উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"ইহা বহু বিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের জন্য সদুপদেশসূত্রে নিবদ্ধ।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, একটি বিশিষ্ট ও সঙ্কীর্ণ বিষয় লইয়া গ্রন্থখানি রচিত, কিন্তু বিষয়টির উপরই লেখক এত ঝোঁক দিয়াছেন যে, তাহাতে নাট্যবস্তুর বা চরিত্রাঙ্কনের যে ক্ষতি হয় নাই, তাহা বলা যায় না। নাটকের বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বর্ণনে যে সকল কথার উল্লেখ করিতে হয়, তাহা সহৃদয়তার ব্যাঘাতজনক; আর তাহা ত্যাগ করিলে আসল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। রামনারায়ণ যথেষ্ট কৌশল প্রকাশ করিয়াও এই দুই পক্ষের

১৭। বিজ্ঞাপনের তারিখ,—"কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। ১৫ বৈশাখ, ১২৭৩ সাল।"

১৮। ইনি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে (১৮৭৩, পৃঃ ২৬১) লিখিয়াছেন,—The plot is poor and destitute of interesting incidents......In truth, the acting was infinitely better than the writing of the play.

ব্যাঘাত সম্যক্ অপনয়ন করিতে পারেন নাই। সেই জন্য বক্তৃতা, অভিমত প্রকাশ, অবান্তর প্রসঙ্গ প্রভৃতির সাহায্যে সামান্য গল্পাংশকে নাটকাকারে বিস্তৃত করিতে হইয়াছে।

নাটকের গল্পটি এই,—গবেশ নামক কোন স্থূলবুদ্ধি জমিদার দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া তাহার প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী ও তদ্‌গর্ভজাত ষোড়শ-বর্ষীয় পুত্র সুবোধকে, দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রলেখার প্ররোচনায় অবহেলা করেন। নানা প্রকার লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়া সুবোধ গৃহত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরে প্রস্থান করেন; এবং সাবিত্রী স্বামিগৃহের পার্শ্বে এক পর্ণকুটীরে অত্যন্ত ক্লেশে দিন যাপন করেন। ইতিমধ্যে একদিন দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রলেখা তাহার সপত্নীকে মিথ্যা করিয়া বলিল যে, লক্ষ্ণৌ হইতে তাহার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে। ইহাতে সাবিত্রী হতাশ ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং সেই শোকেই অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। ইহার কিছু পূর্ব্বে চন্দ্রলেখা স্বামীকে বশে আনিবার জন্য টোট্‌কা ঔষধ সেবন করায়। ইহাতে গবেশের উদরে কোন দুরারোগ্য রোগ হইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী সাবিত্রীর মৃত্যুর দিনে তাহারও মৃত্যু হয়। সেই দিনই সুবোধ লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া পিতা ও মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইবা মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, ও তাহারও মৃত্যু হয়।

নাটকটি ছয় অঙ্কে ও কয়েকটি "প্রস্তাব" বা "গর্ভাঙ্কে" বিভক্ত। এই গর্ভাঙ্কগুলি ইংরেজী নাটকের Act ও Scene-এর অনুকরণে অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং এক-একটি অঙ্ক শেষ হইলে, এক-একটি গর্ভাঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে গর্ভাঙ্ক বিরল হইলেও, সংস্কৃত "গর্ভাঙ্ক" শব্দের ইহাই বোধ হয় তাৎপর্য্য। প্রতি অঙ্কের দৃশ্য বা "সংযোগস্থল" [১৯] এইরূপ,—প্রথম অঙ্ক—পুষ্করিণী সমীপে; দ্বিতীয় অঙ্ক—অন্দরের সামান্য পথ, অন্দর মহল; তৃতীয় অঙ্ক—গ্রামের প্রান্তে বটবৃক্ষ সমীপে প্রকাশ্য পথ; চতুর্থ অঙ্ক—গবেশবাবুর শয়নগৃহ। গোল-পাতার ঘরের উঠান; পঞ্চম অঙ্ক—গবেশবাবুর বৈঠকখানা; ষষ্ঠ অঙ্ক—গবেশবাবুর বাটীর বহির্ভাগ। গবেশবাবুর বাটীর নিকট বৃক্ষের তলা। সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে সূত্রধার ও নটীর দ্বারা আরব্ধ একটি প্রস্তাবনাও আছে।

প্রথম অঙ্কে, গবেশবাবুর প্রথমা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বার বিবাহ সম্বন্ধে পুষ্করিণীর ঘাটে জমীদার বাড়ীর দুই দাসী সাবী ও ভগীর আলোচনা। ইহারই গর্ভাঙ্কে, পরে ঘাটে বসিয়া দুই মোসাহেব গবেশবাবুর বিবাহের ইচ্ছা সমর্থন করিতেছে, কিন্তু গ্রামের কোন শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ যুবক সুধীর এরূপ বিবাহের যে কুফল, তাহা তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেছে। সুধীরের প্রস্থানের পর দুই মোসাহেব গবেশবাবুকে পরামর্শ দিল যে, তাহার পুত্রের গৃহশিক্ষক হইয়া সুধীরের স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে; সুতরাং এই চাকরী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া এবং তাহার যে ব্রহ্মোত্তর জমী আছে, তাহা কাড়িয়া লওয়া হউক। দ্বিতীয় অঙ্কে, চন্দ্রলেখার সখী ও প্রতিবেশিগণের নিজ নিজ অবস্থা বর্ণনা করিয়া গদ্যে ও পদ্যে কথোপকথন। ইহার মধ্যে কমলা, অমলা ও বিমলার প্রত্যেকের অনেকগুলি সপত্নী আছে; নির্ম্মলা বিধবা, এবং গবেশবাবুর সদ্যপরিণীতা চন্দ্রলেখার মাত্র একটি সপত্নী। তারপর, গবেশবাবুর প্রথমা স্ত্রী

১৯। 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকে, ইংরেজী Scene অর্থে 'সংযোগস্থল' ব্যবহৃত হইয়াছে; 'ভানুমতী-চিত্তবিলাসে এই অর্থে 'অঙ্গ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী-সত্যবান' নাটকে Act ও Scene অর্থে 'কাণ্ড' ও 'অঙ্ক' শব্দ পাওয়া যায়।

সাবিত্রীর সহিত এই গ্রাম্যনারীগণের সাক্ষাৎ এবং স্বামীবশীকরণের জন্য তুক্‌তাক্ করিতে পরামর্শ দান। তৃতীয় অঙ্কে, গ্রাম্য ও নাগর নামক গ্রামবাসী ও নগরবাসী দুই যুবকের বাক্যালাপ বেশ কৌতুকজনক। রায়েদের বাড়ীতে বহু-বিবাহ-নিবারিণী সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়া নূতন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নাগর, বহুবিবাহ, ইংরেজী শিক্ষার ফলাফল, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় লইয়া পথে গ্রাম্যের সহিত আলাপ করিতেছে। নাগরের ভাষা ইংরেজী ও বাঙ্গালার অদ্ভুত খিচুড়ী; গ্রাম্যের কুশল প্রশ্নের উত্তরে নাগর বলিতেছে,—

হাঁ, এখন আমার হেল্‌থ মচ্ ইম্‌প্রুব্‌ড বটে, কিন্তু অনেকদিন এবার কলিকাতায় ছিলেম, টৌনের ভিতরটা নাকি বড় ডার্টি, তাতে তত ষ্ট্রং ফিল্ কচ্চিনে। তা ভাই তুমি একটু ওয়েট্ কর, আমার একটি ফ্রেণ্ড আস্‌বে, দেখি আস্‌চে কি না।

তারপর ইহাদের যে আলাপ হইল, তাহা হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি (তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ৫১-৫৫),—

নাগর। না ভাই তিনি এখনো এলেন না, আমি থিঙ্ক করি, তাঁর সে ভেঞ্চর এখনো হ্যাং কচ্চো; তা চল যাই আমরা খানিক ওয়াক্ করি গে। (কিঞ্চিদ্‌গমন)।

গ্রাম্য। তা ভাই বল দেখি, কলিকাতার নূতন খবর কি শুনি।

নাগর। কলিকাতার নিয়ুস্ এখন সকলি নিয়ু—অফ কোর্স, টাইম যত ফিচ্চে তত সকল বিষয়েরই চেঞ্জ দেখা যাচ্চো, তা ভাই না হলেই বা ইণ্ডিয়ার ভাল কিসে হবে?

গ্রাম্য। (হাস্য করিয়া) তোমার আপনার কথার অর্থ আপনি বুঝলে।

নাগর। কেন?

গ্রামা। কি কর‍্যে বুঝবো? আমি তো ইংরেজি পড়িনি—তুমি যে মাঝে মাঝে একটি ইংরেজির বুকনি দিচ্য।

নাগর। হাঁ, আমরা বাঙ্গালা কথার মধ্যে দুএকটি ইংরেজি কথা ইয়ুজ করে থাকি—আমাদের ওরূপ হ্যাবিট্ বটে।

গ্রাম্য। ঐ আবার হলো—ভাই বাঙ্গালি ধুতি চাদর পর‍্যে একটি ইংরেজি টুপী মাথায় দিলে যেমন হাস্যাস্পদ হয়, বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে ইংরেজি কথা দুএকটা প্রবেশ করালেও সেইরূপ হয়ে ওঠে, ও বড় খারাপ।

নাগর। হাঁ তা বটে, তা তোমারো তো হচ্যে, তুমি তসোর কাপড় পর‍্যে, পৈতে গলায় দে, ফোঁটা কর‍্যে, আবার মধ্যে মধ্যে দাড়িতে মুর রাখ্‌চ যে? খবর, খারাপ, এ সকল ফার্শি বুলিও তো তুমি বাঙ্গালায় ফোড়ন দিচ্য।

গ্রাম্য। হাঁ বিলক্ষণ উত্তর দিলে। ঐ দেখ ওটা কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে।

নাগর। আমাদেরই কি প্রাক্‌টিশ্—মব্ অভ্যাস হতে নাই? আর তাও বলি যুটিয়ে উঠিতে পারিনে কি করি।

গ্রাম্য। যোটে নাই বা কেন?

নাগর। বিদ্যা কৈ ভাই? সেই গুরু মোশায়ের পাঠশালে শট্‌কে পড়্যেই

শট্‌কে পড়িচি, বাবা বল্‌লেন আর কেন—বাঙ্গালায় কাজ কি? ইংরেজিতে পয়সা আছে, বল্যে ইস্কুলে ভরতি করো্যে দিলেন। কি করবো, বাঙ্গালা তো ছেড়ে যেতে দেবেন না—তা বাঙ্গালা কেন ছাড়ালেন তা তিনিই জানেন।

গ্রাম্য। ঐ তো আমাদের দেশের দোষ, মাতৃভাষা শিক্ষা না করো্যে অন্যভাষা শিক্ষা করা এ আর কোথাও নাই। আর তোমাদেরও ভাই ইংরেজিতে বিলক্ষণ ভক্তি জন্মেচে, বাঙ্গালা জেনেও ইংরেজি বল্‌তে তোমরা ভালবাসো।

নাগর। তাও সত্য কথা। তা বল্‌বো না কেন? আমরা তো বহুরূপী হরবোলার জাত্‌, যা দেখি তাই শিখি। দেখ যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন সেই ব্যবহারই করেচি, সংস্কৃত কথা বল্‌তেম, কুশাসনে বস্‌তেম, ধুতি চাদর পরতেম্‌, পরে যবনদের অধিকারে ফার্শিতে অনুরক্ত হয়েছিলেম, গদি, তাকিয়ে, মশলন্দ, আলবলা, গুড়গুড়ি এ সকল ব্যবহার, স্ত্রীলোকদের গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করো্যে রাখা তদবধিই তো আমাদের চল্যে আস্‌চে, এখন আবার ইংরেজের অধিকার, এখন চ্যার, চুরোট, চাম্‌চে কেন না চল্‌বে? ইংরেজি ভাষা প্রতি শ্রদ্ধাই বা কেন না হবে? আরো একটা কথা বলি বিবেচনা করো, ভাষান্তরের সঙ্গে যোগ না হলে ভাষা বৃদ্ধিও পায় না।

গ্রাম্য। হাঁ ভাই, সে কথা আমি মানি, কিন্তু তাতে একটি কথা আছে, বাঙ্গালাতে যে সকল কথা নাই, ইংরেজি থেকেই হোক, আর অন্য ভাষা থেকেই হোক, সে সব কথা নিয়ে ভাষা-শরীর পরিপুষ্ট করা উচিত, কিন্তু তা বল্যে, যা বাঙ্গালাতে আছে, তার পরিবর্ত্ত করো্যে ভাষান্তরীয় কথা ব্যবহার কেন? বাবা না বল্যে ফাদর বল্যে কি ভাল শুনোয়?

নাগর। হাঁ, সেটি অন্যায় বটে।

গ্রাম্য। নাগর, ভাল ভাই, এখন তো তুমি বেশ উত্তম বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কচ্যো।

নাগর। তাতো পূর্ব্বেই বলেচি, আমরা যে নিতান্ত বাঙ্গালা জানিনে তা নয়, তবে কিনা ইংরেজি আয়ত্ত অধিক, আর কিছু ভক্তিও থাকবে। তা তুমি ইংরেজি জান না তোমার সঙ্গে সাবধান হয়ে কৈতে হচ্যে।

তারপর কোন তোষামোদকারী ব্রাহ্মণ চিত্ততোষ আসিয়া, 'জামাই-বারিকে'র পদ্মলোচনের দুই স্ত্রীর হস্তে চোরের লাঞ্ছনার অনুরূপ একটি গল্প বলিল। তাহারা চলিয়া গেলে, কৌতুক নামে কোন অনূঢ় যুবক ও রসময়ী গোয়ালিনীর রসিকতা; আধুনিক রুচিসম্মত না হইলেও কৌতুকজনক। রসময়ী তন্ত্রমন্ত্র জানে, এবং গবেশবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী চন্দ্রলেখাকে স্বামী-বশীকরণের ঔষধ শিখাইতেছে। 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের ডাকিনীদের মন্ত্রের মত, ঔষধকরণের ছড়াটি এইরূপ,—

> বেঙের মাথার ঘিয়ে, প্রদীপ তাহে জ্বালিয়ে, মড়ার মাথার খুলি, তাহে কাজল তুলি, ত্রিমাত্রা পথের ধূলি, নৌকার জলেতে গুলি, পানের শিকড় পেলে, নখে তা ছিঁড়িয়ে তুলে, কনক ধুতুরা ফুল, হিরাকশি শতমূল, গোময়ের ঠুলি করো্যে, এ সকল তাতে পুরো্যে, পুড়িয়ে করিয়ে ছাই, ভাই আমি যা মনে করি তাই পাই।

এরূপ ঔষধ সেবন করিয়া, বশীভূত না হইয়া গবেশবাবু যে রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের কথা নহে !

এই অঙ্কের গর্ভাঙ্কে, সমাজ-সংস্কারে উদ্যোগী সুধীর ও কলহপ্রিয় ভণ্ড দলপতি দন্তাচার্য্যের সাক্ষাৎ। তৎপরে সুধীরের সহিত সুবোধের সাক্ষাৎ এবং সুবোধের পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রার উদ্যোগ। চতুর্থ অঙ্কে, দুই সখী চন্দ্রকলা ও চপলার নিকট সপত্নী-নির্য্যাতনে স্বীয় দক্ষতা সম্বন্ধে চন্দ্রলেখার অহঙ্কার। পরে সাবিত্রীর গোলপাতার ঘরের সম্মুখে গিয়া চন্দ্রলেখা তাঁহাকে সুবোধের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিলেন। তাহাতে সাবিত্রীর মূর্চ্ছা, বিলাপ ইত্যাদি। পঞ্চম অঙ্কে, তোষামোদকারী চিত্ততোষ আসিয়া অসুস্থ ও অসুখী গবেশবাবুকে জানাইলেন যে, জমীদারগৃহে বাস করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব নয়, কারণ চন্দ্রলেখার যে ঝাঁটা এতদিন গবেশবাবুর জন্য মজুদ ছিল, এখন তাহা মাঝে মাঝে চিত্ততোষের পৃষ্ঠে পড়িতেছে, কারণ চিত্ততোষ সাবিত্রীর দুঃখে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিল। দুর্ব্বলচিত্ত গবেশ তাহাকে দশ টাকা ঘুষ দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। এমন সময় অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনের রোল আসিল। সাবী দাসী আসিয়া খবর দিল যে, সাবিত্রী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। ষষ্ঠ ও শেষ অঙ্কে, সুধীরের স্বগতোক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, গবেশবাবুর অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে পরে সুবোধের লক্ষ্ণৌ হইতে হঠাৎ প্রত্যাগমন এবং সুধীরের মুখে পিতা ও মাতার মৃত্যুসংবাদে ('নীলদর্পণে' নবীনমাধবের মত) মূর্চ্ছা, বিলাপ ইত্যাদি।

এইরূপ সামান্য গল্পের মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া বহুবিবাহ প্রভৃতির কুপ্রথার দোষোদ্‌-ঘোষণই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যমূলক রচনার যাহা কিছু দোষ, তাহা এই নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্যমূলক রচনা মাত্রই মন্দ নহে; কিন্তু উদ্দেশ্যটি যদি নাট্যকলা অপেক্ষা গ্রন্থকারের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে, তবে নাটকটি প্রবন্ধের সমষ্টিতে পরিণত হয়। 'নব-নাটকে'ও তাহা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে—"এ নবনাটুকে দেশে নবনাটকের অপ্রতুল কি? কত চটকওয়ালা নাটক এখন দিন দিন হয়ে উঠ্‌চে।" কিন্তু গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, "কোনও সদুপদেশপূর্ণ বিশুদ্ধ নাটক প্রকাশ করা"। এই উপদেশ দিবার ইচ্ছা তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়। সেই জন্য বহু স্থলে অনেক চরিত্রের মুখে লম্বা লম্বা বক্তৃতা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি, নাটকের শেষে নটী ও সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া দর্শকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

> *সভ্য মহোদয়বর্গ! আপনারা গুণগ্রাহী, এই নাটকখানি দেখ্‌লেন, অভিনয়ে গবেশবাবুর দুরবস্থা সকলেই স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি আপনারা বহু-বিবাহ প্রথায় অনুমোদন করবেন? ও দুষ্প্রথা আর রাখতে চাবেন? যাতে ঐ নানা দোষকর ঘৃণিত দুষ্প্রথা দেশ হতে দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে আপনারা কি কিছু যত্ন করবেন না? যদি করেন, আমরা কৃতার্থ হই, গ্রন্থকার কৃতার্থ হন, এবং যে সকল মহোদয়ের উদ্যোগে এই নাটক প্রস্তুত হয়ে অভিনীত হলো তাঁরাও কৃতার্থ হন।*

গ্রন্থকার কৃতার্থ হইলেও, কতদূর এই নাটকের দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা এ দেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এ বিষয়ে নাটকখানির সুফল স্বীকার করিয়া লইলেও, শুধু নাটকহিসাবে দেখিলে ইহার সফলতা খুব বেশী নহে। গ্রন্থকারের সহজ নাট্য-

প্রতিভা তাঁহার রচনাকে অনেক দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে সত্য, এবং তৎকালীন সমাজের রঙ্গচিত্র হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ইহা নাটক হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, এই নাটক দীনবন্ধুর 'নীলদর্প ণ' নাটকের ছয় বৎসর পরে রচিত[২০] এবং শেষোক্ত নাটকের দ্বারা ইহা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। 'নীলদর্পণ' নাটকের melodrama বা sentimental sensationalism এবং শোকাবহ ঘটনার আতিশয্য, মধ্যে মধ্যে পয়ারের আবির্ভাব প্রভৃতি অনেক পরিমাণে এই নাটকে আছে ; কিন্তু নীলদর্পণকারের নাট্যকৌশল ও চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতা ইহাতে নাই বলিলেও চলে। প্রত্যেক চরিত্র কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের জন্য বা কোন প্রথার দোষ প্রদর্শনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। মানবচরিত্রের ও জীবনের অভিজ্ঞতা গ্রন্থকারের যথেষ্ট ছিল, এবং সেই জন্য কতকগুলি চরিত্র-চিত্র সুন্দর হইয়াছে ; যথা, *বিধর্ম্মবাগীশ, চিত্ততোষ, নাগর, রসময়ী গোয়ালিনী ইত্যাদি।* পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও তাহার খোসামুদে অনুচরদ্বয়, গ্রাম্যঘোঁটের অগ্রণী কলহশীল ভণ্ড দলপতি প্রভৃতি চরিত্রাঙ্কন বেশ সুস্পষ্ট ও কৌতুকজনক হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীচরিত্র অঙ্কনে দক্ষতা দেখা যায় না, এবং প্রধান চরিত্রগুলি বিশেষত্বহীন ও বৈচিত্র্যবর্জ্জিত। সেগুলি কোনও দোষগুণের সাধারণ type বা প্রতীকস্বরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, রক্তমাংসের বিশিষ্ট বা individual জীব হয় নাই। 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' নাটকেও এই দোষ আছে ; কিন্তু 'নব-নাটকে' ইহা সুস্পষ্ট। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নামকরণ হইতেই গ্রন্থকারের এই উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। যথা, গবেশ—গ্রাম্য জমীদার ; সুধীর—সুপণ্ডিত ; গ্রাম্য—পাড়াগেঁয়ে লোক ; নাগর—নগরবাসী ; চিত্ততোষ—তোষামোদকারী ; বিধর্ম্মবাগীশ—পাণ্ডিত্যাভিমানী অধার্ম্মিক ; দম্ভাচার্য্য—দাম্ভিক ভণ্ড দলপতি ইত্যাদি। নামগুলি চরিত্রের গুণ বা দোষজ্ঞাপক label স্বরূপ।

কিন্তু একটি বিষয়ে উন্নতি দেখা যায় ; সেটি সরল নাট্যোপযোগী ভাষার প্রয়োগ। 'নব-নাটকের' কিছু পূর্ব্বে প্রকাশিত তারকচন্দ্র চূড়ামণির বহুবিবাহ বিষয়ক 'সপত্নী নাটক'এর[২১] ভাষা, ভাব ও ভঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করিলে, এ সম্বন্ধে রামনারায়ণের কৃতিত্ব কত বেশী, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যদিও 'নব-নাটকে' পয়ারাদি ছন্দে দু'এক স্থলে পদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে[২২] সেগুলি খুব বেশী পরিমাণে নহে। এগুলি প্রায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে স্ত্রীলোকদিগের কথোপকথনে কিংবা দম্ভাচার্য্যের গ্রাম্য দলাদলির বর্ণনায় দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বত্র ভাষা স্বাভাবিক, প্রাঞ্জল ও লঘু।

২০। কোন সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গালা সম্বন্ধে চিত্ততোষ বলিতেছে (তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ৬০) "তার বাঙ্গলা শুনল্যে নীলদর্পণ নাটক মনে হয়।"

২১। এই নাটকের কথা আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার পরিচয়-পত্র এইরূপ,—সপত্নী নাটক।। প্রথম ভাগ।। জমিদার। শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের। আদেশে। শ্রীতারকচন্দ্র চূড়ামণি। প্রণীত।। কলিকাতা।। ভাস্করযন্ত্রে শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তি দ্বারা মুদ্রিত।। সংবৎ ১৯১৪।। পত্রসংখ্যা ১-১৪৮। গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে "উত্তরপাড়া ২৪ পৌষ ১২৬৪" এইরূপ তারিখ আছে। বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে 'ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই পুস্তকখানি সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা যে 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বের' ক্ষীণ অনুকরণে রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটিকার উপাখ্যান-ভাগ গদ্যে সঙ্কলিত করিয়া তারকচন্দ্র চূড়ামণি, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, উত্তরপাড়ার জমীদার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে প্রকাশিত করেন।

২২। ইতি পূর্ব্বে প্রকাশিত নাটকগুলিতে মাইকেল পয়ারাদি ত্যাগ করিয়াছেন, এবং পদ্মাবতী (১৮৬০) নাটকের এক স্থলে অমিত্রাক্ষর ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন ; কিন্তু 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকে দীনবন্ধু তাহা করেন নাই।

এই নাটকে তিনটি গান আছে; তাহার মধ্যে একটি প্রস্তাবনায় নটীর দ্বারা গেয় ও জয়দেবের অনুকরণে সংস্কৃতে লেখা। যথা—

মলয়নিলয়পরিহারপুরঃসরদূরসমাগমধীরে,
বিকচকমলকুলকলিকাপরিমলবাহিনি বহতি সমীরে।
বহুপরিণায়কনাথবধূরবসীদতি সপদি শরীরে,
জগদতিবিরহকৃশানুকৃশা কিল মজ্জতি লোচননীরে॥

প্রথম অভিনয়ের সময় ঊনবিংশবর্ষবয়স্ক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নটীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া, এই গানটি গাহিয়াছিলেন।

'নবনাটক' অভিনয়ের পর প্রতিভাবান্ নাট্যকার বলিয়া রামনারায়ণের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহার পর এক 'রুক্মিণী-হরণ' নাটক ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই রচনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যান্য অনূদিত নাটকের মত, 'মালতী-মাধব' নাটকও উল্লেখযোগ্য, কিন্তু পরবর্ত্তী পৌরাণিক নাটক ও প্রহসনগুলিতে তাঁহার শক্তির হ্রাস ও অবনতি দেখা যায়।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবু (পরে মহারাজা স্যর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার পাথুরিয়াঘাটা ভবনে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। ইহাতে ৬ই জানুয়ারী, শনিবার, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে (=২৩শে পৌষ ১২৭০ সালে) তাঁহার স্বরচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক[২৩] প্রথম অভিনীত হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র এই রঙ্গমঞ্চের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন,—not very spacious, but very beautifully got up......the scenes are singularly well painted, especially the drop-scene, which is ablaze with aloes and water-lilies, and entirely oriental. এই রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের অনূদিত 'মালতী-মাধব', তাঁহার তিনখানি প্রহসন 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল', 'উভয় সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান', এবং তাঁহার মৌলিক পৌরাণিক নাটক 'রুক্মিণী-হরণ' অভিনীত হইয়াছিল।

ভবভূতির সুবিদিত সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে লিখিত রামনারায়ণের 'মালতী-মাধব' ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ শে সেপ্টেম্বর তারিখে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীতে অভিনীত হয়, এবং ইহার জন্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থকারকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেন। সেই বৎসরই ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়[২৪]। রামনারায়ণ নিজে লিখিয়াছেন যে, এই নাটক উক্ত রঙ্গমঞ্চে প্রায় ১০।১১

২৩। ইহার প্রথম সংস্করণ (১০০ খণ্ড মাত্র) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়; কিন্তু ইহা সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই সংস্করণ দেখি নাই। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ, ইণ্ডিয়া আফিসের গ্রন্থাগারে আছে; তাহার তারিখ ১৮৬৫ খ্রীঃ অঃ। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এই নাটক উক্ত রঙ্গমঞ্চে পাঁচবার অভিনীত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের, ১৩ই জানুয়ারীর গিরীশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রে ইহার সম্বন্ধে এই মন্তব্য দেখা যায়,—The play has been purged of the grossness and immorality with which the original of Bharat Chandra was stained. Of its literary merits we cannot say it displays any high effort of the dramatic faculty.

২৪। ইহার পরিচয়-পত্র এইরূপ,—মালতীমাধব নাটক ।। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন। প্রণীত ।। কলিকাতা।। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ। ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্টান্‌হোপ যন্ত্রে। মুদ্রিত।। বাং ১২৭৪ ইং ১৮৬৭। পত্রসংখ্যা ৵০ + ১৭৯। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৮৭৩।

বার অভিনীত হইয়াছিল। নামে অনুবাদ হইলেও, রামনারায়ণের অন্যান্য অনুদিত নাটকগুলির মত, ইহাও পরিবর্ত্তনাদি হিসাবে প্রায় নূতন করিয়া লেখা। কালীপ্রসন্ন সিংহের অপরিপক্ক অনুবাদ অপেক্ষা, এই রচনা সুপাঠ্য ও সুলিখিত। কালীপ্রসন্নের রচনার সঙ্গে তুলনার জন্য ইতিপূর্ব্বে এই নাটক হইতে একটি অংশ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে (১৩৩৮) তুলিয়া দিয়াছি, সুতরাং এখানে আর তাহার নমুনা পুনরায় উদ্ধৃত করিবার দরকার নাই। গর্ভাঙ্কে বিভক্ত পাঁচটি অঙ্কে এই নাটক সমাপ্ত, এবং বনয়ারীলাল রায় নামক কোন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ইহার গানগুলি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

রামনারায়ণের তিনখানি প্রহসনের[২৫] একটিও স্বরচিত নহে। অন্যান্য নাটকে তাঁহার যে স্বাভাবিক রসিকতা ও রঙ্গচিত্র-অঙ্কন-ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রহসনগুলিতে তাহার কিছুই নাই। plot বা আখ্যানভাগ নির্ম্মাণে রামনারায়ণ কোন কালেই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; এগুলিরও আখ্যানভাগ যৎসামান্য ও বৈচিত্র্যহীন। নাটকচ্ছলে সৎশিক্ষা দেওয়া সবগুলিরই স্পষ্ট উদ্দেশ্য। 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল' বোধ হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম সংস্করণের কাপি আমরা দেখি নাই; দ্বিতীয় সংস্করণের তারিখ ১৮৭২ (পত্রসংখ্যা ৫৫)। কোন বৃদ্ধ ও বুদ্ধিহীন মুন্সেফ, স্বীয় বার্দ্ধক্যসত্ত্বেও, নিজকে তরুণ মনে করিয়া, কোন প্রতিবেশীর সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর সহিত প্রেম করিতে গিয়া কিরূপ জব্দ হইয়াছিলেন, তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রহসনখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। 'উভয়-সঙ্কট' বহুবিবাহ বিষয়ক, ২৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, আরও ক্ষুদ্রকায় প্রহসন। কিছুই বিশেষত্ব নাই; 'নব-নাটক' ও 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের পর ইহার রচনা নিষ্ফল। ইহা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (=১২৭৬ সালে) কলিকাতায় মুদ্রিত, এবং বোধ হয় সেই বৎসরই অভিনীত হয়। 'চক্ষুদান'ও এইরূপ ২৬ পৃষ্ঠায় ও তিন অঙ্কে সমাপ্ত ক্ষুদ্র প্রহসন। মাতাল, বেশ্যাসক্ত ও তোষামোদকারীর করতলগত স্বামীকে তাহার চতুরা স্ত্রী কিরূপে সৎপথে আনিয়াছিল, তাহাই ইহার সামান্য ও বৈচিত্র্যবর্জ্জিত গল্পাংশ। ইহার প্রথম সংস্করণ (ইং ১৮৬৯=বাং ১২৭৬) (printed for private circulation) সাধারণের জন্য মুদ্রিত হয় নাই; কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়।

এই সময় রামনারায়ণের আর একখানি নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা মুদ্রিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন,—"সুনীতিসন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে (=১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা কাঁশারীটোলা নিবাসি বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান করি। তিনি আমাকে ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। ঐ নাটক কোন কারণে মুদ্রিত হয় নাই।"

২৫। এই প্রহসনগুলি সাধারণতঃ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামেই চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহা ঠিক নয়। রামনারায়ণও স্বয়ং তাঁহার আত্মকথায় লিখিয়াছেন,—"এতদ্ব্যতীত যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট এবং চক্ষুর্দ্দান নামে আরও তিনখানি প্রহসন অর্থাৎ হাস্যরসব্যঞ্জক ক্ষুদ্র নাটক প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের (যতীন্দ্রমোহনের) নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইয়াছি, সে সকল নাটকও প্রত্যেকে ৭।৮ বার তাঁহারই বাটীতে অভিনীত হইয়াছে।" মুদ্রিত পুস্তকের পরিচয়-পত্রে রামনারায়ণই গ্রন্থকার বলিয়া দেওয়া আছে।

ইহার তিন বৎসর পরে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে (= ১২৭৮ সালে) রামনারায়ণের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রুক্মিণীহরণ' রচিত ও প্রকাশিত হয়[২৬] ইহার জন্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থকারকে ৫০৲ পুরস্কার দেন এবং বহুবার স্বভবনে ইহার অভিনয়ের আয়োজন করেন। ইহার প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২। "রায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর"এর উদ্দেশ্যে নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা এই নাটক উৎসর্গ করা হইয়াছে,—

হাটককর্ণাভরণং নাটকমিদং রুক্মিণীহরণাখ্যম্।
কুরুতাং কৃপয়া কর্ণে ভবদভ্যর্ণে সমর্পয়ামি ॥

নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক ও আটটি গর্ভাঙ্ক আছে। পাঁচটি গানও দৃষ্ট হয়। গল্পাংশ এইরূপ। প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে, যুবরাজ রুক্মী পাশা খেলিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধ রাজা আসিয়া, নারদের উপদেশ অনুসারে কৃষ্ণের সহিত স্বদুহিতা রুক্মিণীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু রুক্মীর ইহাতে মত হইল না, কারণ সে অন্য বর ঠিক করিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে, রুক্মিণী কাব্যের নায়িকার মত, কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে সগদ্‌গদ, এবং কিছুক্ষণ যাত্রার ধরণে হাহুতাশ করিয়া, পরে ধনদাস নামক কোন তোত্‌লা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণের নিকট দ্বারকায় প্রেমপত্র দিয়া দূতস্বরূপ পাঠাইলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে, নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে বিবাহের উপদেশ দিলেন; কিছু পরে, রুক্মিণীর চিঠি লইয়া তোত্‌লা ধনদাসের প্রবেশ ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক তাহার আদর অভ্যর্থনা। যথা—

(আহার সামগ্রী লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ ও তৎপ্রদান)

কৃষ্ণ। আহার করুন আপনি।

ধন। (দেখিয়া পরমাহ্লাদে) ইঃ! এ-এত সামগ্রী। (একবার ঘটীর প্রতি দৃষ্টিপাত) বলি এত সামগ্রী তো আ-আমি খে-খেতে পারবো না।

কৃষ্ণ। পারবেন বৈ কি, সব খেতে হবে।

ধন। (হৃষ্টচিত্তে) সব খেতে হবে, তাই তো, এত কি খেতে পারবো; (স্বগত) তোলাট কিছু অসভ্যতা, তা হোক্, দেখ্‌তে না পেলেই হলো, ও যখনি অন্যদিকে চাবে, তখনি ঘটীর মধ্যে ফেল্‌বো। (ভোজনারম্ভ) ব-বলি এটা কি?

কৃষ্ণ। ওটা চন্দ্রপুলী।

ধন। চন্দ্রপুলী! ঠিক কথা, কেমন চ-চন্দ্রের ন্যায় আকার। (স্বগত) আহা এ চন্দ্র ব্রাহ্মণীর মুখমণ্ডলে উদয় হলো না, কেবল এই রাহুগ্রাসে পড়্‌লো। (প্রকাশ্যে) এদিগে অল্প রাঙা রাঙা শা-শালগ্রামের আকৃতি এ-এগুলি কি?

কৃষ্ণ। ওর নাম রসগোল্লা।

ধন। র-রসগোল্লা কি একেই ব-বলে? (ভক্ষণ করিয়া) উঃ! এতে এত রস, এমন সুরস সামগ্রী তো কখনও খাওয়া যায় নাই। (স্বগত) রসগোল্লা, আমার মুখে এ রস কেবল গোল্লাই হয়ে গেল, ব্রাহ্মণীকে তো দিতে পাল্যেম না।

২৬। রুক্মিণী হরণ নাটক।। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।। কলিকাতা।। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে। ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।। সন ১২৭৮ সাল।। পত্রসংখ্যা ৵০ + ৭৭। ইহার যে উৎসর্গপত্র আছে, তাহার তারিখ এইরূপ,—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, ভাদ্র ১২৭৮।

কৃষ্ণ। খাউন না ; এগুলি খাউন দেখি, এ মনোহরা, এগুলি মনোরঞ্জন।

ধন। আহা কি সু-সুন্দর নামগুলি, শু-শুনলেই কর্ণ জু-জুড়ায়, আর খেলে পেট জুড়োবে তার আর আ-আশ্চর্য্য কি! (স্বগত) আর তো খাওয়া যায় না। পোড়াকপাল! এমন সব সামগ্রী রুচবে কেন, তা যা থাকে অদৃষ্টে, ব্রাহ্মণীর জন্য এমন অপূর্ব্ব সামগ্রী কিছু নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু তুল্‌তে গেলে যদি দেখ্‌তে পায়! আঃ—তা পেলেই বা, ব্রাহ্মণের ও স্বভাব আছে সকলেই জানে, তবে পাছে দ্বারপাল বেটারা ঘটীটে ধরে' টানাটানি করে? তা কি পারবে?—না! ভাল, দেখাই যাক্ না......

তৃতীয় অঙ্কে, গুরুজন কর্ত্তৃক বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে আদিষ্টা রুক্মিণী, উৎকণ্ঠিতা নায়িকার মত, ধনদাসের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ধনদাস আসিয়া খবর দিল যে, কৃষ্ণ শীঘ্রই আসিতেছেন। ধনদাসের গৃহপ্রত্যাগমন বর্ণনায় রামনারায়ণ হাস্যকর চিত্র-অঙ্কন-ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্কে, শ্যামা ও সোনা নামক দুই দাসীর মুখে রুক্মিণীর বিবাহের সংবাদ। পরিজনবেষ্টিতা রুক্মিণী যে-সময় অম্বিকার মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সে-সময় হঠাৎ কৃষ্ণ ব্যোমযান হইতে অবতরণ করিয়া রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছেন, এবং সেই উপলক্ষ্যে যুদ্ধও হইয়াছে। এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি কৌতুকজনক, এবং ইহাতে রামনারায়ণের রসিকতা ও মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃশ্যে রুক্মী, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্য ও বিদূরথ কৃষ্ণকর্ত্তৃক যুদ্ধে লাঞ্ছিত ও আহত হইয়া কাপুরুষোচিত শূন্য আস্ফালন ও নিস্ফল ক্রোধের বাগাড়ম্বর করিতেছে। পরে নারদের উপদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে আগামী রাজসূয় যজ্ঞের সময় কিরূপে এই অপমানের প্রতিশোধ লওয়া যায়, তাহারই জল্পনা-কল্পনায় দৃশ্য শেষ হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কে, কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মিলন ; নারদের একটি কোরাস্‌যুক্ত স্তবগানের দ্বারা নাটকের সমাপ্তি।

নাটকের গল্পাংশে বা তাহার নির্ম্মাণে তাদৃশ বৈচিত্র্য নাই ; এবং সংস্কৃত নাটকের বিদূষক-স্থানীয়, আধুনিক পেটুক ছাঁদাবাঁধা ব্রাহ্মণের প্রতীকস্বরূপ এক তোত্‌লা ধনদাস ভিন্ন কোন চরিত্রই তেমন সুন্দর ভাবে ফুটে নাই। তবে নাটকটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ভাষা বেশ সহজ ও সরস, এবং ইহার পরিকল্পনায় একটি হাস্যরস-সমুজ্জ্বল মনোরম নূতনত্ব রহিয়াছে। চরিত্রগুলি প্রাচীন, পুরাণপ্রসিদ্ধ ও পূজাস্থানীয় হইলেও, প্রায় প্রত্যেকটি আধুনিক সময়ের সাধারণ জীবন্ত মানুষের মত সৃষ্ট হইয়াছে, এবং স্থান-কালের anachronism বা ঔচিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নাট্যকারের নাই বলিলেও চলে। নারদের কোরাস্‌-গানে যোগদান ছাড়া, কৃষ্ণ যে সেকালে চন্দ্রপুলী, রসগোল্লা, মনোহরা ইত্যাদির দ্বারা অতিথিসৎকার করিতেন, এ কল্পনাও মনোরম। এমন কি, তিনি নারদকে বলিতেছেন, আমি কালো আমায় কে মেয়ে দেবে। ব্যোমযান হইতে নামিয়া রুক্মিণীকে লইয়া পলায়ন, আধুনিক চলচ্চিত্রের এরোপ্লেন elopement এর মত শুনায়। কৃষ্ণ রুক্মীকে শুধু পরাস্ত করিয়া ছাড়েন নাই, তাহার মাথা মুড়াইয়া অপমানের চূড়ান্ত করিয়াছেন কতকগুলি ভাব গদ্‌গদ বা গম্ভীর দৃশ্য ছাড়িয়া দিলে, সমস্ত নাটকটি 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'-রচয়িতার লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে।

রামনারায়ণ আরও কতকগুলি পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তেমন

কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এবং এক 'স্বপ্নধন' ছাড়া অন্য কোন নাটক কোথাও অভিনীত হয় নাই। দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নবীন নাট্যকারগণের অভ্যুদয় ও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনেল থিয়েটার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণের প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গিয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী রচনাগুলির নাম পর্য্যন্ত শোনা যায় না। তখন পৌরাণিক নাটক-রচনার একটি যুগ আসিয়াছিল; সে যুগ তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' (১৮৫২), হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব-বিয়োগ' (১৮৫৮), ও মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' (১৮৫৮) হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর গিরীশচন্দ্র ও হাতনাগাদ ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। দুর্গাদাস করের দ্রৌপদী-বস্ত্র-হরণ বিষয়ক 'স্বর্ণশৃঙ্খল' নাটক (১৮৬৩), কালিদাস সান্যালের 'নলদময়ন্তী' (১৮৬৭)[২৭], উমেশচন্দ্র মিত্রের 'সীতার বনবাস' (১৮৬৬)[২৮] এবং মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' (১৮৬৮), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৪)[২৯] প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক এই সময় রচিত হইয়াছিল। সুতরাং স্বীয় প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য, সংস্কৃত নাটকের অনুবর্ত্তন ও সামাজিক চিত্র অঙ্কন ছাড়িয়া দিয়া, রামনারায়ণ যে পৌরাণিক নাটক লিখিতে আরম্ভ করিবেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু 'রুক্মিণী-হরণ' ভিন্ন, তাঁহার অন্য পৌরাণিক নাটক তেমন সফল হয় নাই।

রামনারায়ণের 'কংসবধ' ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (=১২৮২ সালে) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উক্ত রঙ্গমঞ্চের জন্য রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু কখনও কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। নাটকের নামেই ইহার কথাবস্তুর পরিচয়; কিন্তু ৭২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই অনতিবৃহৎ নাটকে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। রামনারায়ণও তাঁহার আত্মকথায় ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। সেই বৎসরই (১৮৭৫) হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত তাঁহার 'ধর্ম্মবিজয়' নাটকও প্রকাশিত হইয়াছিল[৩০], কিন্তু ইহাও যে কলিকাতার কোন স্থানে অভিনীত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না, এবং রামনারায়ণের আত্মকথাতে ইহারও উল্লেখ নাই। অন্য কোন বিশেষত্বের দাবী না করিলেও, ইহার প্রস্তাবনায় সূত্রধার নটীকে বলিতেছে,—"অন্যান্য রসঘটিত নাটক এখন সর্ব্বত্রই চল্‌চে, শান্তরসের নাটক দেশভাষায় অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই, এটি নূতন!" কিন্তু এটি ঠিক নূতন নহে। 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি নাটকের অনুবাদ ছাড়িয়া দিলেও[৩১], ঠিক এই সময় হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান লইয়াই মনোমোহন বসুর পূর্ব্বোল্লিখিত নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ধর্ম্ম-বিজয়' নাটকের নাট্যবস্তু নির্ম্মাণে নূতনত্ব আনিবার চেষ্টা থাকিলেও, বৈচিত্র্য নাই, এবং

২৭। গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাগবাজার নাট্যশালায় অভিনীত।

২৮। ভবানীপুর নীলমণি মিত্রের বাটীতে অভিনীত।

২৯। বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত।

৩০। ধর্ম্মবিজয়। নাটক।। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।। হরিনাভি বঙ্গনাট্য সমাজের সম্পাদক। শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।। হরিনাভি। ইষ্টইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত।। ১২৮২। পত্রসংখ্যা ৪+১১৪। প্রকাশককে গ্রন্থকার গ্রন্থসত্ব, ১০ই ভাদ্র ১২৮২ সালে বিক্রয় করিয়াছেন, এইরূপ লিখিত আছে।

৩১। গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১২৫৯ সালে (=১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে) প্রকাশিত। কিন্তু এই অনুবাদ ঠিক নাটকাকারে লিখিত নহে।

মোটামুটি রামনারায়ণের অন্যান্য নাটকের মত সুলিখিত নয়। সর্ব্বকার্য্যের বিঘ্নকারক বিঘ্নরাট্ ও বিদ্যাত্রয়সিদ্ধির পরিকল্পনা মন্দ নহে; এবং যবনধর্ম্মী দুষ্প্রতাপ, পাপপুরুষ প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টিতে নূতনত্বের চেষ্টা আছে, কিন্তু এক শ্মশানদৃশ্য ভিন্ন কোন দৃশ্যই মনোরম হয় নাই, এবং বিশ্বামিত্রকে একটি খিটখিটে সাধারণ রাগী বামুনের মত করিয়া গড়া হইয়াছে। কতকগুলি গান আছে, সেগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থের শেষে দেওয়া হইয়াছে। এই গানগুলির জন্য প্রকাশক, শ্রীযুক্ত কালীকুমার চক্রবর্ত্তী ও কালীনাথ সান্যালের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এগুলি গ্রন্থকারের রচিত নহে, প্রকাশকের দ্বারা পরে অভিনয়ের জন্য সন্নিবিষ্ট।

ইহা ভিন্ন, রামনারায়ণ 'ধনুর্ভঙ্গ' নামক একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু তাঁহার আত্মকথায় ইহার কোন উল্লেখ নাই, এবং আমরা এই পুস্তকের সন্ধান পাই নাই। বরং তাঁহার আত্মকথায় রামনারায়ণ লিখিয়াছেন,— "কেরলী-কুসুম নামে একখানি নাটক প্রস্তুত করা গিয়াছে; অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।" এই সময় রামনারায়ণ 'স্বপ্নধন' নামক একটি ক্ষুদ্র নাটক রচনা করেন। ইহা সিমুলিয়া বঙ্গরঙ্গভূমিতে (বেঙ্গল থিয়েটর) ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হইয়াছিল, এবং উক্ত রঙ্গভূমির সম্পাদক গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রন্থসত্ব ক্রয় করিয়া ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে (=১৯৩০ সংবতে) মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন[৩২]। এই নাটকের নায়িকা কেরল-রাজকুমারী কুসুমলতা। আমাদের মনে হয়, রামনারায়ণ স্বয়ং যে নাটক 'কেরলী-কুসুম' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই 'স্বপ্নধন' নাটক। যখন রামনারায়ণ তাঁহার আত্মকথা লিখিয়া রাখেন, তখনও বোধ হয় এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয় নাই[৩৩]। পরে 'কেরলী-কুসুম' এই নাম বদলাইয়া 'স্বপ্নধন' এই নূতন নামে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রাচীন কথাসাহিত্যের স্বপ্ন-সন্দর্শন কৌশল অবলম্বন করিয়া 'স্বপ্নধন' নাটক রচিত, এবং ইহার নামকরণ ও কথাবস্তুর কল্পনা এই মূল ঘটনা লইয়া। বিদর্ভদেশের রাজপুত্র মতিমান ও কেরলদেশাধিপতির একমাত্র কন্যা কুসুমলতা পরস্পরকে স্বপ্নে দেখিয়া পরস্পরের প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন। মৃগয়ার সময় মৃগানুসরণে পথশ্রান্ত হইয়া, রাজপুত্র বৃক্ষতলে পথশ্রমে নিদ্রিত হইয়া অপরূপ লাবণ্যবতী রাজকন্যাকে স্বপ্নে দেখেন; পরে সেইখানে কোন যোগীর নিকট সংবাদ পাইয়া মতিমান অনুমান করেন যে, তাঁহার স্বপ্নের ধন কোন কেরলী কুমারী; এবং এদিকে রাজকুমারীও তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া, অনঙ্গপীড়ায় পীড়িত হইয়া মানসিক ক্লেশ ও শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করেন। বনমধ্যে পথভ্রষ্ট কোন সওদাগরকে সিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া, রাজপুত্র তাহার গৃহে অতিথি হইয়া, সেইখানে কেরলরাজের পূর্ব্বতন সভাপণ্ডিতের

৩২। স্বপ্নধন নাটক।। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন। প্রণীত।। সিমুলিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমি হইতে। প্রকাশিত।। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।। কলিকাতা—সিমুলিয়া, মাণিকতলা ষ্ট্রিট নং ১৪৮।। সম্বৎ ১৯৩০।। মূল্য আট আনা।। উক্ত রঙ্গভূমির সম্পাদক লিখিত ইহার বিজ্ঞাপনের তারিখ—সিমুলিয়া। কার্ত্তিক,—১২৮০।

৩৩। তাঁহার আত্মকথার শেষে রামনারায়ণ লিখিয়াছেন যে, "বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি"। এই সংস্কৃত গ্রন্থ ১২৭৮ সালে (=১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে) রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার আত্মকথা এই সালেই লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। বোধ হয় এই কারণেই আত্মকথায় 'কংসবধ' ও 'ধর্ম্মবিজয়' নাটকের উল্লেখ নাই।

নিকট কেরলরাজকুমারী ও তাঁহার অসুস্থতার কথা জানিতে পারেন। সে স্থান হইতে ছয় সাত দিনের পথ কেরলদেশে ব্রহ্মচারীবেশে উপস্থিত হইয়া, দৈবক্রমে রাজোদ্যানে রাজকুমারীর কোন সখীর সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া এবং সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া, সেই রাজকুমারীই যে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টা কন্যা, সে বিষয়ে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। পরে কৌশলপূর্ব্বক সেই সখীর হস্তে স্বচিত্রিত সেই স্বপ্নলব্ধ কুমারীর প্রতিমূর্ত্তি রাজকন্যার নিকট প্রেরণ করেন। রাজকুমারীও স্বপ্নদৃষ্ট যুবকের অঙ্কিত ছবি দেখিয়া চিনিতে পারিয়া, নিজহস্তে অঙ্কিত রাজপুত্রের চিত্র সখীর দ্বারা কৌশলপূর্ব্বক পাঠাইয়া দেন। এই চিত্র-বিনিময়ের পর, কন্যাবেশ ধারণ করিয়া মতিমান, বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশী সওদাগর বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সওদাগর স্বীয় কন্যার নিরুদ্দিষ্ট বাগ্‌দত্ত বর আনয়নের জন্য যাত্রার ছল করিয়া, রাজার নিকট কন্যাবেশী মতিমানকে অর্পণ করিলেন। এইরূপ রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া, মতিমান রাজপুত্রীর সখীরূপে থাকিয়া, তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়া ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক গান্ধর্ব্ববিবাহে কুসুমলতার পাণিগ্রহণ করেন। পরে একদিন কুসুমলতার সঙ্গে দীঘিকায় স্নান করিতে গিয়া মতিমান অলক্ষিতে সেস্থান ত্যাগ করেন; কেরলরাজ ব্রাহ্মণকন্যাকে জলমগ্না ভাবিয়া মহাচিন্তায় পড়িলেন। এদিকে ভাবী জামাতারূপী মতিমানকে সঙ্গে লইয়া, ব্রাহ্মণবেশী সওদাগর রাজসভায় আসিয়া স্বীয় কন্যা প্রত্যর্পণের জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। ছদ্মক্রোধ ও বিষাদে ব্রাহ্মণের ম্রিয়মাণ অবস্থা দেখিয়া শেষে রাজা মতিমানকে খেসারতস্বরূপ কন্যা দান করিয়া ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিলেন। বাসরঘরে মতিমান নিজের পরিচয় দিয়া রাজার আশীর্ব্বাদ ও সকলের আনন্দস্রোতে অভিষিক্ত হইয়া কুসুমলতার সঙ্গে মিলিত হইলেন। শেষে নায়ক মতিমানের নিম্নোদ্ধৃত কথার দ্বারা নাটক সমাপ্ত হইয়াছে,—

> মতি। তবে আর কি, সৎপাত্রে কন্যা প্রদত্ত হয়েছে বলে মহারাজ সন্তুষ্ট হয়েছেন, স্বপ্নধন লাভ হয়েছে, সুতরাং রাজকন্যা সন্তুষ্ট হয়েছেন; সখীরে! তোমরাও সকলে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে, এখন সভ্যগণ! এই স্বপ্নধন নাটক দর্শনে আপনারা যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, গ্রন্থকর্ত্তার হাতযশ আর আমার অদৃষ্ট।

এই নাটক-রচনায় গ্রন্থকর্ত্তার যে বিশেষ হাতযশ বা নিপুণতা আছে, তাহা বোধ হয় না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাহিণীর রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প, স্বপ্নদর্শন, ছদ্মবেশধারণ, চিত্রবিনিময়, কন্যাকে ন্যাসরূপে সমর্পণ, ছদ্মবেশী নায়কের অন্তঃপুর-প্রবেশ প্রভৃতি মামুলী কৌশলের দ্বারা নির্ম্মিত নাট্যবস্তুতে যে শুধু বৈচিত্র্যের অভাব আছে, তাহা নহে, স্থানে স্থানে উপকথার অস্বাভাবিকতাও আছে। কাহিনীহিসাবে গল্পটি মন্দ না হইতে পারে, এবং ভাষাও প্রাঞ্জল, কিন্তু নাটকের পক্ষে এরূপ মালমসলা বিশেষ উপযোগী হয় নাই।

বাঙ্গালা নাট্যশালার সামান্য আরম্ভের যুগ হইতে, ন্যাশানেল থিয়েটারের স্থাপনের সহিত (১৮৭২) সাধারণ ও স্থায়ী বাঙ্গালা নাট্যশালার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত, রামনারায়ণের সাহিত্যিক জীবন বিস্তৃত। কিন্তু ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রথম যুগেরই পথপ্রদর্শক। তাঁহার সমসাময়িক মাইকেল মধুসূদন ও কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী দীনবন্ধু, এই দুইজনই বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন। ক্রমবর্দ্ধনশীল বাঙ্গালা নাটক ও অভিনয়ের উল্লিখিত

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস[৩৪] হইতে বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালা নাটক আধুনিক যুগের সৃষ্টি; ও ইহার বিকাশ, বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবের অন্যতম ফল। উনবিংশ শতকে বিদেশীয় আদর্শে 'নভেল', 'এপিক' প্রভৃতির মত নাটকের প্রচলন হইয়াছিল। নবশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ যে শুধু ইংরেজী নাটকের আস্বাদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা নহে, ইংরেজী রঙ্গমঞ্চে এই সকল নাটকের উত্তম অভিনয় দর্শনের সৌভাগ্যও তাঁহাদের হইয়াছিল। ইংরেজী নাটকের অভিনয় ও অনুশীলনের দ্বারা বাঙ্গালা শিক্ষিত সমাজের রুচি ক্রমশঃ ঘটিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং রামনারায়ণের মত ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরও প্রচলিত যাত্রায় অশ্রদ্ধা ও নূতন ধরণের নাটকাভিনয়ে শ্রদ্ধা দেখা যাইতেছিল[৩৫]। ইংরেজী নাটক ও অভিনয়ের প্রভাবে ও আদর্শে নূতন বাঙ্গালা নাটক ও অভিনয়ের আরম্ভ হইল। প্রথমে অল্পসংখ্যক নাটক রচিত হইয়াছিল, এবং অভিনয় শুধু মাঝে মাঝে সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির গৃহে নির্দ্দিষ্ট দর্শকের জন্য হইয়াছিল কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বাঙ্গালা নাটকের সংখ্যা বহুলপরিমাণে বাড়িয়া গেল, এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গমঞ্চও স্থাপিত হইল।

কিন্তু সম্পূর্ণ বিদেশীয় আদর্শে সূত্রপাত হইলেও, সংস্কৃত নাটকের প্রভাবে বাঙ্গালা নাটক দেশীভাব একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই। অভিনয়েও নয়, রচনাতেও নয়। আমাদের অভিনয় প্রণালী সম্পূর্ণ বিদেশীয় অনুকরণ; কিন্তু পূর্ব্বকালেও কি, এখনও কি, সংস্কৃত অভিনয়ের পদ্ধতি বা যাত্রার ধরণ একেবারে ইহা হইতে যায় নাই। বিশেষতঃ দীর্ঘচ্ছন্দী হাস্যাংশে, বক্তৃতায়, ভাব-বাহুল্যে, এবং মামুলী প্রথাগত কাব্যের নায়ক-নায়িকার পরিকল্পনায়। সেইরূপ ইংরেজী নাটকের আদর্শ ও রীতি অনুসারে রচিত হইলেও, প্রথম বাঙ্গাল' নাটকগুলি ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে সংস্কৃতের প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াইতে পারে নাই। সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক 'ভদ্রার্জ্জুনে'র রচয়িতা নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ ইংরেজী নাটকের প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ; কিন্তু ইহার আখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত, এবং ইহার ভাব ও ভাষাও সম্পূর্ণ দেশী। হরচন্দ্র ঘোষের রচনা ইহা অপেক্ষা ইংরেজীভাবাপন্ন; কিন্তু তিনিও সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে নান্দী ইত্যাদির প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং তাঁহার 'কৌরব-বিয়োগ' নাটকে (১৮৫৮) বিজাতীয় আখ্যানও সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের তো কথাই নাই। তিনি ইংরেজী নাটকের 'অতুলন রসমধুরী'তে মুগ্ধ, কিন্তু স্বয়ং ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, সংস্কৃত কাব্যনাটক ও অলঙ্কারের অধ্যাপক। নূতন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও, তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক বাঙ্গালায় নূতন করিয়া লিখিয়াছেন, পৌরাণিক বিষয় লইয়াও মৌলিক নাটক রচনা করিয়াছেন। এমন কি, ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় ভাবের প্রধান আমদানিকারী স্বয়ং মাইকেল মধুসূদনও প্রথমে সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করিয়া হাত পাকাইয়াছেন। স্বরচিত নাটক সম্বন্ধে তিনি খুব জোর দিয়া লিখিয়াছেন,—

৩৪। বর্ত্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত নহে বলিয়া, শোভাবাজার রাজবাটীর রঙ্গমঞ্চ (১৮৬৫), গোপাললাল চক্রবর্ত্তীর বাগবাজার নাট্যসমিতি (১৮৬৬), বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ (১৮৬৮) ও বাগবাজার থিয়েট্রিকাল পার্টি (১৮৬৮) প্রভৃতির কথা এখানে বলা হয় নাই।

৩৫। 'রত্নাবলী'র উল্লিখিত 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

I am aware that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing?......It is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

কিন্তু তিনি যাহাকে সংস্কৃতের গঠিত শৃঙ্খল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে শৃঙ্খল তিনি আপনিও সম্পূর্ণ চূর্ণ করিতে পারেন নাই। বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়াও তিনি বাঙ্গালী ছিলেন; এবং স্পষ্ট না হইলেও তাঁহার রচনায় দেশীয় ভাবের ছাপ যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

'পদ্মাবতী' নাটকে ইন্দ্রনীল রাজার মধ্যস্থতায়, মুরজা, শচী ও রতির সৌন্দর্য্যবিবাদ প্রসঙ্গ, তিনি গ্রীক গল্পের Paris-এর মধ্যস্থতায় Athena, Juno, Venus-এর সুবিদিত Apple of Discord আখ্যান হইতে লইয়াছেন; তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ইংরেজী Romantic Drama-র অনুকরণে tragic heroine, villain, rival claimants, comic relief প্রভৃতি সমস্তই আনিয়াছেন। কিন্তু এ সকল স্বীকার করিলেও, সংস্কৃত নাটকের অনিবার্য্য প্রভাব তাঁহার নাটকগুলিতে লক্ষিত হইবে। রামগতি ন্যায়রত্নকে কেহই ইংরেজী ভাবের পক্ষপাতী বলিবেন না, এবং তিনি তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' আধুনিক বিদেশী-ভাবাপন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট কটাক্ষপাত করিয়াছেন; কিন্তু তিনিও মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' সম্বন্ধে স্বীকার করিয়াছেন,—"শকুন্তলা নাটক অধ্যয়নের পরেই কবি এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি স্পষ্ট প্রমাণ লক্ষিত হয়", এবং উদাহরণস্বরূপ তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাবতীর সহিত রাজার মিলনের উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাটকের বিদূষককে বর্জ্জন করিয়াছেন; মাইকেল তাহা করেন নাই। ইহা আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, যাঁহারা নাটকরচনার প্রথম প্রবর্ত্তক, তাঁহারা সকলেই ইংরেজী সাহিত্য হইতে নূতন ধরণের রচনা ও শিল্পকলা শিক্ষা করিয়াও, দেশের যাহা গৌরবের সামগ্রী সেই পুরাতন সাহিত্যকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, এবং দেশের যাহা বৈশিষ্ট্য তাহাও জলাঞ্জলি দেন নাই। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে বিদেশীয় সাহিত্যের ছায়া স্পষ্ট হইলেও, দেশীয় ভাব ও জাতীয়তার সহিত এরূপ সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত বলিয়া, ইহা একেবারে বিজাতীয় হইতে পারে নাই। তবে, 'servile admiration of Sanskrit'-এ যে আর নাটক লেখা চলিতে পারে না, একথা মাইকেল ঠিকই ধরিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। শুধু পুরাতনকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, নূতনের সহিতও অগ্রসর হইতে হইবে। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ বা অনুবাদ তাঁহার সময়ে যথেষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং সাহিত্যের ধারা বদ্‌লাইয়া না দিলে নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। নবশিক্ষিত পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলা ও সাহিত্যের আদর্শ লইয়া, প্রাচ্য ভাব ও ভাষাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই হিসাবে তিনি বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে অগ্রণী। তিনি আর এক স্থলে এই কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন,—

If I live to write other dramas, *you may* rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of Sahitya-darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real national theatre.

আর একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। এই সকল পুরাতন বাঙ্গালা নাটকের আলোচনা করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল রচনার ত্রুটি অনেক পরিমাণে ইহার ভাষার অপরিপুষ্টতার জন্য। তখনও গদ্য বা নাট্যসাহিত্যের উপযোগী ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, এবং ভাষা-সমস্যার নিষ্পত্তিও হয় নাই। প্রথম সৃষ্টির যাহা কিছু দোষ, তাহা এইসকল রচনায় আছে, কিন্তু সেই দোষগুলি অনুপযোগী ভাষার জন্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনেক স্থলে অনেক লেখক (যথা রামনারায়ণ) অনেকটা সরল ও সরস ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা যে এক দিকে সংস্কৃতানুযায়ী ও কৃত্রিম এবং অন্য দিকে অত্যন্ত মেলো ও অমার্জ্জিত, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তখনকার কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ উৎকট সংস্কৃত-বহুল ভাষা প্রয়োগ করা, ভাষার আভিজাত্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন মনে করিতেন। 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটকের "জগতীতল এক্ষণে অস্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজ তাপসমূহ সমর্পিত করিয়া স্বয়ং সুশীতল হইল। অ-হ-হ! বিরহীজনসন্তাপে কাহারও সঙ্কোচ নাই" প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার পরবর্ত্তী নাটকগুলিতে (এমন কি সংস্কৃত অনুবাদেও) রামনারায়ণ অনেক পরিমাণে এই দোষ পরিহার করিয়াছেন, এবং সহজ ভাষার প্রয়োগে সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সরল ভাষা অনেক সময় (বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রের কথোপকথনে) হাল্‌কা ও মেলো হইয়া পড়িয়াছে, এবং গুরুগম্ভীর সাধুভাষার মোহ তিনি একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে-সময় ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যপ্রবন্ধে ইহা অপেক্ষা শতগুণ অলঙ্কার-কণ্টকিত, অনুপ্রাস-বহুল ও অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জ্জিত সংস্কৃতের যে রূপান্তর, বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ গৃহীত হইত, রামনারায়ণ কোন দিনও তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। "অহো! পূর্ব্বভাগের গগনের উপর ধ্বান্তহর গুণাকর দিনকর করনিকর বিস্তার করতঃ কি এক নয়ন-প্রফুল্লকর মনোহর ভাস ভাসিতেছে—দারুণ দুঃখের অন্ধকারস্বরূপ অন্ধকারকে নাশিতেছে—তিমিরারি তিমিরকে সহস্রকরে ধারণ করিয়া সহস্রকরে গ্রাসিতেছে, শাসক হইয়া তোমার এই সংসার শাসিতেছে; এই মিহির মহীর মনের মালিন্য মোচন মানসে পূর্ব্ব হইতে অপূর্ব্বভাবে ক্রমে ক্রমে পশ্চিমদিগে আসিতেছে; আলোকদ্বারা তাপন আপন আগমন জ্ঞাপন করাতে সকল কমল অমল হইয়া কমলহৃদয়ে মধুভরে আলপনপ্রকাশপূর্ব্বক প্রেমানুরাগে ভাসিতেছে"—এরূপ ভাষা একেবারেই নাট্যোপযোগী নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখনও সাহিত্যের, বিশেষতঃ নাট্যসাহিত্যের, ভাষার সৃষ্টি হয় নাই; ভাষা তখনও সাহিত্য-শিল্পাগারে শিক্ষার্থী। তখনও গদ্যে, নাটকে, কবিতায় সকলেই নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কাব্যে ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল ও মধুসূদন; নাটকে রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু; গদ্যে এক দিকে সংস্কৃত কালেজী দল, অন্যদিকে আলালী ও হুতোমী নক্সাকার—এইরূপ সাহিত্যের সকল বিভাগে এই চেষ্টার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। কিন্তু ইহাদের কেহই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। এক দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অন্য দিকে অক্ষয়কুমার দত্ত

—এই দুই মহাপুরুষের কল্যাণে যদিও গদ্যের ভাষা নবজীবন লাভ করিল, তথাপি উভয়েই সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন বলিয়া, ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও সংস্কৃতানুযায়ী হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়ী ভাষার লালিত্য, দৃঢ়তা ও ওজস্বিতা থাকিলেও, সংস্কৃত ভাব, অলঙ্কার ও শব্দগৌরবে এত ভারাক্রান্ত যে, তাহাতে মহাকাব্য রচিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা কোন মতে নাটক বা উপন্যাসে ব্যবহৃত হইতে পারে না। অবশ্য এই সময়ে টেকচাঁদের আলালী ভাষা অধিকতর দ্রুত, সহজ ও স্ফূর্ত্তিশালী ছিল, কিন্তু তাহা এত হাল্‌কা ও অনেক স্থলে এত খেলো হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাকে মার্জ্জিত করিয়া না লইলে, কোন উচ্চশ্রেণীর রচনায় চালান যাইত না। এমন কি, দীনবন্ধুর রচনাতেও এক দিকে দীর্ঘায়ত সমাস-বহুল ভাষা 'নীলদর্পণ' নাটকের বহু স্থলে করুণ রসের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে; অন্য দিকে টেকচাঁদী ভাষার ছায়া তাঁহার হাস্যরসের রচনার শ্রীবৃদ্ধি করিলেও স্থানে স্থানে যে অত্যন্ত লঘু হইয়া যায় নাই, তাহা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সমৃদ্ধিশালিনী সর্ব্বশ্রীসম্পন্ন ভাষার সৃষ্টি হয় নাই; এবং হইলেও তাহার আদর্শ তখনও সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই। ভাবের ভাষা, সৌন্দর্য্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা, যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ব্ববিষয়ের ও সর্ব্বসাধারণের ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্র তখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই।*

পরিশিষ্ট

[১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা নাটক ও তাহার অভিনয়ের একটি ক্রমানুযায়ী তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ হইল। কোন কোন স্থলে বাঙ্গালা সাল হইতে ইংরেজী অব্দ দেওয়াতে এক বৎসরের এদিক ওদিক হইতে পারে। তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে; কারণ ১৮৬০ সালের পর বাঙ্গালা নাটকে সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সবগুলি এখানে তালিকাবদ্ধ করা সম্ভব বা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বাঞ্ছনীয় নহে। প্রকাশের ও অভিনয়ের তারিখ সর্ব্বত্র এক নহে; বর্ত্তমান তালিকা অভিনয়ের তারিখ অনুযায়ী। অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য নাটক একেবারেই অভিনীত হয় নাই, সেগুলি প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে।

এই তালিকায় অভিনয়ের তারিখ বা স্থান সর্ব্বত্র নির্ভুল না হইতেও পারে; এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

নাটক	গ্রন্থকার	প্রকাশের তাং	প্রথম অভিনয়-তাং	অভিনয়-স্থল
বিদ্যাসুন্দর	×	×	১৮৩৩ (?)	শ্যামবাজার, নবীনচন্দ্র বসুর বাটী
রত্নাবলী নাটিকা	নীলমণি পাল	১৮৪৯	×	×
✓ ভদ্রার্জ্জুন	তারাচরণ শিকদার	১৮৫২	×	×
ভানুমতী-চিত্তবিলাস	হরচন্দ্র ঘোষ	১৮৫৩	×	×

* এই প্রবন্ধ গত আষাঢ় মাসে লিখিত হইয়া পত্রিকার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে শ্রীমান্ প্রিয়রঞ্জন সেন আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে (১৩৩৮) 'নাট্যকে রামনারাণ' প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্বিনের 'প্রবাসী' বর্ত্তমান প্রবন্ধের শেষ ফর্ম্মার প্রুফ দেখিবার সময় আমার হস্তগত হইয়াছে। একটি ভুল চোখে পড়িল; উক্ত প্রবন্ধের পরিশেষ্টে 'কংসবধ' অপ্রকাশিত বলিয়া লিখিতও হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে।

নাটক	গ্রন্থকার	প্রকাশের তাং	প্রথম অভিনয়-তাং	অভিনয়-স্থল
✓ কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৫৪	১৮৫৭	নূতনবাজার চড়কডাঙ্গা জয়রাম বসাকের বাটী
✓ অভিজ্ঞান-শকুন্তলা	নন্দকুমার রায়	১৮৫৫	৩০এ জানুয়ারী ১৮৫৭	সিমুলিয়া আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাটী
অনুতাপিনী নবকামিনী	শ্যামাচরণ দত্ত	১৮৫৬	×	×
বিধবোদ্বাহ	উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	১৮৫৬	×	×
বেণীসংহার	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৫৬	এপ্রিল ১৮৫৭	জোড়াসাঁকো, কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটী, বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চ
বিক্রমোর্ব্বশী	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৫৭	নভেম্বর ১৮৫৭	ঐ
কলিকৌতুক	নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি	১৮৫৮		
সপত্নী নাটক (প্রথম ভাগ)	তারকচন্দ্র চূড়ামণি	১৮৫৭		
কৌরব-বিয়োগ	হরচন্দ্র ঘোষ	১৮৫৮	×	
রত্নাবলী	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৫৭	৩১ জুলাই ১৮৫৮	বেলগাছিয়া রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের উদ্যান বাটী
সাবিত্রী-সত্যবান্	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৫৮	×	জোড়াসাঁকো বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ
শর্ম্মিষ্ঠা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৫৮	৩রা সেপ্ট, ১৮৫৯	উপরোক্ত বেলগাছিয়া নাট্যশালা
নলদময়ন্তী	উমাচরণ দে	১৮৫৯	×	×
মালতীমাধব	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৫৯	১৮৫৯	জোড়াসাঁকো বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ
বিধবা-বিবাহ	উমেশচন্দ্র মিত্র	[দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৭]	১৮৬০	বড়বাজার সিঁদুরেপটী, গোপাললাল মল্লিকের বাটী, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির উদ্যোগে
নব-বৃন্দাবন (অর্থাৎ ধর্ম্ম-সমন্বয় নাটক)	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	[দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৩]	১৮৬০ (?)	ঐ
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬০	১৮৬১	ঢাকা, পূর্ব্ববঙ্গ নাট্যশালা, শোভাবাজার রাজবাটী,

নাটক	গ্রন্থকার	প্রকাশের তাং	প্রথম অভিনয়-তাং	অভিনয়-স্থল
একেই কি বলে সভ্যতা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৫৯	১৮৬৪	দেবীকৃষ্ণ দেবের ভবনে, শোভাবাজার নাট্যসমিতি
	ঐ	১৮৬১	২৪শে জুলাই ১৮৬৫	ঐ
বিদ্যাসুন্দর	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	১৮৫৮	৬ই জানুয়ারী ১৮৬৬	পাথুরিয়াঘাটা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী
বুঝলে কি না	ঐ (?)	×	১৮৬৬	ঐ
যেমন কর্ম্ম তেমন ফল	রামনারায়ণ তর্করত্ন	[দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭২]	১৮৬৬ (?)	ঐ
স্বর্ণশৃঙ্খল	দুর্গাদাস কর	১৮৬৩	×	×
চারুমুখ-চিত্তহরা	হরচন্দ্র ঘোষ	১৮৬৪	×	×
সীতার বনবাস	উমেশচন্দ্র মিত্র	১৮৬৬ (?)	১৮৬৬	ভবানীপুর নীলমণি মিত্রের বাটী
অভিজ্ঞান-শকুন্তল	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৬০	১৮৬৭	শাঁখারীটোলা, ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটী
নবনাটক	ঐ	১৮৬৬	৬ই জানুয়ারী ১৮৬৭	জোড়াসাঁকো, নাট্যশালা কমিটি, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটী
মালতীমাধব	ঐ	১৮৬৭	৩১শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৭	পাথুরিয়াঘাটা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটী
পদ্মাবতী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৬০	১৮৬৭	গরাণহাটা জয়চন্দ্র মিত্রের বাটী
নল-দময়ন্তী	কালিদাস সান্যাল	১৮৬৭	১৮৬৭	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাগবাজার থিয়েট্রিক্যাল্ পার্টি
কিছু কিছু বুঝি	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	১৮৬৭	২রা নভেম্বর ১৮৬৭	কয়লাতলা, হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটী (চোর-বাগান এমেচর থিয়েটর কর্ত্তৃক)
ইন্দুপ্রভা	গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৬৮	১৮৬৮	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাগবাজার থিয়েট্রিক্যাল পার্টি
চন্দ্রাবতী	নিমাইচন্দ্র শীল	১৮৬৮	×	×

নাটক	গ্রন্থকার	প্রকাশের তাং	প্রথম অভিনয়-তাং	অভিনয়-স্থল
রামাভিষেক	মনোমোহন বসু	১৮৬৮	১৮৬৮	বহুবাজার অবৈতনিক নাট্য-সমাজ
উভয় সঙ্কট	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৬৯	১৮৬৯ (?)	পাথুরিয়াঘাটা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটী
চক্ষুদান	ঐ	১৮৬৭	ঐ (?)	ঐ
সধবার একাদশী	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬৬	১৮৬৯	বাগবাজার এমেচার থিয়েটর (পরে ন্যাশানল থিয়েটর নামে অভিহিত)
প্রণয়-পরীক্ষা	মনোমোহন বসু	১৮৬৯	১৮৬৯	বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ
সতী নাটক	ঐ	১৮৭১	১৮৭১	ঐ
লীলাবতী	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬৭	১৮৭১	বাগবাজার এমেচার থিয়েটর
রুক্মিণী-হরণ	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৭১	১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭২	পাথুরিয়াঘাটা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটী
স্বপ্নধন	ঐ	১৮৭৪	১৮৭৩	সিমুলিয়া, বঙ্গ রঙ্গভূমি (বেঙ্গল থিয়েটর)
কংসবধ	ঐ	১৮৭৫	×	×
ধর্ম্মবিজয়	ঐ	১৮৭৫	×	×

শ্রীসুশীলকুমার দে

দ্রষ্টব্য :—এই প্রবন্ধে রামনারায়ণের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের' তারিখই ভুলক্রমে ১৮৬২ এইরূপ ছাপা হইয়াছে; উহা ১৮৬০ হইবে। এই নাটক ১৯১৭ সংবতে বা ১২৬৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। রামনারায়ণের আত্মকথায় ইহার তারিখ ১২৬৯ দেওয়া আছে, তাহা বোধ হয় ঠিক নহে। আর্য্যাশতকের তারিখ ১২৭৯ হইবে। উপরে ৭নং ফুটনোটে এই লাইন যোগ হইবে; "রামনারায়ণের রত্নাবলীর অঙ্কবিভাগের নাম 'প্রকরণ'। 'প্রস্তাব' এই কথাটি তাঁহার অভিজ্ঞান শকুন্তলে সংস্কৃত নাটকের বিষ্কম্ভক-প্রবেশকের স্থান অধিকার করিয়াছে। নব নাটকেও বোধ হয় এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।"—উপরোক্ত বাঙ্গালা রচনা ভিন্ন, রামনারায়ণ সংস্কৃতেও বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অপ্রাসঙ্গিক বোধে সেগুলি এখানে ধরা হয় নাই। তাঁহার আত্মকথা হইতে জানা যায় যে, তিনি কল্কিপুরাণ, সমুদয় উত্তররামচরিত ও যোগবাশিষ্ঠের কিয়দংশ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া 'সর্ব্বার্থ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত রচনার মধ্যে 'মহাবিদ্যারাধন' নাম দশমহ বিদ্যাস্তোত্র ও 'আর্য্যাশতকে'র উল্লেখ আত্মকথায় আছে। তদ্ভিন্ন পঞ্চসর্গাত্মক 'দক্ষযজ্ঞ' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যও তিনি লিখিয়াছিলেন।

ধনুর্ব্বেদ

বর্ত্তমানে প্রাচীন ভারতের বিবিধ বিদ্যা বা শাস্ত্রের ইতিহাস ও বিবরণ বিভিন্ন ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক নানা ভাষায় আলোচিত হইতেছে। এই আলোচনার ফলে, প্রাচীন ভারতবাসীর জীবনযাত্রার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতেছে এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসী সম্বন্ধে লোকের যে সকল ধারণা ছিল, অনেক বিষয়ে তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কোনও বিষয়েরই আলোচনা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই—কোনও বিষয়েই উপলভ্যমান সমস্ত উপকরণ নিঃশেষে বিচারিত হয় নাই। তবে যে বিষয়ে যতটা আলোচনা হয়, তাহাই আমরা সাগ্রহে বরণ করিয়া লইব।

সম্প্রতি প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধবিদ্যার দিকে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা ভাষায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে—যুদ্ধবিদ্যাবিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজীতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ ত্র্যম্বক দাতে মহাশয় Art of War in Ancient India নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বিগত ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস্ হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণাঙ্গ না হইলেও এবিষয়ে এইখানিই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে পি জগন্নাথ স্বামি-লিখিত Warfare in Ancient India নামক এজাতীয় আর একখানি পুস্তক মাদ্রাজ হইতে জি এ নটেশন্ কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'ধনুর্ব্বেদ' শীর্ষক বিস্তৃত প্রবন্ধ 'সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র চতুর্থ বর্ষে (১৮৮৪ শকে) মুদ্রিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে ধনুর্ব্বেদ সম্বন্ধে 'বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ', 'বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর', 'বীরচিন্তামণি', 'যুদ্ধজয়ার্ণব,' 'নরপতি-জয়চর্য্যা' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয়, এই সকল গ্রন্থের পুথি বা প্রকাশিত সংস্করণ প্রবন্ধকার সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কি না, অথবা তাঁহার উদ্ধৃত অংশ অন্য গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত, সে সম্বন্ধে প্রবন্ধকার কোন কথাই বলেন নাই। এই জন্য প্রবন্ধটির মধ্যে বহু মূল্যবান্ তথ্য থাকিলেও ইহার উপযোগিতা যে অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় এ সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। একটি প্রবন্ধ গত ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'প্রবাসী' পত্রে এবং 'ধনুর্ব্বেদ' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা—প্রথম খণ্ডে' (পৃঃ ১১২—৪২) প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও উপাদেয় প্রবন্ধে প্রাচীন যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। শেষের প্রবন্ধে লেখক দুইখানি ধনুর্ব্বেদ বিষয়ক গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। একখানি অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদ। আর একখানি বশিষ্ঠ প্রণীত ধনুর্ব্বেদ। শেষোক্ত গ্রন্থ বিষয়ে প্রবন্ধকার Maharaja Kumud Chandra Memorial Series—No. 1. -রূপে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'ধনুর্ব্বেদ সংহিতার' তারিখ-শূন্য সংস্করণই ব্যবহার করিয়াছেন। বোধ হয়, এই সংস্করণ প্রকাশিত হইবার অনেক পূর্ব্বে ১৮৪০ শকে ১৯৭৫ সংবতে এই গ্রন্থ পণ্ডিত হরদয়ালু স্বামি-বিরচিত হিন্দী অনুবাদ সহ বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম প্রেস হইতে ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রেষ্ঠী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণে প্রকাশিত মূলের সহিত শ্রীযুক্ত সিংহ ও শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থের পার্থক্য

বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থের ভূমিকার কতকটা অংশের আলোচ্যবিষয় ও উদ্ধৃত প্রমাণাদির সহিত ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের প্রবন্ধের আশ্চর্য্যরকম মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা দুইজনেই বোধ হয় 'বিশ্বকোষে'র 'ধনুর্ব্বেদ' প্রবন্ধ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইতঃপূর্ব্বেই এই গ্রন্থের দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এক সংস্করণ খড়্গবিলাস প্রেস্ হইতে মুদ্রিত, আর এক সংস্করণ আলিগড় জেলা হইতে প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় ছাড়া অন্য কেহ বোধ হয় এ পর্য্যন্ত যুদ্ধবিদ্যাবিষয়ক কোনও গ্রন্থের এরূপ কোনও বিবরণ প্রদান করেন নাই। অথচ, এইরূপ বিবরণের উপরেই এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইবার ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে। আর এখন হইতে চেষ্টা করিলে এ সম্বন্ধে রায় মহাশয় কর্ত্তৃক অনুল্লিখিত নানা প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইবে না। অবশ্য প্রাচীন সমস্ত গ্রন্থই যে রক্ষিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। তবে এখন পর্য্যন্ত যে সকল পুঁথি আছে বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাদের বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার। Aufrecht মহোদয়-সঙ্কলিত সুবিখ্যাত Catalogus Catalogorum গ্রন্থে ধনুর্বেদ ও যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে বহু পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে 'ধনুর্বিদ্যাদীপিকা', সদাশিব-প্রণীত 'ধনুর্বেদ', বিক্রমাদিত্য-প্রণীত 'ধনুর্বেদ প্রকরণ', শার্ঙ্গদত্ত-প্রণীত 'ধনুর্বেদ', নরসিংহ-দত্ত-প্রণীত 'ধনুর্বেদ চিন্তামণি' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে যাঁহারা এপর্য্যন্ত কোনও প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ইহাদের কোনও উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। তাহা ছাড়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিবিধ গ্রন্থে যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদেরও আলোচনা হওয়া দরকার। রঘুনন্দন জ্যোতিষতত্ত্বে 'যুদ্ধযাত্রা' ও 'যুদ্ধজয়ার্ণবে'র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার 'প্রস্থান ভেদ' নামক গ্রন্থে উপবেদ সমূহের বর্ণনাপ্রসঙ্গে যজুর্ব্বেদের উপবেদ ধনুর্বেদের উল্লেখকালে পাদচতুষ্টয়াত্মক বিশ্বামিত্র-প্রণীত ধনুর্বেদের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন (প্রস্থান ভেদ—বাণীবিলাস প্রেস সংস্করণ—পৃঃ ১৫-৬)। মধুসূদন ও চরণব্যূহ পরিশিষ্টের ভাষ্যকার মহিদাস (১৭শ শতাব্দী) যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বামিত্র-প্রণীত ধনুর্ব্বেদই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। বশিষ্ঠ-প্রণীত ধনুর্বেদসংহিতার গোড়ায় বলা হইয়াছে যে, ইহা বিশ্বামিত্রের অনুরোধে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট কথিত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ-কথিত এই সংহিতার সহিত মধুসূদন-বর্ণিত বিশ্বামিত্র-প্রণীত সংহিতার কিছু কিছু পার্থক্য আছে। বশিষ্ঠের মতে ধনুর্বেদ সংহিতা যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ সম্মত সংহিতা। চরণব্যূহ পরিশিষ্ট ও মধুসূদনের মতে ধনুর্বেদ যজুর্বেদের উপবেদ। চরণব্যূহ পরিশিষ্টে ইহা ব্যাস অথবা স্কন্দের মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বশিষ্ঠের মতে ধনুর্বিদ্যা প্রথমে সদাশিব পরশুরামকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র-প্রণীত সংহিতার মতে বোধ হয়, ইহার গুরুপরম্পরা এইরূপ—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিশ্বামিত্র। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী লেখক রামানন্দ ঘোষের মতে বৈবস্বত মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু যোগবলে ধনুর্বেদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন (হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা—১ম খণ্ড—বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—পৃঃ ২৩২)। বশিষ্ঠের মতে ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজন গো-ব্রাহ্মণ-সাধু-বেদের সংরক্ষণ ও বিশ্বামিত্রের হিত ; বিশ্বামিত্র মতে—স্বধর্ম্ম যুদ্ধাচরণ, দুষ্টের দণ্ড, চোর প্রভৃতি হইতে প্রজাপালন। ইহা ছাড়া, রামায়ণ, মহাভারত ও মন্বাদি সংহিতা গ্রন্থেও প্রসঙ্গক্রমে যুদ্ধবিদ্যাবিষয়ক নানা কথা বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলির সমবেত আলোচনা হওয়া দরকার। এইরূপ আলোচনায় যে বিশেষ সুফললাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বৃহস্পতি রায়মুকুট*

যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ প্রথম রাঢ়দেশে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে বাৎস্য গোত্রে ছান্দড়ের বংশে রবি, মহিন্তা-গ্রামের গ্রামণী হন। সেই জন্য রবির বংশকে 'মহিন্তা-গাঁই' বলে। মহিন্তা-গাঁইএ অনেক বড় বড় পণ্ডিত—অনেক বড় বড় রাজকর্ম্মচারী জন্মিয়া গিয়াছেন। একখানি ঘটকের বইএ দেখিয়াছিলাম,—"মহিন্তা মাধবাচার্য্যো রাঢ়দ্বয়ে দণ্ডধৃক্" অর্থাৎ তিনি উত্তর ও দক্ষিণ—দুই রাঢ়েরই দণ্ডধারী ছিলেন। দণ্ডধারী অর্থে সংস্কৃতে সেনাপতিও বুঝায় এবং বিচারপতিও বুঝায়। মাধবাচার্য্য কি ছিলেন, জানি না।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এই বংশে একজন জ্যোতিষী জন্মান। তাঁহার নাম শ্রীনিবাস মহিন্তা। তাঁহার এক গ্রন্থ আছে,—তাহার নাম 'শুদ্ধিদীপিকা'। উহাতে হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের উপযুক্ত কালনির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। কোন্‌টা বিবাহের যোগ্য কাল, কোন্‌টা উপনয়নের যোগ্য কাল, কোন্‌টা যাত্রার যোগ্য কাল—এই সব বিষয়েরই আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। শুদ্ধি শব্দের পরবর্ত্তী কালে যে অর্থই হউক, শ্রীনিবাসের সময় উহার অর্থ ছিল, ধর্ম্মকর্ম্মের শুদ্ধ কাল। শ্রীনিবাসের আরও একখানি বই আছে। সেখানি বিশুদ্ধ গণিতের বই। নাম গণিত-চূড়ামণি; ইংরেজী ১১৫৮ সালে লেখা। হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে শুদ্ধিদীপিকার উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লালসেন যে কুল-মর্য্যাদার সৃষ্টি করেন, তাহাতে তিনি মহিন্তাদের কাহাকেও কুলীন করেন নাই। সিদ্ধ শ্রোত্রিয়দের মধ্যে উহাদের আসন খুব উচ্চে ছিল। কিন্তু এই বংশের শ্রীনিবাস আপনাকে কুলীন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, রায়মুকুটও আপনাকে কুলীন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হয় বল্লালী কুল মানিতেন না, অথবা তাঁহারা কুলীন শব্দ সাধারণ অর্থে (উচ্চ-কুলপ্রসূত এই অর্থে) ব্যবহার করিয়াছেন।

এখন আমাদের বৃহস্পতি মহিন্তার জীবনচরিত লিখিতে হইবে। ইঁহার কথা লিখিবার পূর্ব্বে মুসলমান অধিকার হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহস্পতির সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস একটু দেওয়া উচিত। নহিলে তাঁহার জীবন-চরিতের মর্ম্ম বুঝা যাইবে না। ইংরেজী ১২০০ হইতে ১৪০০ পর্য্যন্ত দুই শত বৎসর বাঙ্গালায়, বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যও ছিল না, সংস্কৃত সাহিত্যও ছিল না। আমি ত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া পুথি খুঁজিতেছি। কিন্তু ঐ সময়ের লেখা কোন বইএর পুথি পাই নাই। ঐ সময়ের নকল করা পুথির মধ্যেও দুই একখানি ছাড়া পাই নাই। পাই নাই বলিয়া যে, একেবারে ছিল না, তাহাও বলিতে পারি না। আর কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ঐ কালের লেখা বা নকল করা পুথি পাইতে পারেন। কিন্তু এখন আমরা যত দূর জানি, তাহাতে এই দুই শত বৎসরের সাহিত্যিক ইতিহাস একেবারে সাদা।

* ১৩৩৮, ৩রা আশ্বিন তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

মুসলমান অধিকারের প্রথম আশী বৎসর ত কেবল কাটাকাটি মারামারি। মুসলমানেরা টানা বাঙ্গালা দেশ সমস্ত অধিকার করিতে পারেন নাই, যেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার চার পাশে হিন্দু রাজারা ছিলেন; তাঁহাদের সহিত নিরন্তর যুদ্ধ লাগিয়াই ছিল। মুসলমানে মুসলমানে যখন এই যুদ্ধ হইত, তখন ইহা ভীষণ হইত। এই আশী বৎসর বাঙ্গালা দেশে এত বেশী যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল যে, দিল্লীতে বাঙ্গালা দেশের নামই ছিল—ঝগড়ার দেশ।

১২৮০ সালে তোগরল বলিয়া একজন আফ্‌গান, দুই একটা হিন্দু রাজা মারিয়া আপনাকে এত বড় বলিয়া মনে করিলেন যে, তিনি দিল্লীর বাদশাহ্‌কে গ্রাহ্যও করিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বন অনেক সেনা লইয়া বাঙ্গালায় আসিলেন। প্রথমেই সুবর্ণগ্রামের রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। বলিলেন,—জলপথে যদি তোগরল পালায়, আপনি তাহাকে আটকাইবেন। ক্রমে তোগরল ধরা পড়িল। গিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বন, তোগরল এবং তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান সাহায্যকারীদিগকে গৌড়ের বাজারে শূল দিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে এক লক্ষ শূল পোঁতা হয়। দু সারি শূলের মধ্যে তিনি ও তাঁহার বড় ছেলে বোখারা খাঁ ঘোড়ায় চরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাবা ছেলেকে বলিলেন,—তুমি বাঙ্গালায় থাকিতে চাও, থাক। কিন্তু যদি দিল্লী হইতে পৃথক্ হইতে চাও, তাহা হইলে জানিবে, তোমারও এই দশা হইবে।

বোখারা খাঁ নাজীর উদ্দীন উপাধি লইয়া বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইলেন। তিনি দিল্লীর সুলতানের পুত্র। তাই তাঁহার উপাধি হইল সুলতান। দিল্লীর তক্ত তাঁহার বংশ হইতে চলিয়া খিলিজি ও তোগলকের বংশে গেলেও, বাঙ্গালায় তাঁহার বংশে সুলতান উপাধি অটুট রহিল। ইঁহারা তিন পুরুষে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন এবং একটু একটু করিয়া বাঙ্গালার অনেক স্থান দখল করেন। শেষ পূর্ব্ববাঙ্গালা ও বিক্রমপুর দখল করিয়া লন। ইঁহাদের পর বাঙ্গালাকে তিন ভাগ করার চেষ্টা হয় —গৌড়, সাতগাঁ ও সোনার গাঁ। সুতরাং মারামারি কাটাকাটি আরও বেশী হয়। সাম্‌স্‌উদ্দীন্ ইলিয়াস শাহ্ নামে একজন পরাক্রান্ত মুসলমান তিনটি রাজ্য দখল করিয়া ১৩৪৫ সালে বাঙ্গালায় স্বাধীন সুলতান হন। ইলিয়াস্ শাহ্‌ও যেমন আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন, দিল্লীর বাদশাহ্‌ও অমনি বার বার বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। আরও ১০।১২ বৎসর মারামারি কাটাকাটি চলিল। বলিতে গেলে ১৩৫৫ সালে বাঙ্গালায় শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই। ক্রমে ইলিয়াস্ শাহ্ ও তাঁহার ছেলে সিকন্দর পরস্পর মারামারি করিতে লাগিলেন।

ইলিয়াস্ শাহের পুত্র সিকন্দর ও তাঁহার পুত্র গিয়াস্‌উদ্দীন বাঙ্গালায় কতকটা শান্তি পাইয়াছিলেন। তখন দিল্লীও পড়িয়া আসিয়াছিল। সুতরাং বাহির হইতে আসিয়া কেহ বাঙ্গালার শান্তিভঙ্গ করে নাই। তৈমুর আসিয়া যখন ১৩৯৮ সালে দিল্লী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেলেন, তখন বাঙ্গালার অবস্থা বেশ ভাল। ইলিয়াস্-শাহীরা দেশবাসীর সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিতেন। এমন কি, তাঁহাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ বড় লোকের সাহায্য না লইলে চলিত না। তাঁহাদের রাজত্বে অনেক

জায়গায় বড় বড় হিন্দু ও বৌদ্ধ জায়গীরদার ছিল। একজন হিন্দু রাজা একটি টাকা রাজস্ব দিয়া ভাতুড়িয়ার জমিদারী ভোগ করিতেন। সেই জমিদারীর নাম ছিল একটকিয়া। অনেক কায়স্থ মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিস্তর জমিদারী ভোগ করিত; বিশেষ উত্তররাঢ়ী কায়স্থরা। আর করিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা; কেন না, তাহারা রাজধানীর অতি নিকটে থাকিত। মুসলমানদের মধ্যে এই সময়ে অনেকগুলি বড় বড় পীর খুব প্রতিপত্তি করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ইলিয়াস্‌শাহীরা কিন্তু গৌড় ছাড়িয়া দশ ক্রোশ দূরে পাণ্ডুয়ায় আপনাদের রাজধানী করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। এইখানে সেকেন্দর ইলিয়াস্‌শাহীর আদিনা মস্‌জিদ্। ইহার ৩৬০টি গম্বুজ ছিল। এখনও বোধ হয়, ১৬০টি আছে। এত বড় মস্‌জিদ্ ভারতবর্ষে আর কোথায়ও নাই। এখানেই দু'জন বড় বড় পীরের আস্তানা আছে। একজনের নাম শাহ্ জালাল। ইনি বাইশ হাজার বিঘা জমি পাইয়াছিলেন, এ জন্য ইঁহার আস্তানার নাম বাইশহাজারী। আর একজনের নাম নুর্ উল্ কুতব্ উল্ আলাম। ইনি ছয় হাজার বিঘা জমি পাইয়াছিলেন। ইঁহার আস্তানার নাম ষষ্‌হাজারী।

এখান হইতে সেকেন্দর বাঙ্গালা দেশ জরীপ করেন। জরীপ করায়, বড় বড় মস্‌জিদ্ তৈয়ারী করায়, বড় বড় মক্‌বরা তৈয়ারী করায়, আর পীরেদের চেষ্টায়, বেশ বোধ হয়, ইলিয়াস্‌শাহীরা বাঙ্গালায় শান্তিই ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সময় হইতে রাজা গণেশের প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া যাইতেছিল। তাঁহারা উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ, কাশ্যপগোত্র ও দত্ত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা গিয়াসুদ্দীন বল্‌বনের বংশধর বাঙ্গালার সুলতানদিগের এবং ইলিয়াস্‌শাহী সুলতানদিগের অধীনে কার্য্য করিয়া অনেক জমি পাইয়াছিলেন এবং দত্তখান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। গণেশ কিন্তু পূর্ব্বপুরুষদের ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। গিয়াস্‌উদ্দীনের পর সইফ্‌উদ্দীন ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নামে মাত্র রাজা খাড়া করিয়া, তিনি আপনিই বাঙ্গালার রাজ্য শাসন করিতেন। শেষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া তিনি আপনি রাজা হইয়াছিলেন। গণেশ রাজা হইলে মুসলমানেরা অত্যন্ত চটিয়া যায়, এবং তাহাদের পীর নুর উল্ কুতব্ উল্ আলম দিল্লী হইতে কোনও সাহায্য পাইবার আশা বৃথা জানিয়া, জোয়ানপুরের শর্‌কী সুল্‌তান ইব্রাহিমকে বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনিও সেই অনুরোধ অনুসারে অনেক দূর অগ্রসর হন। ইহার কিছু পূর্ব্বেই তিনি মিথিলা হইতে অর্স্‌লান নামক একজন তুর্কীকে তাড়াইয়া 'দিয়া' কীর্ত্তিসিংহকে রাজা করিয়া যান। সুতরাং তিনি পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার করিবার এ সুযোগ ছাড়িতে পারেন নাই।

ধূর্ত্ত গণেশ কিন্তু নুর উল্ কুতব্ উল্ আলমের নিকট গিয়া বলিলেন,—আপনি কেন ইব্রাহিমকে ডাকিতেছেন। আমার ছেলেকে আপনি মুসলমান করুন। আমি তাহাকেই রাজা করিয়া চলিয়া যাই। হইলও তাহাই। তাঁহার পুত্র যদু, জালাল উদ্দীন নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার রাজা হইলেন। ইব্রাহিম ফিরিয়া গেলেন। গণেশও

ছেলেকে আবার হিন্দু করিয়া নিজেই রাজা হইয়া বসিলেন এবং দনুজমর্দ্দন নামে টাকা চালাইতে লাগিলেন।

অদ্বৈত প্রভুর ঠাকুরদাদা নরসিংহ, শ্রীহট্ট অঞ্চলে নারিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আসিয়া রাজা গণেশের মন্ত্রী হইলেন। মহিন্তা বৃহস্পতি এই সময় গৌড়ে আসিয়া বাস করিলেন এবং বহু ছাত্র পড়াইতে লাগিলেন। এক একবার মনে হয়, গণেশের ছেলে যদুও যেন তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলেন। তিনি বৃহস্পতিকে আচার্য্য এবং কবিচক্রবর্ত্তী উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি জগদত্তের পুত্র। এই জগদত্তই রাজা গণেশ। যদু রায়রাজ্যধর পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেনাপতি হইয়াছিলেন—অনেক হাতী, ঘোড়া, বাজনা, ছত্র, সোনা রূপা প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম জলাল উদ্দীন হইয়াছিল। তিনি নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি ষোড়শ মহাদানের মধ্যে অনেক মহাদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড, সোনার ঘোড়া, সোনার রথ, বিশ্বচক্র, পৃথিবী, কৃষ্ণাজিন, কল্পতরু প্রভৃতি দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগের দারিদ্র্য দূর করিয়াছিলেন। তিনি আবার সুলতানদের মন্ত্রীও ছিলেন।

বৃহস্পতি 'স্মৃতিরত্নহার' নামে যে স্মৃতির গ্রন্থ লেখেন, তাহাতে তাঁহার উপরিলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি অমরকোষের 'পদার্থচন্দ্রিকা' বা 'অমরচন্দ্রিকা' নামে যে টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দ, মাতার নাম নীলমুখায়ী দেবী এবং স্ত্রীর নাম রমা। তাঁহার অনেকগুলি ছেলে ছিল। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্রাম ও রাম, এই দুইটি বড়। তাঁহারা দিগ্‌বিজয়ীদিগকেও জয় করিয়াছিলেন, অনেক বই লিখিয়াছিলেন এবং অনেক মহাদান করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি 'গৌড়াবনীবাসবের' (জলাল উদ্দীন) নিকট হইতে ছয়টি উপাধি পাইয়াছিলেন। প্রথম—আচার্য্য, তার পর কবিচক্রবর্ত্তী, পণ্ডিতসার্ব্বভৌম, কবি-পণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য্য, রাজপণ্ডিত। কিন্তু রাজা যখন তাঁহাকে সর্ব্বশেষে 'রায়মুকুটমণি' এই উপাধি দেন, তখন খুব জাঁক করা হইয়াছিল। তাঁহাকে হাতীর উপর চড়াইয়া নানাবিধ বৈধ স্নান করান হইয়াছিল। তাঁহাকে একগাছি হার দেওয়া হইয়াছিল—তাহাতে অনেক হীরামাণিক লাগান ছিল—তাহাতে তাহা ঝলমল করিতেছিল। তাঁহাকে যে কুণ্ডল দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও ঝক্‌ঝক্ করিত। দুই হাতে 'রতনচুর' দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে দশ আঙ্গুলে দশটি আংটি এবং তাহাতে হীরা লাগান ছিল। দুইটি ছাতা দেওয়া হইয়াছিল, অনেকগুলি ঘোড়া দেওয়া হইয়াছিল।

তিনি শিশুপালবধেরও এক টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'নির্ণয়বৃহস্পতি'। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি শ্রীধর মিশ্রের নিকট হইতে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং গৌড়ের রাজার নিকট হইতে তিনি প্রচুর প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে শিশুপাল-বধ ও অমরকোষের টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বোধ হয়, ইনি আরও অনেক কাব্য নাটকের টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি অমরকোষের টীকায় আপনাকে 'ব্যাখ্যান-দীক্ষাগুরু' বলিয়াছেন। তাহাতেও বোধ হয়, তিনি নানা গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিয়া সংস্কৃত

আলোচনায় নব জীবন দিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে তাঁহার লিখিত রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের টীকার পুথি আছে।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা শিশুপালবধের টীকা লেখেন, তাঁহারা তাহার পূর্ব্বে আরও অন্য প্রচলিত কাব্যের টীকা লিখিয়া থাকেন। দুই শত বৎসরের পর নূতন করিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালার চর্চ্চা আরম্ভ হইবার সময়ে যে নানা বইএর টীকার দরকার হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সব টীকাই যে বৃহস্পতি লিখিয়াছিলেন, তাহাও ঠিক বলা যায় না। তবে কতকগুলির যে লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাঘ কাব্যখানি বড় কঠিন। উহাতে আবার কতকগুলি কঠিন কঠিন বন্ধও আছে। মাঘের টীকা লিখিতে গেলে, নীতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ দখল থাকা দরকার। অশ্বশাস্ত্র, গজশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রেও খুব দখল থাকা চাই। এই সব কারণেই মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,—'মেঘে মাঘে গতং বয়ঃ।'

কিন্তু তাঁহার স্মৃতির বইখানি বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ইতিহাসে একখানি অমূল্য রত্ন। অনেক স্মৃতির বইতেই বার মাসে যে তের পার্ব্বণ হয়, তাহার প্রয়োগ ও পদ্ধতি লেখা থাকে। রঘুনন্দন, রায়মুকুটের দেড় শত বৎসরের পরের লোক। উপর উপর রঘুনন্দনের বই ও এখনকার পাঁজির সহিত রায়মুকুটের বই মিলাইয়া আমরা যে ফল পাইয়াছি, তাহা নিম্নে দিতেছি। মাঘ-টীকার মঙ্গলাচরণ হইতে বেশ বোধ হয়, রায়মুকুট বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতিরত্নহারে জন্মাষ্টমীর কথা নাই, রামনবমীর কথা নাই—রথের কথা নাই—দোলেরও কথা নাই। রাসের বদলে সুখরাত্রি আছে। ইহাতে কার্ত্তিক পূজা ও কালী পূজার কথাও নাই। দূর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তব্রত প্রভৃতিও ইহাতে নাই।

নূতন পর্ব্বের মধ্যে শ্রাবণ মাসে উৎসর্গ ও উপাকর্ম্মের উল্লেখ আছে। সে কালের ব্রাহ্মণেরা বর্ষাকালে বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিত না। বাড়ীতে বসিয়া মুখস্থ বেদের আবৃত্তি করিত। অতি পূর্ব্বকালে শ্রাবণ মাসে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিত এবং পৌষ মাসে শেষ করিত। কিন্তু বৃহস্পতি, উৎসর্গ ও উপাকর্ম্ম দুইটিকেই শ্রাবণ মাসে ফেলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার সময়ে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা অতি অল্পমাত্রায় বেদ পড়িত। তাহারা এক মাসের মধ্যেই একটু একটু করিয়া যতটুকু বেদ পড়া ছিল, দুরস্ত করিয়া লইত। এ প্রথা এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখন আমরা নিরগ্নিক ও প্রায় নির্ব্বেদ হইয়া পড়িয়াছি।

বৃহস্পতির আর এক নূতন জিনিষ, যাহা এখন উঠিয়া গিয়াছে, তাহা শক্রোত্থান বা ইন্দ্র-পূজা। বর্ষার শেষে—এখন যাহাকে আমরা ব্রতপক্ষ বলি, সেই শুক্ল পক্ষে ইন্দ্রের একটা ধ্বজা তোলা হইত এবং তাহার চারি দিকে নাচ, গান, আমোদ প্রমোদ করা হইত। কালিদাস রঘুর চতুর্থ সর্গে ইন্দ্রধ্বজের বর্ণনা করিয়াছেন। ভরতনাট্যশাস্ত্রে বলে দেবাসুরদের যুদ্ধে অসুররা পরাজিত হইলে, দেবতারা ইন্দ্রের ধ্বজা তুলিয়া, সেইখানে তাঁহারা কেমন করিয়া অসুরদের পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার অভিনয় করেন। ইহাতে অসুরেরা রাগিয়া ধ্বজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে ও দেবতাদের মারিতে আসে। ইন্দ্র তখন ধ্বজা উপড়াইয়া তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করেন। সেই জন্য উহার নাম হয় জর্জ্জর। প্রত্যেক অভিনয়ের পূর্ব্বে জর্জ্জরের পূজা করিতে হইত।

নেপালে এখনও ইন্দ্রপূজা হইয়া থাকে। এক দিন এইরূপ ইন্দ্রপূজায় কাটমণ্ডুর সমস্ত লোক উন্মত্ত, এমন সময় গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন ও কাটমণ্ডু দখল করেন। বৃন্দাবনে ইন্দ্রপূজা বন্ধ করিয়া কৃষ্ণ বড় গোলে পড়িয়াছিলেন। ইন্দ্র রাগিয়া এত বৃষ্টি করেন যে, সকল ভাসিয়া যায়। তখন কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া সমস্ত রক্ষা করেন। মহীশূরে এখনও ইন্দ্রপূজা হয়, পশ্চিমেও হয়। বাঙ্গালায় এখন উঠিয়া গিয়াছে।

রায়মুকুট, অষ্টকা শ্রাদ্ধ কেবল অগ্রহায়ণ মাসের কৃত্যের মধ্যে ফেলিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার দেশে শাকাষ্টকা, পূপাষ্টকা এবং মাংসাষ্টকা—এই তিনটি অষ্টকা চলিত না। কেবল একটি মাত্র চলিত। এখন অষ্টকাশ্রাদ্ধ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

বৃহস্পতির উল্লিখিত দুর্গোৎসব দুই রকমের—এক রকমের বড়, এক রকমের ছোট। বড় দুর্গোৎসবে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে কল্পারম্ভ হয়। ছোট দুর্গোৎসবে ষষ্ঠীতে কল্পারম্ভ হয়। প্রতিপদাদি কল্পারম্ভের কথা তাঁহার বইএ নাই। বড় দুর্গোৎসবে নবপত্রিকাস্নান বা কলাবৌ নাওয়ানোর উল্লেখ আছে; ছোট দুর্গোৎসবে নাই. বড় ও ছোট, কোনও দুর্গোৎসবেই সন্ধিপূজার কথা নাই। বড় দুর্গোৎসবে অষ্টমী পূজার দিন মধ্যরাত্রিতে ভদ্রকালী পূজার বিধান আছে। বিজয়ার দিন ক্রীড়া-কৌতুক-মঙ্গল এবং নীরাজনের কথা আছে। ক্রীড়া-কৌতুক-মঙ্গলের আর এক নাম শবরোৎসব অর্থাৎ চণ্ডালের ব্যাপার। জীমূতবাহন ইহার অর্থ করিয়াছেন, অশ্লীল গান ও কুৎসিত ব্যবহার। রঘুনন্দনও তাহাই করিয়াছেন। বৃহস্পতির বোধ হয়, তাহা অভিপ্রেত নহে। কারণ, তিনি কেবল জীমূত-বাহনের মতটি তুলিয়াছেন—তাহার সমর্থন করেন নাই। মনে হয়, এইরূপ আচার মুসলমান আমলে রাজধানী গৌড়ে চলিত ছিল না।

শ্রাদ্ধে বৃহস্পতি, জীবন্ত ব্রাহ্মণ রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন্ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে প্রশস্ত—কোন ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এইরূপ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে দর্ভময় ব্রাহ্মণের উপর শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। যে সকল লক্ষণ হইলে ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে বসান যায়, সে সকল লক্ষণ অনেক কাল হইতেই ব্রাহ্মণে পাওয়া যাইত না। হেমাদ্রি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশে বাস করিলে ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয় হয় অর্থাৎ শ্রাদ্ধের পঙ্‌ক্তিতে বসিতে পারে না। এ পঙ্‌ক্তির অর্থ শ্রাদ্ধ করিবার সময় পিতৃপিতামহাদির উদ্দেশে পাত্রে যে অন্ন দেওয়া হয়, তাহাই ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণের পঙ্‌ক্তি—শ্রাদ্ধান্তে ভূরিভোজনের পঙ্‌ক্তি নহে। বোধ হয়, বৃহস্পতির সময়ে দুই প্রথাই ছিল—জীবন্ত ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে বসাইবার প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছিল এবং দর্ভময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করার বহুল প্রচলন হইতেছিল। এখন আর বাঙ্গালায় কেহ শ্রাদ্ধে জীবন্ত ব্রাহ্মণ বসাইবার চেষ্টা করেন না।

বোধ হয়, বৃহস্পতির সময়েও ব্রাহ্মণেরা চারি বর্ণে বিবাহ করিতেন। কারণ, তিনি বর্ণ-সন্নিপাতাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন অর্থাৎ এক ব্রাহ্মণের যদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিবাহ থাকিত এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীর সন্তান থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের কিরূপ অশৌচ হইবে,

তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের এবং এখনকার চলিত স্মৃতির বইএ এইরূপ অশৌচের উল্লেখ নাই। কারণ, এখন বর্ণসন্নিপাতই নাই। নেপালে এখনও ব্রাহ্মণে চারি বর্ণে বিবাহ করে; কিন্তু ব্রাহ্মণী স্ত্রীকেই রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইতে হয়—অন্য বর্ণের স্ত্রীকে রাঁধিতে দেওয়া হয় না। এক ব্রাহ্মণের চারি বর্ণের চারিটি স্ত্রী ছিল এবং সকলেরই কয়েকটি করিয়া সন্তান ছিল। হঠাৎ ব্রাহ্মণী স্ত্রীটি মরিয়া গেল। ব্রাহ্মণটিকে নিজে রন্ধন করিয়া সকলকে খাইতে দিতে হইত। জীমূতবাহনের দায়ভাগে চারি বর্ণে বিবাহের কথা আছে, এবং চারি বর্ণের সন্তানের দায়ভাগের কথাও আছে। বৃহস্পতির সময় প্রথাটা বোধ হয়, উঠিয়া আসিতেছিল—কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই।

অমরকোষের দুইখানি প্রধান প্রাচীন টীকা বাঙ্গালা দেশে লেখা হয়। একখানি ১১৫৯ সালে, সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটীয় (বন্দ্যোপাধ্যায়) কর্ত্তৃক লিখিত হয়। আর একখানি পদচন্দ্রিকা—বৃহস্পতি রায়মুকুটের লেখা। দুই জনেই পাণিনীয় ব্যাকরণে দক্ষ ছিলেন। শ্রীশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন,—রায়মুকুট অষ্টাধ্যায়ীতে খুব ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু তখনও ত ভট্টোজি দীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী হয় নাই। সুতরাং এই সকল প্রাচীন লেখকদিগকে বৌদ্ধটীকাকারদের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ভট্টোজি পঞ্চদশ শতকে বৌদ্ধ টীকাকারদের একেবারে ছাঁটিয়া ফেলেন। সুতরাং তাঁহার বইখানি পুরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বই। সে সম্প্রদায় এইরূপ—পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, ভর্ত্তৃহরি, কৈয়ট, ভট্টোজি দীক্ষিত। ভট্টোজি দীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী ও মনোরমা চলিলে পর, সেই অনুসারে অমরকোষের আর একখানি টীকা লেখা দরকার হয়। সেখানি লেখেন—ভট্টোজি দীক্ষিতের পুত্র ভানুজি দীক্ষিত। তাঁহার টীকাই এখন পশ্চিমাঞ্চলে খুব চলে। পশ্চিমের লোকে রায়মুকুটের উপর অনেক সময় কটাক্ষ করিয়া থাকেন। সে কটাক্ষের মানে আর কিছুই নয়—রায়মুকুট বৌদ্ধ টীকাকারদের মত অনেক সময় গ্রহণ করিয়াছেন।

সর্ব্বানন্দের টীকার সহিত রায়মুকুটের টীকার তুলনায় সমালোচনা দরকার। দু'জনেই বাঙ্গালী, দু'জনেই প্রকাণ্ড পণ্ডিত অথচ দু'জনে প্রায় তিন শ' বৎসরের তফাৎ। এক বিষয়ে সর্ব্বানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না। তিনি অমরকোষের প্রায় দুই শত শব্দের তখনকার চলিত বাঙ্গালায় মানে দিয়া গিয়াছেন। রায়মুকুট দুই চারিটা দিয়াছেন বটে, কিন্তু এত নয়। সর্ব্বানন্দ অমরকোষের দশখানি টীকা দেখিয়া টীকাসর্ব্বস্ব লিখিয়াছিলেন। রায়মুকুট ষোলখানি টীকা দেখিয়া আপনার বই লিখিয়াছিলেন। সর্ব্বানন্দ ১৯৪ খানি পুথি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রায়মুকুট ২১০ খানি হইতে করিয়াছেন। রায়মুকুট গৌড়ের সুলতানের আশ্রিত ছিলেন—তাঁহার লাইব্রেরী খুব বড় ছিল। কিন্তু সর্ব্বানন্দ যে সকল পুস্তক পাইয়াছিলেন, তিনি তাহা সকল পান নাই। অনেক বই দুই তিন শ' বৎসরে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তথাপি তিনি সর্ব্বানন্দ অপেক্ষা প্রায় এক শ'খানি বেশী পুথি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। হয় ত দু' চার জায়গায় রায়মুকুটকে প্রমাণের জন্য অন্য লোকের উপর নির্ভর করিতে হইতে হইয়াছিল। তিনি অন্যের উদ্ধৃত প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সর্ব্বানন্দ ও রায়মুকুট উভয়েই অনেকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে আপনাদের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি মহাকাব্য।

একখানি—বুদ্ধচরিত, একখানি সৌন্দরনন্দ, আর একখানি কপ্‌ফণাভ্যুদয়। প্রথম দুইখানি অশ্বঘোষের, তৃতীয়খানি শিবস্বামীর। দুঃখের বিষয়, দুই তিন শতাব্দী ধরিয়া আমাদের পণ্ডিতেরা এই সব গ্রন্থের নামও জানিতেন না। প্রথম দু'খানি নেপাল হইতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃতীয়খানি আরও সম্প্রতি পুরী ও দক্ষিণ-ভারত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রায়মুকুট বুদ্ধচরিত হইতে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি গণরত্নমহোদধি হইতে লইয়াছেন—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধচরিত হইতে নয়।

কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দুই জন টীকাকারই অভিধান ও ব্যাকরণের অনেক বৌদ্ধ বই হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন; যথা,—চন্দ্রগোমী, জয়াদিত্য, বামন, জিনেন্দ্রবুদ্ধি, পুরুষোত্তমদেব, মৈত্রেয় রক্ষিত। হিন্দু ও ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা বৌদ্ধলিখিত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রায়মুকুট কোন কোন স্থানে বৌদ্ধাগম হইতেও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। যে সময়ে সর্ব্বানন্দ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালা ত বৌদ্ধে ভরা ছিল। নালন্দা মগধে, বিক্রমশিল ভাগলপুরে, জগদ্দল বগুড়ায়; বড় বড় বিহার ও সঙ্ঘারামে পরিপূর্ণ ছিল। তখনও বাঙ্গালায় বৌদ্ধ বই নকল হইতেছিল। ১৪৩৬ সালে বর্দ্ধমানে বেণুগ্রামে বোধিচর্য্যাবতার নকল হইয়াছিল। ইহার দশ বৎসর আগে মালদহে কালচক্রতন্ত্র নকল হইয়াছিল। উহা এখন কেম্ব্রিজে আছে। ইহারই কয়েক বৎসর পরে একজন বৃদ্ধ মঠধারীর সখ হয়, তিনি সংস্কৃত শিখিবেন। তিনি কলাপব্যাকরণ টীকার সহিত নকল করান। ঐ পুথির কয়েক খণ্ড এখন ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, রায়মুকুট যখন বই লেখেন, তখনও বাঙ্গালায় বৌদ্ধপ্রভাব বেশ ছিল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শূন্যপুরাণ

(১) সংস্করণ

সন ১৩১৪ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ "শূন্যপুরাণ" প্রকাশ করেন। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু ইহার সংস্কর্ত্তা হইয়াছিলেন। কয়েকমাস হইল "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির" হইতে এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সংস্কর্ত্তা।

শূন্যপুরাণে রাঢ়ে প্রচলিত ধর্ম্মপূজার প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাকৃত বাংলার নিদর্শন আছে। দুই কারণেই ইহার গুরুত্ব। কিন্তু যেখানে পুরাকাল, সেখানেই ধুন্ধু। অনেক বিজ্ঞজনে ধুন্ধু বধ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। মূল গ্রন্থ ছোট, ডিমাই কাগজের দ্বাদশ-পৃষ্ঠভঙ্গের ১৪২ পৃষ্ঠা। নগেন্দ্রবাবুর ভূমিকা ৭১ পৃষ্ঠা ছিল। নূতন সংস্করণে ভূমিকা ১৩০ পৃষ্ঠা, গ্রন্থের প্রায় সমান হইয়াছে। ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং অধ্যাপক শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং স্বয়ং সংস্কর্ত্তা অশেষ পরিশ্রমে 'প্রবেশকে' বহু বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার বিষয়-সূচী দিলে ভাল হইত। গ্রন্থের ভাব সোজা, ভাষা সোজা; কিন্তু সব শব্দের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। না পারিবার চারি কারণ আছে। কবি অশিক্ষিত, লিপিকর অশিক্ষিত, শব্দ প্রাচীন, এবং পুথীপাঠক সে ভাষায় ও বিষয়ে অনভিজ্ঞ। পরিশিষ্টে কতকগুলি শব্দের অর্থ উদ্ধার করা যাইবে।

শূন্যপুরাণের মহত্ত্ব ইহার বিষয়ে। বহুকাল যাবৎ আমাদেরই সহস্র সহস্র নরনারী ধর্ম্মরাজের দ্বারে আশ্রয় লইয়া দুঃখে ও বিপদে সান্ত্বনা পাইয়াছিল। বাল্যকালেও দেখিয়াছি শত শত নরনারী শত দ্বারে ধর্ম্মের জয় বলিতেছে। কাল-মাহাত্ম্যে এখন সর্ব দেবতার প্রভাব ক্ষীণ হইয়াছে, তথাপি যাহা আছে, তন্মধ্যে ধর্মরাজের অল্প নয়। শূন্যপুরাণে এই ধর্ম্ম-পূজার প্রথম পর্ব্ব আছে। এই হেতু ইহার বিষয়ের একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।

(২) প্রশ্ন-চতুষ্ক

পুরাতন গ্রন্থ পাইলে তৎসম্বন্ধে চারিটি প্রশ্ন আসে,—(১) গ্রন্থের বিষয় কি? (২) গ্রন্থকার কে? (৩) কোন্ দেশের? (৪) কত কালের? এই চারি প্রশ্নের সংজ্ঞা 'চতুষ্ক' রাখা যাউক। শূন্যপুরাণ, ধর্মরাজ-পূজা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। এই পূজা-সম্বন্ধেও চতুষ্ক জানিতে ইচ্ছা হয়। (১) ধর্মরাজের স্বরূপ কি? (২) পূজা-প্রবর্ত্তক কে? (৩) তিনি কোন্ দেশের? (৪) কোন্ কালের? এই দুই চতুষ্কের কোন কোন পাদে ঐক্য থাকিতে পারে, নাও পারে। চতুষ্কদ্বয়কে পৃথক্ ভাবে আলোচনা না করিলে ধুন্ধু থাকিয়া যায়, একই কথার পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকে।

চতুষ্ক-নির্ণয়ের উপকরণ কি আছে ? (১) প্রচলিত ধর্মপূজা, (২) "ধর্মপূজা-বিধান", (৩) "শূন্যপুরাণ", (৪) ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থ। রাঢ়ে ধর্মরাজ-পূজা প্রচলিত আছে। কিন্তু পূজার বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। নানাস্থানের ধর্মরাজ ও তাঁহার পূজা-প্রকরণ না দেখিলে সামান্য লক্ষণ পাওয়া যাইতে পারে না। এই অভাবে এক-দেশ-দর্শিতা ঘটিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ "ধর্মপূজা-বিধান" প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি ইহার চতুষ্ক নির্ণীত হয় নাই। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু শূন্যপুরাণের ভূমিকায় সে পুরাণের চতুষ্ক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ণয়ে আমার সন্দেহ হওয়াতে, আমি ১৩১৬ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার নিরূপিত কালে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি মাতৃকা-পুথীখানি বিষ্ণুপুরের দক্ষিণে ময়নাপুরের এক ধর্মপণ্ডিতের নিকট পাইয়াছিলেন। তখন "ধর্মপূজা-বিধান" প্রকাশিত হয় নাই।

(৩) ধর্মপুরাণ

ধর্মমঙ্গল গ্রন্থ, পুরাণ। পুরাণ হইতে সত্য-নিষ্কর্ষ অতিশয় কঠিন। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি, খেলারামের ধর্মমঙ্গল প্রাচীনতম। ইহা ৪০৩ বৎসর পূর্বে "ভুবন শকে বায়ু শরের বাহন" (ভুবন = ১৪; বায়ু, মরুৎ = ৪৯) অর্থাৎ ১৪৪৯ শকের "শরের বাহন" শরাসন, ধনু মাসে লিখিত হইয়াছিল। ইহার বিষয় কিছুই জানি না। ইহার পরে ৩১৬ বৎসর পূর্বে রূপরামের ১৫২৬ শকে[১], ২৩২ বৎসর পূর্বে সীতারাম দাসের ১৬২০ শকে[২], ২১৯ বৎসর পূর্বে ঘনরামের ১৬৩৩ শকে, ১৯৬ বৎসর পূর্বে সহদেব চক্রবর্তীর ১৬৫৬ শকে[৩], এবং ১৪৯ বৎসর পূর্বে মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ১৭০৩ শকে[৪] প্রণীত হইয়াছিল। এই কয়খানির মধ্যে ২২০ বৎসর পূর্বের ঘনরামের এবং ১৫০ বৎসর পূর্বের মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল মুদ্রিত হইয়াছে। ধর্মপূজা বহু পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সে পূজার ইতিহাস এই দুই আধুনিক কালের "মঙ্গলে" পৌরাণিক হইয়া পড়িয়াছে।

(৪) ময়ূরভট্ট

সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ময়ূরভট্ট-বিরচিত ধর্মপুরাণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে ঘনরাম ও মাণিকরামের বন্দিত ময়ূরভট্ট মনে করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি মূল পুথী কিম্বা তাহার পুরাতন অনুলিপি পান নাই। সন ১৩১০ সালের এক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ দেখিয়া সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ময়ূরভট্টের কাল জানা নাই; কিন্তু জানি তিনি রূপরামের পূবে ছিলেন, এবং অন্ততঃ সাড়ে তিন শত বৎসরের পুরাতন। মুদ্রিত পুস্তকের ভাষা ১৩১০ সালের বটে। কেবল 'পনীর' (১০পৃঃ) নয়,

১। সন ১৩৩৬ সালের পৌষের "প্রবাসী"তে "কবি শকাঙ্ক"।
২। ময়ূর-ভট্টের ধর্মপুরাণের ভূমিকা।
৩। সন ১৩৩৪ সালের ভাদ্রের "প্রবাসী"তে "ধর্মের গান কত কালের ?"
৪। সন ১৩৩৬ সালের পৌষের "প্রবাসী"তে "কবি শকাঙ্ক"।

'দেবতার কোমর ভাঙ্গা' (১০), 'বেশী কি কহিব আর' (৪১), 'তথাপি দেবীর নাহি হইল কদর' (১৩৬), 'দয়া করি মুক্তি দিন' (৫৬), 'শরীর ভগ্ন' (৫৯), 'তাই সবিশেষ কহি' (৬০), 'তা হলে' (৬১), 'অধিকাংশ কূর্মাকৃতি' (৫৫), 'প্রস্তুত হইব' (৮৪), ইত্যাদি অসংখ্য বাগ্‌ভঙ্গি বর্তমান কালের। পরিবর্দ্ধনের একটা উদাহরণ দিই। বিবাহে কন্যাপণ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে বরপণ আরম্ভ হইয়াছে। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের রূপবতী ও 'বয়স্থা' কন্যার নিমিত্ত নব্য কবি 'পঞ্চ শত রৌপ্যমুদ্রা' বরপণ করিয়াছেন। সে ব্রাহ্মণকে পঞ্চশত 'রৌপ্যমুদ্রা' দিয়া বহু ব্রাহ্মণ সে কন্যা গ্রহণ করিতেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাহাকে কন্যাদান করিলেন, তিনি কুলীন নহেন, অকুলীন, তদুপরি অবীরার পুত্র! দরিদ্র ব্রাহ্মণ 'পতিত' হইয়া থাকিলে বরপণ লাগিতে পারে। নব্য কবি লিখিয়াছেন, 'মিথুন সমুদ্র দিনে ঋতুবতী হোল ধরা', কিন্তু এখনও 'যে আষাঢ় মাসের ৭ই অম্বুবাচী হইতেছে। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে ১১ই আষাঢ় হইত[৫]। ইত্যাদি। যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম 'সঙ্গাত খণ্ড'। সঙ্গাত উৎপত্তি। ইহাতে ধর্মরাজের শিলারূপে প্রকাশ, ও রামাই পণ্ডিতের ও তাঁহার পুত্রের জন্ম ও কর্ম বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্গাত-খণ্ডে রামাই উপাখ্যান বিস্তারিত হইয়াছে, মনে হয় যেন এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থের উৎপত্তি। নূতন বিষয়ের মধ্যে নানা ধর্মবিগ্রহের নানা নাম ও চিহ্ন বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশ যে-সে গায়কের জানা সম্ভব ছিল না, রচনাও গুণীর, এবং বোধ হয়, ইহা সংস্কৃতেও লিখিত হইয়া গোপ্য রহিয়াছে। বোধ হয়, সঙ্গাত-খণ্ড নামে এক ক্ষুদ্র পুথী ছিল, তাহা এখানে নব্য-কবি দ্বারা পল্লবিত হইয়াছে। সে পুথীর কর্তা এক গ্রহ-বিপ্র। নইলে এত দিনক্ষণের বাঁধাবাঁধি থাকিত না।

এই কবি হরিচন্দ্র রাজার পুত্রলাভ দুইবার শোনাইয়াও দ্বিতীয় খণ্ডে আবার শোনাইবেন বলিয়াছেন। ঘনরাম ও মাণিকরাম লাউসেনের জন্ম উপলক্ষে একবার শুনিয়াছিলেন। ইঁহারা আর এক অপুত্রক রাজার পুত্র-লাভের বিবরণ শোনেন নাই। ইনি কলিঙ্গদেশের রাজা রণজিৎ-রায় (১০৮)। ইনি গালব মহর্ষিকে পুরোহিত করিয়া পুত্রেষ্টি

৫। এই পুস্তক পড়িলে বহু স্থানে মনে হয়, যেন বর্তমান থিয়েটার বা যাত্রা-গানের কুশীলবের "বক্তৃতা" শুনিতেছি। 'তুমি যদি দেহত্যাগ কর এই ক্ষণে। কিরূপেতে মম কীর্তি থাকিবে ভুবনে॥' (৬২)। 'অবশ্যই চাই বিপ্র তোমার নন্দনে' (৬২), 'পরহিত মহাব্রত সঙ্কল্প আমার' (৮৪), 'আমিত্বের অহং জ্ঞানে সর্ব্বদায় রত' (১১১)। নব্য কবি জানিতেন না, প্রাচীন বাংলায় 'ও' যোজক-অব্যয় ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন, "মাঝি ও বাগ্‌দী মেটে নাহি ভেদজাতি' (৮২)। 'মেটে' বানানও ভুল। হইবে 'মেট্যা'।

[থিয়েটারী ভাষা পড়িয়া নব্য কবির বৃত্তান্ত জানিতে কৌতূহলী হইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ সমাপ্ত হইবার পর জানিতে পারিলাম, পুথীলেখক শ্রীআশুতোষ পণ্ডিত কলিকাতা অঞ্চলে ও আরামবাগে ২।৩ বৎসর করিয়া যাত্রার দলে ছিলেন। এখন (১৩৩৭ সাল) তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর। অর্থাৎ তিনি ৫ বৎসর বয়সে "বহু পুরাতন কীটদষ্ট পুস্তক" হইতে "সঙ্গাত খণ্ড" উদ্ধার করিয়াছিলেন! সে "কীটদষ্ট পুস্তক" আর নাই, ছাপা হইয়া গিয়াছে! সে ছাপা পুস্তকে, এই ময়ূরভট্ট। তাঁহার নিবাস গোঘাট থানায় বটে, কিন্তু বদনগঞ্জের তিন মাইল দক্ষিণে ভেউটে বা ভেঙটে গ্রামে। তিনি ডোম-পণ্ডিত, বাংলা লেখাপড়া ভাল জানেন, ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। আমার এই প্রবন্ধ যেমন লেখা হইয়াছিল, তেমনই রাখা গেল, সংশোধন করিলাম না।]

যজ্ঞ করিতেছিলেন, রামাই-পুত্র ধর্মদাস এক ধর্মশিলা লইয়া উপস্থিত। রাজা শিলা গ্রহণ করিলেন, গালব মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞ অপূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ধর্মদাস যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি দিলেন, গালব মুনি ক্রোধে ধর্মদাসকে কুবচন শোনাইলেন, ফলে মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার সঙ্গের চারি মুনিরও সে রোগ হইল। "কিছুতে না কমে রোগ বাড়য়ে যন্ত্রণা"। পরে তাঁহারা "পণ্ডিতের কৃপাতে উদ্ধার" পাইলেন। রাজা "গৃহাভরণ" ও "নবখণ্ডে" (দেহের নয় স্থানে বাণ ফুড়িয়া) সেবা করিলেন, পুত্রলাভ হইল। শেষে কবি লিখিয়াছেন, "গুরুর নিকটে যাহা করিনু শ্রবণ। সেই কথা এখানেতে করিনু বর্ণন॥" অর্থাৎ কবির পূর্বের কাহিনী।

এই রণজিৎ-রায় সত্য সত্য এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। আরামবাগের নিকট রণজিৎ-রায়ের বিস্তীর্ণ দীঘি আছে, "গড়বাড়ী"তে তাঁহার বংশধরেরা বিদ্যমান আছেন। তদ্দেশবাসী ৺অম্বিকাচরণ-গুপ্ত লিখিয়াছেন, "জেলা হুগলীর আরামবাগ মহকুমার কাছারী হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে বায়ড়া পরগণার রাণা রঞ্জিৎ সিংহের গড়ই গড়বাড়ী নামে পরিচিত।" (চিত্র পশু)। তাঁহার উপাধি 'রাণা' ছিল, কি না, জানি না। কেহ বলে রঞ্জিৎ সিংহের, কেহ বলে রঞ্জিৎ রায়ের দীঘি। নিকটে পশ্চিম দ্বারকেশ্বর নদ থাকিতেও বারুণীর দিন অসংখ্য লোকে এই দীঘির জলে স্নান করে, পাড়ে তিন দিন জাত বসে। ১৬০৭ শকের (১৬৮৫ খ্রীঃ) "রসকল্পলতা"য় "গড়বাড়ী" নাম আছে।[৬] তিন শত বৎসর পূর্বের জগন্মোহন-পণ্ডিতের "দেশাবলী-বিবৃতি"তে এই দীঘির উল্লেখ আছে।[৭] অনুমান হয় রাজা রণজিৎ-সিংহ চারিশত বৎসর পূর্বে ছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম রাজা অচ্যুতানন্দ। রাজা রণজিৎ রায় শাক্ত-তান্ত্রিক ছিলেন, তাঁহার অর্চিতা যন্ত্ররূপা বিশালাক্ষী-দেবী এখনও প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি যে পুত্র-কামনায় ধর্ম্মদাসের কথায় নবখণ্ডে ধর্মের সেবা করিবেন, বিশ্বাস হয় না। গড়বাড়ীতে ধর্মঠাকুরও নাই।[৮] ধর্মের পূজা দেওয়া আশ্চর্যের নয়। পূজায় ঘটা হইয়াছিল, সে কাহিনী ময়রভট্ট শুনিয়া থাকিবেন। কবির কলিঙ্গ দেশ এখানে দ্বারকেশ্বরের পূর্ব, তাঁহার মগধ দেশ নদের উত্তরে, বর্দ্ধমান জেলায়। এখানে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, ধর্মদাস গিয়া সুবৃষ্টি করাইয়াছিলেন[৯]। কবির নিবাস বদন-গঞ্জের নিকটে কোথাও ছিল। দেখা

৬। সা-প-পত্রিকা, ১৪শ ভাগ ৩৪ পৃঃ। জয়কৃষ্ণদাসের "রসকল্পলতা"।

৭। "দীঘিকা মহতী রাজন্ রণজিৎ-রায়াখ্যা নিত্য।"—দেশাবলী বিবৃতি।

৮। আমার জন্মগ্রাম (দিগড়া) দীঘি হইতে দুই মাইল দক্ষিণে দ্বারকেশ্বরের পশ্চিমকূলে। আমি উক্ত রায় বংশীয় এই হেতু রণজিৎ রায়ের সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছি। তাঁহার রণোদ্যম-সম্বন্ধে গাথা প্রচলিত ছিল; শুনিয়াছি একটা ছাপাও হইয়াছিল। তিনি বিশালাক্ষীকে কন্যা ভাবিতেন। এই কন্যাই, দীঘিতে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহাঁর পরেই রাজা মানসিংহের আমলে বায়ড়া রাজ্য মুসলমান দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হয়। জেতার বংশধরের অদ্যাপি নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস করিতেছেন। রণজিৎ-রায়ের বংশ (গুর্জর) প্রতিহার। আদি-নিবাস বুন্দেলখণ্ড।

৯। অনেক স্থানে লোকের বিশ্বাস আছে, অনাবৃষ্টি কালে ধর্মের পূজা দিলে সুবৃষ্টি হয়। মালিয়াড়া (চিত্র) হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে নিত্যানন্দপুরে এক খর্জ্জুর-বৃক্ষমূলে 'ডেমুর‍্যা' ধর্মরাজ আছেন। অনাবৃষ্টি হইলে ব্রাহ্মণ গিয়া পূজা করেন। ডেমুর‍্যা, বোধ হয় ডামর-ইয়া, ধ-পূ-বিধানের ডামর-সাক্ষি, ডামর-স্বামী। "বৃহড্ডামর" নামে এক তন্ত্র আছে।

যাইতেছে, নব্য-কবির ময়ুরভট্ট সাড়ে তিনশত বৎসরের পূর্বে ছিলেন না। ইনি কবিকঙ্কণ হইতে ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর পাইয়া পাট-ভক্ত্যা করিয়াছেন; এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে অনেক ভাব ও কয়েকটি পাত্রের নাম লইয়াছেন। যেমন এই পুরাণের গঙ্গার স্থিতিকাল, রাধিকার শাপে বিরজার নদীত্ব-প্রাপ্তি, কলাবতী, মালাবতী, ব্রহ্মদত্ত, সুযজ্ঞ নামের অনুরূপ নাম। এই পুরাণের বর্তমান সংস্করণ ষোড়শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের পূর্বে হয় নাই।

(৫) ধর্মরাজপূজা

ধর্মরাজপূজার যৎসামান্য বিবরণ দিলে পরে বুঝিবার সুবিধা হইবে। ধর্ম, নিরঞ্জন স্বয়ম্ভু ত্রিগুণাতীত জ্ঞানময়; তাঁহার রূপ আর কি? ভক্তেরা তাঁহার পাদুকা কল্পনা ও "মুক্তাহার' তণ্ডুলের রচনা করিয়া পূজা করিত। কূর্মপৃষ্ঠ মেদিনীতে তাঁহার পাদুকা, কূর্ম তাঁহার বাহন। ভক্তেরা মনে করেন, কূর্মাকার শিলা ধর্মের বিগ্রহ। অধিকাংশ বিগ্রহ কূর্মাকার বটে, কিন্তু সকলেই নহে। কিন্তু সকলেই কূর্মপৃষ্ঠ। কূর্মপৃষ্ঠ চক্রাকার স্ফটিক প্রস্তরও আছে। তাহাতে পাদাদির চিহ্ন থাকিতে পারে না। কোথাও কোথাও তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে কৌটার মধ্যে থাকেন, কি মূর্তি কেহ জানে না। এই বিগ্রহের পাশে দুই দুই চারি 'কামিন্যা' (সেবাদাসী) মূর্তি থাকে।

'রাজ' শব্দ হইতে 'রায়'; ধর্মরাজ, ধর্মরায়। নানা নামে তিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যেমন, জগৎরায়, যাত্রাসিদ্ধিরায়, বাঁকুড়ারায়, কৌতুকরায়, বুড়ারায়, কালুরায়, বাঘরায়, ইত্যাদি। নাম দীর্ঘ হইলে 'রায়' যুক্ত হয় না। যেমন, খেলারাম, স্বরূপনারাণ, পঞ্চানন্দ, দলমাদল (দলমর্দন), শীতল-নারাণ। ধনবান্ ভক্তের অভাবে কেহ কেহ বৃক্ষমূলে স্থিতি করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলায় ইঁহারা 'ভৈরব' কিম্বা 'সন্ন্যাসী' নামে খ্যাত। দূরে দূরে কোথাও 'ধর্মরাজ', এই নামে প্রসিদ্ধ, বিশেষ নাম নাই। ধর্মরাজের ও বাঁকুড়ার 'আসিনী' নাম্নীদেবীর থানে মাটির ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা শ্বেত অশ্বে ভ্রমণ করেন। ভক্তেরা ঘোড়া, কখনও হাথী জোগাইয়া আশা করেন, ইঁহাদের আগমনে বিলম্ব হইবে না। কেহ কেহ মনে করেন, ঘোড়া দিলে শিশুপুত্র খট্‌খট করিয়া চলিয়া বেড়াইবে। ইদানী এই বিশ্বাসের চিহ্ন নূতন ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায় না। মাণিক-গাঙ্গুলী অনেক ধর্মরাজের নাম করিয়াছেন; কিন্তু বিষ্ণুপুর-ময়নাপুরের যাত্রা-সিদ্ধির করেন নাই। ময়নাপুর হইতে তাঁহার নিবাস পাঁচ ছয় ক্রোশ মাত্র দূরে ছিল।

যাঁহারা ধর্মপূজা করেন, তাঁহারা 'ধর্মপণ্ডিত'। বাঁকুড়ায় নাম, পড়িত। তাঁহারা নিজ নিজ নামের পর 'পণ্ডিত' উপাধি যোগ করেন, যেমন 'শ্রীনিবাস পণ্ডিত'। তাম্র-দীক্ষিত না হইলে ধর্মপণ্ডিত হইতে পারা যায় না। দক্ষিণ বাহুতে তামার তাগা ও এক অঙ্গুলীতে তামার এক-ফের তারের অঙ্গুরী দেখিলে বুঝি, তিনি ধর্মপণ্ডিত। ধর্মপণ্ডিত না-থাকিলে পণ্ডিতানী পূজা করেন। তাঁহার বাম বাহুতে তামার তাগা থাকে। ইদানী তাম্রবলয় "অসভ্য" হইয়াছে; তাম্র-অঙ্গুরী মাত্র আছে। ভক্তেরা আপনাদিগকে সদ্ধর্মী বলিতেন।

ধর্মপণ্ডিত নানাজাতির আছেন। যেমন, বাগ্‌দী, ডোম, নমশূদ্র, কেওট, জালিক (ধীবর), তাঁতী, জুগী (যোগী), নাপিত, ইত্যাদি। অন্য অনেক জাতির সেবায়েৎ আছেন,

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, ডোম হইলেই বাদ্যকর। তাহা নহে। ডোমের দুই শ্রেণী আছে। (১) আঁকড়া ডোম। পূর্বকালে ইহারা সেনা হইত। লাউসেনের কালুডোম এইরূপ ছিল। (২) বেঁশো ডোম, বেণুকর। ইহাদের অপর নাম বাজান্তে ডোম। কিন্তু কোথাও কোথাও আঁকড়া ডোম বাদ্যকর হইয়াছে। পূর্বকালে ডোম রণবাদ্যও করিত। রুহিদাস (মুচি) জয়-ঢাক বাজাইত। বাঁকুড়া জেলায় আঁকড়া ডোম হইতেই ডোম-পণ্ডিত হইয়া থাকেন। কিন্তু অন্যত্র বেঁশো ডোমও ধর্মপণ্ডিত আছেন। ঠাকুর প্রসিদ্ধ হইলে তাঁহার পণ্ডিতবংশও প্রসিদ্ধ হন। কোথাও ডোম পণ্ডিত, কোথাও নমশূদ্র পণ্ডিত, কোথাও জেল্যা পণ্ডিত প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। লোকের বিশ্বাস, ধর্মের নিন্দা করিলে ধবলরোগ ও মহাব্যাধি হয়। যেখানে ভয় প্রবল, সেখানে সকলকেই মাথা নোআতে হয়। এই কারণে ব্রাহ্মণেও কোন কোন ধর্মরাজ পূজা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাম্রদীক্ষিত হন না।

ধর্মরাজের পূজা দ্বিবিধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্য পূজায় ঘটা হয় না, কোনও ঠাকুরের হয় না। নৈমিত্তিক পূজা, দিনবিশেষে পূজা ও মানসিক শোধ। নিত্যপূজা না হইলেও মকর-সংক্রান্তির দিন পূজা হয়ই হয়। লোকে কঠিন-রোগ-মুক্তি, শিশুর অকাল-মৃত্যু-রোধ, অপুত্রকের পুত্র-লাভ নিমিত্ত মানসিক করে, অভীষ্ট-প্রাপ্তি হইলে কৃষ্ণ-ছাগ-বলি-সহ পূজা দেয়। শুক্রবারে নিয়মে থাকিয়া শনিবারে পূজা দেয়। শৈশবে অগ্রজের মৃত্যু হইলে বালকের পায়ে, প্রায়ই এক পায়ে, ধর্মের 'ডাঁড়ুকা' (লোহার বেড়ী) পরাইয়া দেয়। যমরাজ সে 'ডাঁড়কো' ছেলেকে ছুঁইতে পারেন না। গৃহভরণ নামক পূজায় মানসিক শোধের ঘটার বাহুল্য হয়। ইহাতে চারিপাশের গ্রামের বারটি ধর্মরাজ কামিন্যা-সহ একত্র করিয়া সকলের পূজা করা হয়। এ নিমিত্ত নূতন মণ্ডপ নির্মাণ করিতে হয়। এক গৃহে ভরণ, আনয়ন; ইহা হইতে নাম গৃহভরণ। শূন্যপুরাণে নাম 'ঘরভরা'। বোধ হয়, মূল শব্দ 'বিগ্রহ আহরণ', কিম্বা 'গৃহে আহরণ'। লোক-বল ও ধন-বল না থাকিলে গৃহভরণ অসাধ্য। ইদানী আর শোনা যায় না। পূর্বকালেও দশ পনর বৎসরে একবার হইত। গৃহভরণ সমাপ্ত হইতে বারদিন লাগে, ইহার শেষ দিন গাজন (মেলি) হয়।

কুলদেবতা ও গ্রামদেবতা ভেদে দেবতা দ্বিবিধ। গ্রামদেবতা শিবের গাজন হয়, শীতলার হয়, সেইরূপ ধর্মেরও হয়। চৈত্রমাসের শেষদিন শিবের গাজন শেষ হয়। এইদিন দিন-গাজন, ইহার পূর্বরাত্রিতে রাতগাজন। গ্রামবাসী যোগ না দিলে, গাজন হইতে পারে না। কারণ গাজনের সন্ন্যাসী চাই, অর্থব্যয়ও আছে। ধর্মের গাজনের সন্ন্যাসীরা ভক্তিয়া বা ভক্ত্যা নামে পরিচিত। শিবের গাজনের পূর্ব পনর দিন শিবের 'মসুই' হয়। 'মসুই', ঘৃত দুগ্ধ খণ্ড আতপ তণ্ডুল ও নারিকেল-কোরা যোগে পরমান্ন। অবশ্য ব্রাহ্মণে পাক করেন। বাঁকুড়ায় এই পাচকের নাম ধামাৎকর্ণি। গ্রাম-যাজক হইতে গাজন্যে বামুনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী-দের মধ্যে একজন মূল-সন্ন্যাসী হন। ইনি 'শালে ভর' করেন, একখানা পাটায় বিদ্ধ লৌহ শলার উপরে শয়ন করেন। ধর্মের গাজনে ইহাকে 'পাট-ভক্ত্যা' বলে। কোন জল-চল জাতি হইতে পাট-ভক্ত্যা হয়। কেহ 'পাট ভাঙ্গেন'। ছোট ছোট গামার পাটায় বিদ্ধ লৌহশলার উপর ঝাঁপ দেন। কেহ অগ্নি-সন্ন্যাসী, আগুনের উপর চলিয়া যান, (বাঁকুড়ার একতেশ্বর

শিবের গাজনে বার্ষিক ঘটনা), কিম্বা আগুনের উপরে ঝাঁপ দেন। কেহ লোহবাণ দ্বারা জিহ্বা ও দেহের নবঅঙ্গ ফুড়িয়া দিতেন। 'জিহ্বাবাণ' নিষ্ঠুর কর্ম। আঙ্গুলের তুল্য মোটা লোহার শিক জিহ্বায় চালাইয়া রক্তপ্লাবিত দেহে উদ্দাম নৃত্য, ইত্যাদি। গাজন শেষে সন্ন্যাসীরা গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের জয় কামনা করেন। ধর্মের গাজনও এইরূপ। বিশেষ এই, (১) বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া (অক্ষয়া তৃতীয়া) দিনে ঘট স্থাপনা হয়, তদনন্তর দুই দিনে, প্রায়ই পূর্ণিমায় শেষ হয়। শিবের কিম্বা ধর্মের গাজন নির্দ্দিষ্ট দিনে সমাপনে অসুবিধা থাকিলে যে গাজন হয়, তাহার নাম 'অপাল গাজন', বা 'আবাল গাজন'। (২) ধর্মের গাজনে পাকা মন্নুই হইত না। হইবার জো ছিল না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির গৃহে পক্বান্ন-প্রসাদ-গ্রহণ চলে না। কিন্তু ধর্মপণ্ডিতের গৃহে ধর্মরাজ না থাকিয়া লোকালয় হইতে দূরে থাকিলে পাকা মন্নুই হয়, অবশ্য ব্রাহ্মণে পাক করেন। ইহাঁরও পদবী ধামাৎকর্ণি। শূন্য-পুরাণে মন্নুই অপক্ক। তখন ব্রাহ্মণ ধর্মপূজায় যোগ দিতেন না। (৩) ধর্মের গাজনে ১২ পুরুষভক্ত্যা ও ৪ জন নারীভক্ত্যা চাই। নারীভক্ত্যারা 'বালা ভক্ত্যা'। (৪) ধর্মের গাজনে ছাগ-বলি হয়। এই ছাগ গাজনের দুই তিনবৎসর পূর্ব হইতে ধর্মের নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সমুখের এক পায়ে খুরের উপর লোহার বেড়ী দেওয়া থাকে। দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। লোহা থাকে বলিয়া সে ছাগের নাম লুয়া (লোহিয়া)। প্রতিবৎসর গাজন হয় না, লুয়া বৃহৎ হইয়া উঠে। লুয়া ছাগ, ডাঁড়কো ছেলের অনুরূপ। ডাঁড়কো ছেলেকেও লুয়া বা লুয়ে বলে। ধর্মের গাজনের লুয়া-বধ, এক বিচিত্র ব্যাপার। হাড়িকাঠে লুয়া-ছেদ হয় না; বিগ্রহের নিকটে লুয়া পত্রপুষ্প খাইতে থাকে, উপবাসী ঘাতক (প্রায়ই কর্মকার) এক কোপে মুণ্ড পৃথক্ করে। তৎক্ষণাৎ এক হাঁড়ীতে সে মুণ্ড রক্ষিত হয়। অপুত্রক নারী এই হাঁড়ী কোলে লইয়া বসে, মধ্যে মধ্যে লুয়া-মুণ্ডকে দুধ খাইতে দেয়। সে নারীর পুত্র হইলে তাহার নাম 'লুইধর' কিম্বা 'লাউসেন' রাখা হয়। এই নাম হইতে মনে হয়, 'লাউসেন' নাম বাস্তবিক লৌহসেন। লৌহ শব্দ হইতে 'লৌ'। পূর্বকালের উচ্চারণে 'লউ' না হইয়া 'লাউ' হইত। এইরূপে লৌহ-সেন, লাউসেন হইয়াছে। প্রায়ই আর এক ছাগ-বলি দেওয়া হয়। এই ছাগ 'কোল লুয়া'। বোধ হয়, ধর্মমঙ্গল গ্রন্থের লাউসেনের ভাই কর্পূর, এই কোল-লুয়ার স্থানীয়, একেবারে কৃত্রিম। হরিচন্দ্র রাজার পুত্র লুইচন্দ্র। বোধ হয়, সে পুত্রের পায়ে লোহা দেওয়া হইয়াছিল। ধ-পূ-বিধানে (১৮১) লুয়া ছাগের নাম 'লুইধর' (লৌহধর)। কোন কোন ধর্মরাজকে মদ্য দেওয়া হয়। ধ-পূ-বিধানে মাধ্বিক, মধু কিম্বা মউলজাত মদ্য (১৭৬)। (গৃহভরণের বিস্তারিত বিবরণ মুদ্রিত ময়ূরভট্টের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

(৬) "ধর্মপূজা-বিধান"

এখন "ধর্মপূজা-বিধান" পুস্তক দেখি। ইহাতে ধর্মের নিত্য পূজা ও সাধারণ মানসিক শোধের পৃথক্ ব্যবস্থা নাই, ধর্মের গাজনেরও নাই। কেবল গৃহভরণের ব্যবস্থা আছে। এখন কোথাও কোথাও গৃহভরণ ও গাজন একার্থ হইয়া গিয়াছে। ধ-পূ-বিধানে চারিখানি পুথীর সমষ্টি একত্রে ছাপা হইয়াছে। প্রথম পুথী ৩৬ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় ১৩৪ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় ১৮৩ পৃষ্ঠায়

শেষ এবং চতুর্থ ২৫৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শূন্যপুরাণের অনুরূপ পুরাণ। তিন গৃহভরণ-বিধিতে 'দেবশর্মা' পুরোহিত, ও ধর্মপণ্ডিত, দুইজনের কর্ম মিশ্রিত হইয়াছে। 'দেবশর্মা' সংকল্প ও সংস্কৃত মন্ত্র, বেদের মন্ত্র, এবং ধর্ম পণ্ডিত বাংলা বলেন। এমন মিশ্রণ আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রথম পদ্ধতি দ্বিতীয়ের সংক্ষেপ। ইহাতে ধর্মরাজের নিদ্রাভঙ্গ ডাক আছে (৪)। ব্রাহ্মণের দুঃখ হইলে ধর্ম থর-থর কাঁপেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ধর্মের এই অনুকম্পা গত দুইশত বৎসরের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার শেষকালে 'বাজেদিগর' শব্দ পাইতেছি (২০)। দেশটি দেয়াসিনী, উঠ্যাসিনী, বালাসিনী (৯), "আসিনী" নাম্নী দেবীর, অর্থাৎ বাঁকুড়ার।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 'তাড়েশ্বরের' (তারকেশ্বরের), শিখরদেশের, মল্লপাটের (মল্লভূমের), দক্ষিণ রাঢ়ের জলার পুষ্পংজয় আছে। তারকেশ্বর মহাদেব প্রায় দুইশত আড়াইশত বৎসর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অতএব এই পদ্ধতির দেশ, মল্লভুম, বোধ হয়, বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে। কাল, দেড়শত বৎসরের মধ্যে। বাংলার ভাষা ও কর্মকর্তাদিগের পদবী দেখিয়াও বাঁকুড়া জেলা বুঝিতে পারা যায়।

তৃতীয় পদ্ধতির দেশ বর্দ্ধমানের নিকট, কাল দুই শত বৎসরের মধ্যে। বিশেষ দ্রষ্টব্য, এই পদ্ধতিতে পরমান্ন মনুই দেওয়া হইয়াছে। অতএব বোধ হয়, এই পদ্ধতির ধর্মরাজের দেউল। জল-আচরণীয় জাতি ছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষার পূজায় পূর্বকালের কাঁচা মনুইর উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পদ্ধতির লিপিকর, অর্জুন-পণ্ডিত-কর্মকার। ইনি বাঁকুড়া জেলাবাসী ছিলেন। ইনি দামোদর ও বাঁকা নদীর নাম করিয়াছেন। দ্বারকেশ্বরের নাম চম্পাই (অর্থাৎ চম্পা নই) দিয়াছেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতির সংস্করণ আধুনিক হইলেও মূল প্রাচীন। কারণ কর্মকর্তাদের পদবী এত প্রাচীন যে অধুনা বোধগম্য হয় না। 'দেউল্যা মহারাণা' (যে মহারাণা দেউল করিয়া দিয়াছিলেন), 'পাট সাঙ্গই' (পাট সঙ্গতি, পাটভক্তিয়া), 'সাংশুর ভক্ত্যা' (সর্বেশাংশু ১৩৪ পৃঃ, সর্বঈশ-অংশু, সকল দেবতার প্রভার ভক্ত্যা), ইত্যাদি। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গৌড়েশ্বরের পুষ্পংজয়, এবং তৃতীয়টিতে বৃদ্ধ মহারাণা, মহারাণা এবং দেউল্যা মহারাণার জয় আছে। এই গৌড়েশ্বর ও মহারাণা অবশ্য হিন্দু। গৌড়েশ্বরের সামন্ত রাজাকে রাণা ও মহারাণা বলা হইত।

এই তিন পদ্ধতি পড়িলে মনে হয়, এই ধর্মপূজার স্থান বর্দ্ধমান অঞ্চলে, দামোদর ও দ্বারকেশ্বরের মধ্যবর্তী প্রদেশে ছিল। বোধ হয়, সেদেশের নাম "বিহার" ছিল (চিত্র)। সেখানে এক মহারাণা ধর্মের দেউল করাইয়াছিলেন। তখন দেশটি গৌড়েশ্বরের অধীন ছিল। অতএব ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের পূর্বে বলিতে হইবে। মল্লভূমের রাজবংশ তৎকালে প্রতাপশালী হয় নাই। মল্লরাজারা আপনাদিগকে মহারাণা বলিতেন না। ধ-পূ-বিধানের পরিশিষ্টের রামাক্রির পদ্ধতি, "শূন্যপুরাণে"র সহিত আলোচনা করিতেছি।

(৭) "শূন্যপুরাণ"-চতুষ্ক

"শূন্যপুরাণ" নামটি শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসুর প্রদত্ত। ইহার একস্থানে "আগমপুরাণ"

নাম আছে। আগম ও নিগম ভেদে নিগম বেদশাস্ত্র, আগম তন্ত্রশাস্ত্র। অতএব "শূন্যপুরাণ" বৌদ্ধতন্ত্রের পুরাণ। ধর্মের পূজা প্রকাশ ইহার উদ্দেশ্য। শ্রেষ্ঠপূজা গৃহ-ভরণ। ইহাতে ধর্মকে মধ্যস্থলে রাখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অম্বিকা প্রভৃতি সকলদেবতার একত্রে পূজা হইত। 'দেবতা সকল ভরিলেন ঘর' (১৭০), 'বারমতি ভরিল ঘর' (১৭১), 'এহি সভা ধর্ম্মর সমাজ' (৭১)। ইহার অপর নাম 'বারমতি ভরণ' (১৩৯); অন্যত্র 'বারমতি সুপ্রসন্ন', 'মধুলব্ধ বারমতি' (১৭)। 'অনাদি নিরঞ্জন করিলেন আগমন বারমতি ইন্দর ভুবনে' (১৭৩)। ধ-পূ-বিধানে 'বারমতি নামে গৃহভরণ' (১৯৮), 'ভরিল বার্ম্মতী ঘর' (২৩৭), 'বার্ম্মতি গৃহভরণ' (২১, ৪২)। অতএব বারমতি শব্দের 'বার' অর্থে দ্বাদশ নয়, শব্দটি সংস্কৃত 'বার'—সঙ্ঘ মনে করিতে হইতেছে।[১০] মতি, অর্থে ইচ্ছা, স্মৃতি। বারমতি পূজা, দেবতাসঙ্ঘ মতি করিয়া পূজা। এই সঙ্ঘ, বৌদ্ধসঙ্ঘের চিহ্ন। বর্তমান কালের গৃহভরণে দ্বাদশটি ধর্মবিগ্রহ একত্র করা হয়। ধ-পূ-বিধানে (২৫৫) 'আদি সঙ্ঘ ভোরি বার্ম্মতি।' এখানে 'সঙ্ঘ', বৌদ্ধ সঙ্ঘ। 'বারমতি গীত', যে গীত বার-মতিতে, গৃহভরণে গাওয়া হইত। দৈবক্রমে পূজা বার (দ্বাদশ) দিনের হইয়াছে। এই পূজায় অনেক (দ্বাদশ আদিত্য হইতে) দ্বাদশ আছে, এই হেতু বারমতি অর্থে দ্বাদশদিনের গান মনে হইয়াছে। এই ভ্রম পরবর্তীকালের, লাউসেনের গানের পালার পরে, প্রায় তিন-শত বৎসর পূর্বে ময়ূরভট্ট নূতন অর্থের কর্তা হইয়াছিলেন। উৎসবমাত্রেই গীতবাদ্য আবশ্যক হয়। সেটা নূতন নয়।

"শূন্যপুরাণ", পুরাণ। এই পুরাণ (ও এইরূপ ধর্মপুরাণ) গান করা হইত। প্রমাণ ?

(১) যাবতীয় সংস্কৃত পুরাণের ন্যায় ইহাতেও সৃষ্টিবর্ণন আছে। পুরাণে দেবতাবিশেষের মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে উপাখ্যান থাকে। শূন্যপুরাণের হরিচন্দ্র রাজার পুত্রলাভ, মার্কণ্ড মুনির কুষ্ঠরোগ-শান্তির উপাখ্যান আছে। ধান্যের জন্ম, ছাগের জন্ম, পৌরাণিক কাহিনী। পুরাণে শুদ্ধি-কল্প থাকে। শূন্যপুরাণেও প্রায় সেইরূপ 'পাবন' আছে। বার-ব্রত থাকে, 'নিয়ম-ভাঙ্গা'ও আছে (নিয়ম, ব্রত)। পাঠের নিমিত্ত পুরাণ রচিত হইত। শিবরাত্রি, সাবিত্রী প্রভৃতি ব্রতে পুরাণ-কথা পাঠ হয়। শূন্যপুরাণেরও পদ্য-বিশেষ ধর্মপূজার সময় আবৃত্তি করা হয়।

(২) বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, নারদ মুনি তে-ঠেঙ্গা ঢেঁকিতে চড়িয়া গমনাগমন করিতেন। নারদের বাহন, ঢেঁকি, কোনও সংস্কৃত পুরাণে নাই। 'ঢেঁকি' শব্দ সংস্কৃত নয়, ইহার পুরাতন সংস্কৃত নাম পুরাণে নাই। কোনও কারণে এই উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছিল, শূন্যপুরাণে সেটা পাইয়াছে। রাঢ়ের গ্রামবাসী ধর্মপূজার নিমিত্ত শিবের ধান-চাষ শুনিয়াছে, এমন চাষ যে, ভীমসেনের মাত্র আড়াই হালা হইয়াছিল। তাহারা এই কথা ও তাম্রের ও ছাগের জন্ম ধর্মের গান শুনিয়া জানিয়াছে।

১০। সং বার-নারী শব্দে এই 'বার'। বাং 'বার-আরি'পূজা, সমূহে মিলিয়া পূজা। গ্রাম্য 'বার-আরি'। শুদ্ধ করিতে গিয়া লেখা হয় বারোয়ারি। যেমন পাট-আরি, লেখা হয় পাটোয়ারি। 'বার' শব্দ বাংলা বারহ (দ্বাদশ) হইলে 'বার্মতি' শব্দ হইত না। দ্বাদশ অর্থ করিলে শূ-পু হইতে উদ্ধৃত একটা উল্লেখেরও সঙ্গত অর্থ হইবে না।

(৩) শূন্যপুরাণের প্রত্যেক পদের ভণিতা দেখিলেও বুঝি, এটি গান। "শ্রীজুত রামাই রচিল পাঁচালী-সঙ্গীত," "রামাই পণ্ডিত রচিলেন গীত" (১৫৮), "শ্রীধর্মচরণে গীত পণ্ডিত রামাই গাএ", "ভকত নাএকে পরভু রাখিব কল্লানে," ইত্যাদি। যিনি গান করান, তিনি নায়ক। শূন্যপুরাণ গান না হইলে "নায়ক" শব্দ নিরর্থক হইয়া পড়ে। দুইটি পদ্যের মাথায় রাগিণীর নামও দেওয়া আছে।

(৪) টীকা-পাবন, চনা-পাবন প্রভৃতি প্রথমে ধর্মপূজায় "ডাকা" হইত, উচ্চৈঃস্বরে কথিত হইত। তখন এই "ডাক" মন্ত্রের স্থানীয় হইয়াছিল। পূজাকালে যে কর্ম করা হয়, তাহা গদ্যে কিম্বা পদ্যে ডাকা হয়। পরে সে স' 'ডাক' পবিত্র রহস্য মন্ত্র হইয়া উঠে। শূন্যপুরাণের কয়েকটি পদ্য ধর্মপূজায় ডাকা হইত, এখনও হয়। কিন্তু সেহেতু পুরাণখানি পূজা-পদ্ধতি, অর্থাৎ পূজা-জ্ঞাপক-গ্রন্থ নয়। নয় বলিয়াই এত পাঠান্তর ঘটিয়াছে। ধর্মপণ্ডিতরা বলিলেও পদ্ধতি শব্দের অর্থান্তর না করিলে শূন্যপুরাণকে ধর্মপদ্ধতি বলা যাইতে পারে না। তাঁহারাও "নিরঞ্জনের রুষ্মা"কে কদাপি পূজা-পদ্ধতির অঙ্গ বলিবেন না। তাঁহারা রামাইর উপাখ্যানকেও পদ্ধতি বলিয়াছেন। শূন্যপুরাণ একখানি পুথী নয়, অনেক পুথীর সংগ্রহ। এই হেতু কোন একটি নাম সার্থক হইবে না।

সমগ্র শূন্যপুরাণ এক কবির বা গায়কের রচিত নয়, এক দেশেরও নয়। এক কৃত্তিবাস হইতে যেমন বহু কৃত্তিবাসের উদ্ভব হইয়াছে, এক রামাই হইতে তেমন অনেক রামাই জন্মিয়াছিলেন। "ধর্মপূজা-বিধানে" যে কথান্তর আছে, সেটা অর্জুন পণ্ডিতের। ভাষা ও ভাখা দেখিলে বুঝি তিনি বিষ্ণুপুরের নিকট-বাসী ছিলেন। শূন্য-পুরাণের দুই চারিটা ব্যতীত অধিকাংশ পদ্য বিষ্ণুপুরের পূর্ব কিম্বা দক্ষিণ দেশের (পরিশিষ্ট পশ্য)। রামাই পণ্ডিত নানাস্থানে ধর্মরাজকে 'স্বরূপ নারাণ' বলিয়াছেন (৬০, ৭২, ১৩৫, ১৬৪)। এক স্থানে এই বিগ্রহের রূপ বর্ণিত আছে (৭০)। নাগরাজ কূর্মরাজকে বেড়িয়াছে, এবং কূর্মরাজ পদ্মাসনে বসিয়াছেন। বর্তমান স্বরূপনারাণ ধর্মরাজের বিগ্রহ এইরূপ[১১]। অতএব বোধ হয়, তিনি এই নামের ধর্ম-ঠাকুরের জন্য গান রচিয়াছিলেন। হুগলী জেলার গোঘাট থানাধ গোঘাট গ্রামে এক 'স্বরূপ নারাণ' প্রসিদ্ধ আছেন। মাণিক গাঙ্গুলী 'গোঘাট' নাম 'গোপুর' করিয়া স্বরূপ নারাণকে বন্দনা করিয়াছেন। ইহাঁর বর্তমান পূজক রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। এক ব্রাহ্মণ এই গোঘাট হইতে এক 'স্বরূপ নারাণ' কোতুলপুরের নিকটে এক গ্রামে লইয়া গিয়াছেন। জাড়া (মেদিনীপুর জেলার) গ্রামের নিকটে এক বিখ্যাত 'স্বরূপনারাণ' আছেন। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে এক '(স্ব)রূপনারাণ' আছেন। বর্দ্ধমান জেলায় কোথায় কোথায় আছেন, তাহা অনুসন্ধেয়। 'রাই' (২২২, আয়ী, আই,), 'রুষ্মা' (২৩২, উষ্মা) শব্দের র আগম বর্দ্ধমানের দিকের ভাখা। ময়নাগড়ে স্বরূপ-নারাণের মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লোকে বলে, সে স্বরূপনারাণ লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত।

১১। নবাময়ূরভট্ট "দক্ষিণ আবর্তে নাগ শ্যামল বরণ। সপ্তদল কমলেতে যাহার আসন॥ স্বরূপ নারায়ণ শিলা কমঠ আকৃতি। সপ্তদল পঙ্কজেতে অঙ্গ তার স্থিতি॥" (৩১, ৩২)।

শূন্যপুরাণ রচনার কালও একটি নয়। যে সকল পদ্যে ফার্সী শব্দ আছে, সে সকল বাদ দিলেও একটি কাল নয়। কাল মাপিবার গজও নাই। সে গজ একদেশীয় সমান বিদ্বান্ কবির নির্মিত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না। এইরূপ গজ অন্ততঃ দুই তিন কালের থাকা চাই। কারণ, সকল দেশের ভাষা-পরিবর্ত্তন এক ক্রমে এক বেগে হয় না। বাঁকুড়া জেলার পূর্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ দেশের ভাষা এক নয়। এই হেতু দেশ না জানিলে ভাষাদৃষ্টে কাল অনুমান দুঃসাধ্য। এইরূপ, অজ্ঞাত দেশের লিপিদৃষ্টে কাল অনুমানও দুঃসাধ্য। নগেন্দ্রবাবু শূন্যপুরাণ পুথীর লিপিদৃষ্টে ইহা ৩০০ বৎসরের পুরাতন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাষায় দেড় শত বৎসরও পাইতেছি। ইহার প্রাচীন অংশ ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের মনে হয়। তদনন্তর নানা দেশের নানা কবি ইহার পাঠান্তর ঘটাইয়াছেন। অতএব শূন্যপুরাণের কাল ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দ পর্যন্ত বলা যাইতে পারে। পরিশিষ্টে দেশ ও কাল নিরূপণ করা যাইবে।

কবি রামাই ধর্মপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জাতি-কুল অজ্ঞাত। শূন্যপুরাণে ৬০টি পদ্য আছে, দুই তিনটি ব্যতীত সকলের অন্তে রামাই বা রাম পণ্ডিতের ভণিতা আছে। কেবল একটি ভণিতায়, "গাইল দ্বিজ রামাঞি" আছে (২১৩)। পদ্যটির নাম "মুখ-শুদ্ধি কপূর পান", কিন্তু শুদ্ধির বাষ্প-গন্ধও নাই। এই একটি অসম্পূর্ণ পদ্য দেখিয়া গায়ক রামাইকে দ্বিজ মনে করা চলে না। এটি কে রচনা করিয়াছে, কে জানে? ধর্মপূজাবিধানে প্রায় ২৬টি ভণিতা আছে, কিন্তু একটিতেও 'দ্বিজ' রামাই নাই। অনেক কবির মধ্যে দুই এক জন দ্বিজ থাকা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু সে কথা প্রকাশ নাই। আর যিনি তাম্রদীক্ষিত ধর্মপণ্ডিত হইয়াছেন, তিনি জন্মে ব্রাহ্মণ-পুত্র হইলেও দ্বিজত্ব-গৌরব রাখিতে পারেন না। তিনি ধর্মের সেবক হইয়া মনে করিতেন, ব্রাহ্মণের উপরে উঠিয়াছেন।

(৮) ধর্মপূজার আদি স্থান

শূন্যপুরাণে আছে, ধর্মঠাকুর নিজের তপস্যার স্থল না পাইয়া তিলমাত্র ভূমিতে বল্লুক নদী ও তাহার জল সৃষ্টি করেন। সে বল্লুকা-নদীকূল, পৃথিবীতে ধর্মের আদি স্থান।

"ধর্মপূজা-বিধানে"র সম্পাদক শ্রীযুত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "বল্লুকা নদী বর্দ্ধমানের নিকট দামোদর হইতে উঠিয়া মৃজাপুরের খালে পড়িয়াছে; নদীটি এখন মজিয়া গিয়াছে; সব জায়গায় জল থাকে না; কিন্তু বড়োযাঁনে, বিশেষ ধর্ম্ম ঠাকুরের মন্দিরের নীচে জল থাকে। এই বল্লুকা নদীই ধর্ম্মঠাকুরের তীর্থস্থান।" আমি এই নদী খুজিয়া পাই নাই। পরে জানিলাম, মেমারি রেল ষ্টেশনের অল্প দক্ষিণে বল্লুকা নামে এক খাল আছে। গ্রামের নাম বড়-যান, কেহ কেহ এখন বড়আঁ বলে। পূর্বে ডোমপণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজা করিতেন; কয়েক বৎসর হইতে রাঢ়ি ব্রাহ্মণ করিতেছেন। এই ধর্মরাজের মাহাত্ম্য আছে। কারণ, পুরাতন পাথরের মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর আবার নূতন মন্দির হইয়াছে।

কিন্তু আমাদিগকে সহস্র বৎসর পূর্বের অবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। তখন দামোদরের বাম পার্শ্বে দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন বাঁধ ছিল না। দামোদর, এই নাম ছিল না। কোন

ভাষার দামু-দা (বন্যা) হইতে দামোদর নাম। এখনও হুগলী জেলায় অনেক লোকে উহাকে 'বড়নদী' বলে। সাঁওতাল বলে, 'মারং নাই', অর্থাৎ বড় নই। "বড় যান" নামেও সে অর্থ পাইতেছি। যান শব্দে গতি ও বাহন বুঝায়, জলস্রোতও বুঝায়। (পূর্ববঙ্গে চলিত। রাঢ়ে আছে জাঅনা)। এখন বল্লুকা একটা খাল হইলেও পূর্বকালে দামোদরের বড় শাখা ছিল, এবং কালনার দক্ষিণে গঙ্গায় গিয়া পড়িত। হয় ত বর্দ্ধমানের বাঁকা নদীর নাম বল্লুকা ছিল। তাহারই এক অংশ এখনও বল্লুকা নামে প্রসিদ্ধ আছে। ধর্মরাজ গণ্ডী-রেখা দিয়া বল্লুকা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, তিনি বল্লুকার উৎপত্তি-স্থলের ত্রিকোণ-ভূমিখণ্ডে তপস্যার স্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে সে স্থান বনাকীর্ণ ছিল।

শূন্যপুরাণের কবিসম্প্রদায় বল্লুকায় ধর্মের স্থিতি স্বীকার করিতেন। কেবল সৃষ্টি-পত্তনে নয়, অন্যত্রও এই কথা আছে। 'বৈকুণ্ঠেত জীঅ ধর্ম্ম বল্লুকাতে স্থিতি' (১২১)। এখানে রামাই পণ্ডিত থাকিতেন। 'রামাই পণ্ডিত করে নিত্তগীত, পসন্ন হইল বল্লুকা' (১৯৯)। এখানে কোন ভক্ত ধর্মের দেহারা করাইয়া দিয়াছিলেন। বড়বান গ্রামে যে পাথরের দেহারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সে দেহারা হইতে পারে না। কিন্তু মন্দির-নির্মাণ-প্রাজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষিত না হইলে কিছুই বলিতে পারা যায় না। তাঁহারা বলেন, পূর্বকালে বঙ্গদেশে পাথরের মন্দির নির্মিত হইত না। সে যাহা হউক, একটা দেহারা ছিল। 'বিচিত্র দেহারাঅ কনকচন্দ্র চূড়ে। সুশীতল আনামতে জাহার ধ্বজা উড়ে॥ বেআল্লিশ বাজনা বাজে জয়ঢাক বাজে। ধর্ম্মর আনাম ভাল বল্লুকাত সাজে॥ (১২১)।' (আলাম, সং আলম্ব, পতাকা।) ধর্মনিন্দার ফলে মার্কণ্ড মুনি কুষ্টরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি এখানে ধর্মের পূজা করিয়া রোগমুক্ত হন। মুনি 'রুদ্রপাল ধুনাচুরে' প্চুর চন্দনকাষ্ঠ ঘৃত ও ধুনা দিলেন, 'ব্রহ্ম অগ্নি দিআ রামাই দিল জালাইআ' ॥[১২] (১২২)। ধর্মপূজাবিধানেও মুনির অষ্টকুষ্ঠ রোগশান্তির কথা আছে (২৪৫)। দুই পুস্তকেই মাত্র রামাই আছেন, অন্য তিন পণ্ডিত নাই। শূন্যপুরাণে মার্কণ্ড মুনি গৃহভরণ মানসিক করিয়াছিলেন, ধ-পূ-বিধানে সে কথা নাই। বস্তুতঃ দরিদ্র মুনির পক্ষে সে ব্যয়সাধ্য কর্ম অসম্ভব ছিল।

রাজা হরিশ্চন্দ্র

মার্কণ্ড মুনির ধর্মপূজার কত বৎসর পরে, কে জানে, অমরা-ভুবনের রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাণী মদনা, পুত্রের কারণে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে বল্লুকায় সন্ন্যাসিবেশ ধর্মের কিংবা মার্কণ্ড মুনির সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার উপদেশে অনাহারে ধর্মের পূজা করিয়া পুত্রবর পান। ধর্মমঙ্গল মতে এই পুত্রের নাম লুহিশ্চন্দ্র, বাংলা পঞ্জিকার মতে মনিশ্চন্দ্র। ইনি 'নৃপকুল অবতংস' ছিলেন। এই হরিশ্চন্দ্র রাজা মূতন মণ্ডপে ঘটায় গৃহভরণ করিয়াছিলেন। শূন্যপুরাণের আট নয়টি গানে এই পূজা গীত হইয়াছে। রাজা ও

১২। এখানে মনে হয়, যেন চন্দন ও ধুনার ধূমের স্বেদ গ্রহণ, কুষ্ঠচিকিৎসার এক অঙ্গ ছিল। ধূমে ঘন তৈল থাকে, তাহা ব্রণে লিপ্ত হয়। গুগ্‌গুল, গর্জন তৈল, চালমুগরার তৈল, কুষ্ঠ ব্রণের প্রসিদ্ধ ঔষধ। আয়ুর্বেদে (ভাবপ্রকাশে) মার্কণ্ডেয় ঋষি কুষ্ঠ-রসায়নের আবিষ্কর্ত্তা। বোধ হয়, তিনি নিজে ভুগিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি ছিল, এবং তাঁহাকে ধরিয়া ধর্মপুরাণের কথা। রৌদ্রসেবন দ্বারা কুষ্ঠ উপশান্ত হয়। এ বিষয় পরে বলা যাইবে।

রাণী ধর্মপূজা দুইবার করিয়াছিলেন। একবার পুত্রবর মাগিবার সময় বল্লুকায়, পুনর্বার পুত্র-লাভের পর নিজ গড়ে নূতন মণ্ডপে গৃহভরণ করিয়াছিলেন। এই মণ্ডপ এক পুখর আড়ার উপরে নির্মিত হইয়াছিল। রাজধানীর নাম অমরা, দামোদরের উত্তরে, বর্দ্ধমানের দিকে হইবে। দশম কি একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের ঘটনা হইবে।

এই তিন সূত্র ধরিয়া খুজিলে বর্দ্ধমান জেলায় দামোদরের উত্তরে, মানকর রেল-ষ্টেশনের ঈশান-কোণে অমরা-গড় পাইতেছি। সেখানে পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। লোকে বলে, অমরার গড়; কেহ বলে, মহেন্দ্রের গড়, এবং কুতূহলী জনে রাজা মহেন্দ্রের পাটরাণীর নাম অমরাবতী রাখিয়া, সেই রাণীর নামে গড়ের নাম কল্পনা করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে রাজা মহেন্দ্রের বংশ আছে। সে বংশের ঐতিহ্য ও অসম্পূর্ণ কুলজী হইতে অবগত হইতেছি, বংশের আদিপুরুষ সরযূ-পার-বাসী ছিলেন। তিনি মানকর হইতে ৫।৬ মাইল উত্তরে ভাল্‌কী (ভল্লুকা) নামক স্থানে বাস করেন (চিত্র)। তাঁহার পুত্র রাঘবসিংহ রায়, উপাধি ভল্লুপাদ, ১০৩৫ খ্রীষ্ট-শতাব্দে রাজ্য স্থাপন করেন। তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র শতক্রতু, তৎপুত্র মহেন্দ্র, তৎপুত্র নরেন্দ্র ইত্যাদি পরে পরে রাজা হইয়াছিলেন। শতক্রতু নাকি শত যজ্ঞ করিয়া এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শতক্রতু তাঁহার প্রকৃত নাম নয়। বোধ হয়, তাঁহার প্রকৃত নাম হরিশ্চন্দ্র, এবং ইনিই শতক্রতু ইন্দ্র হইয়া ভাল্‌কী হইতে দক্ষিণে আসিয়া "ইন্দ্র-ভুবন," "অমরা" বা "অমরাবতী" নির্মাণ করিয়াছিলেন। শূন্যপুরাণে "বারমতি ইন্দর ভুবনে" (১৭৩)। এখানে রাজা শতক্রতু যে ইন্দ্র, তাহা যেন বলা হইয়াছে। মাণিকরাম ইন্দ্রের নর্তক 'শক্রধর'কে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র কল্পনা করিয়াছেন। শক্র, রাজা মহেন্দ্র। এই উহ স্বীকার করিলে রাজা হরিশ্চন্দ্র একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের শেষ পাদে অমরার রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত মহেন্দ্র, পাঁজিতে মনিশ্চন্দ্র। এই বংশের কুলদেবী শিবাখ্যা (শিলাময়ী দশভুজা) অদ্যাপি পূজিতা হইতেছেন। আদিপুরুষ হইতে বর্তমানে ৩০ পুরুষ চলিতেছে। ত্রিশ বৎসরে এক পুরুষ ধরিয়া দেখিতেছি, ৯০০ বৎসর পূর্বে প্রায় ১০৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাঘবসিংহ, এবং প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র ছিলেন।[১৩]

১৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাসে" পাইতেছি, বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয়ের পর রাঘব নামক এক নরপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহা ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী ঘটনা। ভল্লুক বা ভল্লক রাজ্যের রাঘব কি না, তাহা ঐতিহাসিক চিন্তা করিবেন। বর্দ্ধমান জেলাই প্রাচীন রাঢ়। পূর্বকালে ইহার বিভিন্ন প্রদেশ কি নামে প্রসিদ্ধ ছিল, কে জানে। পরে পরগণা নামের উৎপত্তি হইলে উহা গোপভূম নামে আখ্যাত হয়। (গোপ অর্থে গোপালক নয়, ভূরিগ্রামাধিকারী, ভূমিপতি —অমর-মেদিনী কোষ)। গোপ ও গুপ্ত একই, বৈশ্যের উপনাম। কিন্তু এই বংশের আচার-ব্যবহার ক্ষত্রিয়ের ছিল। ভাগীরথীর পশ্চিমে ইন্দ্রাণী পরগণা। ইহার পশ্চিমে ও দামোদরের উত্তরে গোপভূম রাজ্য বহু বিস্তীর্ণ ছিল। ইহার পশ্চিমে কঙ্করময় বনভূমি, বর্ত্তমান রাণীগঞ্জ। অমরাগড়ের শেষ রাজা বৈদ্যনাথ মুসলমান ফৌজ দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। পুরুষ গণিলে সে ঘটনা ইং ১৬৩৫ সালের সময়ে হইয়াছিল। ধর্মমঙ্গলপ্রণেতা রূপরাম দীর্ঘনগর হইতে গোপভূমের অমরার রাজা গণেশের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থকাল ইং ১৬০৪ সাল। বোধ হয়, এই গণেশ, রাজা বৈদ্যনাথের পিতা ছিলেন। বৈদ্যনাথের পূর্ববর্তী এগার রাজার নাম পাওয়া যায় নাই। উক্ত বংশের এক বর্তমান

(৯) ধর্মপূজার দ্বিতীয় স্থান

দামোদরের উত্তরে বর্দ্ধমান অঞ্চলে ধর্মপূজার আদি স্থান ছিল। ক্রমে বর্দ্ধমানের সাত আট ক্রোশ দক্ষিণে দ্বারকেশ্বরের কূলে এক স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। পূর্বকালে এই নদীর কি নাম ছিল, জানা নাই। ভবিষ্য-পুরাণে নাম নাকি দারিকেশী। ইহা ষোড়শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের কথা। এই শতাব্দে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীর পুরের উত্তরের নদীর নিকটবর্তী এক গ্রামের নাম দ্বারিকা রাখিয়াছিলেন। সে নাম এখনও আছে। হয় ত এই দ্বারিকা হইতে নদীর স্থানীয় নাম দ্বারিকেশী ছিল। কিন্তু সর্বত্র প্রচলিত হয় নাই। পূর্বদিকে ইহার নাম চম্পা-নদী বা চাঁপা-নই ছিল। ধর্মপূজাবিধানে এই নাম। শূন্যপুরাণেও "স্নান সন্ধ্যা গোসাঞির চম্পা নদির ঘাট" (১৪৯)। চম্পাকে 'জটা'ও বলা হইয়াছে (১৪৮)। জটা—কেশ। ইহার নীচে হুগলী জেলায় নাম ঝুমঝুমি, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বেও এই নাম শোনা যাইত। এখন সর্বত্র দ্বারকেশ্বর নাম চলিয়াছে। আরও দক্ষিণে ঘাটাল হইতে শিলাই নদী আসিয়া দ্বারকেশ্বরে পড়িয়াছে। এখান হইতে নাম রূপনারাণ।[১৪]

রঞ্জাবতী ঝুমঝুমি-দ্বারকেশ্বর বাহিয়া চাঁপায়ের ঘাটে আসিয়াছিলেন। ঘনরাম লিখিয়াছেন, মহামতি মকরাক্ষের রাণী চাঁপাবতী সে ঘাট বাঁধাইয়া কূলে দেহারা দিয়াছিলেন। চাঁপাবতী নামটি কবিকল্পনা। যেমন শিলাবতী শিলাই, কংশাবতী কাঁশাই নাম, তেমন চাঁপাবতী চাঁপাই। সে ঘাট কোথায় ছিল? কোতুলপুরের ঈশান কোণে দ্বারকেশ্বরের কূলে মদনগর ও বিহার গ্রাম আছে (চিত্র)। বিহারে কালুরায় ধর্মরাজ আছেন। ইঁহার মন্দির পুরাতন নয়। কিন্তু নিকটে মাটি খুঁড়িতে গিয়া প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, আশে-পাশে পুরাতন ইটও পড়িয়া আছে। এইখানে চাঁপায়ের প্রসিদ্ধ ঘাট ছিল। অন্য কোথাও দেহারার চিহ্ন নাই, বিহার নামও নাই।[১৫]

সন্তান ডাঃ অকিঞ্চন রায় (অমরাগড়, মানকর পোষ্ট আপিশ) আমায় লিখিয়াছেন, সে বংশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন. কিন্তু কত পুরুষ পূর্বে, তিনি তাহা বলিতে পারেন না। তাঁহাকে আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য অবশ্য জানাই নাই। "বর্দ্ধমান গেজেটিয়ার" নামক পুস্তকে অমরাগড়, কাঁকশাগড়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কিন্তু লেখক কাল-নির্দেশের চেষ্টা করেন নাই। দুই একটা উড়া শোনা কথা লিখিয়াছেন।

১৪। চম্পা ফুলের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া নদীর নাম চম্পা হইয়া থাকিবে। এক স্রোত দুই ভাগ হইয়া, পরে মিশিলে চম্পককলিকাতুল্য দেখায়। দুই স্রোতের মধ্যে এক দ্বীপ হয়। বিষ্ণুপুরের উত্তরে এবং বিহারের নীচে এইরূপ দ্বীপ আছে। এই দুই স্রোত, জটা। হুগলী জেলায় আরামবাগের দক্ষিণে ডোঙ্গল হইতে দারকেশ্বর আবার দুই স্রোত হইয়া মাঝে দ্বীপ করিয়াছে। এখানেও নাম শাঁকরা অর্থাৎ শঙ্করজটা। দীর্ঘ দ্বীপটিকে ছেলেদের খেলিবার কাঠের ঝুমঝুমি বলা যাইতে পারে। দুইটি স্থানেই ঝুমঝুমি নাম শুনিয়াছি। বিহারের নিকটে দ্বারকেশ্বর চারি মাইলের মধ্যে চারি বার পুটলী হইয়াছে। রেনেল সাহেবের মানচিত্রেও পুটলী দেখিতেছি। বোধ হয়, এইখানে 'চাঁপা' ছিল। শূন্যপুরাণে, "পূব দিগ মাঝে কনকলঙ্কাপার, কনক বেহার।" (১৫)। বর্দ্ধমান জেলার কস্‌বা নামক গ্রামের দক্ষিণে দামোদরের নাম চাঁপাই ছিল। সে নাম হইতে চম্পানগরী। মনসা-মঙ্গলের চাঁদ সদাগর না কি এই চাঁপাই হইতে দামোদরের এক শাখা দিয়া গঙ্গায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেহুলার (বহুলা, কৃত্তিকা ; বিপুলা নাম নয়) পতিভক্তি কাহিনী নানা দেশে প্রচলিত আছে। সর্বত্র চাঁপা নদী পাওয়া গিয়াছে কি না জানি না। ধর্মমঙ্গলের চম্পানদী দামোদর নয়, দ্বারকেশ্বর।

১৫। ঐ স্থানের পশ্চিমে নারাঙ্গী গ্রামের নিকটে 'চাঁপাতলার ঘাট' নাম আছে। কিন্তু চাঁপায়ের ঘাট চাঁপা নদীর ঘাট ; চাঁপা গাছতলার ঘাট নয়। শূন্যপুরাণে ও মাণিকরামে নদীর নাম চাঁপাই।

লাউসেন

ধর্মপুরাণে হরিশ্চন্দ্র রাজার পরে লাউসেন আসিয়াছিলেন। শূন্যপুরাণে লাউসেনের নাম গন্ধও নাই। রঞ্জাবতী ও লাউসেনের তুল্য ধর্মভক্ত পাইলে শূন্যপুরাণে তাঁহাদের কথা নিশ্চয় থাকিত। হরিশ্চন্দ্র নবখণ্ডে সেবা করেন নাই, রাণী মদনা শালে ভরও করেন নাই। কিন্তু লাউসেন পশ্চিমে সূর্যের উদয় করাইয়াছিলেন,—একবার নয়, দুইবার! ধর্মের মাহাত্ম্যের ও কৃপার এমন উদাহরণ আর ছিল না। অতএব অনুমান হয়, শূন্যপুরাণের সময়ে লাউসেন জন্মেন নাই। যদি হরিশ্চন্দ্রকে একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের শেষ পাদে ধরি, তাহা হইলে লাউসেনকে অন্ততঃ এক শত বৎসর পরে আনিতে হইবে। তাহাতে ঢেক্করীয় গড়ের তাম্রশাসন-দাতা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষকে ধর্মপুরাণের ইছাই ঘোষ পাই। ঈশ্বর ঘোষের কাল অজ্ঞাত। তাঁহার দত্ত তাম্রশাসনের লিপিদৃষ্টে তাঁহাকে দ্বাদশ শতাব্দের অনুমান করা হইয়াছে। ধর্মপুরাণে ইছাই ঘোষের পিতার নাম সোম ঘোষ, তাম্রশাসনে ধবল ঘোষ। একজনের এইরূপ দুই নাম থাকা অসাধারণ নয়। কিম্বা ময়ূরভট্ট প্রকৃত নাম বিস্মৃত হইয়া অর্থ-চিন্তা করিয়া 'সোম' নাম রাখিয়াছেন।[১৬]

১৬। ইছাই ঘোষের ত্রিষষ্টির গড় কোথায় ছিল? অজয়ের দক্ষিণ তটে দুইটি স্থানে কিংবদন্তী আছে। একটি কেন্দুলীর পূর্ব দিকে, শ্যামরূপার গড়ে; অপরটি সেনপাহাড়ী পরগণায় গৌরাণ্ড গ্রামের নিকটে। শ্যামরূপার গড় এখন বিস্তীর্ণ অরণ্য। মন্দির একতলা ঘর, অন্ধকার। এক কৌটার মধ্যে কি আছে, তাহারই পূজা হয়। নিকটে এক উচ্চ চতুষ্কোণ দেউল আছে, লোকে বলে, ইছাই ঘোষের। কিন্তু দেউলটি পুরাতন নয়। দেউলের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে মনে হয়, ঘনরাম ইহাকে শ্যামরূপার দেউল বুঝিয়াছিলেন। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে এখানে কর্ণগড়। বোধ হয়, এখানে কর্ণসেনের বাড়ী ছিল এবং এখানে তিনি পরাজিত হইয়া দক্ষিণে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ডোম সৈন্য এখানে নিহত হইয়াছিল। (২০-টিপ্পনী)। ইছাই ঘোষ এস্থান ত্যাগ করিয়া পশ্চিমে গড় করিয়াছিলেন। ছোট শ্যামরূপার মন্দিরটি পুরাতন, কিন্তু মন্দির-প্রাজ্ঞের অনুমানে ৫০০ বৎসরের অধিক নয়। ঘনরাম লিখিয়াছেন, ইছাই ঘোষ "চৌদিকে পাহাড়, বেড়ি বাড়ী গড়, দুর্গম গহন কাটি" ত্রিষষ্টির গড় করিয়াছিলেন। অতএব স্থানটি পাহাড়্যো। হয় ত তেঁতাট্ট পাহাড় বেষ্টিত গিরিদুর্গ। গিরিদুর্গ প্রায়ই অজেয় হয়। সেনপাহাড়ী মনে করিতে হইতেছে। মাণিকরাম ইহার উত্তরে (অবশ্য অজয়ের উত্তরে) সিওর নাম করিয়া সেনপাহাড়ী নির্দেশ করিয়াছেন। রূপরাম। "ইছাই ঘোষ বধপালা" নামক এক খণ্ডিত পুথিতে অজয়ের নাম অজয়া, স্থানীয় নাম ঢেকুর। "ঢেকুর হইল যেন পদ্মপত্রের জল।" "ঢেকুরের দক্ষিণে উত্তরে মহীপাল।" (উত্তরে, উত্তীর্ণ হইল)। ঢেকুর অর্থে উদ্গার। যে নদীতে জলের উদ্গার হয়। এই শুখনা; হঠাৎ এ কূল ও কূল ডুবাইয়া বান। ইহা পার্বত্য নদীর লক্ষণ। সেখানে নদীর বিস্তার অল্প ছিল। নইলে লাউসেন ঘোড়ায় চড়িয়া লাফাইয়া পার হইতেন না। এই অল্প-বিস্তার ঐখানেই সম্ভব। (শ্যামরূপার কাছে অজয় প্রায় এক মাইল।) এই সকল কারণে মনে হয়, গৌরাণ্ডির কিম্বদন্তী সত্য হইতে পারে। সেনপাহাড়ী পরগণার নামেও সেনবংশ পাইতেছি। ("বর্দ্ধমান গেজেটিয়ার" লেখক বর্দ্ধমান সহরের প্রথম রাজা চিত্রসেন রায়ের (১৭৪০-৪৪) নামের "সেন" টুকু লইয়া বৃথা কল্পনা করিয়াছেন।) বোধ হয়, এইখানে বল্লালসেনের পূর্বপুরুষেরা আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং কর্ণসেন সে বংশের কেহ ছিলেন। এই বংশের সহিত উত্তর রাঢ়ের অমরাগড়ের রাজবংশের শত্রুতা স্বাভাবিক। ঈশ্বর ঘোষ "রাঢ়াধিপলেরজন্ম"। অমরার বংশ বিদেশী ছিলেন। কেহ কেহ এদেশের বৈশ্য বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে মনে হয়, ঈশ্বর ঘোষ সে বংশের অন্বয় ছিলেন। ধর্মপুরাণে, ইছাই গোয়ালা। গোপ শব্দ ব্যর্থ বলিয়া এই দুর্গতি। কিন্তু গোয়ালা শক্তিপূজক হয় না।

এই ঐক্যে লাউসেন দ্বাদশ শতাব্দের শেষ পাদে পড়িতেছেন। ইহাতে বাধা, ঘনরামের ধর্মপাল। কিন্তু ঘনরাম ধর্মের গায়ক ছিলেন, ধর্মের মাহাত্ম্যবৃদ্ধি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার রূপরাম "ময়ূরভট্টের পদ মনে অনুমানি" (১ পৃষ্ঠে), লিখিয়াছেন,—"মহী নব রাজা সুধর্ম্মপাল রায়।" "তার পুত্র রাজা হয় শুনিতে উল্লাস॥" (৯ম পত্র ১ম পৃষ্ঠে)। এখানে সুধর্মপালের পুত্রের উল্লেখ। মাণিকরামও ময়ূরভট্টাদি রূপরামকে বন্দনা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ময়ূরভট্টই এক অনির্দিষ্ট ধর্মপালের কালে লাউসেনকে লইবার কর্তা। ময়ূরভট্ট কবিত্বগুণে তাঁহার পরবর্তী গায়কদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি পশ্চিমে সূর্যোদয় ও ধর্মের ইচ্ছাক্রমে কর্পূরসেন সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি সত্য মিথ্যার তৌল করেন নাই। যদি নব্য ময়ূরভট্টে পুরাতনের ছায়াও থাকে, তাহা হইলে সে পুরাতন কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়। বঙ্গীয় পঞ্জিকায় ধর্মপালের নাম নাই, রাঢ়ে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হয় নাই। আশ্চর্যের বিষয়, পালরাজগণের তাম্রশাসন একখানিও রাঢ় দেশে পাওয়া যায় নাই। কোন্ কিম্বদন্তী কার শিরে গিয়া পড়িয়াছে, কে জানে। দুই শত বৎসর পূর্বের সহদেব চক্রবর্তী শুনিয়াছিলেন, রামাই পণ্ডিতের পিতার নাম শ্রীধর, নিবাস জাজপুর। আর একজন শুনিয়াছিলেন, পিতার নাম হিমাই (শূন্যপুরাণ, ভূমিকা, ৫৬ পৃঃ)। ধর্মরাজের ব্রতদাসী সামুলা[১৭], কোন মতে রামাইর ভগিনী, পূর্বজন্মে কিরাতকন্যা ও জাতিস্মরা; কোন মতে রঞ্জাবতীর ভগিনী, পিসতাত ভগিনী। লাউসেনের কয়টি কোথায় কোথায় বিবাহ, তাহাতেও গায়েনেরা একমত নহেন। পুথীর অধিকারীরা মিলাইয়া দেখিতে পারেন। লক্ষ্মণসেনদেব কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। হয় ত লাউসেন তাঁহার এক সামন্ত সেনাপতি ছিলেন। উভয়ের নামে সেন দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যে বন্ধু-সম্বন্ধ ছিল।[১৮]

১৭। নামটি সাফুলা। হুগলী চুঁচুড়ায় কুমুদ ফুলকে বলে। বোধ হয়, সং শ্বেতফুল্ল। একশত বৎসর পূর্বে সাফুলা নাম চলিতছিল, পুরুষের নামও হইত। (রাধামাধব ঘোষকৃত "জগন্নাথলীলা গ্রন্থশেষে কবির আত্মপরিচয়)।

১৮। বিরোধী প্রমাণ না পাইলে লাউসেনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিম্বদন্তীর মূলে কিছু সত্য থাকে। লাউসেনের প্রকৃত নাম জানা নাই। ধর্মের পূজা প্রকাশ নিমিত্ত লাউসেনের জন্ম হইয়াছিল। তখন লোকে শক্তির মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিত, শক্তিপূজা করিত। শ্রীমন্ত সদাগর শক্তির মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছিলেন, লাউসেনও তেমনই ধর্মের দেখাইলেন। যদি শ্রীমন্ত কবিকল্পনা হয়, লাউসেনও কবিকল্পনা। লাউসেনের ময়নাভুবন কোথায় ছিল? বর্তমান গড় ময়না তমলুক হইতে নয় মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে, কাঁসাই নদীর নিকটে। কিন্তু ঘনরাম, মাণিকরাম পথের যে নাম করিয়াছেন, তাহাতে তমলুকের নাম নাই। এক নদী কালিন্দী-গঙ্গার অপর পারে ময়না ছিল। এই নদীর নিকটে পহুঁছিতে পদুমার বিল পার হইতে হইত। এই কয়েকটি স্থান স্মরণ করিলে মনে হয়, লাউসেনের ময়না শিলাই নদীর অপর পারে ঘাটালের নিকট ছিল। পদুমার বিল এখন বড়দা। কালিন্দী, কালিঙ্গী --কলিঙ্গ দেশের নদী। (তুং কালিঙ্গ, কালিন্দ ফল, তরমুজ)। শিলাই দ্বারকেশ্বরে পড়িবার পর রূপনারাণ, কিন্তু স্থানীয় নাম গাং অর্থাৎ গঙ্গা। ইহাতে মনে হয়, শিলাই যেন যমুনা। শিলাই কলিঙ্গের নদী বটে, যমুনাও বটে। এককালে ঘাটাল, সমুদ্রের ঘাট বা বন্দর ছিল। ঘাটালের চারি মাইল দক্ষিণে দ্বারকেশ্বরের মুখে 'বন্দর' নামে গ্রাম আছে। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে বন্দরের দক্ষিণে বর্তমান রাণীচক নামক স্থানে রাজগড় আছে। রাণীচক নাম কোন রাণীর নাম হইতে আসিয়াছে। সে রাণীর নাম ময়না হইতে পারে। যদি এখানে স্বরূপনারাণ প্রসিদ্ধ
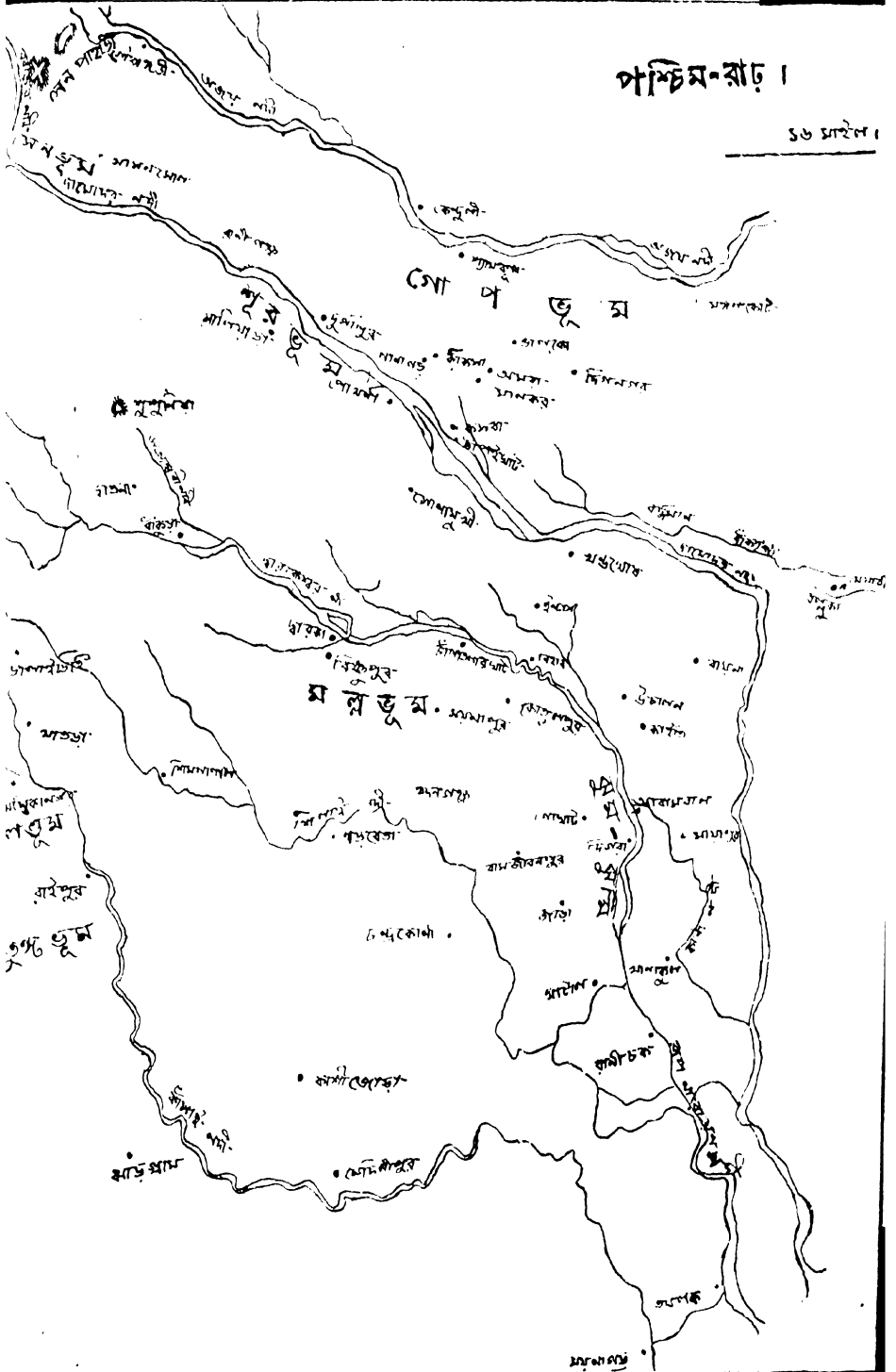
(১০) ধর্মপূজা-প্রচারক রামাই

উপরে দেখা গেল, রামাই পণ্ডিত বল্লুকানদীতীরে থাকিয়া ধর্ম সেবা করিতেন। বল্লুকা দামোদরের উত্তরে, বর্দ্ধমানের নিকটে। তিনি দ্বিজ ছিলেন, ধর্মের ভক্ত সাধক ছিলেন। "পণ্ডিত দ্বিজরাম সকলি গুণধাম, জনন পত্তন সাধনে" (১৫৬)। তাহাঁর সাধন দেখিয়া যমরাজা ভয় পাইতেন। তিনি ধর্মপূজা পত্তন করিয়াছিলেন। এখানে 'জনন' অর্থে নিরঞ্জন-ধর্মের উপাসনা-পদ্ধতি রচনা। যেমন "ব্রাহ্মণ-পদ্ধতি" "ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব" নামক বই, রামাইও তেমন "পণ্ডিত-পদ্ধতি" করিয়া গোস্বামী বা গোসাঞি পণ্ডিত আখ্যা পাইয়াছিলেন। তিনি মার্কণ্ডমুনিকে কুষ্ঠরোগমুক্ত করিয়াছিলেন। "হাথ ধরিএ দ্বিজরাম সআগে কৈল পার"। (১০৫)। অর্থাৎ তিনি ধর্মভক্তকে উদ্ধার করিতেন। রামাইর পিতা-মাতা পুত্র-কলত্র, কিছুই জানা যাইতেছে না।

রামাই ধর্মের গাজন প্রবর্তিত করিয়া "গাজনে পণ্ডিত রাম" হইয়াছিলেন। অতএব তাহাঁর পূর্বে ধর্মের গাজন ছিল না। লোকে ধর্মের গাজন মানসিক করিত। গাজন দুই দিনে সমাপ্ত হইত। বৃহস্পতিবার গাজনের আয়োজন, শুক্রবার ও শনিবার গাজন শেষ হইত। শিবের গাজনের অনুকরণে ধর্মের গাজন। বৎসরের শেষ দিন, সৌর চৈত্র মাসের শেষ দিন শিবের গাজন। অতএব ষষ্ঠ খ্রীষ্ট-শতাব্দের পরে শিবের গাজন চলিয়াছে। ধর্মের গাজন, আরও পরে।

থাকেন, তাহা হইলে সে নাম হইতে নদীর নাম রূপনারাণ হইয়াছে। স্বরূপনারাণ, রূপনারাণ নামে অন্যত্র প্রখ্যাত হইয়াছেন। এখানে অনুসন্ধান কর্তব্য। লাউসেন সিমুলিয়া হরিপালের কন্যা কাণাড়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দুই নাম জুড়িয়া এখন নাম সিমলা-পাল (চিত্র)। রাজধানী শিলাই নদীর উপর, ঘাটাল হইতে ২৪ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। এখানে রঙ্কিণী (ধর্মপুরাণে রঙ্গিণী) প্রসিদ্ধ আছেন। কাণাড়া নাম কর্ণাট হইতে। বোধ হয়, কর্ণাটের সেনরাজগণের কে আ য় এখানে রাজা ছিলেন। কিম্বা চোড়-গঙ্গবংশ কাণাড় মনে হইয়াছে। সিমলা-পালের দক্ষিণ পশ্চিমে রায়পুরে তুঙ্গভূম। তুঙ্গ নামটি চোড়গঙ্গ বংশের কুলোট্টুঙ্গ নাম স্মরণ করাইতেছে। এসব একাদশ শতাব্দের শেষ পাদের কথা। গঙ্গবংশ ওড়িষ্যার রাজা ছিলেন। এই বংশের এক মহাপাত্র (মহামন্ত্রী) সিমলা-পালের রাজা হইয়াছিলেন। বর্তমান রাজা সেই বংশের উৎকল ব্রাহ্মণ। ধর্মপুরাণে লাউসেন কামরূপের ধবলরাজ-কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কন্যার নাম কলিঙ্গা, আসামে অসম্ভব। সে সময় কিম্বা পরে কামরূপে ধবল নামে রাজবংশ ছিল না। আমার বোধ হয়, এই দুই অম্বিকানগরে খুজিতে হইবে। এই নগর কাঁসাই নদীর উপর এবং সিমলা-পাল হইতে ৮ ক্রোশ পশ্চিমে। এখানে অম্বিকা দেবী আছেন. লোকে সতীর এক পীঠ বলে, নিকটে ভৈরব আছেন। এটি ধবলভূম, সংক্ষেপে ধলভূম। রাজাদের পদ্ধতি ধবল ছিল, এখনও আছে। এখানে কুমারী নদী পড়িয়াছে। কুমারী ও কাঁসাই, মধ্যে সারঙ্গড়। দুই দিকে পাহাড়। স্থানটি নাকি মনোরম। প্রাচীন বৌদ্ধ-মূর্তি হইতে আরম্ভ করিয়া গণপতি ও সপ্তাশ্ববাহন সূর্যমূর্তি ও কালচাঁদ পর্যন্ত নানা দেব দেবীর প্রতিমা যেন কেহ সাজাইয়া রাখিয়াছেন। রাঢ়ে দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার নাই, রাজসাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নাই। থাকিলে এই একটি স্থানের প্রত্ন-উদ্ধার দ্বারা বড় বই পূর্ণ হইত। সে যাহা হউক, এই কলিঙ্গদেশ কন্যা, লাউসেনের কলিঙ্গা রাণী। 'ধবল' পদ্ধতি হইতে মনে হয়, পশ্চিম দেশের গুর্জর। রাজা ছত্রি। বাঁকুড়ায় ধবল পদ্ধতি অসাধারণ নয়। কিন্তু অন্যজাতি উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ দেশ হইতে বহুতর লোক আসিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে।

প্রথম প্রথম ধর্মের বিগ্রহ নির্মিত হইত না, তাঁহার পাদুকার পূজা হইত। "শূন্যে পূজএ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ মতি, নূতন মণ্ডপে পাদুকা নাই কামিঞা পাইব কথি" ॥ (১১১)। নূতন মণ্ডপে বিগ্রহ পাইবার কথাও নয়। বোধ হয়, পরে স্বরূপনারাণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে বেড়িয়া বারমতি ধর্ম-সমাজের ভরণ হইয়াছিল। বারমতি পূজা এক পণ্ডিতের কর্ম নয়। মণ্ডপের চারি দিকে চারি পণ্ডিত বসিয়াছিলেন। ইঁহারা সেতাই নীলাই কংসাই রামাই, চারি সম্প্রদায়ের চারি পণ্ডিত। অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্র রাজার সময়ে চারির কেহই ছিলেন না। হরিশ্চন্দ্র একাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে ছিলেন। রামাইকে নবম, কি দশম শতাব্দের মনে করিতে হইতেছে।

এই প্রাচীনতার একটু নিদর্শন আছে। শূন্যপুরাণের 'বারমাসি' পদ্যে চৈত্র হইতে বার মাস গণিত হইয়াছে। (১২৬)। 'বার আদিত্য বার ভাই', ধর্মপূজায় দ্বাদশ গণিবার মূল এই। চৈত্র হইতে গণনা, চান্দ্র মাস গণনা। "গৌড় লেখমালা" হইতে মনে হয়, পালরাজারা বঙ্গের শাসনে সৌর দিবস, এবং বঙ্গের বাহিরের শাসনে চান্দ্র দিবস গণিতেন। অর্থাৎ 'বারমাসি' রচনার সময় রাঢ়ে সৌর মাস গণনা প্রসিদ্ধ হয় নাই। একাদশ শতাব্দের শেষ পাদে শতানন্দের "ভাস্বতী"তে সৌর মাস পাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র প্রচলিত হইতে পারে নাই। শতানন্দের নিবাস পুরীতে ছিল। তথাপি আরও দুই শতাব্দ পূর্বে না গেলে চান্দ্র মাস প্রচলিত পাই না। "বারমাসি"র ভাষাও প্রাচীন। ইহার "কোমি" নামক পদবী আর পাই না। বোধ হয়, ইনি গ্রামাধ্যক্ষ ছিলেন। অন্য দুই এক পদ্যেও প্রাচীন ভাষা আছে। সে ভাষা যে বাঁকুড়ার, তাহাও নয় আপাততঃ রামাইকে নবম কিম্বা দশম শতাব্দের বলিতে পারি।

(১১) উপাখ্যানের রামাই

যখন কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তখনই তাঁহার চরিত লেখা হয় না। বহুকাল পরে তাঁহার ভক্তেরা মনের মতন করিয়া গড়িয়া থাকেন। ময়নাপুরের ধর্মপণ্ডিতেরা আপনাদিগকে রামাই পণ্ডিতের বংশধর মনে করেন। লোকে বলে রমাইর বংশ। ঘনরামে রমাই নাম আছে, রামাই নাম নাই। রমাই ও রামাই এক নয়। মাণিকরাম রমাই কিম্বা রামাই নাম করেন নাই। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু উক্ত পণ্ডিতদিগের বাড়ী হইতে রামাইর এক "আখ্যায়িকা" দিয়াছেন। তাহাতে নামটি রামাই। নব্য ময়ূরভট্টের সংস্কৃত শ্লোকে নামটি 'রামায়ি'। দুয়েরই মূল এক ছিল, নব্য কবি নানা স্থানে মার্জিত ও স্ফীত করিয়াছেন। আখ্যায়িকাটি দেখি।

দ্বারিকা পুরীতে বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ ধর্মপূজা করিতেন। "একদিন চামর ঢুলাতে অঙ্গে লাগিল তরাস।" ধর্ম শাপ দিলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বনে গিয়া বিষ্ণুর [ধর্মের নয়] চরণ পূজা করিতে লাগিলেন। তদন্তে রামাইর জন্ম হইল। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হইল, রামাই পিতৃদেহে 'মৃত্তিকা অর্পণ' করিলেন।[১৯] তার পর স্বয়ং ধর্ম বালকের অন্নজল দিতে ও সকল কর্ম করিতে লাগিলেন। রামাই পিতৃভবনে দ্বারিকায় ফিরিয়া

আসিলেন। সঙ্গে মার্কণ্ড মুনি আসিলেন। রামাই দিকে দিকে ধর্মের স্থাপন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার আশী বৎসর বয়সে ধর্মের দক্ষিণ চরণ-জাত এক কন্যা, নাম কেশবতী, দাসী হইল। "রামাই বলে কোলে লহ তুমি ত জননী।" [যোগী গীতের কথা]। পরে সেই কন্যার গর্ভে রামাই হস্ত দিলেন, এক বালকের জন্ম হইল। এই বালকের নাম ধর্মদাস। বড় হইয়া বিবাহ করিতে চাহিলে রামাই শাপ দিলেন, কালিকালে ডোমের পুরোহিত হইবে। কালিন্দী নদীকুলে শ্রীধর্মের ঘর্মজাত সদা নামে এক ডোমের কন্যা কালবতীকে ধর্মদাস বিবাহ করিলেন, বংশ বিস্তার হইল।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন (১ পৃঃ), "বহুদিন হইতেই গ্রহাচার্য্যগণ ধর্ম্মপূজা করিতেন," এবং এই কারণে বঙ্গীয় পঞ্জিকায় ধর্মপূজা-প্রচারক লাউসেনের নাম রাজচক্রবর্তীদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আমারও তাহাই মনে হয়। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। আখ্যায়িকা হইতে বুঝিতেছি, গ্রহাচার্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। কেহ গ্রহপূজা, কেহ ধর্মপূজা করিতেন। বৃত্তির ও ধর্মমতের প্রভেদ হেতু দুই জাতির মধ্যে বিদ্বেষও জন্মিয়াছিল। আখ্যায়িকায় "গ্রহকাজে রত হয় ফেটে মরে তাই।" রামাইর কাহিনীটিও এক গ্রহাচার্যের রচিত। নইলে সূতিকাগৃহে যে অর্ক খদির উডুম্বর শমী চন্দন, এই পঞ্চ যজ্ঞ-কাষ্ঠের অগ্নি করা হইয়াছিল, তাহা অন্যের মনে হইত না। রামাইর অন্নপ্রাশনের শুভদিন যে, গুরুবার পঞ্চমী অশ্বিনী নক্ষত্র দশ দণ্ড, এ কথাই বা কে মনে করিয়া রাখিত। গ্রহচার্য রামাইর জন্মদিনও দিয়াছেন। বৈশাখ মাসের শুক্লপঞ্চমী রবিবার ভরণী নক্ষত্র। এই নক্ষত্র চন্দ্রের নয়, রবির। অর্থাৎ বৈশাখ মাসের ১৩ দিন গতে, কিম্বা ১৩ই। গ্রহাচার্য স্থূলে ভুল করিতে পারেন না। চন্দ্র-নক্ষত্র যে আর্দ্রা, তাহা পাঠককে বুঝিয়া লইতে বলিয়াছেন। এককালে ভরণীর আদ্যে বৎসরান্ত হইত।[২০]

ধর্মপূজাবিধানেও গ্রহাচার্য্য পাইতেছি। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের পুষ্পং জয় বুঝিতে পারি, কিন্তু কোন্ যুগে কত বৎসর, তাহার উল্লেখ গ্রহাচার্য ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণের মনে

১৯। দাহ করিলেন না। নব্য কবি ব্রাহ্মণকে সহমৃতা করিয়াছেন। নব্য কবি রামাইপুত্র ধর্মদাস দ্বারা ধর্মপূজা-প্রচার করাইয়াছেন।

২০। সংস্কৃতে আছে, (ময়ূরভট্টের ভূমিকা), "মেষস্থতপনে শুক্লপঞ্চম্যাং চার্কে যমজে।" যমজ যম-নক্ষত্র, ভরণী। এটি দ্ব্যর্থ। সাধারণতঃ চন্দ্র-নক্ষত্র দেওয়া হয়। এই হেতু ভরণী চন্দ্র-নক্ষত্র মনে হইয়াছিল। শৈবশাস্ত্রে নাকি এই তিথি ও দিনে শিবের পুষ্পগৃহোৎসব। "মাধবে মাসি পঞ্চম্যাং সিতপক্ষে ভরণ্যাদৌ স্থিতরবৌ।" ('আদ্যের গম্ভীরা"। ১৬শ ভাগ সা-প-প, ৫৩ পৃঃ)। এখানে ভরণীর আদি বলিয়া ১৩ই বৈশাখ বলা হইয়াছে। এইরূপ রামাই এক বিশেষ দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাঁকুড়া সহর হইতে বিষ্ণুপুর, তথা হইতে পূর্বে দামোদর এবং তথা হইতে পশ্চিমে পোখর্ণা গ্রাম পর্যন্ত ১৩ই বৈশাখ নূতন বৎসর আরম্ভ হইত। বাঁকুড়া সহরের পুরাতন নিবাসী দোকানদার এই দিন নূতন খাতা করে। ইহার নাম "হাল সাল"। অন্যত্র এই দিন অপরাহ্নে লোকে ঘরের চালের ঈশান কোণাচে শাওড়া ডাল গুঁজিয়া দেয়। বিশ্বাস, এই ডাল থাকিলে ঘরে বজ্রপাত হয় না। বর্দ্ধমান জেলার অজয় নদের দক্ষিণে ইছাই ঘোষের দেউল আছে। ইহার নিকটে "লাউসেন কুণ্ড" নামে এক পুকুর আছে। সে অঞ্চলের ডোমেরা ১৩ই বৈশাখ এই পুকুরে স্নান করিয়া সজাতি কালুবীরের তর্পণ করিয়া থাকে। কেহ বলিতে পারে না, ১৩ই বৈশাখ কি ঘটিয়াছিল

আসিত না। (১২৭)। ইহাঁরা সংস্কৃতে পণ্ডিত হইতেন, বেদ উচ্চারণও করিতেন এবং ইহাঁদেরই একজন দ্বিতীয় রঘুনন্দন সাজিয়া "ধর্মপূজা-বিধান" লিখিয়াছিলেন। স্মার্তাচার্য ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। অতএব ধর্ম-গোসাঞি রঘুনন্দন অতি পুরাতন হইলেও সপ্তদশ খ্রীষ্ট শতাব্দের পূর্বে ছিলেন না। পূর্বেও অন্য কারণে ধর্ম-পূজা-বিধানের এই কাল পাইয়াছি। অতএব দেখা যাইতেছে, রামাই কাহিনী দুই শত বৎসরের মধ্যে রচিত। আখ্যায়িকার ভাষাও ইহার পূর্বের নয়। ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি-রায়ের মন্দির বিষ্ণুপুরের কোন রাজার নির্মিত হওয়া সম্ভব।

কাহিনীর উৎপত্তি বিষ্ণুপুরের নিকটে, যেখানে রাজা বীর-হাম্বীর দ্বারকেশ্বর-তটে দ্বারিকা গ্রাম করিয়াছিলেন। সে ষোড়শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের কথা। শূন্যপুরাণে, 'বৈতরনি পার হৈল্য দ্বারিক্যাকে রাখি।' (২১১)। এই বৈতরণী চম্পা-নদী বা দ্বারকেশ্বর।[২১] শ্রীকৃষ্ণের দ্বারিকায় বৈতরণী নাই। শূন্যপুরাণে কিম্বা ধর্মপূজা-বিধানে ধর্মদাসের নাম নাই। ধর্মপূজা-বিধানের গাজনের পর নানা ভক্তের নামে ও নগর পণ্ডিতের নামে পুষ্প দেওয়া হইয়াছে, ধর্মদাসের নামে দেওয়া হয় নাই। ইনি যে 'গোসাঞি পণ্ডিত' নামে আখ্যাত হন নাই, তাহা পরে দেখা যাইতেছে।

(১২) ধর্মরাজ পূজার পরিণাম

ধর্ম, ধর্মরাজ, ধর্ম ঠাকুর, একই দেবতা। অমরাদি কোষে—ধর্মরাজ তথাগত বুদ্ধ। পণ্ডিতেরা বলেন, এককালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। গৌড়ের পাল-রাজবংশ বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণকে ভূমিদানও করিতেন। সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের কি আকার ঘটিয়াছিল, জানি না। কিন্তু সে সময়ে সবাই বৌদ্ধ হইলে দেবদেবীর এত প্রতিমা নির্মিত হইত না; রাঢ় থাক, পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অনেক চিহ্ন নিশ্চয় থাকিত। শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী আবিষ্কৃত ৯ম—১২শ শতাব্দের প্রতিমার মধ্যে চারি-পাঁচ আনা মাত্র বৌদ্ধ প্রতিমা দেখিয়াছেন। অর্থাৎ এই পরিমাণ লোক বৌদ্ধ ছিল। জানি, জগৎ পরিণামশীল, বৌদ্ধধর্মেরও পরিবর্তন হইয়াছিল। রাঢ়ের ধর্মরাজে এক পরিবর্তন দেখিতে পাই। ইহার মূল কোথায়, কে জানে? ত্রিবেণীর গঙ্গোদকে কোন্ কোন্ দেশের জলবিন্দু কি কি পরিমাণে মিশ্রিত আছে, কে জানে? অচিন্ত্য বিষয়ে তর্ক নিষ্ফল।

("বীর-ভূমবিবরণ," ১ম খণ্ড, শ্যামারূপার গড়) বোধ হয়, এই ডোমেদের আদিনিবাস মল্লভূমে ছিল। খ্রীষ্টের চারি শত বৎসর পূর্বে ভরণীর আদ্যে বিষুব হইত। তদবধি এই স্মৃতি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। রাঢ়ের আর কোথাও এই স্মৃতি নাই, পাঁজিতেও নাই, এই অঞ্চলে কেন আছে? অনুমান হয়, প্রথম বৌদ্ধেরা ভরণীর আদ্যে বৎসর ধরিতেন। কারণ, তাহাঁদের কালে এইরূপ ঘটিত। অথবা গ্রহাচার্য ইহা পুরাণ হইতে লইয়াছেন। এটি মহাপদ্মনন্দের অভিষেককাল। এই নন্দ ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন। পুরাণে ইহাঁকে ধরিয়া পরীক্ষিতের কাল বলা হইয়াছে। এই অনুমানই ঠিক মনে হয়। ইহার সহিত মল্লাব্দের সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

২১। নব্য ময়ূরভট্ট বল্লুকার মাঝে এক দ্বীপ কল্পনা করিয়া বিষ্ণুপুরের নিকটস্থ দ্বারকেশ্বর আরও স্পষ্ট করিয়াছেন। এই বল্লুকায় রামাই ৪৩২০০০ [কলিযুগে যত বৎসর, তত] ধর্মশিলা তুলিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের দিকের বল্লুকায় শিলা পাওয়া যায় না। এই শিলা মর্কট পাথরের—'বল্লুকীটে সেই শিলা কৈল খণ্ড খণ্ড'। (১১)।

"শূন্যপুরাণের" সৃষ্টিবর্ণন দেখি। "সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি ছিল না।" ইহাদ্বারা বুঝিতেছি, সৃষ্টি অনাদি নয়। "তখন সবই শূন্য।" জ্যোতিষ্ক-অভাবে আমরা মনে করি, সেটা ধুন্ধু [কোয়াশার মতন; তমসাচ্ছন্ন] ছিল। কেবল এক 'প্রভু' [সৎ, অব্যক্ত, পরম ব্রহ্ম] ছিলেন। তাহাঁর 'মায়ায়' [ইচ্ছায়] তিনি 'নিরঞ্জন ধর্ম' হইয়া 'ব্রহ্মজ্ঞানে' [চিন্ময় ব্রহ্ম বা স্বয়ম্ভু ভগবান্‌রূপে] রহিলেন। ইহাঁর হাই হইতে এক পক্ষী, নাম উল্লূক [বাক্], এবং মুখা-মৃত হইতে জল [আপঃ] উৎপন্ন হইল। উল্লূক হইতে হংসের [প্রাণের] উৎপত্তি হইল। তদনন্তর কূর্মপৃষ্ঠ মেদিনী, আদ্যাশক্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ইত্যাদি।

এই বর্ণনায় উল্লূক সংজ্ঞা ব্যতীত নূতন তত্ত্ব কিছুই পাইতেছি না। উল্লূকের কর্ম দেখিলে বিষ্ণুর বাহন গরুড় মনে হয়। নিরঞ্জন, বিষ্ণুকে জন্ম দিয়া তাহাঁর বাহন লইতে পারেন না, তৎসদৃশ পক্ষী (পেচক) নির্মাণ করিলেন। সুপর্ণ গরুড়ের কর্ম না বুঝিলে উল্লূকের বুঝিতে পারা যাইবে না। লক্ষ্মীর বাহন উলূক কেন ?

ধর্মরাজের বিগ্রহ কূর্মাকার কেন ? পণ্ডিতেরা বলেন, বৌদ্ধ স্তূপের অনুকরণ। কিন্তু সে স্তূপ শিখরী না হইয়া কূর্মপৃষ্ঠ হইল কেন ? কটাহাকার ব্রহ্মাণ্ডের সাদৃশ্যে উভয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে। "বৃহৎসংহিতা"য় ভারতবর্ষকে কূর্ম বলিয়া ভাগ করা হইয়াছে। এই রূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণে। পণ্ডিতেরা আরও বলেন, বৌদ্ধ স্তূপের গায়ে কলুঙ্গী করিয়া তাহাতে চারি কিম্বা পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্তি করা হইত। "ইহাতেই মনে হয়, কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর, পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তির সহিত ধর্মমূর্তির স্তূপ" (ভূমিকা ১১০)। কিন্তু ধর্মরাজের কূর্মবিগ্রহে চারিপাদ ও ঊর্দ্ধমুখ তুণ্ডদ্বারা পাঁচটি নয়, চারিটি ফোকর হয়। কোন কোনও বিগ্রহে তুণ্ড নিম্নমুখে আছে।[২২] যদি ধ্যানী বুদ্ধের স্থানে সেতাই নীলাই কংসাই রামাই বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ষোড়শ-শত-গতি রামাই পণ্ডিত একেবারে কাল্পনিক। থাকেন পঞ্চম পণ্ডিত, গোসাঞি পণ্ডিত। যদি ইনিও এক ধ্যানী বুদ্ধ হন, তাহা হইলে ধর্মপূজা-প্রচারক রামাই বা গোসাঞি কেহ ছিলেন না বলিতে হয়!

অন্য দিকে, তেকোণা মেদিনীতে পদ স্থাপন করিয়া ধর্মরাজ। কূর্মপৃষ্ঠ মেদিনীতে তাহাঁর

২২। এখানে কয়েকটি বর্ণনা করিতেছি। লেখক জাড়া-গ্রামনিবাসী শ্রীযুত মৃগাঙ্কনাথ রায়। ইনি আমার আরও কয়েকটি বৃত্তান্ত বলিয়াছেন। (১) জাড়া গ্রামের যাত্রাসিদ্ধি; পূজারী চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। কচ্ছপমূর্তি, চতুষ্পদ পাথরের চৌকির সহিত খোদিত। কূর্মের মুখ ঊর্দ্ধ দিকে। নখ চোখ মুখ ঠোঁট, এমন কি, পায়ের শিরাগুলি পর্যন্ত খোদা আছে; দেখিলেই মনে হয়, একটি জীবন্ত কচ্ছপ বসিয়া আছে। (২) জাড়া গ্রামের জগৎ রায়, পূজারী ডোম-পণ্ডিত। একটি চতুষ্কোণ তিনধাপ পাথরের মঞ্চ। প্রথম ধাপে আটটি পুংমূর্তি, উহাঁরা নাকি অষ্ট পণ্ডিত। দ্বিতীয় ধাপে আটটি স্ত্রীমূর্ত্তি, উহাঁরা নাকি অষ্ট কামিন্যা। তৃতীয় ধাপে লতা-পাতা খোদিত। মঞ্চের উপর পৃষ্ঠে ধর্মের পদযুগলচিহ্ন অঙ্কিত। নীচে অষ্টদল পদ্মকে এক নাগ বেষ্টন করিয়া আছে নাগের পুচ্ছ নাগের মুখে প্রবিষ্ট। উৎকৃষ্ট পাথরে সুন্দর খোদিত। (৩) জাড়ার যাত্রাসিদ্ধি। পূজারী ডোম পণ্ডিত। এক পাথরের চতুষ্কোণ বেদীর উপর কচ্ছপমূর্তি নির্মিত। মুখ ঊর্দ্ধদিকে। পৃষ্ঠে যুগল পদচিহ্ন। জাড়ার নিকটস্থ ছোট পাথর-বাড় গ্রামের স্বরূপনারাণ। পূজারী ডোম পণ্ডিত। এক চতুষ্কোণ চতুষ্পাদ পাথরের চৌকির উপর অষ্টদল পদ্মের মধ্যে যুগল পদচিহ্ন।—ইত্যাদি।

পদচিহ্ন, এবং এই পদচিহ্নই পূজা পাইয়া থাকেন। পূর্বে পদ-চিহ্নের হইত কি না, কে জানে। পুরাণে দেখি, পূর্বকালে মেদিনী চারি দেশে বিভক্ত করা হইত। এই চারি দেশ চতুর্দল পদ্ম। এই পদ্মকে বেষ্টন করিয়াছে, দিক্-চক্র, বাসুকি। (যোগীর হৃৎপদ্মও হইতে পারে।) রামাইর পূর্বে মার্কণ্ড মুনি বিগ্রহ রাখিয়া শূন্য ধ্যান করিতেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে, গোসাঞি পণ্ডিতের সময়ে নানারূপ প্রতিমা নির্মিত হইত, তখন প্রতিমা-নির্মাতা অনেক ছিল। ইহারা কি ভাবিয়া কোন্ নিদর্শন পাইয়া গড়িত, তাহা না জানিলে ধ্যানীবুদ্ধ কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। নব্য ময়ূরভট্টে নানা মূর্তির বিবরণ আছে। এই বিবরণও প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে কূর্ম-কল্পনার মূল পাওয়া যাইবে না।

আর এক দিকে, ক্ষীরোদ-সাগর মন্থনকালে মন্দর-গিরি মন্থন-যষ্টি হইয়াছিল, বিষ্ণু কূর্মরূপ গ্রহণ করিয়া যষ্টির আধার হইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ধর্ম ও নারায়ণ অভিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। নারায়ণের কূর্মাবতার ধর্মবিগ্রহে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন। মৎস্যপুরাণে আছে, অমুক দ্বীপে বরাহাবতার, ভারতে কূর্মাবতাররূপে নারায়ণ। কি হইতে কি হইয়াছে, তাহার বিচার অতিশয় দুর্ঘট মনে করি। নারায়ণের কূর্মাবতারে বিশ্বাস কবে হইতে আরম্ভ হইয়াছে? কূর্ম অবতারের অর্থই বা কি?

এ সব তত্ত্ব রাখিয়া শূন্যপুরাণ দেখি। ধর্মের মণ্ডপের চারি দ্বার। চারি দিক্ চারি দ্বার। কিন্তু দিক্-গণনায় ক্রমভঙ্গ হইয়াছে।

সত্যযুগে	পশ্চিম দিকে,	সেতাই পণ্ডিত,	চন্দ্র কোটাল,	৪০০ গতি
ত্রেতা	দক্ষিণ	নীলাই	হনুমান্	৮০০
দ্বাপর	পূর্ব	কংসাই	সূর্য্য	১২০০
কলি	উত্তর	রামাই	গরুড়	১৬০০

বর্ণ-গণনারও ক্রমভঙ্গ হইয়াছে। শ্বেত, রক্ত, পীত, নীল (বা কৃষ্ণ), চারি বর্ণ-গণনার এই ক্রম চিরপ্রসিদ্ধ। পণ্ডিতেরা কাল্পনিক হইলে দিক্ ও বর্ণের ক্রমভঙ্গ হইত না। গতিসংখ্যা, সত্যাদি ক্রমে দ্বিগুণ হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু চারি যুগে ৪০০০ ধরা হইয়াছে। প্রাচীন কালে এইরূপ ছিল, পুরাণে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ দ্রষ্টব্য, কোটালের নাম। দক্ষিণে লঙ্কা, হনুমান্ বুঝিতে পারি। কিন্তু উত্তরে কুবের না হইয়া গরুড়, পশ্চিমে বরুণ না হইয়া চন্দ্র। শাকদ্বীপের পূর্বে উদয়গিরি, সূর্য্য; পশ্চিমে সোমগিরি, চন্দ্র। উত্তরের গরুড় এখানে উত্তর দিক্ পাইয়াছেন[২৩]। সব দেখিলে মনে হয়, যেন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের দ্বারা উক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে, তিনি বহু প্রাচীন কালের স্মৃতি এখানে রক্ষা করিয়াছেন।

শূন্যপুরাণ রচনার সময় চারি পণ্ডিত বহু পুরাতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। শূন্যপুরাণে "তাম্রধারণ" পদ্য হইতে বুঝি, চারি পণ্ডিতেরা চারি বর্ণের তাম্র পরিতেন। তাম্রের সহিত অন্য ধাতু গলাইয়া চারি বর্ণ করা হইত। (টীকা পশ্য)। এত স্থানে চারি পণ্ডিতের কর্ম আছে যে, সে সব কাল্পনিক মনে হয় না। তাঁহাদের প্রকৃত নাম সেতাই, নীলাই, কংসাই ছিল না, তাম্রের বর্ণ হইতে তাঁহাদের নাম হইয়াছিল। এক ধর্মপণ্ডিত বলেন, জুগী পণ্ডিতেরা

২৩। ১৩৩৮ সালের বৈশাখের "প্রবাসী"তে "পুরাণে দেশ"।

সেতাইর শিষ্য। ইহাঁরা সূতার পইতা পরেন। জেল্যে পণ্ডিতেরা লোহার আঙ্গট পরিতেন। ইহাঁরা নীলাইর শিষ্য। বাগ্‌দী পণ্ডিতেরা কাঁসার বলয় পরিতেন। এ বিষয়ে নাকি শাস্ত্রও ছিল। রামাই আসিবার পর সকলেই তাহাঁর শিষ্য হইয়াছেন। রামাইকে কাল্পনিক মনে করিবার বিন্দুমাত্র হেতু নাই।

উত্তর দ্বারে রামাই পণ্ডিতের স্থান। এই দ্বারের অপর নাম গাজন দ্বার, যে দ্বার দিয়া সন্ন্যাসীরা মণ্ডপে প্রবেশ করে। চারি দ্বার চারি পণ্ডিত নির্দ্দিষ্ট। আর এক দ্বার, পঞ্চম দ্বার, শূন্য যুগের। এখানে গোসাঞি পণ্ডিতের স্থান। ইহাঁকে সর্বদা পাওয়া যায় না। ইহাঁর অপর নাম 'গুরুপণ্ডিত'। (১২৭)। কিন্তু মণ্ডপের পঞ্চ দ্বার হইতে পারে না। উলূক, ধর্মরাজের বাহন। তিনি এক দ্বারের কোটাল হইতে পারেন না। এই সকল কারণে মনে হয়, যিনি রামাই, তিনিই গোসাঞি পণ্ডিত। ধর্মপূজাবিধানে দুইই গোসাঞি (২৫২)। শূন্য-পুরাণের কবি এক নয়, অনেক। সকলে এক কালেরও নয়। ইহাঁরা কিছু কিছু গণ্ডগোল করিয়াছেন। যথা—"পঞ্চম দুআরে শ্রীরাম, কোটাল উল্লুক" (৭৪), "দক্ষিণ দুআরে রামাই" (২৩৬)। যখন রামাই পৌরাণিক হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাহাঁর স্থানে গোসাঞি পণ্ডিত বসিয়াছিলেন। কারণ, কাল ভবিষ্য অনাগত হইলেও তাহা চারি যুগের একটা না একটা যুগে পড়িতেই হইবে। শূন্য দ্বার সম্বন্ধেও সেই কথা। ইহাকে পঞ্চম দ্বার বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু পঞ্চম দিক্‌ ত হইতে পারে না। তাহার দ্বার শূন্য, যুগ শূন্য। ইহার অর্থ পূর্বোক্ত উত্তর দ্বার এবং পূর্বোক্ত কলিযুগ। ইহাতেও পাই, রামাইর নামান্তর গোসাঞি এবং গোসাঞির নামান্তর রামাই। শূন্যপুরাণে "আপুনি রামাই পায় করিল সয়াল" (২১১)। (সয়াল—দুই হাত দিয়া পদদ্বয়কে শৃঙ্খলাকারে বেষ্টন=প্রাচীন বাং সিয়ালি। "রামাই পণ্ডিত করে নৃত্য গীত, প্রসন্ন হইল বল্লূকা" (১৯৯), "হাথ ধরিএ দ্বিজরাম সআগে কৈল পার" (১০৫)। কিন্তু গোসাঞি পণ্ডিতের কর্মের নামগন্ধ নাই। কারণ, তিনি রামাইর স্মৃতি।

রামাইর শূন্য নিরঞ্জন, ক্রমে ক্রমে দেব চক্রপাণি হইলেন (১৫০); ভক্তা আমিনীরা গলায় তুলসীর মালা পরিলেন, ভক্তেরা তুলসী ভক্ষণ করিলেন (১৬৮), এবং বৈকুণ্ঠ তাহাঁদের বাঞ্ছিত লোক হইল। ইতিপূর্বে রাঢ়ের শক্তিপূজা ধর্মপূজার অঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। চারি পণ্ডিত, গণ্ডার অশ্ব মহিষ ছাগ বলি দ্বারা ঘোররূপা-শিবানীর মন্থুই দিতেন (২১৪)। নাথ যোগীরাও তাহাঁদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডের যজ্ঞে গঙ্গা ও তুলসী মহাসতী বলিয়া গঙ্গা রন্ধনী হইলেন, নাথ যোগীরা ও দেবতারা ভোজন করিলেন (২১১)। যোগীদিগের যোগতত্ত্ব ও যোগের সাঙ্কেতিক ভাষা চলিয়া আসিয়াছিল। (২১৫, ২০৯, ধ-পূ-বি)। রামাই পণ্ডিতের পিতার মৃতদেহের সমাধি হইয়াছিল, দাহ হয় নাই। নাথ-যোগীদিগের প্রশ্নোত্তর দ্বারা যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা ধর্মপূজাবিধানের দ্বারভেটা ও অন্যত্র প্রচুর আছে (১৬৩)। বৌদ্ধ সামনেরও প্রশ্ন এইরূপ ছিল। সৌরদিগের দ্বাদশ আদিত্য ও সূর্যার্ঘ্যদানও আসিয়াছে।

শিবের গাজনের অনুকরণে ধর্মের গাজন। হরিশ্চন্দ্র রাজার পূজাকালে অক্ষয়া তৃতীয়া কিংবা বৈশাখী পূর্ণিমা দেখা হয় নাই। শূন্যপুরাণে এই তিথির উল্লেখ নাই। দ্বাদশ খুজিতে গিয়া অক্ষয়া তৃতীয়া আসিয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমা বহু পূর্বকাল হইতে প্রসিদ্ধ

ছিল। তথাগত এক বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ হইয়াছিলেন। একখান পাঁজিতে দেখিতেছি, এই দিন কূর্মাবতার। পঞ্জিকাকার এ কথা কোথায় পাইয়াছেন, জানি না। বৈশাখের শুক্ল তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা তের তিথি, কিন্তু বার দিন হইয়া থাকে। বোধ হয়, বারমতি শব্দের অর্থ বিস্মৃত হইবার পর বার দিনে পূজা এবং বার পালা গানের কথা উঠিয়াছে।

শিবের গাজনে সন্ন্যাসীরা কেবল তপস্যা করিতে একত্র হন না। তপস্যায় গর্জনই বা কেন ? তাঁহারা প্রমথ সাজিয়া শিবপার্বতীর বিবাহের বরযাত্রী হন। গৃহস্থ-ঘরণী নীলকণ্ঠের বিবাহবাসরে উপবাসী থাকেন, যেন তিনিই কন্যা সম্প্রদান করেন। বিবাহ হইয়া গেলে তিনি যুগলের পূজা করেন। নিরঞ্জন ধর্মও শক্তি ভিন্ন থাকিতে পারেন না। তাঁহার শক্তির নাম মুক্তি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নাম মূর্তি। শূন্যপুরাণে মুক্তা, মুক্তি, দুই নামই আছে। ধর্মের সহিত মুক্তির বিবাহ নিমিত্ত মুক্তির স্নান, অধিবাস ও মাঙ্গলিক কর্ম দেখিয়া গৃহী ভক্ত্যারা অবশ্য পরম পরিতোষ লাভ করেন। এই শক্তি, আদ্যা শক্তি, যিনি ধর্মের ঘম হইতে উৎপন্ন এবং সৃষ্টিপত্তনে ধর্মের পুত্রী। কিন্তু সেটা ভাষার অসম্পূর্ণতার দোষ।

কিন্তু ভাষার দোষেই আধ্যাত্মিক বীজ হইতে কেবল শিব-শিবানী নয়, একবারে রাধাকৃষ্ণ আসিয়াছেন। নব্য ময়ূরভট্টে, "শক্তি ছাড়া নাহি রয় ব্রহ্ম" (৩৯), ধর্ম ও বিষ্ণু এক (৮), ধর্মই অযোধ্যাতে রাম গোকুলেতে শ্যাম (১২২), ব্রহ্মের শক্তি কামিন্যা (৪০), তিনি "শ্যামবর্ণা ত্রিলোচনা রক্তবস্ত্র-পরা" (১৩৮)। অর্জুন পণ্ডিত ধর্মপূজা লিখিতে বসিয়া রাধাকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের শূন্য নিরঞ্জন গত তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি পশু-বলি দিতেন না, মদ্যের ত কথাই নাই। হরিশ্চন্দ্র রাজার পূজাতে একটিও দেখিতে পাই না। লাউসেনের পূজাতেও নাই। শক্তি-পূজার মহিমার সময়ে লাউসেন আসিয়াছিলেন, ধর্মের নিকট শক্তি বার বার পরাজিত হইয়াছেন। রামাইর সাত্ত্বিক পূজা তাঁহার শিষ্যেরা তামসিক করিয়া ফেলিয়াছে। তথাপি শূন্যপুরাণের স্থানে স্থানে ধর্মরাজের চরণে একান্ত ভক্তি, নির্ভরতা ও ব্যাকুলতা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এই গুণেই ধর্মপূজা জনসাধারণে প্রচারিত হইয়াছিল।

এই প্রচারে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের হাত স্পষ্ট। শাকদ্বীপে কেবল ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়ও বাস করিতেন। শকেরা উৎপত্তিতে আর্যজাতি, কৃষ্টিতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। খ্রীষ্টের দুই এক শতাব্দ ও আরও পূর্বে এই জাতি ভারতে রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন। শকদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা মগ বা মঙ্গ নামে খ্যাত ছিলেন। বর্তমানে যোধপুর রাজ্যে অনেক বাস করিতেছেন। ইঁহারা মিত্র নামে সূর্যপূজা করিতেন। চন্দ্রেরও করিতেন। মৎস্যপুরাণে আছে, চন্দ্রসূর্যের মূর্তি-পূজা এ দেশের নয়। "শাকদ্বীপে তু বৈ সূর্যঃ পূজ্যতে জনপদাঃ সদা।"—(শিব-পুরাণ)। অন্য এক পুরাণে আছে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গরুড় পাঠাইয়া শকদ্বীপ হইতে মগ আনাইয়াছিলেন। ইঁহারা শাম্বপুরে সূর্যমূর্তি পূজা করিয়াছিলেন। তদনন্তর ইঁহারা নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া এ দেশে সৌর-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কেহ কেহ পশ্চিমের ভোজবংশে বিবাহ করিয়া 'ভোজক' হইয়াছিলেন। (হর্ষচরিত)। ঘনরাম লিখিয়াছেন, ভোজরাজা ধর্মের প্রথম সেবক। পশ্চিমদেশীয় ভোজ রাঢ়ে রাজা হইয়াছিলেন, সঙ্গে শাকদ্বীপী পুরোহিতও আনিয়া থাকিবেন। এই ব্রাহ্মণেরা এ দেশে গ্রহবিপ্র,

গ্রহাচার্য ও দৈবজ্ঞ নামে খ্যাত। ইহাঁদের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, গৌড়-সম্রাট্ শশাঙ্কদেব কুষ্ঠগ্রস্ত হইলে সূর্যার্ঘ্যদান ও গ্রহশান্তির নিমিত্ত দ্বাদশটি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন[২৪]। শশাঙ্কদেব সপ্তম খ্রীষ্ট-শতাব্দে ছিলেন। তাহাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ছিল। তিনি বৌদ্ধবিদ্বেষী ও শৈব ছিলেন। ইহাতে সহজে মনে হইয়া থাকিবে, বৌদ্ধধর্মে দ্বেষ হেতু তাহাঁর কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল।

সপ্তম খ্রীষ্ট-শতাব্দে গ্রহাচার্যগণের রাঢ়ে আগমন ধরা যাইতে পারে। তাহাঁরা এখান হইতে ওড়িষ্যায় গিয়া একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে কোণার্কে সূর্যপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। দুই শতাব্দ পরে কোণার্কের বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়। পুরীমন্দিরের বেষ্টনীর মধ্যেও এক সূর্যমন্দির আছে, এবং এই সূর্যপূজা হইবার পর জগন্নাথদেবের পূজা হয়। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অম্বিকানগরে প্রাচীন রাজধানীর অবশেষের মধ্যে পাষাণের সপ্তাশ্ববাহন সূর্যপ্রতিমা আছে। বোধ হয়, এটি কোণার্কের সমকালীন। মেদিনীপুরে চন্দ্রকোণায় সূর্যপ্রতিমা আছে বলিয়া শুনিয়াছি।

গ্রহবিপ্রেরা রাঢ়ে আসিয়া যত দিন রাজানুগ্রহ পাইয়াছিলেন, তত দিন তাহাঁদের চিন্তা ছিল না। সেনরাজারাও সৌরদিগকে মানিতেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই গ্রহাচার্যদিগের চিন্তার কারণ জুটিয়াছিল। দেশের পুরাগত সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য যজমানের পৌরোহিত্য করিতেছিলেন। তাহাঁদের অবজ্ঞাত গ্রহাচার্যগণ সপ্তশতীর সহিত মিশিয়া যাইতে পারিলেন না। ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে পূর্ব্বরাঢ়ে রচিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে লিখিত আছে, গরুড় শকদ্বীপ হইতে গ্রহবিপ্র আনিয়াছিলেন। ইহাঁরা হোমযজ্ঞপরায়ণ, এবং কেহ দেবল (জীবিকার্থ দেবপ্রতিমা-ধারী ও পরিচারক), কেহ গণক (জ্যোতিষী)। কিন্তু এই এই কর্মদ্বারা সকলের দিন চলিতে পারে না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ নাম লইয়া কে বা নিম্ন হেয় আসনে বসিতে চায়? কেহ কেহ চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের পুরোহিত হইয়া 'বর্ণ-ব্রাহ্মণ, নামে পরিচিত হইলেন। শ্বেতাই, নীলাই, কংসাই পথ দেখাইয়াছিলেন, রামাই সে পথে চলিয়া, পঞ্চম বর্ণের গোস্বামী হইয়া নিজের শিষ্য-দল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিত যে গ্রহবিপ্র ছিলেন, তাহার অনেক নিদর্শন পূর্বে পাওয়া গিয়াছে। তাহাঁর জন্ম হিমালয়ে হইয়াছিল। ইহাও যেন শাকদ্বীপীর আদিনিবাস স্মরণ করাইয়া দেয়। বোধ হয়, ইহাঁরা পশ্চিম হইতে দক্ষিণে গুজরাটে ও সৌরাষ্ট্রে (দ্বারিকায়), তদনন্তর পূর্বদিকে রাঢ়ে আসিয়া উপস্থিত হন। বোধ হয়, এই হেতু ধর্মমণ্ডপের চারিদ্বারের এই পর্যায়। কালে উক্ত দ্বারিকা ও বিষ্ণুপুরের দ্বারিকায় ভ্রম ঘটিয়াছিল। ধর্মপুরাণে অস্তাচলের নিকটে হাকন্দ নদী। হাকন্দ, সং আক্রন্দ, ক্রন্দন-স্থান। এই নদী ভারতে নাই। ভারতে অস্তাচলও নাই। দুইটিই শকদ্বীপের। সেখানে নদীর নাম মুনিতপ্তা। আদিশূর কনৌজ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া, এবং বল্লালসেন কতকগুলিকে কুলীন মর্যাদা দিয়া, অপর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের অবস্থা হীন করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সঙ্গে গ্রহাচার্যগণেরও দুর্গতি হইয়াছিল। এখনও কিন্তু পূর্ব-বিদ্বেষ লোপ পায় নাই। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

২৪। সন ১৩৩০ সালের আষাঢ় মাসের "প্রবাসী। ধর্মরাজের পূজা প্রত্যহ না হইলেও মকরসংক্রান্তির দিন হইতেই হইবে। কারণ, সূর্য অগ্নিকোণে উদয় হন, উত্তরায়ণ আরম্ভ। কোণার্ক নামের হেতু এই।

হইতেছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মনে করিতেন তাঁহারাই দেবদেবী পূজার অধিকারী, এবং তাঁহাদের পূজিত দেবদেবীই পূজ্য। কিন্তু ইতর জাতির পূজিত ধর্মরাজ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও আদি-শক্তির উপরে অধিষ্ঠিত! ধর্মপূজকেরাও এই সকল ব্রাহ্মণের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন, সদ্ধর্মীর নিকট 'হিন্দু' নাম অবজ্ঞাত হইল। শূন্যপুরাণে "হিন্দুর ভূত নগরে সেন্ধাঅ" (৯২), ধর্মপূজাবিধানে "হিন্দু পুজন্তি কাষ্ঠ পাষাণ।" (২২১)। সদ্ধর্মীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল। নিরঞ্জনের উষ্মায় রাঢ়ি ব্রাহ্মণের দুর্গতির একশেষ হইল। সদ্ধর্মীর উল্লাস কিন্তু স্থায়ী হইল না। তাম্র-ধারীকেও বলিতে হইল, "উন্‌কা তাম্বা হুজুর ন মেরা"। (ধ-পূ-বি, ২২৩)। সৈন্যমাত্রেই দুর্বিনীত হইয়া থাকে। বিদেশী বিধর্মী তুর্কী ও পাঠান নায়ক তিন কারণে হিন্দু ও সদ্ধর্মীকে মুসলমান করিতে লাগিলেন। (১) বিজিত দেশে মুসলমান না পাইলে রাজ্যস্থাপন অসম্ভব। (২) "অবিশ্বাসী"কে মুসলমান করিতে পারিলে পুণ্য হয়। (৩) জেতা, ম্লেচ্ছ নামেও অবজ্ঞাত হইতে চায় না। প্রথমে হিন্দু ও সদ্ধর্মীর পরস্পর দ্বেষ দেখিয়া ভেদ-উপায় সহজেই মনে হইল। পরে হিন্দুকে রাজকর্মে নিযুক্ত করিয়া দান-উপায়ে অনুগত করা হইয়াছিল। উচ্চশ্রেণী হিন্দুর স্ব-ধর্মত্যাগ অতিশয় কঠিন। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর বাদশাহের জাত হইবার প্রলোভনও অল্প নয়। বিশেষতঃ সদ্ধর্মীর মুসলমান হওয়া কঠিন নয়। "নিরঞ্জন করতার," সদ্ধর্মী ও মুসলমান দুইই মানেন। মুসলমানের পয়গম্বর যেমন, সদ্ধর্মীর বুদ্ধ তেমন। এই কারণে স্বাধীন চীন ও জাপান দেশের লোকে মুসলমান হইতেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দের পর দুই তিন শত বৎসর দেশে শান্তি ছিল না, অর্থ ছিল না, অভয় ছিল না। ষোড়শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সে সময়ের অনেক ব্রাহ্মণ নানা কারণে পতিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পঞ্চম বর্ণের পুরোহিত হইয়া পরে 'বর্ণব্রাহ্মণ' বা 'জাতিব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হইলেন। তখন হিন্দু সমাজে জাতি-অনুসারে কাহারও শ্রোত্রিয় রাঢ়ি ব্রাহ্মণ, কাহারও বর্ণব্রাহ্মণ, কাহারও 'পণ্ডিত' পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন। পূর্বকালে ব্রাহ্মণ গীতবাদ্য, বিশেষতঃ চর্মবাদ্য করিলে পতিত হইতেন। রামায়ণ মহাভারত রচনা করিলে পাতিত্য হইত না। কিন্তু পায়ে নূপুর, হাতে চামর লইয়া গায়ন হইলে জাতিভ্রষ্ট হইতেন। ধর্মের গান দূরে থাক, রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীর গান শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ করিতেন না। সে দিন অল্পে অল্পে চলিয়া গিয়াছে। এখন উত্তম ব্রাহ্মণের কেহ অজ্ঞানতঃ, কেহ লোভ ও ভয়বশতঃ ধর্মপূজা করিতেছেন, ধর্মের গাজনে বামুন হইয়াছেন, ধর্মপণ্ডিতের সহিত ধর্মপূজা ভাগ করিয়া লইয়াছেন। অথবা সর্বঘটেই যে নারায়ণ! হিন্দুধর্ম আচার বিচার করে, লোকের শীল দেখে, ঠাকুর ভাগ করে না। এককালে ব্রাহ্মণে ধর্মের মাড়ো মাড়াইতেন না, ধর্মপণ্ডিত আপনাকে ব্রাহ্মণের উপরে মনে করিতেন। অদ্যাপি ওড়িষ্যার অলেখ-ধর্মী সকল জাতির অন্ন খায়, খায় না ব্রাহ্মণের। অদ্যাপি রাঢ়ের দূর প্রান্তে (মানভুম জেলায়) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ধর্মপূজা করাতে পতিত হইয়া রহিয়াছেন। এখন ধর্ম ব্রাহ্মণের ক্লেশ দেখিলে থর্-থর কাঁপেন, ব্রাহ্মণের পদাঘাত বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। (ধর্মপূজা-বিধান)।

এখন অপর সকল দেবতার ন্যায় ধর্মরাজেরও মাহাত্ম্য-হ্রাস হইয়াছে। ইহার দুই কারণ ঘটিয়াছে। ধর্মপণ্ডিতেরা কেবল পারত্রিক মঙ্গল করিতেন না, ঐহিক মঙ্গলও করিতেন। গ্রহাচার্যগণ যাবতীয় চর্মরোগ চিকিৎসা করিতেন। তাঁহারা বসন্তের টীকা দিতেন, শীতলা মায়ের

পূজা করিতেন। এত ডাক্তারের দিনেও দৈবজ্ঞই বসন্ত-রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন। ইঁহারাই কুষ্ঠাদি দুঃসাধ্য রোগের একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন। সূর্যকিরণে এই রোগের উপশম হয়, আধুনিক ডাক্তারও বলিতেছেন এবং কৃত্রিম উপায়ে রশ্মি-চিকিৎসা করিতেছেন। দেশের লোকের তুলনায় বৈদ্যজাতি নগণ্য। পঞ্চম বর্ণের বাড়ীতে বৈদ্য যাইতেন না, দূর হইতে ঔষধ বলিয়া দিতেন। এই অবস্থায় এক এক ধর্মস্থান রোগ-চিকিৎসার ধাম হইয়াছিল। ধর্মপণ্ডিতেরা অনেক ঔষধ জানিতেন, লোকের উপকার হইত, ধর্মের মাহাত্ম্য বাড়িত। বাল্যকালে দেখিয়াছি, মেলেরিয়া মহামারীর সময় ইঁহারা প্লীহায় দাগ (দাহ) দিতেন, অসংখ্য রোগী অকাল মরণ হইতে রক্ষা পাইত। আমি একজন নম-শূদ্র পণ্ডিত জানিতাম, তিনি ভূতের রোজা ও নারীর মূর্চ্ছারোগচিকিৎসক হইয়া দূরদেশেও খ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারা ঝাড়-ফুঁক জানিতেন, অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিত। এক এক ধর্ম-স্থান এক এক রোগ শান্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কোথাও পঙ্গুবাত, কোথাও কাসি, কোথাও হাঁপানি, কোথাও অম্লশূল সারিত। নব্য-শিক্ষিত মনে করেন, এ সব অন্ধ-বিশ্বাসের ফল। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, রোগ সারিত। ঠাকুর সত্য সত্য স্বপ্নে দেখা দিতেন। অনেক কবি স্বপ্নাদেশ পাইয়া মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। আমি একটুও অবিশ্বাস করি না। কবি অন্য বিষয়ে কবিত্ব চালাইলেও ভক্তির ও ভয়ের দেবতার নামে মিথ্যা রটনা করিতে পারিতেন না। ভক্তি না থাকিলে কবিত্ব আসে না, আসরে গান জমে না। নব্য কবির 'প্রেরণা' আসে, পুরাতন কবির স্বপ্নাদেশ আসিত, ইহাতে আশ্চর্য কি ?

আদিম কাল হইতে সভ্য অসভ্য সকল মানবজাতির পুরোহিত আছেন। পুরোহিত জ্ঞানী ও গুণী। পঞ্চম বর্ণের পুরোহিত কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ পণ্ডিত, কেহ স-জাতি বয়োবৃদ্ধ। রামাইর আবির্ভাবকালে পঞ্চম বর্ণের ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ছিলেন না, গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরোহিতের কর্ম করিতেন। রামাই কতকগুলি ধর্মপণ্ডিত দিয়া স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করেন, অসংহত অসংযত জাতিকে মানুষ করেন। কালক্রমে কোন কোন জাতি ব্রাহ্মণ-পুরোহিত পাইল। আচার-ভ্রষ্ট জাতি-চ্যুত ব্রাহ্মণ সুলভ হইলে ধর্মপণ্ডিতের প্রয়োজন চলিয়া গেল। 'পণ্ডিত' বংশগত হইয়া পড়িয়াছিল, অনেক পণ্ডিতবংশ লুপ্তও হইয়াছিল। এখনও একই জাতির কোথাও ব্রাহ্মণ, কোথাও পণ্ডিত, পুরোহিতের কর্ম করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পাইলে তাঁহার দ্বারা কালীপূজা, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা করাইতেছে, সে জাতির গৌরব বোধ জাগিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের মান লঘু হইতেছে। এই সকল ব্রাহ্মণের কেহ 'ঠাকুর', কেহ 'শর্মা', কেহ 'চক্রবর্তী', কেহ 'বাঁড়ুজ্যা'। বৈষ্টমও কোন কোন জাতির পুরোহিত হইয়াছেন। 'ঠাকুর' ও বৈষ্টম পুরোহিত, 'গোসাঞি' নামে খ্যাত। বাউরী জাতির পুরোহিত প্রায়ই সজাতি, কদাচিৎ বৈষ্টম। সাঁওতাল জাতি বৈষ্টমও পায় নাই। যে কারণেই হউক, এই সকল জাতি-ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের কি উপকার করিতেছেন, তাহার বিনিময়ে কি পাইয়াছেন, তাহা ভাবিলে চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। জাতিরা গৌরবান্বিত, কিন্তু তাহাদের রক্ষক ব্রাহ্মণ চোরের মতন কালাতিপাত করিতেছেন।

পরিশিষ্ট

(ক)

শূন্যপুরাণের দেশ ও কাল

শূন্যপুরাণ সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহাতে নানা কবির রচনা আছে। পাটায় যেমন বাঁধা ছিল, বোধ হয়, তেমন ছাপা হইয়াছে, কোন পদ্ধতি নাই। পদ্যগুলি ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমে অঙ্কিত করিয়া গেলে ৬০টি পদ্য পাই। চারুবাবু "সৃষ্টিপত্তনে"র চারিটিকে একটি এবং "মুক্তি মঙ্গলা"র দুইটিকে একটি ধরিয়া ৫৫টি গণিয়াছেন। একটু অসুবিধা হইলেও ৬০টি অঙ্ক দিয়া এই মন্তব্য পড়িতে হইবে।

প্রথমে লক্ষ্য হইবে ১—৩৫ এবং ৪৪—৬০ পর্য্যন্ত পদ্যের শেষে অমুক "সমাপ্ত" লেখা আছে। এটি অনুলিপি-কারকের। তথাপি বুঝিতেছি, অন্ততঃ দুইজনের লিপি সংগৃহীত হইয়াছে। পুথীর অক্ষর দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত।

এক এক কবির এক এক ভণিতা। তদনুসারে ভাগ করিলে

ক কবির ভণিতা

ভকত নাএকে ধর্ম্ম চিন্তিব কল্লান॥ পদ্যাঙ্ক—৭, ৯, ২১, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৮, ৩৯ ৪৮, ৪৯।

খ কবির ভণিতা

ভকতর বিপ্নি কর নাস॥ পদ্যাঙ্ক—৮, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫৫, ৫৬।

গ কবির ভণিতা

শ্রীধর্ম্ম চরণ গুণে, শ্রীযুত রামাই ভনে হউ কবি অনাদ্যর দাস॥

পদ্যাঙ্ক—১৭, ২০, ২২, ২৩, ৪১।

ঘ কবির ভণিতা

কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনর পাএ॥ পদ্যাঙ্ক—১৩, ১৬, ১৮, ২৪।

ঙ কবির ভণিতা

গাইল (রচিল) রামাই পণ্ডিত॥ পদ্যাঙ্ক—১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি।

অবশিষ্ট পদ্যের ভণিতা নানাবিধ।

পদ্যগুলি পুনঃ পুনঃ গীত হওয়াতে মূল ভাষা কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। উহাদের বর্তমান রূপ না দেখিয়া প্রাচীন রূপ দেখিতে হইবে। অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু, ঙ, ঞ, লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'হউ কবি', ছিল 'হঙ কবি'; 'দিলান' ছিল 'দিলাঞ', ইত্যাদি। 'কেওদা' নিশ্চয় 'কেঁওদা' ছিল; 'টুই', 'টুঁই' ছিল; 'ডাড়ুকা', 'ডাঁড়ুকা'। বহু বিস্তীর্ণ দেশে ধর্মপূজা চলিয়াছে। উত্তরে অজয়ের উত্তরাংশ, পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে দামোদর, পশ্চিমে কাঁসাই, অর্থাৎ হাওড়া, শ্রীরামপুর অঞ্চল ব্যতীত রাঢ় দেশ, বিশেষতঃ দ্বারকেশ্বর বেষ্টনের মধ্যে অসংখ্য ধর্মরাজ আছেন। তদন্তর দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের মধ্যবর্তী দেশে। পূর্বদিকে বর্দ্ধমান

জেলার বাঘনা-পাড়ার ধর্মরাজ যেমন-তেমন নহেন। পশ্চিমদিকে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলা দেশে যেমন রাইপুর হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে মঠগোদা গ্রামের ধর্মরাজের দ্বারে মাঘমাসের প্রতি শনিবারে অগণ্য ব্রতী সমাগত হয়। এই স্থানের পঁড়িত, জাতিতে কেঅট। কোথায় কত থানের "পণ্ডিত পদ্ধতি" কি আকার পাইয়াছে, কোন বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয় নাই। আমরা ধ-পূ-বিধান ও শূন্যপুরাণ পাইয়া মনে করিতেছি, সব জানিয়াছি। মোটের উপর বলিতে পারি, ধ-পূ-বিধানে ইন্দাসের দিকের, শূন্যপুরাণে ইন্দাস ও গোঘাট দিকের পদ্য পাইতেছি। বোধ হয়, মূল ইন্দাসের ছিল, পরে দক্ষিণে গিয়া ভাষার রূপান্তর হইয়াছে মাত্র। আমি পদ্য বলিতেছি, ননীগোপালবাবু রামাইর ছড়া বলিয়াছেন। কিন্তু অল্প পদ্যেই ছড়ার লক্ষণ আছে। শূন্যপুরাণের দুই তিনটা পদ্যে বিষ্ণুপুরের ভাখা পাইতেছি। বহু কালাবধি এই ভাখা অধিক পরিবর্তিত হয় নাই। অতএব যদি ইন্দাসের দিকের কিম্বা গোঘাটের দিকের ভাষায় ক্রিয়া পদের 'অন্তি', ষষ্ঠীর 'কর' বিভক্তি পাই, তাহা হইলে বুঝি সে ভাষা অতি প্রাচীন। কত প্রাচীন, তাহা বলিবার উপায় নাই। দুই শত বৎসরের কমে বিভক্তি পরিবর্তিত হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রথম কাল ১৩শ—১৪শ, দ্বিতীয় কাল ১৫শ—১৬শ, তৃতীয় কাল ১৭শ—১৮শ খ্রীষ্ট-শতাব্দ ধরা চলে। প্রথম কাল অনির্দিষ্ট রহিবে। কখন কখনও পরবর্তী কবি পূর্ববর্তী কবির ভণিতা লইয়া থাকেন, যেমন ৮৮ পৃষ্ঠে। তথাপি ক ও ঙ কবির কাল ১ম, গ কবির ২য়, খ ঘ কবির ৩য় মনে হয়।

(খ) গোসাঞি পণ্ডিতের কাল।

উক্ত তিন কালের কোন্ কালে গোসাঞি পণ্ডিত ধর্মের গানে প্রবেশ করিয়াছিলেন? ১১শ পদ্যের শেষাংশ পরে যোজিত। ১৪শ পদ্যে কি 'বাটী' লইতে হইবে, কবি জানিতেন না, কিম্বা পাঠে ভুল আছে। ১৫শ, ১৬শ পদ্য ৩য় কালের, ২০শ পদ্য ২য় কালের। ২৫শ পদ্যের ভণিতা নাই, কিন্তু কাল ৩য়। ৩০শ পদ্যের ভণিতা ক কবির হইলেও ভাষা ৩য় কালের। ৩১শ পদ্যটি ১ম কালে পড়িতেছে। ৫৭ম পদ্যে গোসাঞি, গুরু হইয়াছেন, ভাষা ৩য় কালের। স্থূলতঃ দেখা যাইতেছে, গোসাঞি পণ্ডিত ২য় কালে (১৫শ—১৬শ শতাব্দে) প্রথম প্রবেশ করিয়াছেন। অন্যদিকে এই কালের ও পরবর্তী কালের অনেক পদ্যে যোগ্য স্থান থাকিতেও স্থান পান নাই। ইহাতে বোধ হয়, তাঁহার নাম ও মান দেশবিশেষে আবদ্ধ ছিল। দূর দূরান্তরের ধর্মপূজা-পদ্ধতি ও ধর্মের গান না পাইলে ঠিক বলিবার উপায় নাই।

টীকা

[চারুবাবু টীকা করিয়াছেন। যেখানে আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, সেখানে নূতন করিতেছি। দুই চারি স্থানে কিছুই করিলাম না। চঃ চলিত, অচঃ অচলিত, *—* = শুদ্ধপাঠ, বিলুপ = অতিরিক্ত ভুল শব্দ]

(৩য় পৃষ্ঠা) ধুন্ধুকার—অন্ধকার নয়, ধুন্ধুকার। গ্রীষ্মকালে এক একদিন এমন ধুন্ধু হয় যে, একটু দূরের গাছপালা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঁকুড়ায় বলে, ধুন্ধু; হুগলী জেলায় বলে 'রণকোয়াসা', রণক্ষেত্রে উত্থিত ধূলিপটল দ্বারা বায়ুর সমলতা। সংস্কৃতে, আবহের রজঃ

(haze)। হরিবংশ-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ধুন্ধু বধ করিয়া ধুন্ধুমার নাম পাইয়াছিলেন। সে ধুন্ধু রাজপুতনার মরুদেশের সূক্ষ্ম রজঃ।

(৪) বিম্বুপাত—বিন্দুপাত। পরে 'বিম্বু'—বিম্ব। স° বিম্ব মণ্ডল, ইহা হইতে গোলাকার দ্রব্য। যেমন জলবিম্ব।

(৮) চৌদ্দজুগ—চৌদ্দযুগ নাই। চৌদ্দ 'মনু' অর্থে। চৌদ্দমনুকালে ব্রহ্মার একদিন।

(১৩) হিরে জনম কড়ি—যে কড়ির, কুণ্ডলের, জন্ম নির্মাণ হীরাতে।

(১৫) বীরপাক—পুচ্ছের দীর্ঘপক্ষ।

(১৭) বারমতি—প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। ইহার প্রকৃতি ৬৫ পৃষ্ঠে "ঘর দেখা" পদ্যে প্রকাশিত।

(২৫) নঅদীব—নবদ্বীপ। এখানে ত্রিকোণ ভারতবর্ষ বসুমতী। ভারতবর্ষ নবদ্বীপ বা নবখণ্ড।

(২৬) তিনকোন পৃথিবী—তেকোণা মেদিনী, ভারতবর্ষ।

(৩৫) পহড়া—পহলা, প্রথম। ল স্থানে ড়, যেমন ষোল—সোড় (২১৪)।

(৪২) তার—(ভুলে অতিরিক্ত শব্দ, বিলুপ)।

(৪৩) বসুআ—বসুধা।

(৪৪) গাজন—স° গর্জন কোপে। সন্ন্যাসীর মেলি। সন্ন্যাসী কেন কুপিত হন? অ-ভক্ত দেখিয়া? স° গঞ্জ, বা° গাঁজ হইতেও পারে। 'লোকের 'গাঁজ', নিবিড় জনতা। গঞ্জন, গাজন। প্রয়োগ,—'গাজন আসে,' সন্ন্যাসীর দল আসে॥ পাতি—পাতিআ, পত্রনির্মিত পাত্র।

(৪৫) ঢোলসমুদ্র—দীর্ঘ ঢোলের আকারের জলরাশি। কারণ ইহার উৎপত্তি দ্রোণীতে। এখানে বিষ্ণুপুর হইতে তিন মাইল পূর্ব-দক্ষিণের "ঢোল সমুদ্র"। এখন এটি তিন খণ্ড; জুড়িলে দুই মাইল লম্বা, আধ মাইল চওড়া হইবে॥ আসিন্যা—আসনী, চৌকী॥ সারিন্যা ধর্ম্মকিন্যা—* সারিলা * ধর্মকন্যা, সারি দিলা।

(৪৮) তিন খুরি—খুরি, ক্ষুরাকার ক্ষুদ্র-পাদ। চন্দন-পীড়ী তিন-খুরী। চারি খুরী করিলে নড়িতে থাকে॥ সারিআ—সমাপ্ত করিয়া।

(৪৯) চন্দন খুরিতে—চন্দন*ঘুরিতে*। ওড়িয়া ঘুরি ঘর্ষণ করি।

(৫০) ষোল সান্তি—১৬ শান্তি, আধার; ৯ লন্ধক [জৈনদের]; ৭২ কোষ্ঠ, নাড়ীর স্থান। "ষোগের"। কিন্তু লন্ধক কেন? নিয়ম—ব্রত।

(৫১) সুকুল বস্ত্র—শুক্ল বস্ত্র॥ ইন্দুমনরুচি—ইন্দু সোম; যিনি মনের অধিকারী (যোগে), তাঁহার রুচিকর।

(৫২) কুণ্ড—নরককুণ্ড ৮৪।

(৫৩) বড়ু—স° বটু, দেবপূজাহারী॥ মানাইব—মানাইবে, সাজিবে॥ মালঞ্চ—বোধ হয় স° মালকং (মাল্য)। মালকং—মালংক, মালঞ্চ। মালঞ্চর বাড়ি—পুষ্প-বাটিকা। এখন মালঞ্চ পুষ্পবাটিকা।

(৫৪) জাএসি—জাএ সে॥ কোঙর—কুমার, বটু॥ নাপালি—নেপালী (নবমালিকা)॥ কালা কাসন্দা—কালকাসন্দা। দেব পূজায় এই বন্য ফুল লাগিতে দেখিনা॥ লবঙ্গলতা—

পশ্চিমরাঢ়ে দেখিতে পাই না। বোধ হয় আর কোন ফুল ॥ কনক—কনক চাঁপা ॥ ওড়িয়াতে, কিআ কেতকী, পুং স্ত্রীভেদে দুই জাত। বাঁকুড়াতে কিআ।

(৫৫) সহিতর—সহিত-এর। সহিত, সমভিব্যাহৃত, সংযাত্রী, সেথো ॥ আগে করে—বিলুপ 'আগে' ॥ কণ্ডল—কমল।

(৫৬) বেলাল সিকড়—*বেণার* শিকড়। । বেণামূল ঘষিয়া চন্দন বানায় ॥ তোআল—তমাল ॥ পিআল—পিয়াল। সাইল—সাল। আকড়—দুই আঁকড়, আক্রোড়।

(৫৭) গোঁড়চি ভোঁচা ? বোধ হয় তুলসীবর্গের বন্য গাছে (অচঃ) ॥ আকড়া—অক্ষোট ॥ নিঅলি—নেআলী, নেপালী ॥ রূপর মুরলী—রূপের মূর্তি ॥ জটা—শিবজটা পুষ্প ॥ কুঙর—কুমার, বটু।

(৫৮) তেজিআ—*ভেজিয়া*।

(৫৯) আমলা—আমলকী ॥ বীর—*বড়*।

(৬০) চিন্তিয়ে—*চিন্তিব* ॥ এই পদ্যে দুই কবির রচনা স্পষ্ট।

(৬১) ভরএ নবাহুতি ঘর—যে ঘরে নূতন আহুতি করা হইয়াছে, সে ঘর ভরে, দেবপ্রতিমাদ্বারা।

(৬২) নিবারণ—সং বারণ রোধ, নিবারণ অরোধ ॥ ভেটি—ভেটিব ॥ দুআর মুক্ত—দ্বার মার্জনা ॥ ঝাঁটী—ঝাঁটাইয়া ॥ মদনা জুবতী = মদনাবতী।

(৬৫) সহিত গমনে—ধর্মের গাজন 'সহিত' সংযাত্রীর গমনে (সঙ্গে) গমন করিল।

(৬৬) আলম্ব—সং যাহা লম্বিত হইয়াছে, পতাকা ॥ বনমালা—উৎসবে মণ্ডপের দ্বারে দ্বারে লম্বিত পত্রপুষ্পমাল্য (festoon)। (বাঁকুড়ায় চঃ)

(৭০) কূর্ম্মরাজ—স্বরূপ-নারায়ণ বিগ্রহের বর্ণনা।

(৭১) নীলাই রেত—রেত ঋতু (আর্তব শোণিত) কৃষ্ণবর্ণ। "শ্বেতং ন পীতং রক্তং ন রেতং"—ধ-পু-বি (৭৭)।

(৭২) পরসনে—*দরশনে* ॥ সেইত—শ্বেত।

(৭৬) চনা—সং চণক, ছোলা কলাই। ধর্মপূজায় চাউলের নৈবদ্য পরিবর্তে চাল-ভাজা, চিড়া, ছোলা ও মটর ভাজা ইত্যাদি দেওয়া হয় ॥ দণ্ডর নন্দন—রাজদণ্ড, দণ্ডীর পুত্র, অর্থাৎ রাজা, এখানে যিনি দানপতি ॥ চনার বিবেচনা—চণার বিচার করিল না। পাবন—উৎসর্গ।

(৭৮) আম্বর জাঙ্গাল—আম্রের জাঙ্গাল হইতে পারে না। নিশ্চয় কোন খণিজ দ্রব্য। অভ্র পিঙ্গল-বর্ণ হয়। আম্বর—অভ্রর, প্রাং-বাং আব্বর।

(৮০) নিয়ম ভাঙ্গা—নিয়ম 'ব্রত' উদ্‌যাপন। শনিবারে দুগ্ধ দিয়া ধর্মপূজার পর সে দুগ্ধ পান দ্বারা ব্রত শেষ।

(৮১) দিবার নিঅম—দিবাভাগে নীর ও ক্ষীর পান, দেবী রাত্রি ভাগে প্রীতি বাটী, ঘৃত। দেব শব্দ দিবা হইতে পারে না। বাটিলেই করে—বাটি লইয়া করে ॥ কনসদাশিব—*কলুস নাসিব* ॥ স্মৃত (বিলুপ)।

(৮২) জগানে—*যাগালে*, যোগালে ॥ পিরীত বাটী—প্রীতি, স্নেহ। গব্যঘৃত শ্রেষ্ঠ স্নেহ। ঘৃত বাটী। (ধ-পূ-বি, ১৮৫)।

(৮৩) গতি নিতি নিলা—বোধ হয়, 'গতি নিলা জগালে নিতিবাটী'। নিতি—নিত্য, অর্থাৎ কাম্য নয়। নিত্য যে দ্রব্য দেওয়া হয়, বোধ হয় দুগ্ধ। ওড়িয়া নিত্যানি, দুগ্ধ, নিত্য পানীয়।

(৮৪) হোম—এই হোম তাম্রদীক্ষার সময়ের। ব্রাহ্মণের যেমন উপনয়নের সময় হোম করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ, ধর্মপণ্ডিতেরও তেমন অনুষ্ঠান। প্রভেদ, পইতা পরিবর্তে তামার অঙ্গুরী ধারণ। "পণ্ডিত-পদ্ধতি" গ্রন্থ অনুসন্ধান কর্তব্য।

(৮৬) টীকা প্রতিষ্ঠা—এই টীকা তাম্রদীক্ষা কালের। তখন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। ধর্মপূজার সময়ে তিলক ধারণ, টীকাপাবন ॥ পাটসাল—*নাট সাল*।

(৮৯) খেড়—খড়। আশ্চর্য। খেড় শব্দ রাঢ়ে অজ্ঞাত, কখন কখনও মুসলমানে বলে, ইন্দাসের দিকে। "কৃষ্ণকীর্তনে"ও 'খেড়' আছে। ইহা আরও আশ্চর্য। পুর্বকালে ধর্মমন্দিরের কাঁথ ইট পাথরের হইলেও চাল খড়ের হইত।

(৯০) হনুমান রাক্ষসে—হনুমান ও রাক্ষস পরস্পর শত্রু হইলেও।

(৯২) স্থকল—শুক্ল ॥ সজর—সজ্জার, উপকরণের ॥ দুত—যমকিঙ্কর, সে কিঙ্কর হিন্দুর প্রেত ॥ লোব—লোভ, টাকার লোভ ॥ তোপ—*তোক*, শিকল। ডাডুকা—ডাঁড়ুকা, দণ্ডিকা, লোহার বেড়ী ॥ ভেজাএ—ভেদিয়ে। দস্থানে জ ॥ উথল—উঠিল।

(৯০) জন্ম—জঙ্ঘা। এক জাং জল।

(৯৬) ডকবুস—ডাঙ্গশ ॥ ধূনাচুর—ধুনাচুর্ণ পোড়াইবার সদণ্ডপাত্র (চঃ)।

(৯৭) জীবনাস চূড়—জীব-নাশ শূল।

(৯৮) ঘড়াটি ঘড়াটি—ঘোড়া ঘোড়া, পরে পরে অশ্ব ॥ ইঅর ভরিব—এ*ঘর* ভরিব।

(১০১) বৈতরণীকে কবি এক দীঘি কল্পনা করিয়াছেন। বৈন্যার হঅ না হারে—'বন্যার হঅন' হইতে পারে না। বৈতরণী জলে "বন্যা হয় নেহারে"? বসন্ত—বসন্ত-দূত, আম্র।

(১০৩) কেরআল—সং করবাল, আকার-সাদৃশ্যে ॥ ডুআরি—দোআরি, মাঝীর দোআর ॥ ওরে—পারে, আড়ায় ॥ নাউড়ে—নাঅড়িয়া, নৌকাবাহক। (নাউড়ে চঃ)

(১০৪) আনাম—অর্থ, তরঙ্গ। কেমনে? পতাকা যেমন তরঙ্গাকারে দুলিতে থাকে ॥ *সেইত দীব—শ্বেতদ্বীপ, গোলোক। বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে নারায়ণের ধাম।*

(১০৫) *ডুআরিখা—দ্বারিকা। কবির বিশ্বাস দ্বারকার পরেই বৈতরণী। এই দ্বারকা* বিষ্ণুপুরে, বৈতরণী দ্বারকেশ্বর ॥ সআগে—সর্বাগ্রে।

(১০৬) চানক—চন্দ্রাকার মণ্ডপ (চঃ) ॥ মানিক ভাণ্ডার—ধন ভাণ্ডার ॥ বাঅতি পাথর—কবিকঙ্কণে 'বায়টী'। সংবজ্রপট্ট, বজ্রবৎ দৃঢ় পাথর। সেকালে খিলান ছিলনা; দ্বারের উপরে বায়টির ঝনকাঠ (lintel) করা হইত ॥ কন বলিয়ে—কোণ বুলিয়ে। বাঁকুড়া হইতে মেদিনীপুর অঞ্চলের ভাষায় 'ও' স্থানে 'অ' হয়। কোণ—কন, কোটাল—কটাল, শোভা—সভা, যোগান—যগান ॥ কামিনা—অধুনা অচঃ। কিন্তু কামিনী কামিন্ চ ॥ পাছভর—পেছুদিকে ভর পা রাখিল, অর্থাৎ নামিল। চাল হইতে নামিতে হইলে পেছু হইয়া নামিতে হয়।

(১০৭) আড়া—আড়দিকে যে কাঠ বসে॥ পানের স্তম্ব—*সালের* স্তম্ভ। কিম্বা কাঠের যে স্তম্ভে, খুঁটিতে পান খোদা হইয়াছে॥ নাদন—লাদনা, সরদল॥ সাড়কে লাগিল জান—*সাঁড়কে লাগিল গজাল*॥ বেরাল পাট—কলিকাতা অঞ্চলে নাম মেস্তা-পাট। (যোগেশ কোষ পশ্য)। শুষ্ক নীরস ভূমিতে এই পাটের চাষ হয়। সে ভূমিতে নালিচা বা নালিতা পাটের চাষ হইতে পারে না। শ্বেত-বিড়াল-লোম-সদৃশ উজ্জ্বল বলিয়া বেরালপাট নাম॥ বাছান—বিছনি, চালের নীচে আবরণ (ceiling)। দেশে কি বাঁশ ছিল না? গুআর বাখারি করিতে হইয়াছিল? কিম্বা যেমন রূপার বাখারি। গোটি—*গাটী* গাঁইঠ।

(১০৮) পাটে—পাটদোড়ীতে॥ পিড়াঅ—পিঁড়ায়॥ টুঁই—মটকা।

(১০৯) খেনে—এক্ষণে॥ হাতী মাড়মর পটা—মাড়ম, সাঁওতালী মরম্। বাঁকুড়ায় মর্গড়ি, ওড়িয়া মাকড়া, সং মর্কট (laterite)। মর্কট-মুখ তুল্য লাল বলিয়া॥ পটা—পাটা (slab), ওড়িয়া পটা। হাতী মাড়মর—হস্তীপৃষ্ঠ-তুল্য চাঙ্গড়া অর্থাৎ দৃঢ় মাড়ম পাথরের। বীরভূম হইতে ওড়িষ্যা পর্য্যন্ত এই পাথর অপর্য্যাপ্ত॥ কাটডাল—যষ্টিদ্বারা আঘাত করিলে শুখ্না কাঠের মতন ঠন্‌ঠন শব্দ হয়, যেন শুখ্না কাঠ বা ডাল।

(১১০) সাতডকে—*সাড়কে*, সাঁড়কে গজাল॥ ইলামণ্ডপে,—ইলা, (সরস্বতীর) পূজার মণ্ডপে॥ গোড়ি—গোড়, ছাঅনির স্তর।

(১১১) আনাম—সং আলম্ব, ধ্বজা॥ ভাস্‌স—ভাষ্য, ব্যবস্থা (চঃ)।

(১১২) বাদলমালা—*বনমালা*।

(১১৩) দুইভিতে—চারিভিতে? হেমগিরি—হিমালয়, এই অধিবাস পার্বতির বিবাহের অনুকরণে।

(১১৪) মনুই—মনহি, মনই, মনুই ঘৃত দুগ্ধ খণ্ড আতপ তণ্ডুল পাক করিয়া পরমান্ন। ধর্মের গাজনে পাকা মনুই হইত না, ঘৃত দুগ্ধ খণ্ড আতপ তণ্ডুল রম্ভা নারিকেল-কোরা মিশ্রিত করিয়া মনুই হইত। আমরা 'নবান্ন করি', নবান্ন ভোজন করি, সে নবান্ন এইরূপ। ওড়িষ্যার রাজারাও মণোহি, মণোহি করেন, সে মণোহি পক্কান্ন, রাজভোগ। ঋগ্‌বেদে সং মন্থ, এইরূপ। কিন্তু তণ্ডুল স্থানে শক্তু। তুলং হরিমন্থ, হরি অশ্বের মন্থ ভোজ্য চণক। মন্থ, মন্থি শব্দ হইতে মন্‌হি, মনই॥ গাজনে বেড়া মনুই—বাস্তবিক বাড়া মনুই—যে মনুই দানপতি বা দেউল্যা ব্যতীত ভক্তেরা দেয়॥ নারাঅন তৈল—বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত নারায়ণ তৈল। মনুই করিয়া—মনুই ভোজন করিয়া॥

(১২১) আনামতে—আনাম-তে। আনাম, সং আলম্ব। আলম্বে পতাকা উড়ে। ইহা হইতে আনাম বাতাস বোধ হয়।

(১২৩) হানা—সং সন্নাহ, বর্ম। অশ্বের সন্নাহ দুই পৃষ্ঠে একটা॥ তিটকি, আটকি (১৬২)—পায়ের ও মাথার। ঋগ্‌বেদে অংক বক্ষঃবর্ম। সানা স্থানে হানা॥ হানা এত দৃঢ় যে বার বৎসরেও নূতন করাইতে হয় নাই। হানা ধাতুনির্মিত, অগ্নি-তুল্য দীপ্তিশালী॥ টনা—টানা, বল্‌গা।

(১২৪) কানি নাধুনি—কর্ণ ও স্কন্ধ॥ নিছনি—অশ্বদেহের মাল্য॥ বাগে, বেগে (১৬১)—বেগে, ঘাড়ে। ওড়িয়া বেক—ঘাড়।

(১২৫) স্থতি—১৬২ পৃঃ 'স্থিতি'।

(১২৬) ধামাৎকন্নি—ধামাধিকরণিক। কর্ম, মন্নুই পাক। ধ্মাত-করণিক ? সাংস্থর ভক্ত্যা—সর্বেশাং অংশুর (ধ-পু-বি), সকল দেবতার প্রভার, ধর্মরাজ ব্যতীত অন্যান্য দেবের ভক্ত্যা॥ কোমি—গ্রাম কায়স্থ ? সং গোমিন্ (গোপ) ভুরিগ্রামাধিকৃত॥ পরে—*পাবে*।

(১৩৩) রসদীপ—কর্পূরদ্বীপ। তুং রস—ধুনা (১৩৪)।

(১৩৪) সুন্নযুগে—শূন্যযুগ। যে যুগের অঙ্ক নাই, পূর্ববর্তী যুগ, কলিযুগ।

(১৩৫) তেনা মন্নুই—কেসুর পানিফলাদি উপকরণের মন্নুই। অর্থাৎ ফলাহার। তেনা —সং তেমন. ওড়িয়া তেউণ. বোধ হয়॥ অমৃত গুটীকা—লোচনদাসের চৈতন্যভাগবতে দ্রষ্টব্য।

(১৩৬) ডালিম্ব—ডালিম্ব-পুষ্প-বর্ণ পট্টবস্ত্র।

(১৩৭) কেন হাতপা—'যেন' ?

(১৩৯) মুক্তাহার নামক ধানের চাষ এখনও হয়॥ তেঠেঙ্গা—ঢেঁকির তিন ঠেং। দুই পোয়া ও এক মুসলী। অতিবৃদ্ধ নারদমুনি সমুখে নুইয়া দণ্ডে ভর দিয়া চলিতেন, যেন তেঠেঙ্গা ঢেঁকি চলিতেছে। এই সাদৃশ্যে তাঁহার ঢেঁকি বাহন কল্পনা। ঢেঁকির সং নাম 'কুট্টক' (কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে")। এক টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'উষ্ট্রগ্রীবা সদৃশ যন্ত্র"। উষ্ট্রের মুখ ঢেঁকির মুসলী। যখন ঢেঁকি চলে, তখন মেক-মেক শব্দ হয়, "ভেকর সঙ্গীত গাঅ"। নারদমুনিই ঢেঁকি॥ উড়িল—উরিল।

(১৪০) দখিন পদে পার—ঢেঁকিতে দক্ষিণ পদপ্রহার।

(১৪১) গাম্ভারী মঙ্গলা—ইন্দ্রধ্বজের অনুকরণ। চেদি দেশের রাজা উপরিচরবসু ইন্দ্রধ্বজোত্তলন উৎসব প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। যথাকালে বর্ষা আসিতেছে কি না, ইহা ধ্বজে লম্বিত পতাকার দিক্ দেখিয়া অনুমিত হইত। শ্রাবণ দ্বাদশীতে এই উৎসব সম্পূর্ণ হইত। ধ্বজবৃক্ষ কর্তিত হইয়া ঈশান কোণে পতিত হইলে শুভ। কারণ সে সময়ে সে দেশে আরব সাগর হইতে বর্ষা বায়ু বহিত। (উপরিচরবসু মহাভারতে আদিপর্বে বরাহের বৃহৎ সংহিতা,ও অগ্নিপুরাণ পশ্য)। মল্লভূমে ইন্দ্রধ্বজ শক্রোত্থান রোপণ এখনও করা হয়। শিবের গাজনে গাম্ভারী বৃক্ষ ছেদন এক অত্যাবশ্যক কর্ম। কিন্তু গ্রামে এই বৃক্ষ সুলভ নয়। এই হেতু ডাল কাটা হয়। ইহার পাটায় 'শাল' (শূল) বিদ্ধ করিয়া মূল-সন্ন্যাসী তাহাতে শয়ন করেন। ইহার অনুকরণে ধর্মগাজনে গাম্ভারী মঙ্গলা। শূলে শয়নে বিপদ হইতে পারে। তাহা নিবারণ আশায় মঙ্গলা।

(১৪৩) ভক্তার প্রধান—মূলভক্ত্যা, যিনি শালে ভর দেন॥ পাড়ল পূর্বমুখে—পশ্চিমে বাতাস বহিলে পূর্বমুখে পড়িবে। শূন্যপুরাণের দেশে চৈত্রমাস বলা যাইতে পারে।

(১৪৮) জটার কুলে—নদীর জটা-স্বরূপ শাখানদী। (প্রবন্ধ পশ্য)।

(১৪৯) চাম্পান দিব ঘাট—*চাম্পা নদীর ঘাট*। চম্পানদী দ্বারকেশ্বর।

(১৫১) ভারতী—কাবুল দেশের এক নদীর নাম (পুরাণে)। বোধ হয় ভারতী ও সরস্বতী ভিন্ন মনে করিয়া।

(১৫২) লাআতে—লইয়া আনিতে॥ ঘটবারি—বাঁকুড়ায় বিশেষ অর্থ পূজার নিমিত্ত বারিপূর্ণ ঘট।

(১৫৩) সিন্ধুজলে সাঁঝা—জলে সাঁঝা হইতে পারে না। "সন্ধ্যাকালে"।

(১৫৫) পাখ—পাখী।

(১৫৬) সেইত—শ্বেত ॥ অমৃতফল—হরীতকী ॥ আগম—অগাধ।

(১৫৭) আরতী—*আত্রেয়ী*।

(১৫৯) পূর্বদিগ মাঝে কনকলঙ্কা—? কবির পূর্বদিকে "বিহার" ছিল। চম্পানদীতে দ্বীপ ছিল। বোধ হয় তাহার উল্লেখ ॥ সছঁল—স-ছাওয়াল, সবৎসা।

(১৬০) ভঁড়ি—ভরি, পা। (বাঁকুড়ায় ভরি চঃ)। সাইনি—সহিস সাদীন্ হইতে ?

(১৬১) নেঞ্জা—নিরঞ্জন ॥ খরসানি—খুরসানি ॥ বেগে—ঘাড়ে। বিথ্ ক মরা চন্তা—চন্তা, কুন্ত। যে কুন্তের বাঁট মরা বৃক্ষের ?

(১৬২) একই আটকি—প্রভুর সানা ও শিরস্ত্রাণ একই, দুইটি যুক্ত। সে সানা দ্বাদশ আদিত্যের অগ্নিকণা বিকীর্ণ করিতেছে ॥ ফোপলা—ফুপি, পাটের পুষ্প ॥ দশগিরিথর—রথ স্তরে স্তরে উঠিয়াছে, যেন গিরির দশটা স্তর ॥ খচরা সমুদ্র—আকাশ সমুদ্র, যেখানে সূর্য ॥ গুটি গুটি—একটি একটি।

(১৬৪) রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বরূপ-নারাণ বিগ্রহের পূজা করিয়াছিলেন। ইহা নানা-স্থানে স্পষ্ট।

(১৭০) জম নিপবর—জম ? যম তুল্য দণ্ডপর ?

(১৭১) মুক্তা—ধর্মের শক্তি। তাঁহার স্নান ও অধিবাস বিবাহের পূর্বে। কূর্মের পৃষ্ঠে স্থাপন দ্বারা বিবাহের অনুকরণ। কেহ পবিত্র বালির, কেহ মুক্তার, কেহ মুক্তাহার তণ্ডুলের মুক্তি-মূর্তি করিত।

(১৭৩) হফসট—বৌবট্। তন্ত্রে হুঁফট্।

(১৭৪) বরাঙ্গ—(মনে পড়িতেছে যেন) ত্রৈলঙ্গী বাদ্য-বিশেষ। ওড়িয়া ভূড়ঙ্গ ॥ বাংতেও ভুরঙ্গবাদ্য ছিল। একমুখ আনদ্ধ বাদ্য। কাঠি দিয়া পিটিয়া চর্ম ঘষা হয়, ভুঁ ভুঁ শব্দ হয় ॥ সুতরাস—সূত্র-সদৃশ।

(১৭৫) কুড়ে—কুড়ে, মাটি কাটে (খোঁড়া নয়)।

(১৭৬) পাটিত বত্তিস—বত্রিশ পাটে। প্রায় ১৬ হাত গভীর ॥ গম্ভীর—গভীর ॥ পুখরের রইঘর সির্বনিম্ন; ইহার উপরে ভাঁড়ার। এইঘরে জাঠি পোতা হয়।

(১৭৭) পাছ বাট—পুখরের দক্ষিণের বাট।

(১৭৮) রুপি বিকল—রুপিআ কদল ?

(১৮০) ফটিকর খান জাটি—সরোবরের মধ্যস্থলে স্ফটিক খণ্ডের জাটি, যষ্টি দণ্ড ॥ ত্রিসংখ—ত্রিশঙ্কু, অতএব ত্রিশূল।

(১৮১) পলাল—প্রবাল। পলা ও প্রবাল ভিন্ন মনে করিয়া।

(১৮২) পুখরী কাঁদাএ—পুখরীর পাড়ের গায়ে।

(১৮৫) তাবর—তা-অ-র, তার ॥ বীচভোজ—বীচ-বোচ, বীজ-টীজ ॥ নদী এ আছেন কূপজল—কূপতুল্য গভীর জল। এ নদী দ্বারকেশ্বর। কিন্তু কবি নদীর ধারের ভূমি লন নাই ॥

কাত্তিকের সোলুণ্ডেতে—কাতিকের যোলঙ-তে ষোল-উঁ, ১৬ই দিবসে; কার্তিক মাসের অর্দ্ধগতে। পাঁচই, সাতই, ইত্যাদির ই পঞ্চমী, সপ্তমী-র মী। সাদৃশ্যে পনরই, ষোলই। ই বানান ঠিক॥ বাতাস মণ্ডল জাঁতা—বহু বায়ুপূর্ণ জাঁতা, ভস্ত্রা॥ তা তা—*তা তা করিয়া মহাডাক ছাড়িল*। তা তা—জাঁতা চালনা দ্বারা তপ্ত কর, কর॥ ভীম খেত্তি—ভীম ক্ষত্রিয়॥ খালি জোলি—খাল ও জোল। খাল চওড়া, জোল সরু। কামরূপের ১২শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের ধর্মপাল রাজার তাম্রশাসনে জোলি শব্দ আছে। লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসনেও আছে। জোল, জুলী, জোড়, জুড়ী শব্দ বহুপ্রচলিত। পরিবর্তে অন্য নামও নাই। জোড় হুগলী জেলায় ঝোড়, যেমন ঝোড় জঙ্গল। এই ঝোড় সং ঝর।

(১৮৯) মুড়াগিরি—মেরুগিরি। এই গিরি উচ্চতম বিবেচিত হইত॥ পালই—খড়ের গাদা॥ হিঙ্গুলা—পীঠের দেবী॥ পটল—মাপ-বিশেষ। এখন রাঢ়ে অজ্ঞাত। নদীয়া মেহেরপুরে চলিত আছে (২০ শলিতে ?)॥ অমর্ত্ত— অমৃত, জল॥ ধানের নামে কতকগুলি এখনও চলিত ধান। যেমন, দুর্গাভোগ, মুক্তাহার, কালা, নাগরা, দুধরাজ ইত্যাদি। কিন্তু সব নাম এক স্থানের নয়। বিষ্ণুপুরের পূর্বাংশ হইতে দক্ষিণে গোঘাট পর্য্যন্ত দেশের ধান।

(১৯৪) আথল পলি—অগাধ পলি, যে পলির নীচে থল পাওয়া যায় না॥ বিড়া—আটি। এখন আটি শব্দ চলিত্।

(১৯৮) নিতগীত—নৃত্যগীত।

(২২১) দ্বারিক্যা—দ্বারিকা পুরীর পরেই বৈতরণী কল্পিত। (১০৫ পৃষ্ঠা)॥ করিল সয়াল—করিল শিয়লি, হাত দিয়া পদদ্বয় শৃঙ্খল বেষ্টন করিল।

(২১৩) মনঞি করিয়া—মনই ভোজন করিয়া শয়নে অগ্রসর।

(২১৪) এখানে নিরঞ্জন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এক হইয়া গিয়াছেন। শিব শক্তির আবির্ভাব চিন্তনীয়, কিন্তু কুত্রাপি রাধাকৃষ্ণ ভাব নাই॥ বাছা—বাঞ্ছা॥

(২১৯) রেএটি পাথর—বেল্যে পাথর। বায়টি পাথর = রায়টি পাথর ? সং রাজপট্ট॥ পিড়া সভারস— পিঁড়ার শোভা-সৌন্দর্য।

(২২০) তালের কাণ্ডারি—তালের কাণ্ডাড়ি (কাঁড়ি)। বর্দ্ধমানের ভাখায় ড় স্থানে র॥ ত্রিসংখ হাটক—হাটক স্বর্ণনির্ম্মিত ত্রিশঙ্কু, ত্রিশূল॥ অন্যান্য অস্তিক্ষ—অন্যান্য অন্তরীক্ষ, অন্যের অগোচরে।

(২২১) সিন্ধুবল—*সিন্ধুজল*।

(২২২) রাই— আয়ী, র আগম। রাজ্ঞী শব্দ হইতে রাণী হয়, রাই হইতে পারে না। লক্ষ্মী কদাপি রাণীও ছিলেন না॥ আতকাজে—অন্ত ; নীচকাজে॥ যার নর—পুরুষ স্বামী বিষ্ণু, লোকের খাদ্য যোগাইতে খাটিতেছেন॥ সরস্বতী কুআলিনী—কু-পালিনী, ভরণ পোষণ করিতে পারেন না॥ অর্চ্ছব—*উর্চ্ছব*। (পূজা-) উৎসব॥ সরস্বতী শুচি ধ্রুবা-রূপা ব্রহ্মাণী, গায়ত্রী। রম্ভা ও উষা-রূপা কামদা, ও কুতত্ত্বজ্ঞানী, কুমতি। কবি যজ্ঞের নিমিত্ত—পূজা কিম্বা অন্যকৃত্য শেষে—ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইতে রন্ধনী অন্বেষণ করিতেছেন। দুর্গা রন্ধনী হইতে পারেন না। কারণ তিনি কালরূপা, সর্ব্বদা ভক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার হাত উচ্ছিষ্ট। মুণ্ডমালা হেতু তাঁহার দেহ অশুচি। তাঁহার স্বভাবও ভাল নয়। তিনি হাঁক-ডাক করিয়া ডাকাতের মতন রুণ

করেন। লক্ষ্মী চারি যুগের (আয়ী-) বুড়ী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শীলও ভাল নয়, নীচবৃত্তি-কারিকে ধন দেন। তাঁহার 'পুরুষ'টিও তেমনই, জাতি বিচার না করিয়া সকলেরই নিমিত্ত খাটিতেছেন। সরস্বতীর কথা কি বলিব? তিনি কু-পালয়িত্রী। তাঁহার সেবকেরা নির্ধন। তাঁহাকে পূজার ঘটেই দেখিতে পাই। (গায়ত্রী মন্ত্রে)। তিনি একাধারে শুচিস্রুবারূপা ব্রহ্মাণী গায়ত্রী, রম্ভা ও উষা-রূপা কামদা ও কুমতি। তিনি রতিরূপা, যে দিকে চান, সে দিকের লোক মোহ প্রাপ্ত হয়। এমন কি সুরপতিও জ্ঞান হারাইয়া বসেন (অহল্যার উপাখ্যান)। শূন্যপুরাণের স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে, গীতের উপযোগী মধুর ছন্দও আছে।

(২২৩) সিঙ্গা চরঙ্গি নাথ—*সিদ্ধা* চৌরঙ্গী নাথ ॥ দণ্ড-পানি—সন্ন্যাসী ॥ কিন্নরি—কানুহ পাদ।

(২২৪) যজ্ঞের পাস—যজ্ঞের পায়স, পরমান্ন।

(২২৫) বারগাছি শিমুল…ডাল *তাল*। যেখানে বারটা শিমুল গাছ তেরটা তাল গাছ একত্র জন্মিয়াছে এমন তলা কেন? তামার সহিত রাং সীসা দস্তা লোহা গলাইয়া নানা বর্ণের তাম্র করা যাইতে পারে। এখানে তামার ভাগ অধিক বলিয়া তাম্র বলা হইয়াছে। বৈদ্যশাস্ত্রে তাম্রের নানাবিধ গুণ বর্ণিত আছে।

(২২৬) হুতা—হুতাশ শব্দের শ, হ হইয়া লুপ্ত বর্দ্ধমানে ॥ সাদা মাঠা—সাধিত নির্মিত ও মথিত ঘর্ষিত, কারুকর্মহীন ॥ লোহমোহ—কায় স্থাপন করিয়া জীবিত হয়। ইহাদের বিনাশের নিমিত্ত তাম্র। দেখা যাইতেছে সেতাই শ্বেতবর্ণ, নীলাই নীলবর্ণ, কংসাই কাংস্যবর্ণ এবং রামাই রক্তবর্ণ তাম্র ধারণ করিতেন। সেতাই অঙ্গেতে, নীলাই বাহুতে, কংসাই কানে ধারণ করিতেন।

(২২৭) টাড়বালা অঙ্গুরী—রামাই কানে টাড়, বাহুতে বলয়, করে অঙ্গুরী, তিন ধারণ করিতেন ॥ উড়ন পাড়ন—কাপড় বোনা তাঁতের ওড়ন-পাড়ন; দুইদিকের সূত্র। সেইরূপ তামা, ধর্মের সেবকের সর্ব্বস্ব।

(২৩২) জাজপুর—শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, হুগলি জেলায়। কিন্তু থানা কিম্বা ডাকঘরের নাম করেন নাই। অনুসন্ধান করিতে পারা গেল না। এই গ্রাম কবির পূর্বদিকে অর্থাৎ বর্দ্ধমান ও হুগলির দিকে ছিল। বোধ হয়, বর্তমান নাম দাদপুর। পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ দাদপুর হইতে পারে। মাণিক গাঙ্গুলীর জাজপুরের ঠিকানা পাইলাম না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

"রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী"

(আলোচনা)

গত আশ্বিন মাসের শেষে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের "রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী" শীর্ষক উপাদেয় ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি পড়িয়া অনুসন্ধিৎসু মাত্রেই আহ্লাদিত হইবেন। এই প্রবন্ধে সুশীলবাবু কেবলমাত্র রামনারায়ণের নাট্যগ্রন্থাবলীর পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—প্রসঙ্গক্রমে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি ইতিহাস সম্বন্ধেও অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া বাংলা নাটকের, ইতিহাসকার হিসাবে সুশীলবাবুর প্রতিষ্ঠা সুবিদিত। যে-পত্রিকায় তাঁহার এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে উহাও বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষণামূলক পত্রিকা। সুতরাং তাঁহার এই নূতন প্রবন্ধটি ছাত্র ও গবেষক মাত্রেই যে যত্নের সহিত পড়িবেন তাহা বলাই বাহুল্য, এবং উহা বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি অংশ সম্বন্ধে প্রামাণিক রচনা বলিয়া যে পরিগণিত হইবে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

ঠিক এই কারণেই আবার দুঃসাহস হইলেও তাঁহার প্রবন্ধটি সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম। এক্ষেত্রে সুশীলবাবুর প্রতিষ্ঠা এত বেশী যে পাঠকেরা তাঁহাকে সর্ব্বত্রই নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লইতেই বাধ্য। অথচ গবেষণায় ভুলচুক হওয়া বা অসম্পূর্ণতা থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। সুশীলবাবুর মূল্যবান প্রবন্ধটি গবেষক মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাও একেবারে ত্রুটিবিবর্জ্জিত নহে। রচনাটির স্থানে স্থানে অসঙ্গতি এবং কয়েকটি ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। সুশীলবাবু প্রকৃত গবেষক বলিয়াই সেগুলি তাঁহার নিকট নিবেদন করিতে ভরসা পাইতেছি। আশা করি তিনি আমার এই আলোচনাটিকে ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করিবেন না।

১। প্রথম বাংলা নাটক

প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় পাদটীকায় সুশীলবাবু লিখিয়াছেন :—"নীলমণি পাল-রচিত 'রত্নাবলী নাটিকা' (পত্র-সংখ্যা ২:৬) শ্রীহর্ষের নাটিকা অবলম্বনে গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহার পরিচয়-পত্রে কলিকাতা ১৭৭১ শকাব্দ—এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। যতদূর অনুসন্ধানে জানা যায়, ইহাই প্রথম বাংলা নাটক।"

এতদিন পর্য্যন্ত অনেকেই বলিয়া আসিয়াছেন, ১৮৫২ সালে প্রকাশিত তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন'ই বাঙালী রচিত প্রথম বাংলা নাটক। কিন্তু সুশীলবাবু সম্প্রতি 'ভদ্রার্জুন'-এর তিন বৎসর পূর্ব্বে—১৮৪৯ সালে প্রকাশিত, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী অবলম্বনে নীলমণি পাল কর্ত্তৃক গদ্যে পদ্যে রচিত 'রত্নাবলী নাটিকা'র সন্ধান পাইয়াছেন। সঠিক প্রকাশকাল জানা না থাকিলেও এই নাটকখানির নাম আমাদের নিকট অপরিচিত নহে (বিশ্বকোষ—"নাটক," পৃ. ৭২৯ ; Long's *Descriptive Catalogue* etc., p. 73 দ্রষ্টব্য) এবং ১৮৫২ সালে 'ভদ্রার্জুন' প্রকাশের

পূর্ব্বেও যে অনূদিত বাংলা নাটক ছিল তাহার প্রমাণ আমরা 'ভদ্রার্জুন'-এরই 'বিজ্ঞাপনে' পাই।* কিন্তু ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত নীলমণি পালের 'রত্নাবলী নাটিকা'ই প্রথম বাংলা নাটক কি-না, সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। অন্ততঃ তাহার পূর্ব্বেও যে বাংলা নাটকের অস্তিত্ব ছিল, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পুরাতন বাংলা সমাচারপত্রে পাওয়া যায়।

অনেকে বলিয়া থাকেন, ১৮২১ সালে রচিত 'কলিরাজার যাত্রা'ই প্রথম বাংলা নাটক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সে 'পেণ্টোমাইম' মাত্র তাহা ১৮২২ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' নামক বাংলা সমাচারপত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে ঃ—

"নূতন যাত্রা।—এইক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেক২ প্রকার ছদ্মবেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণববেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র, চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রাম হইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাসদাসী এসকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গভঙ্গ পুরঃসর নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর ধিক্কৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন আশ্চর্য্য২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদুমধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানা দিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক২ বিজ্ঞলোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পারিপাট্য হইতে পারে।"†

এই কারণে 'কলিরাজার যাত্রা'র কথা বাদ দিতেছি। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে দুইখানি নাটকের উল্লেখ বাংলা সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামক সংবাদপত্রে ১৮৩১, ২ মে (২০ বৈশাখ ১২৩৮) তারিখে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"পশ্চাৎ লিখিত পুস্তক সকল চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে,…।

কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক	মূল্য ১
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	„ ২।"

~~কেহ কেহ বলেন, এই কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটকই ১৮৩২ (?) সালে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র~~

* "এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনাহ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে।"—ভদ্রার্জুন।

† See also *Calcutta Journal*, Feb. 1, 1822, "Contents of the *Sambad Kaumudi*, No. VIII."

বসুর বাড়িতে অভিনীত হইয়াছিল।* ১৮৩০ সালে চন্দ্রিকা যন্ত্রালয় হইতে 'কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক' প্রকাশিত হয়। পাদরী লং লিখিয়াছেন :—

"*Kautuk Sarbasa Natak*, Ch. P., 1830, a drama, by R. Chundra Tarkalankar of Harinabhi." †

২৮ জুন ১৮৪৮ (১৬ আষাঢ় ১২৫৫) সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও অনুধাবনযোগ্য :—

"আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য গৃহের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত রামতারক ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক গৌড়ীয় গদ্য পদ্যে শ্রীমন্মহাকবি কালীদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সুবিখ্যাত নাটক গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তদীয় ভূমিকা ও মঙ্গলাচার প্রভৃতি কিয়দংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, অপর উক্ত পুস্তক উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে,…।

গৌড়ীয় ভাষার পুনরুন্নতি হওন কালাবধি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ব্যতীত আর কোন নটরসাশ্রিত গ্রন্থের গৌড়ীয় অনুবাদ হয় নাই, বিশেষতঃ এতদ্দেশে পুরাকালের নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদ প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না, অতএব এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরস যাহাতে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে সন্দীপন হয় তাহাতে সম্যগ্রূপ প্রযত্ন প্রকাশ করা বিধেয়, …।"

'কৌতুক সর্ব্বস্ব' নাটকের কথা বাদ দিলেও, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, সুশীলবাবুর কথিত ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত 'রত্নাবলী নাটিকা' প্রকাশের পূর্ব্বেও প্রবোধচন্দ্রোদয় ও অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক দুইখানি অনূদিত নাটক ছিল। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র বিরচিত সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনেকগুলি বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল।‡ তবে গুপ্ত-

…তুক সর্ব্বস্ব' বা 'বিদ্যাসুন্দর'…অভিনয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালীর নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়।…১২৩৮ সালে কলিকাতা শ্যামবাজারে ৺নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়।"—"বঙ্গীয় নাট্যশালা," শ্রীধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, (১৩১৬), পৃ. ২।

† *Descriptive Catalogue of Bengali Works*, (1855), p. 75.

‡ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এর নাটকাকারে লিখিত একখানি বাংলা অনুবাদ আছে। উহা "কাব্যকৌমুদী এবং কৃষ্ণকেলি প্রণেতা কাদিহাটা নিবাসি ৺বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় ০০০০সন ১২৪৬ সালে প্রণয়ন করিয়া অল্পকাল পরে লোকান্তরিত হয়েন। ৩১ বৎসর পরে, ১৮৭১ সালে [উৎসর্গপত্রের তারিখ—১২৭৮, ১ আষাঢ়] তাঁহার দুই পুত্র শরচ্চন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকখানি প্রকাশ করেন।" পুস্তকখানি ১২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুশীলবাবু নাটকাকারে লিখিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের কোন বঙ্গানুবাদের সন্ধান পান নাই। অপর একখানি অনুবাদ সম্বন্ধে তিনি ৪৫ পৃষ্ঠায় ৩১ নং পাদটীকায় লিখিয়াছেন :—"গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক, ২৫ শে অগ্রহায়ণ, ১২৫৯ সালে (= ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দ) প্রকাশিত। কিন্তু এই অনুবাদ ঠিক নাটকাকারে লিখিত নহে।"

কবির লেখায় যেখানির নাম পাওয়া যাইতেছে, সেখানি ১৮৪৮ সালের পূর্ব্বে কোন সময়ে রচিত, খুব সম্ভব এইখানিরই নাম ১৮৩১, ২রা মে তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৫৭ সালের ২১ মে তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত জনৈক সংবাদ-দাতার পত্রে দেখিতেছি, এই সময় প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। এখানি যে 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক নাটকাকারে লিখিত তাহার প্রমাণ পাইতেছি। ১৮৭৩, ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় নাট্যসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবকালে মনোমোহন বসুর বক্তৃতায় আছে :—

> "প্রসিদ্ধ কবি বাবু ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা অনেক বড় বড় লোক 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক বাঙ্গালায় রচনা করাইয়া লইলেন। কিন্তু তাহার গানগুলি যত উত্তম হইল, কথোপকথন তেমন সৌন্দর্য্য-সাধক হইল না। যাহা হউক, মহা ধুমধাম পূর্ব্বক কয়েক মাস তাহার আখড়া চলিল—রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইল—কিন্তু পরিণামে হরিনাম বই আর কিছুই ফল দর্শিল না!" (মধ্যস্থ, পৌষ ১২৮০, পৃ. ৬১৮)

২। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার

সুশীলবাবু লিখিয়াছেন :—"১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়ো বাগানবাটীতে যে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল,…"(পৃ. ২২ পাদটীকা ৩)। 'প্রগতি'তেও (১৩৩৪ আশ্বিন, পৃ. ২৩৩) তিনি ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি। এখানে প্রথম অভিনয় হয় ১৮৩১ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে। বিলাত হইতে প্রকাশিত এশিয়াটিক জর্নালে দেখিতেছি :—

> "A Hindu theatre (amateur) opened on the 28th December [1831]; the entertainments were a portion of the *Uttra Rama Cheritra*, (translated by Professor Wilson,) and a part of *Julius Caesar*. Sir Edward Ryan, and other European gentlemen, as well as some ladies, were present." (*Asiatic Journal*, May 1832,—Asiatic Intelligence—Calcutta, p. 34.)

এই রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বর্ত্তমান বর্ষের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত আমার The Early History of the Bengali Theatre প্রবন্ধে দেওয়া আছে।

৩। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের প্রথম ও পরবর্ত্তী অভিনয়

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়ের তারিখগুলি লইয়া মতদ্বৈধ আছে। সুশীলবাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যাপারটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন, সুতরাং ইহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

১৮৯৩ সালে প্রকাশিত যোগীন্দ্রনাথ বসু-রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতের প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে গৌরদাস বশাক মহাশয়ের স্মৃতিকথা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে

১৮৫৩-৫৪ সালে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার কর্ত্তৃক ওথেলো, মার্চেণ্ট অফ ভিনিস, প্রভৃতি অভিনয়ের উল্লেখ করিয়া বশাক মহাশয় বলিতেছেন :—

> "It was Babu (since Maharaja Sir) Jatindra Mohun Tagore, who first of all suggested to them that they should introduce native dramatic representations, and organise a native orchestra on the basis of our native instruments. Acting upon this hint they produced the sensational play of Kulin Kula Sarvasva, and then the theatre abruptly became defunct in 1856."

স্পষ্টত: না বলিলেও গৌরদাস বশাকের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই সুশীলবাবু তাঁহার দুইটি প্রবন্ধে (প্রগতি—১৩৩৪ কার্ত্তিক, পৃ. ৩০০ ; প্রবাসী—১৩৩৮ আষাঢ়, পৃ. ৩০৮) কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের প্রথম অভিনয় ১৮৫৬ সালে হইয়াছিল বলিয়া লেখেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় তখন অবধি জানিতেন না যে, উপরিউক্ত বিবরণ ভ্রমাত্মক বলিয়াই গৌরদাস বশাক পরে তাঁহার স্মৃতিকথার ঐ অংশ আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া (৩য় সংস্করণ, ১৯০৫ দ্রষ্টব্য) লেখেন :—

> "The credit of organizing the first Bengali Theatre belongs to the late Babu Jayram Bysack of Churruckdanga Street, Calcutta, who formed and drilled a Bengali dramatic corps and set up a stage in his house, on which was performed, in March 1857, the sensational Bengali play of *Kulin Kula Sarvasva...*"

গৌরদাস বশাকের এই সংশোধিত তারিখ—মার্চ ১৮৫৭—ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, কারণ ১৮৫৭, ১৯ মার্চ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে পাইতেছি :—

> "*Friday, the 13th March*···The EDUCATIONAL GAZETTE states that the well-known farce of Koolino Kooloshorbushya was acted in the private residence of a Baboo in Calcutta with great success. We are glad to see *these new pieces acted*."

সুশীলবাবুর একটি প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে এ-সমস্ত কথা আমি গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু দেখিতেছি তিনি এখনও সংশয়মুক্ত হন নাই। সুশীলবাবু আলোচ্য প্রবন্ধে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"বোধ হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়," "ছাতুবাবুর ভবনে ৩০ শে জানুয়ারী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার [শকুন্তলা নাটকের] যে প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয়ের পরবর্ত্তী।" অর্থাৎ সুশীলবাবু বলিতে চাহেন. কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের প্রথম অভিনয়ের **পরে** ছাতুবাবুর বাড়িতে শকুন্তলা নাটক অভিনীত হয়। এই অনুমান সুশীলবাবু কোন্ প্রমাণের বলে করিতেছেন তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। তবে মাইকেল জীবনীর তৃতীয় সংস্করণে (পৃ. ২১৩) যোগীন্দ্রনাথ বসু এরূপ একটা কথা বলিয়াছিলেন বটে। মাইকেল জীবনীতে আছে,—

> "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে, ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের দুইজন অভিনেতার উদ্যোগে, চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বশাক মহাশয়ের বাটীতে, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীন-

কুল-সর্ব্বস্ব নাটক অভিনীত হয়। বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পর, বোধ হয়, ইহাই প্রথম বাঙ্গালা অভিনয়। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব অভিনয়ের পরদিবস...ছাতুবাবুর বাটীতে শকুন্তলা নাটক অভিনীত হইয়াছিল।"

গৌরদাস বশাকের সংশোধিত স্মৃতিকথার একটি স্থান হইতে (পৃ. ৬৪৮) যোগীন্দ্রবাবু এইরূপ অনুমান করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ছাতুবাবুর বাড়িতে শকুন্তলা নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ জানা থাকিলে যোগীন্দ্রবাবু কখনও লিখিতেন না যে বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পর ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে কুলীন কুলসর্ব্বস্বই প্রথম বাংলা অভিনয়, অথবা কুলীন কুলসর্ব্বস্ব অভিনয়ের পরদিবস ছাতুবাবুর বাটীতে শকুন্তলা নাটক অভিনীত হয়!

শকুন্তলা নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ—৩০ জানুয়ারি ১৮৫৭। পুরাতন সমাচারপত্র হইতে আমিই এই তারিখ 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় (১৩৩৮ শ্রাবণ, পৃ. ৪৯১) প্রকাশ করি। সুশীলবাবু তাহাই গ্রহণ করিয়া, যোগীন্দ্রনাথ বসুর কথার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, লিখিতেছেন যে "৩০ জানুয়ারী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার [শকুন্তলা নাটকের] যে প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয়ের পরবর্ত্তী।" এইরূপ বলিবার কারণ বোধ করি যোগীন্দ্রবাবুর উক্তি—"কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয়ের পরদিবস শকুন্তলা অভিনীত হয়"!

১৮৫৭, ৩০এ জানুয়ারি তারিখে ছাতুবাবুর বাড়িতে শকুন্তলা অভিনয়ের পূর্ব্বে বহুদিন যে আর কোন বাংলা নাটকের অভিনয় হয় নাই, এবং কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় যে 'শকুন্তলা'র পরে হয়—আগে নহে—তাহার কিছু কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।—

(ক) শকুন্তলা অভিনয়ের দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে—১৫ই জানুয়ারি ১৮৫৭ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা শ্রুত হইলাম, ৺বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনস্থ জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সভ্য সকলে শ্রীযুত নন্দকুমার রায়ের কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নামক নাটকের অনুরূপ দর্শাইবার নিমিত্ত শিক্ষা করিতেছেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিলে উত্তম বটে, **বহু দিবস আমারদিগের কলিকাতায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ হয় নাই,**...।"

(খ) 'শকুন্তলা' প্রথমবার অভিনীত হইলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন :—

"Years rolled away. ***We had well nigh forgotten that we ever had such a thing as a theatre***, when an invitation card surprised us with the fact that another Bengallee stage had risen like a phoenix upon the ashes of its predecessor. ***The announcement had the further attraction that the play announced was a genuine Bengallee one***, ..."(5 February 1857.)

(গ) 'অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক'-এর দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে (১৮৮২) আছে :—

"ইহাই অভিনয়োপযোগী বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা নিবাসি ৺আশুতোষ বাবুর বাটীতে তৎপরে জনাই নিবাসি জমিদার মুখোপাধ্যায় দিগের ভবনে অভিনীত হয়।"

(ঘ) কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয়ের তিন দিন পূর্ব্বে 'সংবাদ প্রভাকরে' (১০ মার্চ ১৮৫৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন :—

"৺বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে 'শকুন্তলা' নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হওয়াতে এইক্ষণে নাট্যক্রীড়া বিষয়ে এতদ্দেশীয় যুবক দলের অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে, ··অধুনা আমরা শ্রবণ করত সন্তুষ্ট হইলাম, বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নামক নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হইবার অনুষ্ঠান হইতেছে, উক্ত সভার জন্মদাতা শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ এ বিষয়ে বিলক্ষণ মনোযোগী হইয়াছেন।"

সংবাদ প্রভাকরের উপরিউদ্ধৃত অংশ পাঠে মনে হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের সভ্যেরাই জয়রাম বশাকের বাটীতে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক প্রথম অভিনয় করেন।

আশা করি, উপরের প্রমাণগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ছাতুবাবুর বাড়িতে শকুন্তলা নাটক অভিনীত হইবার **পরে**—আগে নহে—কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় হইয়াছিল।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের কলিকাতায় প্রথম ও তৃতীয়, এবং চুঁচুড়ায় চতুর্থ অভিনয়ের তারিখ সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আমিই 'প্রবাসী'তে (১৩৩৮ শ্রাবণ, পৃ. ৪৯০-৯১) প্রকাশ করি ; তারিখগুলি এইরূপ :—

প্রথম অভিনয়...১৩ মার্চ ১৮৫৭ — নূতনবাজার জয়রাম বশাকের বাটী।
তৃতীয় অভিনয়···২২ মার্চ ১৮৫৮ — বাঁশতলার গলি—গদাধর শেঠের ভবনে
(সংবাদ প্রভাকর—২৫ মার্চ ১৮৫৮)
চতুর্থ অভিনয়...১৩ জুলাই ১৮৫৮ — চুঁচুড়া।

দ্বিতীয় অভিনয়ের তারিখ এখনও জানিতে পারি নাই।

রামনারায়ণ তর্করত্ন নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই নাটক নূতনবাজার, বাঁশতলার গলি ও চুঁচুড়া—এই তিন জায়গায় অভিনীত হয় ; এই কারণে সুশীলবাবু ধরিয়া লইয়াছেন, কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক সর্ব্বসুদ্ধ তিনবারই অভিনীত হয় এবং ১৮৫৮, ২৫ মার্চ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' যে-অভিনয়টিকে 'তৃতীয়' অভিনয় বলা হইয়াছে, তিনি তাহা 'দ্বিতীয়' অভিনয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুশীলবাবুর এই পরিবর্ত্তন আমি দু-একটি কারণে মানিয়া লইতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ, সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত সংবাদটি অভিনয়ের দুই দিন পরে প্রকাশিত। ইহাতে ভুল থাকা অসম্ভব না হইলেও, সে সম্ভাবনা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ, রামনারায়ণ 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' অভিনয় তিন জায়গায় হইয়াছে বলিলেই যে অভিনয় তিনবারই মাত্র হইতে পারে,—এক জায়গায় দুইবার হইতে পারে না, এইরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই।*

---

* পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রামজয় বশাকের বাড়িতে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকাভিনয়ে কুলাচার্য্য সাজিয়াছিলেন ; তাঁহার স্মৃতিকথায় দেখিতেছি :—"চড়কডাঙ্গা রোডে (বর্ত্তমান টেগোর কাস্‌ল রোড) রামজয় বসাকের বাড়ীর উঠানে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছিল,...'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক এই বাড়ীতে চার বার অভিনীত হইয়াছিল। ...আমি কুলাচার্য্য সাজিতাম।"--পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্য্যায়), শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত। ১৩২০, পৃ. ১৪৯।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয় যে একই জায়গায়—জয়রাম (রামজয় ?) বশাকের বাড়িতে হইয়াছিল, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। ১৮৫৮, ২৫ মার্চ (১৩ চৈত্র ১২৬৪) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পত্রখানিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

"শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

…গত ১০ চৈত্র সোমবার রজনীতে শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর সেট্ মহাশয়ের ভবনে, কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নামক নবীন নাটকের তৃতীয় বার অভিনয় হয়। বড়বাজারস্থিত এই রঙ্গভূমি প্রায় ছয় সাত শত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরিমোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গণ আগমন করিয়া সভামণ্ডপশোভিত করিয়াছিলেন। অভিনয় প্রক্রিয়া যে কতদূর সুন্দর হইয়াছিল, তাহা লেখনী সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই অভিনয় দর্শন করিয়া প্রত্যেক দর্শকেই ভূরি২ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু সূত্রধার কোন রঙ্গভূমিতে অভিনয় না করাতে, তাঁহার কথোপকথন ও সংগীত ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছিল,… ।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাপ্রসাদ বশাক উদর পরায়ণ ও ঘটকের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করাতে সভাসদগণের প্রীতির ভাজন ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, যিনি জনাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনিও উক্ত রঙ্গভূমিতে ধর্ম্মশীলের কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বশাকের বাটীতে এই কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নামক নাটকের আর দুইবার অভিনয় হয়, কিন্তু উপরোক্ত দিবসে যে অভিনয় হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিকতর উৎকৃষ্ট।…

একজন সভ্যতাপথের পথিক।" *

উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, রামজয় বশাকের বাটীতে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয়, এবং গদাধর শেঠের বাড়িতে তৃতীয় অভিনয় হয়।

প্রবন্ধের ২৫ পৃষ্ঠায় সুশীলবাবু লিখিয়াছেন, কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় "চুঁচুড়ার কোন্ স্থলে হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না।" এই অভিনয় চুঁচুড়া মণ্ডল-বাড়িতে হইয়াছিল মনে করিবার কারণ আছে। ১৮৫৮, ১৫ই জুলাই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয় সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল :—

"*Tuesday, the* 13 *July*. The acting of the Koolin-o-Kooloshurboshwo Natuck at Chinsurah…took place in the house of a *gentleman of the Banya caste*,…"

শ্রীযুত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-জীবনী'তে (৩য় সং. পৃ. ৭৫-৭৭, ৪১৯) দেখিতেছি, সিপাহী বিদ্রোহের সময় "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার মণ্ডল-বাবুদের গৃহে একবার অভিনয় হয়।

* বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে এই সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকর' আছে। পরিষদের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে, বন্ধুবর শ্রীযুত নির্ম্মলকুমার বসু আমার জন্য উদ্ধৃত অংশটুকুর নকল লইতে সমর্থ হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র…দর্শক ছিলেন।" আমার মনে হয়, 'বঙ্কিম-জীবনী'তে উল্লিখিত তারিখটি ১৮৫৭ না-হইয়া ১৮৫৮ হইবে, এবং অভিনীত নাটকখানি রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'।

৪। কংসবধ নাটক

রামনারায়ণের অন্যান্য নাটকগুলির ক্ষেত্রে যেরূপ করা হইয়াছে, 'কংসবধ' নাটকের ক্ষেত্রেও সেইরূপ আখ্যাপত্র ও বিজ্ঞাপন সুশীলবাবু উদ্ধৃত করেন নাই। সম্প্রতি 'কংসবধ'-এর একাধিক খণ্ড আমার দেখিবার সুবিধা হইয়াছে।* ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> কংসবধ নাটক। | শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন- | প্রণীত ও প্রকাশিত। | কলিকাতা। | শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক | ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। | সন ১২৮২ সাল।

ইহাতে গ্রন্থকারের কোনরূপ 'বিজ্ঞাপন' নাই। পত্র-সংখ্যা ৭২।

৫। রামনারায়ণের রচিত প্রহসন

প্রবন্ধের ৪২ পৃষ্ঠায় সুশীলবাবু লিখিয়াছেন :—"'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল' বোধ হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত [পাথুরিয়াঘাটা] রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।"

এই প্রহসনখানির প্রথম সংস্করণের কোন খণ্ড এখনও আমার হস্তগত হয় নাই। কিন্তু খুব সম্ভব ইহা ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত, এবং ঐ সালেরই ডিসেম্বর মাসে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন,—

> "Bidyasundar...This performance took place in December 1865; and was supplemented by that of an amusing farce *Jemana karma Temni Phala*." (*Calcutta Review*, 1873, p. 261).

১৮৬৬ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রহসনখানি আরও কয়েকবার অভিনীত হয়। ১৮৬৬, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে যে অভিনয় হয়, তৎসম্বন্ধে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

> "নাটকাভিনয়।—অবগতি হইল গত শনিবার পাথুরিয়া ঘাটা নিবাসী প্রসিদ্ধ কাব্যানুরাগী শ্রীযুত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভবনে বিদ্যাসুন্দর নাটক ও যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল নামক প্রহসনের পুনরভিনয় † হইয়া গিয়াছে। অভিনয় সভায়

---

* শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন 'কংসবধ' নাটকখানি শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাগার হইতে আনিয়া আমাকে দেখাইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারেও ইহার এক খণ্ড আছে।

† ১৮৬৬, ৯ই জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' দেখিতেছি :—"আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে রাওয়ার মহারাজা সে দিবস [২৩ পৌষ ১২৭২, শনিবার - ৬ জানুয়ারি] শ্রীযুত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীতে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আরো শুনা গেল যে মহারাজ গীত বাদ্যে পরম কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমেটীয়ারদিগকে তিন হাজার টাকা ও প্রতি জনকে এক এক খানা কাসমেরি শাল পুরস্কার দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভদ্রসন্তান ও মানের কারণ উক্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।" এইদিনও যে বিদ্যাসুন্দর নাটকের সহিত 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,' অভিনীত হইয়াছিল, ১৮৬৬, ১৩ই জানুয়ারি তারিখের 'হেরাল্ড' পত্রে তাহার উল্লেখ আছে। See The Early History of the Bengali Theatre"—Modern Review, Decr. 1931, p. 636.

বিজয়নগরের মহারাজা সবান্ধবে উপস্থিত ছিলেন,...। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল।" (১৮৬৬, ২৩ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার)

পুনরায় ১৮৬৬, ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রহসনখানি অভিনীত হয়। ২৭এ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখিয়াছিলেন :—

"নাটকাভিনয়।—পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, কিছুদিন যাবৎ বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যত্নে তাঁহার বাটীতে বিদ্যাসুন্দর নাটক ও যেমন কর্ম্ম তেমন ফল নামক প্রহসনের অভিনয় হইতেছে। বিগত শনিবারের অভিনয় স্থলে আমরা উপস্থিত ছিলাম।...আজি কালি অধিকাংশ লোকের যাত্রা ও বাই খেমটার প্রতি ভক্তি নাই, গোবিন্দ অধিকারী ও গোপাল উড়ের ভাব ভঙ্গী ও বাকচাতুরি সুশিক্ষিত লোকদিগের চিত্তহরণ করিতে সমর্থ হয় না।..."

সুশীলবাবু অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় রামনারায়ণের 'উভয় সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান' প্রহসনের আখ্যাপত্র (টাইটেল পেজ) তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেন নাই। প্রহসন দুইখানির প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ—

উভয় সঙ্কট। | প্রহসন। | বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। | কলিকাতা। | শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে | ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। | ১২৭৬ সাল।

চক্ষুদান। | প্রহসন। | বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। | কলিকাতা। | শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে | ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। | সন ১২৭৬ সাল।

সুশীলবাবু ৪২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন :—

"এই প্রহসনগুলি সাধারণতঃ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামেই চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহা ঠিক নয়।...মুদ্রিত পুস্তকের পরিচয়-পত্রে রামনারায়ণই গ্রন্থকার বলিয়া দেওয়া আছে।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে 'উভয় সঙ্কট' প্রহসনের প্রথম, এবং 'চক্ষুদান' প্রহসনের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ আছে; কিন্তু কোনখানিরই আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই, কোনও 'বিজ্ঞাপন'ও দেখিতেছি না। চৈতন্য লাইব্রেরিতে 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রহসনের দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক আছে; তাহার আখ্যাপত্রেও রামনারায়ণ তর্করত্নের নাম নাই।

৬। দক্ষযজ্ঞম্

সুশীলবাবুর প্রবন্ধে ৫৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে :—"পঞ্চসর্গাত্মক 'দক্ষযজ্ঞ' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যও তিনি [রামনারায়ণ] লিখিয়াছিলেন।" দেখিতেছি তিনি ১৮৮১ সালে প্রকাশিত সংস্কৃতে রচিত "দক্ষযজ্ঞম্ (পূর্ব্বার্দ্ধম্)" কাব্যের কথাই বলিতেছেন। কিন্তু রামনারায়ণ পর বৎসরে "দক্ষযজ্ঞম্ (উত্তরার্দ্ধম্)"—সর্গ ৬-১০—প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পত্র-সংখ্যা ৪১; আখ্যাপত্র এইরূপ :—

"দক্ষযজ্ঞম্ | (উত্তরার্দ্ধম্) | কলিকাতাস্থিত-সংস্কৃতবিদ্যামন্দিরস্য অধ্যাপকান্যতমেন | শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন | বিরচিতম্ | শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন সংশোধিতম্ |

কলিকাতা-রাজধান্যাম্ | নং ২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন্, | গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে | শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্নেন পরিশোধিতং, মুদ্রিতং, | প্রকাশিতঞ্চ। | ইং ১৮৮২

পুস্তকের শেষ শ্লোক হইতে রচনার তারিখ—"১৫ই বৈশাখ ১৮০৪ শক, বৃহস্পতিবার—পাওয়া যাইতেছে। রামনারায়ণের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, শ্রীযুত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় আমারই অনুরোধে সমগ্র দক্ষযজ্ঞম্ কাব্য সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পাঠাগারে উপহার দিয়াছেন।

৭। মহাশ্বেতার অভিনয়

প্রবন্ধের ২৩ পৃষ্ঠার ৫ নং পাদটীকায় দেখিতেছি :—"ছাতুবাবুর ভবনে জুন, জুলাই ১৮৫৭ সালে (ভাদ্র ১২৬৪), 'মহাশ্বেতা' নামক নাটকখানিও অভিনীত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অন্য আর কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না।"

'মহাশ্বেতা' নাটক মণিমোহন সরকারের রচিত। ইহা ছাতুবাবুর বাড়িতে অভিনীত হইবার দুই বৎসর পরে, ১৮৫৯ সালের শেষাশেষি, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭ অক্টোবর ১৮৫৯ (১ কার্ত্তিক ১২৬৬) সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি :—

> "আশ্বিন মাসের ঘটনাবলীর সঙ্ক্ষেপ বিবরণ।...শ্রীযুক্ত বাবু মণিমোহন সরকার মহাশ্বেতা নাটক নামে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশ করেন।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে 'মহাশ্বেতা' নাটক আছে। ইহার 'ভূমিকা' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "নাটক সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হইতে হইতেই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষের * প্রযত্নে তাঁহাদিগের ভবনে ইহার অভিনয় প্রদর্শিত হয়, উক্ত রঙ্গস্থলে দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত মনুষ্য উপস্থিত ছিলেন।
>
> নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ। এবং যাহারা ৺আশুতোষ দেব ভবনে অভিনয় করিয়াছিলেন।..."

৮। বিধবা বিবাহ নাটক

'বিধবা বিবাহ' নাটকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল জানা না থাকায়, সুশীলবাবু তাঁহার প্রবন্ধের 'পরিশিষ্টে' এই নাটকখানির দ্বিতীয় সংস্করণের তারিখ দিয়াছেন, এবং অন্য এক স্থলে (পৃ. ২২-২৩, পাদটীকা ৪) লিখিয়াছেন :—"উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটক বোধ হয়, ইহার [১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 'সপত্নী-নাটকে'র] কিছু পূর্ব্বে রচিত ; ... ।"

'বিধবা বিবাহ' নাটক ১৮৫৬ সালের মাঝামাঝি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ সালের ২রা আগষ্ট তারিখের *The Calcutta Literary Gazette* নামক সাময়িক পত্রের

---

* চারুচন্দ্র ঘোষ —খুব সম্ভব ছাতুবাবুর দৌহিত্র ছিলেন। ১ মে ১৮৫৩ সালের সংবাদ প্রভাকরে "৭ নম্বর ওলড কোর্ট হাউস লাইন" বাটী ভাড়ার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ; তাহাতে আছে :—"...যাঁহার প্রয়োজন হয় ৺বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটী শ্রীযুত চারুচন্দ্র ঘোষ বাবুর...নিকট আগমন করিলেই ভাড়ার ধার্য্য হইবেক।"

৪৮৪ পৃষ্ঠায় "Bidobha Bibaho :—A Tragedy in Bengallee, Bhowanipore —1856" এই নাম দিয়া নাটকখানির এক দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

সুশীলবাবুর মতে এই বিধবা বিবাহ নাটকের "প্রথম অভিনয় হইয়াছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির উদ্যোগে, বড়বাজার সিন্দূরেপটী গোপাললাল মল্লিকের বাটীতে" (পৃ. ২৩, পাদটীকা ৪; পৃ. ৩২)। স্পষ্টতঃ না বলিলেও মনে হয় সুশীলবাবু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' হইতে এই তারিখ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তারিখটিতে ভুল আছে এবং এই ভুল আরও কয়েকটি লেখায়—এমন কি 'বিশ্বকোষে'র "রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)"—প্রবন্ধেও দেখিয়াছি।

১৮৫৮ সালের ২৬ মার্চ তারিখের *The Bengal Hurkaru and India Gazette* পত্রে এই নাটকখানির অভিনয়ের আয়োজন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল :—

> "We learn that Baboo Beharrylall Sett with the aid of Woomeschunder Mittra and others, are going to perform that celebrated drama 'The Bedova Bebaho natuc' on an early day. We wish Baboo Baharylall Sett every success."

১৮৫৮ সালে এই অভিনয় হইয়াছিল কিনা এখনও জানিতে পারি নাই, তবে পর বৎসর ২৩ এপ্রিল তারিখে কলুটোলার সেন-পরিবারের উদ্যোগে, সিন্দুরিয়াপটিতে ৺রামগোপাল মল্লিকের ভবনে (এইখানেই ১৮৫৩, ২ মে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়) এই নাটক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। সমসাময়িক সংবাদপত্রে দেখিতেছি :—

> "*Performance of the Bidhoba Bibaha Natuck.*—The first performance of this drama took place on Saturday last [23 Apr.] at the late Hindu Metropolitan College...Much credit is, however, due to the Proprietor Baboo Mooraly Dhar Sen......" (***The Bengal Hurkaru***, April 27, 1859, Wednesday.)

এই নাটক অভিনয়-প্রসঙ্গে ১৮৫৯, ১৪ মে (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে লিখিত হইয়াছিল :—

> "...সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর সেন স্বীয় বন্ধুবর্গ সংযোগে পূর্ব্বতন মেট্রাপোলিটন কালেজ বাটীতে এক সুরম্য রঙ্গভূমি স্থাপিত করিয়া কয়েকবার যেরূপ শ্রবণ-মনোহর ও লোচন-সুখকর অভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয়, বাঙ্গলাভাষায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আর কুত্রাপি হয় নাই। সুদক্ষ কুশীলব মহাশয়েরা প্রায় সকলেই অতি সুচারুরূপে অভিনয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কুশীলবের অভিনয়ে মোহিত হইতে হয়। আর ঘটনা স্থলের প্রতিকৃতির অধিকাংশই এরূপ চিত্তচমৎকারিণী ও মনোহারিণী হইয়াছে যে তাহা দেখিলে স্বরূপ ঘটনাস্থলই বোধ হয়, রঙ্গভূমির কাল্পনিক কাণ্ড বোধ হয় না। আর গায়ক মহাশয়েরাও সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। অধিক কি কহিব, দর্শকমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে এই অভিনয়ের সর্ব্বাঙ্গীন প্রশংসা করিয়াছেন। অবশেষে এই বলিয়া উপসংহার

করিতেছি, যে ইহার সম্পাদক মুরলীধর বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং তিনি এবিষয়ে যে অকাতরে অর্থব্যয় ও অপরিমিত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সার্থকতা হইল বলিতে হইবে, এই অভিনয়ের সংগীত সকল আমাদের পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় মহোদয় দ্বারা রচিত হয়।...হাটখোলাস্থ গায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় এই সকল গীতের স্বর যোজনা করেন।"

'বিধবা বিবাহ নাটক' অভিনয়ে কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন 'ষ্টেজ ম্যানেজার' এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।*

৯। নব বৃন্দাবন নাটক অভিনয়

বিধবা বিবাহ নাটকের ন্যায়, "চিরঞ্জীব শর্ম্মা"র 'নব বৃন্দাবন অর্থাৎ ধর্ম্মসমন্বয় নাটক' অভিনয়-ব্যাপারেও কেশবচন্দ্র সেনের নাম পাওয়া যায়। সুশীলবাবুর তালিকায় এই নাটক-খানির প্রথম অভিনয়ের তারিখ "১৮৬০ (?)" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নব বৃন্দাবন নাটক অভিনীত হয়—১৮৮২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে! ১৮৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর (শনিবার) তারিখের *Indian Mirror* পত্রে দেখিতেছি :—

A NEW DRAMA IN BENGALI

To the Editor of the "Indian Mirror."

Sir,—It was, indeed, very gratifying to witness the novel and interesting drama brought on the stage last Saturday at the house of Babu Keshub Chunder Sen. The plot of the drama is altogether different from other ordinary dramas which had hitherto been acted at other Bengali theatres in and around Calcutta. It is sublime in its conception, simple in its expressions, chaste and charming in its delineations, but strong and stern in its expositions of some of the vices that are so much prevalent amongst the modern Hindu society. The drift of the whole plot, as far as I was able to gather from witnessing the acting of the drama last Saturday, is simply the reclamation of a prodigal husband, and the idea that impressed us the more was what a healthy influence the sincere prayers of a loving and devoted wife and brother can do towards reclaiming a lost husband......I must confess I am highly pleased with the performance, which was, indeed, a decided success......The healthy tone and tenor of the drama in question is admirable. Such dramas tend not only to impart an innocent amusement to the weary and heavy-worked, but it is a sure means to elevate the

* *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, by P.C. Mozoomdar, 3rd ed., pp. 74-76,

morale of the society so infected of late with vicious stage performances······The projectors of the 'Nova Brindaban' have done one thing at least, that of giving a new turn to our tastes and inclinations for stage performances.

Yours, etc.
R. *

উদ্ধৃত অংশের প্রথম পংক্তি পাঠে বুঝা যায় 'নব বৃন্দাবন নাটক' ১৮৮২ সালেই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। সুশীলবাবু প্রথম সংস্করণের পুস্তক না পাওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের তারিখ দিয়াছেন—"১৮৮৩।" সালটি ১৮৮৪ হইবে, কারণ দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকের আখ্যা-পত্রেই পাইতেছি:—"১৮০৫ শক মাঘ।" কলিকাতা চৈতন্য লাইব্রেরিতে এই নাটকের ২য় সংস্করণের এক খণ্ড আছে।

১০। বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও রঙ্গমঞ্চ

প্রবন্ধের ২৩ পৃষ্ঠায় আছে:—"১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াসাঁকো বাস-ভবনে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীন রঙ্গমঞ্চ...বোধ হয় ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয়।"

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল—১৮৫৩ সাল (প্রবাসী—১৩৩৮ শ্রাবণ, পৃ. ৪৮৯ দ্রষ্টব্য)। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ ১৮৫৬ সালেই স্থাপিত। এই রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে ১৮৫৭, ৩ ডিসেম্বর তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন—"*The Biddotshahinee Theatre* is in the second year of its existence."

১১। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব-নাটক'

সুশীলবাবু তাঁহার প্রবন্ধে ৩৫ পৃষ্ঠায় 'নব-নাটক' রচনার ইতিহাস এইরূপ দিয়াছেন:—

"পাথুরিয়াঘাটানিবাসী দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্রনাথ বহু-বিবাহ বিষয়ে একটি নাটক রচনা করিবার জন্য দুই শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ইহার উত্তরে প্রাপ্ত রচনাগুলির বিচারক ছিলেন,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারা কোন রচনাই পুরস্কার-যোগ্য বিবেচনা না করাতে, তাঁহাদের উপদেশে গুণেন্দ্রনাথ 'নাট্কে রামনারাণ'কে এই বিষয়ে একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। পরে, ২৩শে পৌষ ১২৭৩ সালে (= ৬ই জানুয়ারি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে) এক বৃহৎ সভা আহ্বান করিয়া, প্যারীচাঁদ মিত্রকে সভাপতি করিয়া রামনারায়ণকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহার পূর্ব্ব দিবসে, ৫ই তারিখে, 'নব-নাটক' পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ীতে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল।"

---

* See also *ibid*, pp. 291-92.

সুশীলবাবুর এই উক্তি সম্বন্ধে যৎসামান্য বলিবার আছে। নব-নাটক 'পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ীতে' অভিনীত হয় নাই,—হইয়াছিল 'যোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে'। ইহার প্রথম অভিনয়ের তারিখ—৫ই জানুয়ারি ১৮৬৭—সুশীলবাবু এখানে ঠিকই দিয়াছেন ; কিন্তু ৫৩ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে "৬ই জানুয়ারী ১৮৬৭" ছাপা হইয়াছে।

স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম 'সন্দর্ভ-সংগ্রহে' 'নব-নাটক'-রচনার ইতিহাস প্রকাশ করেন। এ-বিষয়ে তিনি যোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটির সদস্য ও 'নব-নাটকে'র একজন অভিনেতা নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেঠতুত ভগিনীপতি) নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ করেন। সুশীলবাবু 'নব-নাটক'-রচনার যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ বিদ্যানিধি মহাশয়ের পুস্তক, অথবা তদবলম্বনে লিখিত অন্য কোন পুস্তক হইতে গৃহীত। প্যারীচরণ মিত্রের সভাপতিত্বে যেদিন রামনারায়ণকে দুই শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়, বিদ্যানিধি মহাশয়ের পুস্তকে তাহার তারিখ দেখিতেছি—১২৭৩ সালের ২৩শে বৈশাখ,* কিন্তু সুশীলবাবু তাঁহার প্রবন্ধে "২৩শে পৌষ" লিখিয়াছেন। কোথা হইতে এই তারিখ পাইলেন প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ নাই।

যোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি সম্বন্ধে যথাযোগ্য অনুসন্ধান হয় নাই, এই কারণে আশা করিয়াছিলাম সুশীলবাবুর প্রবন্ধ হইতে নূতন কিছু জানিতে পারিব। কিন্তু তিনি সে আশা হইতে আমাদের বঞ্চিত করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির পর, বোধ হয় অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেনই যোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা শোনাইয়াছেন। বহু-বিবাহ বিষয়ে নাটক রচনার পুরস্কার ছাড়া যোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি যে উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য আরও দুইটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, প্রিয়রঞ্জনবাবুই প্রথমে তাঁহার 'নাটুকে রামনারাণ' প্রবন্ধে (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৮, পৃ. ৭৫৯) উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৬৫ সালের ১০ই আগষ্ট (২৭ শ্রাবণ ১২৭২) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামক বাংলা সংবাদপত্রে এই দুইটি পুরস্কার সম্বন্ধে দেখিতেছি :—

"যোড়াসাঁকো নাট্যশালার সভ্যেরা ঘোষণা করিয়াছেন হিন্দু মহিলাগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিষয়ক একখানি নাটক যে রচনা করিবেন, তাহাকে ২০০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে এবং পল্লীগ্রামস্থ জমীদারগণের অত্যাচারের বিষয়ে একখানি নাটকের জন্য ১০০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিবেন।"

এই দুইটি পুরস্কারলাভ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল তাঁহাদের নাম, এবং পুরস্কৃত নাটক দুইখানিই বা কি, সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি।

* বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিবরণ অবলম্বন করিয়াই শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' পুস্তকে (১৩৩৪ সাল) এই তারিখ দিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে ; তবে তিনি 'দুই শত টাকা পুরস্কারের পরিবর্ত্তে 'পাঁচ শত' বলিয়াছেন (পৃ. ১২)। বিদ্যানিধির পুস্তকে 'নব-নাটক'-রচনার অন্য একটি বিবরণে পাঁচ শত টাকা পুরস্কারের কথাও আছে। শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' (১৩২৬ সাল) পুস্তকেও পাঁচ শত টাকার কথা আছে। কিন্তু এই পুরস্কারের পরিমাণ দুই শত টাকাই ছিল। রামনারায়ণের আত্মকথায় দেখিতেছি :—

"নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াসাঁকোবাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনয় হয়।"

১২। বাংলা নাটকের তালিকা

সুশীলবাবু তাঁহার প্রবন্ধের পরিশিষ্টে "১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা নাটক ও তাহার অভিনয়ের একটি ক্রমানুযায়ী তালিকা" দিয়াছেন। "তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে; কারণ ১৮৬০ সালের পর বাঙ্গালা নাটকের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সবগুলি এখানে তালিকাবদ্ধ করা সম্ভব বা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বাঞ্ছনীয় নহে।" পুনশ্চ ৪৮ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি—"প্রথমে অল্পসংখ্যক নাটক রচিত হইয়াছিল,...কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বাঙ্গালা নাটকের সংখ্যা বহুলপরিমাণে বাড়িয়া গেল,... ।"

কিন্তু সুশীলবাবু ১৮৬০ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী "অল্পসংখ্যক" নাটকগুলিরও যে তালিকা দিয়াছেন সেটিও সম্পূর্ণ নহে। সুশীলবাবুর এই পরিশিষ্ট সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।—

(১) ১৮৫২ সালের গোড়ায় প্রকাশিত 'কীর্ত্তিবিলাস' নাটকের নাম সুশীলবাবুর তালিকায় দেখিতেছি না। অনেকেই জানেন না যে এই নাটকখানি তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন'-এর পূর্ব্বে প্রকাশিত। ২৮ মে ১৮৫২ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিত হইয়াছিল:—

> "বিদ্বন্মোদ সভার সম্মতিক্রমে সংপ্রতি বঙ্গভাষায় 'কীর্ত্তিবিলাস' নামক যে এক নাটক বিরচিত এবং মুদ্রিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা আমরা সেই নাটক প্রাপ্ত হইয়া কিয়দংশ পাঠ করিলাম।"

'বিশ্বকোষ' ("নাটক," পৃ. ৭২৯) পাঠে জানা যায়, ৫ অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকখানির রচয়িতা—যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। পাদরী লঙের পুস্তকে আছে:—

> "313. *Kirti Bilas*, Step-mothers, evils of; a Drama in 5 Acts, by G. C. Gupta, pp. 70, B. S. P., 12 as. The subject: a king's son near the Jumna committed suicide, owing to the cruelties of his step-mother,—the work shews considerable talent."†

কিন্তু লং ইহার প্রকাশকাল উল্লেখ করেন নাই। তাহা যে ১৮৫২ সালের প্রথম ভাগে, আমি 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে দেখাইয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে এই নাটকের এক খণ্ড আছে, কিন্তু তাহার আখ্যাপত্র নাই।

(২) তালিকাতে মণিমোহন সরকারের 'মহাশ্বেতা' নাটকের উল্লেখ নাই।

(৩) ১৮৫৮ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখের *Bengal Hurkaru and India Gazette* পত্রে একখানি নূতন নাটকের উল্লেখ পাইতেছি।—

> "A BENGALEE TRAGEDY.—Nobin Kristo Bose, a student of the Government Civil Engineering College, has published to the world a Bengallee tragedy, entitled *Chi ·ut Hurso Nat..ck, Anglice* the Heart-cheering Drama, by Dheesona Chotoospud. The writer displays considerable taste and a thorough knowledge of the human heart. Pundit Eshwar Chunder Bidyashaghur, the eminent and learned Principal of the Government Sanskrit College, has

† Long's *Descriptive Catalogue of Bengali Works*, p. 71.

* See Cat. of Vernacular Literature Committee's Library (compiled by Long)

pronounced the work of Dheesona Chotoospud to be superior to anything that has since been published in the Dramatic Department of the Vernacular literature."

(৪) রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের প্রকাশকাল "১৮৫৭" সাল বলিয়া তালিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধের ২৯ পৃষ্ঠাতেও দেখিতেছি:—"মার্চ্চ, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে (=২৮ শে ফাল্গুন, ১৯১৪ সংবতে)...মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।" তারিখটি মার্চ ১৮৫৮ হইবে।

(৫) ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয়স্থল "কয়লাতলা" নহে,—"কয়লাহাটা," জোড়াসাঁকো। পুস্তকের আখ্যাপত্রেই আছে:—"১২৭৪ সাল ১৫ কার্ত্তিক কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অধ্যক্ষগণের আদেশ ও সাহায্যে"।

(৬) আরও কয়েকখানি নাটক ও প্রহসনের নাম সুশীলবাবু উল্লেখ করিতে পারিতেন। উহাদের প্রথমখানি মণিমোহন সরকারের 'উষানিরুদ্ধ নাটক',—১৮৬৩ সালের প্রারম্ভে (১২৬৯ সাল) প্রকাশিত, এবং ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে অভিনীত হয়। ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি।

দ্বিতীয়খানি, ভ্রান্তিরহস্য-নাটক—শ্রীবেণীমাধব দাস ঘোষ বিরচিত। পুস্তকের আখ্যাপত্রে তারিখ পাইতেছি:—"শকাব্দাঃ ১৭৯০। সন ১২৭৫ সাল। ইং ১৮৬৮ সাল। আষাঢ়।" নাটকখানির "ভূমিকা" হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যদিও আমি কখন নাটক রচনা করি নাই, কিন্তু শোভাবাজারস্থ গোপনীয় নাট্য সভায় ভূতপূর্ব্বে দুইখানি নাটক সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব হয়, তদনুসারে আমি একখানি রচনা করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছিলাম,...অধুনা জগদীশ্বরের কৃপায় বঙ্গভাষালঙ্কৃত কোন প্রাচীন রহস্যাত্মক ইতিহাসের কতিপয়াংশের আভাসানুসারে ষোড়শ গর্ব্ভাঙ্ক যোজিত পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত করিয়া ভ্রান্তিরহস্য আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি রচনা করত প্রতিজ্ঞাপাষ হইতে বিমুক্ত হইলাম।..."

এই নাটকের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে।

তৃতীয়খানি, 'হ্যামলেটে'র অনুকরণে লিখিত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর 'নন্দ-বংশোচ্ছেদ নাটক,' (১২৮০ সাল), তখনকার যুগে ইহা আদৃত হইয়াছিল। ১৮৭৩ সালের গোড়ার দিকে নাটকখানি প্রকাশিত হয়; কারণ ১৮৭৩, ২৯ মে তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় ইহার "প্রাপ্তিস্বীকার" দেখিতেছি। নন্দ-বংশোচ্ছেদ নাটকের একাধিক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার ও চৈতন্য লাইব্রেরিতে আছে।

চতুর্থখানি, ১২৭৯ সালে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কিঞ্চিৎ জলযোগ"। পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। ১৮৭২, ৩০এ সেপ্টেম্বর তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ইহার সমালোচনা দেখিতেছি।

সে-যুগে অভিনীত আরও একখানি প্রহসনের নাম সুশীলবাবু দিতে ভুলিয়াছেন; এখানির নাম—"এঁরাই আবার বড় লোক!" ১৯২৩ সংবতে (১৮৬৬-৬৭) ইহা "রহস্য-সন্দর্ভ" নামক মাসিকপত্রের ৪র্থ খণ্ডে সমালোচিত হইয়াছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহের নাট্যগ্রন্থ

(১) ১৮৫৩-৫৪ সালে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রথম নাট্যগ্রন্থ—'বাবু নাটক'-এর উল্লেখ তালিকায় নাই (প্রবাসী—১৩৩৪ শ্রাবণ, পৃ. ৪৮৯ দ্রষ্টব্য)।

(২) কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অভিনয়ের সঠিক তারিখ ২৪ নভেম্বর ১৮৫৭। 'সংবাদ প্রভাকরে' (১ বৈশাখ ১২৬৫) পাইতেছি :—

> "সন ১২৬৪ সাল, অগ্রহায়ণ।—১০ অগ্রহায়ণ দিবসে যোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অনুরূপ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হয়।"

(৩) কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক'-এর অভিনয়ের তারিখ সুশীলবাবুর তালিকায় নাই। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ, ৪ জুন ১৮৫৮ সালে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের মহলা দেওয়া হইয়াছিল।* এই অভিনয় উপলক্ষ্য করিয়া খৃষ্টানদের 'অরুণোদয়' নামক পাক্ষিক পত্র ১৫ই জুন তারিখে লিখিয়াছিল :—

> "পাক্ষিক সংবাদ।...কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীর রঙ্গভূমিতে এবং জনাঞি গ্রামে নানা রঙ্গ হইতেছে। স্বদেশীয় বাবু ভাইয়েরা দয়া ধর্ম্ম এবং দেশোন্নতি ছাড়িয়া নাট্যশালায় রঙ্গ করিতেছেন!"

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়

(১) তালিকায় পাথুরিয়াঘাটা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি বিদ্যাসুন্দর নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ দেখিতেছি—৬ই জানুয়ারি ১৮৬৬। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই তারিখ দ্বিতীয় অভিনয়ের। বিদ্যাসুন্দর নাটকের প্রথম অভিনয় হয়—১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন :—"Bidyasundar...This performance took place in December 1865." এই উক্তি সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহে'ও দেখিতেছি :—

> "৩০ শে ডিসেম্বর [১৮৬৫] মহারাজ বাহাদুর, তাঁহাকে [রেওয়ার রাজাকে] স্বভবনে আনিয়া অভ্যর্থনা করেন। তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য ঐ তারিখে তাঁহার সম্মুখে বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনীত হয়।"

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নবপ্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে রঙ্গমঞ্চ ছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, ১৮৫৯ সালে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে 'মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক' অভিনীত হইয়াছিল। সুশীলবাবু তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। কিশোরীচাঁদের উক্তি নির্ভরযোগ্য বলিয়াই মনে হইতেছে, কারণ ১৮৬০ সালের গোড়ায় মাইকেল মধুসূদন দত্তকে লিখিত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একখানি পত্রে দেখিতেছি :—

> "Here is the third book of your poem [তিলোত্তমাসম্ভব]...I am led to believe that the Rajas [of Paikparah] will have no more Bengali plays at the Belgachia Theatre, and as for my Brother's stage, I am afraid

* *Memoirs of Kali Prossunno Singh*, by Manmathanath Ghosh, p. 42.

that *Malavika* must be the first and the last drama that is represented there." *

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক অভিনয়ে পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার স্মৃতিকথার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"প্রথমে গোপীমোহন ঠাকুরের পুরাতন বাড়ীর দোতালার নাচঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বলিলেন—'আমি আপনাকে ঠিক 'রত্নাবলীর' মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।' তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' † নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম। ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবার মাত্র Stageএ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অনুরোধে তিনি 'কঞ্চুকী' সাজিয়াছিলেন; ...আমি বিদূষক সাজিয়াছিলাম,..." ‡

(২) পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত 'বুঝলে কিনা' প্রহসনের প্রকাশকাল সুশীলবাবু দিতে পারেন নাই। ইহা ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৬ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখের "বেঙ্গলী" (তৎকালে সাপ্তাহিক) পত্রে ইহার সমালোচনা দেখিতেছি। এই প্রহসনখানি পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে ১৮৬৬, ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। ১৮৬৬, ২২এ ডিসেম্বরের "বেঙ্গলী"তে এই অভিনয় সম্বন্ধে দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখিতেছি।

(৩) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতীমাধব' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ সুশীলবাবুর প্রবন্ধে "৩১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭" বলিয়া লিখিত হইয়াছে (পৃ. ৪২, ৫৩)। 'বিশ্বকোষে'র 'রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)' প্রবন্ধে (পৃ. ১৮১) এবং মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির "সন্দর্ভ সংগ্রহ" পুস্তকেও ঠিক এই তারিখ পাইতেছি। কিন্তু তারিখটি যে ভুল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কারণ ১৮৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস ৩০এ তারিখেই শেষ হইয়াছে,—"৩১ শে" হয় কেমন করিয়া? কিশোরীচাঁদ মিত্র এই অভিনয়ের তারিখ দিয়াছেন—১৮৬৯। তিনি লিখিয়াছেন :—

"Pathuriaghatta theatre,...Malati Madhava, translated by Pandit Ramnarayan, was performed there in 1869." (*Calcutta Review*, 1873, p. 262.)

(৪) তালিকায় রামনারায়ণের 'উভয় সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান' প্রহসনের অভিনয়কাল "১৮৬৯ (?)" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রহসন দুইখানি ১৮৭০ সালের গোড়ায় প্রথম অভিনীত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৭০ সালের ১০ই মার্চ (পৃ. ২৫-২৬) তারিখের "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় ¶ পাইতেছি :—

* মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু। ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৬৫—৬৬।

† মাইকেল মধুসূদন দত্তকে লিখিত, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ১৮৫৯, ১ সেপ্টেম্বর তারিখের একখানি পত্রপাঠে মনে হয় 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকখানি সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত।—'মধু-স্মৃতি',—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, পৃ. ১২৩।

‡ পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্য্যায়)—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত। (১৩২০), পৃ. ১৫৫।

¶ ইহা তখন সাপ্তাহিক ও দ্বিভাষিক (ইংরেজী ও বাংলা) ছিল এবং যশোহর হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হইত।

"পাথরিয়া ঘাটা নাট্যালয়।...শৌরীন্দ্র বাবু এই প্রায় দশ বৎসর নাট্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত যত্নশীল আছেন ও এক্ষণে তাঁহারা অকুতভয়ে প্রধান প্রধান ইংরাজ আহ্বান করিয়া থাকেন ও তাহারাও দর্শন ও শ্রবণ করিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদের নাটকের প্রধান অভাব এই যে স্ত্রীলোক আক্টর পাওয়া যায় না, তাহা বলিয়া হাত কি।

এবারেই দুইটী প্রহসনই চমৎকার হইয়াছে, একটীর নাম 'চক্ষুদান', আর একটীর নাম 'উভয় সঙ্কট'। এ দুইটীর প্রণয়ন কর্ত্তা যতীন্দ্র বাবু।..."

(৫) রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রুক্মিণী-হরণ' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ "১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭২" বলিয়া সুশীলবাবু উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৪৩, ৫৪)। দেখিতেছি তারিখটি তিনি *Calcutta Review* (1873, p. 271) পত্রে প্রকাশিত কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তারিখটি প্রথম অভিনয়ের নহে, এবং এই ভুল আরও অনেকেই করিয়া আসিতেছেন। রুক্মিণী-হরণ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়—১৮৭২, ১৩ই জানুয়ারি তারিখে। ১৮৭২ সালের ১৫ই জানুয়ারি (সোমবার) তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দেখিতেছি :—

"THE PATHURIAGHATTA THEATRE—This theatre... has risen to the rank of a national institution, and its suspension last year was a great disappointment to the native public. This year it has been re-opened, and the first performance took place last Saturday night. A new drama, Rukhini Harana, which we had noticed a few issues back, was brought on the stage, and played with the usual success... The drama was followed by a roaring Farce of 'Uvaisankata'..."

কিশোরীচাঁদ মিত্র রুক্মিণী-হরণ নাটকের অভিনয়ের যে তারিখ দিয়াছেন, এবং যাহা সুশীলবাবু 'প্রথম অভিনয়ে'র তারিখ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা দ্বিতীয় অভিনয়ের। ১৮৭২, ২১এ ফেব্রুয়ারি তারিখের *The National Paper* নামক সাপ্তাহিক পত্রে দেখিতেছি :—

"*Puttoriaghatta Theatre.* We had the pleasure of being present at the theatrical entertainments held at Raja Jotendra Mohun Tagore's on the night of Saturday the 10th instant. A serio-comic tale from Mohabharata cast into a dramatic form and a farce portraying the troubles of a man having two wives, were produced on the stage,...The theatre has been closed for the present in condolence of the heavy calamity which has befallen India by the death of the Viceroy [Lord Mayo]."

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে "উপসংহার" নামে দশ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাইয়াছি। তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়। | সন ১২৭৮ সালের নাট্যাভিনয় সমাপনোপলক্ষে |

উপসংহার। | কলিকাতা। | শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে | ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। | সন ১২৭৯ সাল।

ইহা রুক্মিণী-হরণ নাটকের অষ্টম অভিনয় রজনীতে অভিনীত হইয়াছিল। এই পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় আছে :—

"ব্রাহ্মণ।...দর্শক-মহাশয়েরা! অদ্য রুক্মিণী-হরণ নাটকাভিনয়ের অষ্টক রাত্র; এই অষ্টাহতে আপনাদের অনুগ্রহ সহকারে আমরা নাট্যামোদে যে কি পর্য্যন্ত আমোদিত ছিলেম তা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা কঠিন।..."

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার 'সন্দর্ভ-সংগ্রহে' (পৃ. ২৩) লিখিয়াছেন :—

"রূপকটি কেবল ১২৭৮ সালে ১১ই চৈত্র (১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ্চ) তারিখে 'রুক্মিণীহরণ' নাটকের অভিনয়ান্তে অভিনীত হয়।"

মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্যগ্রন্থ

(১) মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও অভিনয়-স্থল "১৮৬৪—দেবীকৃষ্ণ দেবের ভবনে, শোভাবাজার নাট্যসমিতি" বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তারিখটি ভুল; সুশীলবাবুই নহেন, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি আরও অনেকে এই ভুলটি করিয়া আসিতেছেন। ১৮৬৫ সালের ২৯ জুলাই তারিখে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয়ের সহিত শোভাবাজার নাট্যসমিতির উদ্বোধন হয়। ১৮৬৫, ৩১ জুলাই (সোমবার) তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে দেখিতেছি :—

"THE HINDOO THEATRE—We are glad to notice the resuscitation of the Hindoo Theatre by the praiseworthy exertions of the junior members of the Shobha Bazaar Raj family…On last Saturday night the Shobha Bazar amateurs had their first performance…It was the well known and popular farce of Mr. Michael M. S. Dutt, entitled 'Is this Civilization ?'…we must cordially confess that this farce is not a fit subject for representation on the stage of a 'Family Theatre.'

এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৬৫ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" লিখিয়াছিলেন—

"আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম, শোভাবাজারের কয়েকজন সুশিক্ষিত যুবকের যত্নে তথায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অনেকদিন পরে আমরা অভিনয়ের কথা শুনিলাম।"

পুনরায়, ৯ই আগষ্ট তারিখের কাগজ হইতে জানিতে পারিতেছি :—"অভিনয় স্থানে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাবু দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।"

(২) তালিকায় মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী'র প্রথম অভিনয়ের তারিখ "২৪ শে জুলাই ১৮৬৫" দেওয়া আছে।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকের অন্তর্গত 'রঙ্গভূমির ইতিহাস'-এর ২৫ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি :—

"শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি।—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজার রাজবাটীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন অগ্রে অভিনীত হয়। তৎপরে 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত করিবার উদ্যোগ। কৃষ্ণকুমারী ১৮৬৫। ২৪ শে জুলাই (১২৭২। ১০ই শ্রাবণ) সোমবার প্রথম খোলা হয়।"

স্পষ্টতঃ না-বলিলেও মনে হয় সুশীলবাবু এই তারিখই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে 'কৃষ্ণকুমারী'র প্রথম অভিনয়ের তারিখ নহে, 'সন্দর্ভ-সংগ্রহে'র উদ্ধৃত বিবরণের পরবর্ত্তী অংশে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাহা এইরূপ :—

"১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেও রিহার্সেল চলে। ১৮৬৭। ১২ই ফেব্রুয়ারিতে ইহার প্রথম প্রকাশ্য অভিনয়।"

বিদ্যানিধির কথা অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। তাঁহার প্রদত্ত 'কৃষ্ণকুমারী'র প্রথমাভিনয়ের এই তারিখও—১৮৬৭, ১২ই ফেব্রুয়ারি—ভুল। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৬৭, ১১ ফেব্রুয়ারি * তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' যাহা লিখিত হইয়াছিল, বিদ্যানিধির 'রঙ্গভূমির ইতিহাসে'র ৩০-৩৪ পৃষ্ঠায় তাহাও মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ—১৮৬৭, ৮ই ফেব্রুয়ারি :—

The Shobha Bazar Theatre....on last Friday night the amateurs of the Shobha-Bazar Theatre entertained a respectable and select company with their first public performance of the well-known tragedy of *Krishna Kumari*..."

(৩) মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র নাম তালিকায় নাই। ইহা ১৮৬৭ সালে কাঁসারিপাড়ায় বাঁধা ষ্টেজে অভিনীত হয়।

(৪) সুশীলবাবুর তালিকায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'পদ্মাবতী' নাটকের "প্রথম অভিনয়ের তারিখ"— "১৮৬৭—গরাণহাটা জয়চন্দ্র মিত্রের বাটী" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রবন্ধেও এই তারিখ পাইতেছি। কিন্তু পদ্মাবতী নাটক ইহার অনেক আগে—১৮৬৫ সালে অভিনীত হইয়াছিল। ১৮৬৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর (সোমবার ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৭২) তারিখের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" নামক সংবাদপত্রে দেখিতেছি :—

"বিগত শনিবার পাথরিয়াঘাটা নিবাসী কোন বড় মানুষের বাড়ীতে পদ্মাবতী নাটকের পুনঃ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর দুইবার অত্রত্য কোন কোন ভদ্র লোকের বাড়ীতে ঐ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। বিগত শনিবারের অভিনয় পূর্ব্বেকার ন্যায় হয় নাই। অনেক বিষয়ে ত্রুটি হওয়াতে অভিনয়ের কোন

---

* এই তারিখ ঠিক আছে, কারণ হিন্দু পেট্রিয়ট তখন প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হইত এবং ১৮৬৭, ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখেও সোমবার পড়ে।

কোন অঙ্গের ব্যাঘাৎ হইয়াছে।...পদ্মাবতী একখানি বিদেশীয় নাটকের ভাব গ্রহণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকে গল্পটির মূল বৃত্তান্ত অনবগত ছিলেন। কোন পৌরাণিক গল্প না হইলে স্বভাবতঃ এ দেশীয় লোক তাহাতে আস্থা করেন না। পদ্মাবতীর ভাগ্যে সেইটী ঘটিয়াছিল।...

হিন্দুদিগের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে যে সকল গুণাদির বিলোপ হইয়াছে, সঙ্গীত শক্তিও তাহারদের সহগমন করিতে ত্রুটি করে নাই। সংস্কৃত ভাষায় যে সকল নাটক দেখিতে পাওয়া যায়, কবিগণ উহা অভিনয়ের জন্যই রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয়। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু রাজগণের প্রাধান্যকালে যে ঐ দেশে নাটকাভিনয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই। সৌভাগ্যসূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে উহা অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যাত্রা প্রণালীও অভিনয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রার বাহুল্য প্রচার ছিল, ক্রমে ক্রমে উহা এদেশে আগমন করিয়াছে হইতেও পারে। যাহা হউক এরূপ অভ্যুদয়ের সময়ে যাত্রা আর লোকের মনে ধরে না, রাধিকার বিচ্ছেদ, কৃষ্ণের মোহিনী বেশ সুশিক্ষিত অন্তঃকরণে তৃপ্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। কালুয়া ভুলুয়া ও মেথরাণীর কথোপকথন শুনিলে বিজাতীয় হাসি যায়। গোপালে উড়ের দলের মালিনী, গোবিন্দ অধিকারির দুতীবেশ কেবল বারোয়ারি দলের মনঃমোহন করিতে সমর্থ।...এ সকল আর ভাল দেখায় না। অবকাশ ক্রমে কোন প্রকার আমোদজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যখন লোকের আকস্মিক ভাব হইল তখন যাত্রা ও কবিওয়ালাদিগের পরিবর্ত্তে অভিনয়ের প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে, অন্যান্য সভ্য প্রধান দেশে অভিনয়ের প্রথাই প্রচলিত আছে। এদেশে উহার বাহুল্য প্রচার করিলে কোন হানি নাই,...। অত্রত্য কেহ কেহ নাটকের অভিনয় করিতেছেন তদ্দ্বারা অভিনয় প্রথার আশানুরূপ উন্নতি হয়। কিন্তু সাধারণে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। কলিকাতার সুশিক্ষিত দল ভিন্ন অতি অল্প লোক অভিনয়ের বিন্দু বিসর্গও জানেন না। যখন অভিনয় ব্যবসায়ী একদল যুটিবেন, তখন আমরা জানিব যে এদেশে অভিনয় প্রথার মূল প্রচার যথার্থ হইতেছে। অতএব আমরা অনুরোধ করি, একদল নাটকপ্রিয় সুশিক্ষিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। আপাততঃ এ দেশের পক্ষে অতি সুশিক্ষিত লোকের অভিনয় ব্যবসায় করা লজ্জাকর বিষয় বটে। কিন্তু যাঁহারা অভিনয়ের প্রকৃত রসজ্ঞ তাঁহাদিগের নিকট অভিনেতাদিগের সম্মানের ত্রুটি হইবে না।"

যোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮৬৪ (?) সালে প্রথমে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী', পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর জননী ও সার্জ্জন সাজিয়াছিলেন।*

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৯৯-১০০।

দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যগ্রন্থাবলী

(১) সুশীলবাবুর তালিকায় "বাগবাজার এমেচার থিয়েটর" কর্ত্তৃক দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'সধবার একাদশী' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ দেখিতেছি—১৮৬৯ সাল। সালটিতে ভুল আছে; ইহা ১৮৬৮ হইবে। এই অভিনয়ে রাধামাধব কর একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার স্মৃতিকথায় পাইতেছি:—

> "গিরিশ বাবুর পরামর্শে 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করা হইল।... বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুজ্যের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে ষ্টেজ বাঁধিয়া সপ্তমী পূজার দিন 'সধবার একাদশী' অভিনীত হইল। কোজাগর পূর্ণিমার নিশীথে শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে পুনরায় অভিনয় করা হইল।... অল্পদিনের মধ্যেই... এটর্ণি দীননাথ বসুর বাড়ীতে আমাদের তৃতীয় অভিনয় হইল।...১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শ্রীপঞ্চমীর দিনে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের ভবনে আমাদের অভিনয় হইবে, স্থির হইল।" *

(১৫) সুশীলবাবুর তালিকায় দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী নাটকের "প্রথম অভিনয় তারিখ" ও "অভিনয়-স্থল"—"১৮৭১—বাগবাজার এমেচার থিয়েটার" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে।

লীলাবতী নাটক ১৮৭১ সালে কৃষ্ণনগরে প্রথম অভিনীত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি তারিখের "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত একখানি পত্রে পাইতেছি:—

> "মহাশয়—বিগত ১৩ই পৌষ তারিখে মহেশপুর গ্রামে লীলাবতী নাটকাভিনয় পুনঃ সংস্করণ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছ।...কৃষ্ণনগর, ১৩ই জানুয়ারি। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্ম্মা।"

ইহার পর লীলাবতী নাটক চুঁচুড়ায় অভিনীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮৭২ সালের (৩০১) মার্চ মাসে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এই নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৭২, ৪ এপ্রিল তারিখের "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় ইহার প্রশংসাসূচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> "চুঁচুড়ায় সম্প্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে।...অভিনয়টি অতি সুচারু পূর্ব্বক হইয়াছিল॥...আমরা নাটক অভিনয়টি দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছি। যদিও ইহা সম্পূর্ণ রূপে দোষ শূন্য হয় নাই তথাচ এদেশে যত উৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এটি একটী।"

চুঁচুড়ার অভিনয়ের মাস-দেড়েক পরে—১৮৭২, ১১ই মে—বাগবাজারের দল লীলাবতী নাটকের অভিনয় করেন। সুশীলবাবু ভ্রমক্রমে এই অভিনয়ের তারিখ দিয়াছেন—"১৮৭১" সাল। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, গিরীশচন্দ্র ঘোষের চরিতকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়,

* পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্য্যায়)—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃ. ১৬৭-৬৮।

প্রভৃতিও ঠিক এই ভুলই করিয়া আসিতেছেন। 'লীলাবতী'র অভিনয় সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দু-শেখর বলেন :—

"অনেক দিন রিহার্স্যালের পর ১৮৭১—১২৭৮ সালের বর্ষাকালে রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে আমাদের 'নিজের ষ্টেজে' লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হ'ল।...কথা উঠ্‌ল থিয়েটারের কি নাম দেওয়া হবে?...নবগোপাল বাবু আমাদের থিয়েটারের নাম The Calcutta National Theatre রাখবার প্রস্তাব করেন। শেষে মতিবাবুর প্রস্তাব মত Calcutta টুকু বাদ দিয়ে কেবল The National Theatre রাখা হয়। প্রথম দিন ঐ নামেই অভিনয় হয়।

রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে পর পর তিনটা শনিবার তিনটী অভিনয় হয়।"*

কিন্তু 'লীলাবতী'র অভিনয়কাল ১৮৭১ নহে। ন্যাশনাল থিয়েটার নামক সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার চার-পাঁচ মাস পূর্ব্বে ১২৭৯ সালের ৩০ বৈশাখ, অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ১১ই মে তারিখে ইহার প্রথম অভিনয় হয়, এবং এই সময় বাগবাজারের অবৈতনিক দলের নাম ছিল 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'—'ন্যাশনাল থিয়েটার' নহে। ১২৭৯ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে (শনিবার) 'মধ্যস্থ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে দেখিতেছি :—

"সংবাদ।—...বিগত শনিবার রজনীযোগে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইয়াছে এবং কয়েক সপ্তাহ হইবার কল্পনা আছে।... শুনিলাম রঙ্গভুমি সুসজ্জিত ও অভিনয় কার্য্যটী সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছিল।"

পুনরায়, ১৬ আষাঢ় ১২৭৯ সালের "অতিরেক মধ্যস্থে" 'লীলাবতী নাটকাভিনয়' নাম দিয়া একখানি পত্র প্রকাশিত হয়; তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সম্পাদক মহাশয়!

কয়েক দিবসাবধি বাগবাজারস্থ কতকগুলিন যুবকবৃন্দ শ্রীযুক্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর-প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয় করিতেছেন। তাঁহাদের অভিনয়ে কতকগুলিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ সত্ত্বেও অদ্যাবধি যে সকল উৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে তাঁহাদেরও এক্ষণে গণনা করিতে হইবে।...

অভিনয়-ত্রয়-দিবসে অভিনেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই পুনঃ পুনঃ অভিনয়ের সজ্জাতেই রঙ্গভুমির বহির্ভাগে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে অভিনয়ের গাম্ভীর্য্য থাকে না।...

কলিকাতা। ৬ আষাঢ়, ১২৭৯ সাল।" কশ্চিৎ দর্শকঃ

উপরিউদ্ধৃত বিবরণের সহিত স্বর্গীয় মুস্তফি মহাশয়ের কতকগুলি কথার বেশ মিল দেখিতেছি,—যথা, "পর পর তিনটা শনিবার তিনটী অভিনয় হয়", "বর্ষাকালে...আমাদের ...প্রথম অভিনয় হ'ল।" কিন্তু তাঁহার কোন কোন কথা নির্ভরযোগ্য নহে, যেমন,—অভিনয়ের প্রথম দিনেই থিয়েটারের The National Theatre নামকরণ, অথবা লীলাবতী নাটকের অভিনয়কাল ১৮৭১—১২৭৮ সাল।

'মধ্যস্থ' হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখাইয়াছি 'লীলাবতী'র প্রথম অভিনয় হয় ১২৭৯, ৩০ বৈশাখ

---

* "রঙ্গভূমি" ৬ই মাঘ ১৩০৭ শনিবার, 'অর্দ্ধেন্দু বাবুর বক্তৃতা' শীর্ষক প্রবন্ধ।—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত "গিরিশ-প্রতিভা" পুস্তকের ৫৭৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

(১৮৭২, ১১ই মে) তারিখে। রাধামাধব কর মহাশয়ের স্মৃতিকথাতেও এই অভিনয়ের সঠিক তারিখ পাইতেছি। তাহাতে আছে :—

"১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে 'লীলাবতী' অভিনীত হইল। মুক্ত আকাশতলে উঠানের উপর দর্শকবৃন্দের বসিবার আসন করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজিয়া গেল।...

বহুপূর্ব্বে নবগোপাল মিত্র আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। Calcutta National Theatre নামকরণের প্রস্তাব আদৌ উল্লিখিত হয় নাই; নবগোপালের মুখ হইতে এরূপ অসঙ্গত নাম কখনই প্রস্তাবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।"*

(২) সুশীলবাবুর তালিকায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী', 'কমলে কামিনী', 'জামাই বারিক' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র নাম পাইলাম না। এগুলির প্রকাশকাল ও প্রথম অভিনয়ের তারিখ আমি পৌষ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র (দীনবন্ধু সংখ্যা) "দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" প্রবন্ধে দিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মনোমোহন বসুর নাট্যগ্রন্থ

(১) মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটকের প্রকাশকাল ১৮৬৮ সাল না হইয়া ১৮৬৭ সাল হইবে; কারণ, প্রথম সংস্করণের পুস্তক হস্তগত না হইলেও অন্য সংস্করণে মুদ্রিত "প্রথমবারের বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ দেখিতেছি—"শকাব্দাঃ ১৭৮৯, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।" তাহা ছাড়া ১৮৬৭ সালের ১৭ই জুলাই তারিখের *The National Paper* নামক সাপ্তাহিক পত্রেও ইহার সমালোচনা দেখিতেছি।

(২) সুশীলবাবুর তালিকায় মনোমোহন বসুর 'সতী নাটক'-এর প্রকাশকাল "১৮৭১," এবং বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক উহার অভিনয়ের তারিখ "১৮৭১" সাল বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই উভয় তারিখই ভুল। সুশীলবাবু বোধ হয় ১৩৩০ সালের মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের "বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ" নামক সচিত্র প্রবন্ধ হইতে ঐ তারিখ দুইটি গ্রহণ করিয়াছেন।

'সতী নাটক'-এর প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে "শকাব্দঃ ১৭৯৪" এবং "কৃতজ্ঞতা স্বীকার" পত্রে "১৭ই মাঘ, ১২৭৯ সাল" পাইতেছি। স্পষ্ট জানা যাইতেছে, সতী নাটক ১৮৭৩ সালের প্রারম্ভে প্রথম প্রকাশিত হয়,—১৮৭১ সালে নহে। ১৮৭৩, ৩০এ জানুয়ারি (১৮ মাঘ ১২৭৯) তারিখের "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত নিম্নলিখিত পত্রে সতী নাটকের মুদ্রাঙ্কণ ও মহলার কথা জনা যায় :—

"বহুবাজার নাট্যশালা। মহাশয়! সম্প্রতি কতিপয় ভদ্র যুবক কর্ত্তৃক বহুবাজার নাট্যশালা নামক একটী নূতন নাট্য-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাঁরা একটী নূতন মাঠ লইয়া তথায় নূতন নাট্যমন্দির করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাঁরা রামাভিষেক অভিনয় করিয়া লোকের নিকট অতিশয় আদরণীয় হইয়াছিলেন। ইহাঁরাই

---

* পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্য্যায়)—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত। ১৩৩০, পৃ. ১৭৬-৭৭, ১৭৪-৭৫।

রামাভিষেক মুদ্রাঙ্কণ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে অভিনয় করেন। এবারও ঐরূপ একখানি নূতন নাটকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য প্রায় শেষ করিয়াছেন, গুপ্ত অভ্যাস আরম্ভ হইয়াছে এবং বহুবাজার ঐক্যতান সমাজস্থ সভ্যেরা ইহাঁদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। ইহাঁরা প্রায় ৪।৫ বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী যন্ত্র সকল বাদন করিতেছেন। সম্প্রতি উক্ত ঐক্যতান সমাজে পাঁচ জন লোকের আবশ্যক হইয়াছে। পিওনো হারমোনিয়ম, কনসার্টিনা, সিকলে ফ্লুট ও ফ্লাগি ফ্লুট বাদক। সদ্বংশ্য ও বিদ্বান ব্যক্তির আবেদন সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হইবে। ঐক্যতানের অধ্যক্ষ (ব্যাণ্ডমাষ্টার) শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতী চরণ দাস উহাদিগকে শিক্ষা দিবেন, নাট্যশালা হইতে যন্ত্র সকল দেওয়া হইবে এবং উপদেশক অবৈতনিক। যাঁহাদিগের ২৫ বৎসর বয়স হইয়াছে তাঁহারা ৪০ নং মদন বড়ালের গলিতে স্বয়ং অথবা পত্র দ্বারা তত্ত্ব করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

বহুবাজার ঐক্যতান সমাজ
২৬শে জানুয়ারি ১৮৭৩
বশম্বদ।
শ্রীকামিক্ষাচরণ বসু।"

সতী নাটক ১৮৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে ২৫ নং বিশ্বনাথ মতিলালের লেনে* প্রথম অভিনীত হয়,—১৮৭১ সালে নহে। ১৮৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি (১০ মাঘ ১২৮০ বৃহস্পতিবার) তারিখে অমৃত বাজার পত্রিকা লিখিয়াছিলেন :—

"সংবাদ।...বহুবাজারে কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তি একটী সখের নাট্যসমাজ সংস্থাপন করিয়া একটী রঙ্গ-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবারে এখানে সতী নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ আপন আপন অংশ অতি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়টী দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। প্রসূতী ও সতীর দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যগুলি কমাইয়া ফেলিলে ভাল হয়। নাট্যসমাজের ঐক্যতান-বাদনটি আমাদের অতি মধুর লাগিয়াছিল।"

১২৮০ সালে মাঘ মাসের 'মধ্যস্থে' (পৃ. ৬৯৩) সতী নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ের এইরূপ বিবরণ দেখিতেছি :—

"কলিকাতায় প্রথমশ্রেণী বলিয়া যে কয়টী নট-সম্প্রদায় গণ্য ছিলেন বা আছেন, তন্মধ্যে বহুবাজারের নাট্য-সমাজও প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের দ্বারা রামাভিষেক নাটকের প্রথম অভিনয় প্রদর্শিত হয়—সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধানও বটে! যেহেতু উক্ত নাটক বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্ব দেশেই অভিনীত হইলেও তাঁহাদের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রদর্শন আর কোথাও যে হইয়াছিল, এমন আমরা শুনি নাই। সেই মহাশয়েরা এক্ষণে আবার 'সতীনাটক' নামা আর একখানি পৌরাণিক নাটকের অভিনয় করিতেছেন। তাঁহারা ফরমাইস করিয়া এই নাটকখানি রামাভিষেকের লেখক দ্বারা লিখাইয়া লইয়া আপনাদিগের ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।...আমরা দ্বিতীয় রজনীতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বহুবাজার নাট্যসমাজকর্ত্তৃক যে নবগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে,

* এই ঠিকানা এবং "শনিবার মাঘ ১২৮০" তারিখযুক্ত "সতীনাটকাভিনয়"-এর একখানি টিকিটের প্রতিলিপি ১৩৩০ সালের মাঘ মাসের 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

তদ্দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইলাম, সেই সুদীর্ঘ উচ্চগৃহ এরূপ রঙ্গভূমির সম্যগ্‌ উপযোগী। গৃহসজ্জা, পট ও আলোকাদির ব্যবস্থা বিশেষ মনোরম...।"

(৩) ১২৮১ সালের পৌষ মাসে (১৮৭৪ ডিসেম্বর ?) প্রকাশিত মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের নাম তালিকায় বাদ পড়িয়াছে। ১৮৭৪ সালের শেষাশেষি নাটকখানি বহুবাজারস্থ বঙ্গ-নাট্যালয়ে অভিনীত হয়। ১২৮১ সালের মাঘ মাসের 'মধ্যস্থে' পাইতেছি :—

"হরিশ্চন্দ্র নাটকাভিনয়।—বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গনাট্যসমাজের অবৈতনিক রঙ্গভূমিতে বাবু মনোমোহন বসুকৃত হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয় হইতেছে। আমরা বারদ্বয় দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি।..."

বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ সম্বন্ধে ১৮৭৪, ১৯এ মার্চ (৭ চৈত্র ১২৮০ বৃহস্পতিবার) তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল :—

"Last Saturday Babu Nilcomal Mittra of Allahabad and others, proprietors of the Bowbazar amateur Theatre gave a brilliant entertainment to H. H. of Vizianagram, Raja Chandra Nath Bahadoor, and a few European gentlemen."

উপসংহার

এই আলোচনা অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অথচ আরও কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা না করিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই যথাসাধ্য সংক্ষেপে কথা কয়টি বলিতে হইতেছে। এই আলোচনার প্রারম্ভেই বলিয়াছি সুশীলবাবুর প্রবন্ধে অনেকগুলি অসঙ্গতি লক্ষিত হইল যাহার জন্য তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে পাঠকের একটু অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। এই সকল অসঙ্গতির কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

(১) সুশীলবাবুর প্রবন্ধের ৩৫ পৃষ্ঠায় আছে :—"৫ই [জানুয়ারি ১৮৬৭] তারিখে, 'নব-নাটক' পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ীতে মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল।" আবার ৫৩ পৃষ্ঠায় বাংলা নাটকের তালিকায় দেখিতেছি :—"৬ই জানুয়ারী ১৮৬৭—জোড়াসাঁকো, নাট্যশালা কমিটি, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটী।" দুইটি উক্তির কোনটিই নির্ভুল নহে।

(২) প্রবন্ধের ৪৬ পৃষ্ঠার ৩৩ নং পাদটীকায় সুশীলবাবু 'আর্য্যাশতক' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :— "এই সংস্কৃত গ্রন্থ ১২৭৮ সালে (= ১৮৭১ খৃঃ অব্দে) রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।" তাহার পরই আবার পূর্ব্বোক্ত ৫৪ পৃষ্ঠায় 'দ্রষ্টব্যে' তিনি বলিতেছেন, "আর্য্যাশতকের তারিখ ১২৭৯ হইবে।" কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সুশীলবাবু এই তারিখটি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ তিনি করেন নাই। তবে মনে হয় গত আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'নাটুকে রামানারাণ' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে 'আর্য্যাশতকে'র তারিখ ১২৭৯ বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি এই পরিবর্ত্তনটুকু করিয়াছেন। এই পরিশিষ্টটি আমারই লিখিত। বলা প্রয়োজন যে 'আর্য্যাশতক' প্রকাশের প্রকৃত তারিখ ১২৭৮ই—১২৭৯ নয়। এই ব্যাপারে আমার একটু ভুল হইয়াছিল ; কেন হইয়াছিল পরে বলিব। কিন্তু সুশীলবাবু বিনা বিচারে আমার তারিখটি গ্রহণ করিয়া ভুলে পড়িয়াছেন এবং যে-যুক্তির বলে প্রথমে তিনি আর্য্যাশতক প্রকাশের তারিখ ১২৭৮ সাল বলিয়াছিলেন তাহাও সম্পূর্ণ ভুল।

সুশীলবাবু অনেক জায়গায় রামনারায়ণের আত্মকথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের ৪৬ পৃষ্ঠায় ৩৩ নং পাদটীকায় আছে :—

"রামনারায়ণ লিখিয়াছেন যে, 'বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি'। এই সংস্কৃত গ্রন্থ ১২৭৮ সালে...রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহার আত্মকথা এই সালেই লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়।"

কিন্তু আর্য্যাশতক এবং আত্মকথা যে ১২৭৮ সালে লিখিত হইতে পারে না রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে তাহা প্রমাণ করা যায়। রামনারায়ণ লিখিতেছেন :—

"১২৭৮ সালে মহাবিদ্যারাধন নামে দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি।"

ইহা হইতে কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, রামনারায়ণের স্মৃতি অনুযায়ী ১২৭৮ সালের পরে, যে-বৎসরে আর্য্যাশতক প্রস্তুত হয় সেই বৎসরই আত্মকথা লিখিত হইয়াছিল। আমি এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া এবং ১২৭৯ সালের মাঘ মাসের 'মধ্যস্থে' আর্য্যাশতকের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আর্য্যাশতকের তারিখ ১২৭৯ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। পরে অনুসন্ধান করিয়া আরও নূতন প্রমাণ পাওয়াতে দেখিতে পাইতেছি যে আর্য্যাশতকের রচনাকাল সম্বন্ধে রামনারায়ণের নিজের উক্তিও অভ্রান্ত নয়;—অবশ্য 'মহাবিদ্যারাধন' ১২৭৮ সালেই প্রকাশিত হইয়াছিল, এই তারিখটি ছাপিবার সময়ে যদি কোন মুদ্রাকর প্রমাদ না ঘটিয়া থাকে। রামনারায়ণের আত্মকথা অধ্যাপক শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মুদ্রণে তারিখগুলি যে সর্ব্বত্র নির্ভুলভাবে ছাপা হয় নাই, তাহার অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত—অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটক রচনার তারিখ "১২৬৭" না হইয়া ১২৬৯ মুদ্রিত হইয়াছে। আমার মনে হয় আত্মকথার ক্ষেত্রে রামনারায়ণের নিজের ভুল হওয়া অপেক্ষা ছাপার ভুল হওয়াই বেশী সম্ভবপর।

কিন্তু সে যাহাই হউক আর্য্যাশতক যে কিছুতেই ১২৭৯ সালে প্রকাশিত হইতে পারে না তাহার প্রমাণ দিতেছি।*

(ক) ১২৭৮ সালের ২রা চৈত্র (১৪ মার্চ ১৮৭২) তারিখের "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় পাইতেছি :—

"পুস্তক প্রাপ্তি।—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমরা নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। আর্য্যশতকম্ (সংস্কৃত)

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।..."

(খ) ১৮৭২ সালের ১৮ই মার্চ (=৬ চৈত্র ১২৭৮) তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' আর্য্যাশতকের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতেছি। সুতরাং রামনারায়ণের 'আর্য্যাশতক' যে ১২৭৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত।

(৩) সুশীলবাবু আর্য্যাশতক এবং আত্মকথার তারিখ ১২৭৮ অথবা ১২৭৯ বলিয়া

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট এক খণ্ড 'আর্য্যাশতক' দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার আখ্যাপত্রখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

উল্লেখ করিলেও, বলিবার ভঙ্গী হইতে সর্ব্বত্র মনে হয় আত্মকথা রচনার ঠিক তারিখ সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহ আছে। তিনি লিখিতেছেন ঃ—

(ক) "যখন রামনারায়ণ তাঁহার আত্মকথা লিখিয়া রাখেন, তখনও বোধ হয় এই গ্রন্থখানি [স্বপ্নধন] মুদ্রিত হয় নাই" [পৃ. ৪৬]। অথচ স্বপ্নধন-প্রকাশের তারিখ ১২৮০ সুশীলবাবুর লেখাতেই আছে!

(খ) "'কংসবধ' ১২৮২ সালে...রচিত ও মুদ্রিত...রামনারায়ণ তাঁহার আত্মকথায় ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই" (পৃ. ৪৫)।

(গ) "'ধর্ম্মবিজয়' নাটক...রামনারায়ণের আত্মকথাতে ইহারও উল্লেখ নাই" (পৃ. ৪৬), অথচ এই নাটকের প্রকাশকাল—১২৮২ সাল—সুশীলবাবুর প্রবন্ধেই দেওয়া আছে!

(ঘ) রামনারায়ণের "আত্মকথা এই সালেই (১২৭৮) লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। বোধ হয় এই কারণেই আত্মকথায় 'কংসবধ' ও 'ধর্ম্মবিজয়' নাটকের উল্লেখ নাই।"

১২৭৮ অথবা ১২৭৯ সালে আর্য্যাশতক এবং আত্মকথা লিখিত হইয়াছে, এ-কথা নিজে বলিয়াও সুশীলবাবু কেন যে এই সকল অনাবশ্যক কথা তুলিতেছেন তাহা বুঝিতে পরিলাম না। যে-আত্মকথা, তাঁহারই মতে, ১২৭৮ অথবা ১২৭৯ সালে রচিত, তাহাতে পরবর্ত্তী কালের বিবরণ কেমন করিয়া স্থান পাইতে পারে?

১৩, বেথুন রো,
কলিকাতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দের মন্তব্য

'পত্রিকা'র সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ব্রজেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত আলোচনাটি আমার মন্তব্যের জন্য পাঠাইয়াছেন। মন্তব্য করিবার বিশেষ কিছু নাই, কারণ ব্রজেন্দ্রবাবু আমার প্রবন্ধের যে-সকল ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ তিনি সমসাময়িক কাগজপত্র হইতে দেখাইয়াছেন; সুতরাং মতভেদের সম্ভাবনা নাই। যখন আমি উক্ত প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম, তখন এইরূপ আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, এবং ব্রজেন্দ্রবাবুর আলোচনায় যে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি তাহা বলা বাহুল্য। তদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণরূপে লিখিত হয় নাই; এইরূপ আলোচনার দ্বারাই তাহার উপকরণ সংগৃহীত হইবে। ব্রজেন্দ্রবাবু যে-সকল কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাহা সকলের সুপ্রাপ্য নহে। বিশেষতঃ ঢাকায় থাকিয়া সেগুলি আমার অধিগম্য নহে। ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ও অসাধারণ। বর্ত্তমান সমালোচনায় সমসাময়িক পত্রিকাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি আমার ও অন্যের অনেক সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অনেকগুলি বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত এখন চূড়ান্ত নিষ্পত্তিরূপে গৃহীত হইবে; পরে আর এ-সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর থাকিবে না। তাঁহার সমালোচনা আমার

প্রবন্ধের অনেক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে তজ্জন্য শুধু আমার নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগীমাত্রেরই তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

দু-একটি স্থলে, আমার প্রবন্ধে রচনা বা অভিনয়ের তারিখে এক বৎসরের এদিক-ওদিক হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ বাঙ্গালা সন বা শকাব্দ হইতে ইংরাজী অব্দ দেওয়া সকল সময়ে নির্ভুল হয় নাই। এগুলির নিঃসন্দেহরূপে সংশোধন করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

পরিশিষ্টে বাঙ্গালা নাটকের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা খসড়ামাত্র; তাহা যে সম্পূর্ণ বা নির্ভুল নহে তাহা জানিতাম। যাহাতে সমালোচনার দ্বারা তথ্য নির্ণীত হইতে পারে তাহাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আশা করি ব্রজেন্দ্রবাবু পরে একটি সম্পূর্ণ ও নির্ভুল তালিকা, সমসাময়িক পত্রিকাদি হইতে প্রস্তুত করিয়া প্রকাশিত করিবেন।

অনেক স্থলে তাঁহার পূর্ব্বের আলোচনা হইতে (বিশেষতঃ গত কয়েক সংখ্যা 'প্রবাসী' হইতে) অনেক তথ্য আমি সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বত্র ইহার স্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। স্বীকার করার যে প্রয়োজন আছে তাহাও মনে হয় নাই, কারণ এ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত লেখাগুলি অনুরাগী পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এইরূপ আমার ধারণা ছিল। এ ত্রুটি স্বেচ্ছাকৃত অকৃতজ্ঞতা নহে, কারণ পূর্ব্বগামীদের সিদ্ধান্ত অনুগামী লেখকের উপজীব্য স্বরূপ।

আমার প্রবন্ধে আরও কয়েকটি ভুল ও অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে; ব্রজেন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক পরে এগুলির প্রতিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সেগুলিও সংশোধন করিয়া লইতেছি।

(১) ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি :—"সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক ভদ্রার্জ্জুনের রচয়িতা..."। কিন্তু 'ভদ্রার্জ্জুন'কে এখন আর সর্ব্বপ্রথম নাটক বলা যায় না। সুতরাং 'সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক' কথাগুলি বর্জ্জিত হইবে।

(২) ৫৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় "তাহা বোধ হয় ঠিক নয়," এই স্থলে "বোধ হয়" এই বাক্য নিষ্প্রয়োজন।

(৩) প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থলে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' ও 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' এইরূপ ছাপা হইয়াছে। হওয়া উচিত ছিল 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'—রামনারায়ণ স্বয়ং নামটি এইরূপই দিয়াছেন। অথবা সর্ব্বত্র একই প্রণালীতে ছাপা হওয়া উচিত ছিল।

(৪) ২৪ পৃষ্ঠায় রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে উদ্ধার-চিহ্নের মধ্যে যে অংশটি তুলিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহাতে সামান্য ভুল রহিয়া গিয়াছে। তাহা এইরূপ হইবে—"আমি বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড অধ্যয়ন করি।"

(৫) ২৪ পৃষ্ঠায় রামনারায়ণের মৃত্যুর তারিখ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইবে। এবং সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিয়োগের তারিখ ১৬ই জুন হইবে।

দ্রষ্টব্য —

এই আলোচনার শেষাংশ মুদ্রণকালে, চাংড়িপোতা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ আমাকে কতকগুলি পুরাতন 'সোমপ্রকাশ' দেখাইয়াছেন। তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন আছে।

(১) ১২০ পৃষ্ঠায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতীমাধব' নাটকের অভিনয়-কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। নাটকখানি ১৮৬৯, ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত হয়। ১৮৬৯, ১৫ই ফেব্রুয়ারি (৫ ফাল্গুন ১২৭৫) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দেখিতেছি :—

> মালতীমাধব নাটকের অভিনয়।—গত ২৫এ মাঘ শনিবার রাত্রিতে আমরা পাথুরিয়াঘাটায় মালতীমাধব নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।... ...গ্রন্থের নায়ক মাধব ; কিন্তু তাঁহার অভিনয় প্রীতিকর হয় নাই।...
>
> মকরন্দের অভিনয়টী অতিশয় মনোহর হইয়াছে। তাঁহার অভিনয়ে, চতুরতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, সদাশয়তা ও অকপট মিত্রানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। অঘোরঘণ্টের পূজা মন্ত্রপাঠ, কপালকুণ্ডলার বলিদানের উদ্যোগ হইয়াছে বলিয়া জিজ্ঞাসা এগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। মাধব যখন মালতীর উদ্ধারসাধন করিলেন তখন তাঁহার মনোরথ বিফল ও যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত হইল দেখিয়া তাঁহার প্রগাঢ় ক্রোধ গালী না দিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে কটিবন্ধন, অব্যাকুলভাবে মাধবকে খড়্গাঘাত করিবার উদ্যোগ, নয়নরক্তিমা ও অঙ্গভঙ্গি এগুলি অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল। বৃদ্ধ মন্ত্রীর যোগিবেশ ও ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া শোকসম্বরণ অপ্রীতিকর হয় নাই। মালতীর অভিনয় উত্তম হইয়াছে। কামন্দকীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব স্ত্রীজনদুর্লভ প্রশান্ত সাহস ও চতুরতা অতিশয় আনন্দিত করিয়াছিল। চন্দ্রোদয় মেঘাড়ম্বর বিদ্যুৎ জলপ্রপাত প্রভৃতিও যার পর নাই প্রীতিকর হইয়াছিল। এখানকার একতানবাদ্যের ন্যায় বাদ্য আমরা আর কোথায়ও শ্রবণ করি নাই।

(২) ১১৮ পৃষ্ঠায় 'এঁরাই আবার বড়লোক' পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির বাংলা পুস্তকের তালিকায় ইহার প্রকাশকাল ১৮৬৮ সাল দেওয়া আছে। ১৮৬৮ সালের ১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৫) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' একজন দর্শক ইহার অভিনয়ের যে দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> সম্প্রতি ঠনঠনিয়াতে একটী নাট্যালয় হইয়াছে। গত শনিবার [৯ মে] তথায় 'এঁরাই আবার বড় লোক' নামে এক নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয়ের সঙ্গে একতান বাদ্য ও গীতও হইয়াছিল।
>
> নাটকখানির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসার্হ। সুরাপানের দোষোল্লেখ করিয়া তাহা হইতে লোককে পরাঙ্মুখ করা ও সুরাপান প্রভৃতি কতিপয় কুক্রিয়ায় আসক্ত হওয়াতেই নব্য বাঙ্গালিরা যে স্বদেশের রীতি পদ্ধতির সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াও বিফলপ্রযত্ন ও পরিণামে হাস্যাস্পদ হইতেছেন, তাহা প্রমাণ করা এই নাটকের উদ্দেশ্য।...
>
> গ্রন্থের যে দোষ থাকুক, অভিনয় অতি সুন্দর ও যাবতীয় শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অঙ্গভঙ্গী, আর্ত্তনাদ, রোদন, আহত হইয়া ভূতলে পতন ও মৃতকল্প হইয়া শয়ন এবং সূর্য্যাস্ত বিদ্যুৎ মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত প্রভৃতি অতি সুন্দর ও প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াছিল। 'মাষ্টার কেষ্টোকিশোর' অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন।...

(৩) সুশীলবাবুর তালিকায় নিমাইচন্দ্র শীলের 'চন্দ্রাবতী' নাটকের "অভিনয়স্থল"-এর কোন উল্লেখ নাই। নাটকখানি ১৮৭০ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে হুগলী ঘুটিয়াবাজারে সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ১৮৭০, ১৪ই নভেম্বর (২৯ কার্ত্তিক ১২৭৭) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই অভিনয়ের যে দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> গত ৩০এ আশ্বিন শনিবার হুগলীর ঘুটিয়া বাজারের নব-নির্ম্মিত রঙ্গভূমিতে চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ শীলের বিরচিত চন্দ্রাবতী নাটকখানির প্রথম অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে।... ...

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সংখ্যার 'শূন্যপুরাণ' নামক প্রবন্ধের সহিত পঠিতব্য

টিপ্পনী

বিহার (৭৮ পৃঃ)

বিহার (চলিত্ নাম বেহার) কোতুলপুরের ঈশানকোণে দ্বারকেশ্বরের বামকূলে। ইহার একমাইল পূর্বদিকে বামকূলে পরিখাপাড়া নামে এক ছোট গ্রাম আছে। এই গ্রাম উচ্চ ডাঙ্গা। ইহার পরে নিম্নভূমি। গ্রামে এক দীঘি আছে। মনে হয়, এই গ্রামে এক রাজপুরী ছিল, তাহার পরিখা হইতে গ্রামের নাম হইয়াছে। বোধ হয়, ঘনরাম এই পুরীর রাজার নাম মকরাক্ষ শুনিয়াছিলেন। এখন কোন কিম্বদন্তী নাই। কিন্তু এখানকার এঁটেল মাটিতে 'চম্পা' (দ্বীপ) সম্ভব বোধ হয় না। দুই তিন মাইল দক্ষিণে চম্পা আছে। তাহা হইতে চম্পা ও ঝুম্ঝুমি নাম। বিহার নাম নূতন নয়। অনেক কাল যাবৎ "জোত বিহার" বিষ্ণুপুরের রাজার ছিল। এই অঞ্চল সবিশেষ পরিদর্শন আবশ্যক।

ময়নাগড় (পাদটীকা ৮০ পৃঃ)

সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, ময়নাগড়ে ধর্মরাজ কিম্বা ধর্মরাজের মন্দির নাই। কিন্তু এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বৈশাখ ও ভাদ্র সংক্রান্তির দিন ধর্মরজের পূজা হয়। (বোধ হয়, শিলাখণ্ডে।) ময়নাগড়ের কিছু পূর্বদিকে দোবান্দা-কালাগণ্ডা নামক গ্রামে এক মাহিষ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে এক ধর্মরাজ আছেন। পণ্ডিত ইঁহার পূজার নিমিত্ত রাজবংশ হইতে ভূমি পাইয়াছেন। ময়নাগড়ের পূর্বে ও উত্তরে কাঁসাই নদী। পূর্ব্বকালে নাকি এই কাঁসাইকে কালিন্দী, সংক্ষেপে কালিনী বলিত। কাঁসাই রূপনারাণে পড়িয়াছে। যে নদী এক বড় নদীতে পড়ে, সে নদীর নাম কালিন্দী, এখানেও এই সংজ্ঞা পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ কালিন্দী নাম দ্বারা লাউসেনের ময়না চিহ্নিত হইতেছে না। ঘনরাম পদুমার বিল পার হইয়াই কালিন্দী পাইয়াছিলেন। কোতুলপুরের নিকট লাউগ্রাম ও পদুমা। এখন এই বিল বা জলা অনেক দক্ষিণে সরিয়া গিয়া বড়দা-র জলা নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহার পরেই কালিন্দী ছিল।

আম্বর জাজাল (টীকা ৯৫ পৃঃ)

টীকায় 'আম্বর' অভ্র কল্পনা করিয়াছি। সেটা ভুল। বোধ হয়, পুথীতে 'তাম্বর' ছিল, পাঠে ভুল হইয়া 'আম্বর' ছাপা হইয়াছে। এই জাজাল রামাই পণ্ডিতের। তাম্র তাঁহার লক্ষণ। গায়েন, তামা ও তাম্র শব্দ দ্বারা দুই ধাতু মনে করিয়াছেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার*

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের বাড়ী গুপ্তিপাড়া। গুপ্তিপাড়া কাল্‌নার একটু দক্ষিণে গঙ্গার ধারে, শান্তিপুরের প্রায় আরপার। এখানে বহুদিন ধরিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণের বাস। এখানকার ব্রাহ্মণেরা বড়ই স্পষ্টবাদী ছিলেন এবং বড়ই রসিক ছিলেন। শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলো, এই তিন জায়গায় ব্রাহ্মণেরা পরস্পর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া বাঙ্গালাদেশকে অনেকদিন সজাগ রাখিয়াছিলেন। শান্তিপুরের লোক গুপ্তিপাড়ার লোককে বাঁদর বলিত এবং গুপ্তিপাড়ার লোক উলো শান্তিপুরের লোককে পাগল বলিত। তাহাই লইয়া পরস্পর খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিত।

বাণেশ্বর শোভাকরের সন্তান। শোভাকর দেবীবর ঘটকের গুরু ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১৪৮২ সালে দেবীবর রাঢ়ীশ্রেণীর বড় বড় কুলীনকে একত্র করিয়া তাহাদের মেলবন্ধন করেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও দেবীবর মাসতুতো ভাই ছিলেন। যোগেশ্বর বড় কুলীন, দেবীবর শ্রোত্রিয়, সেই জন্য যোগেশ্বর পণ্ডিত মাসীর বাড়ী ভাত খান নাই। তাহাতে দেবীবর অত্যন্ত চটিয়া যান, এবং কুলীনের যত দোষ আছে, সেইগুলি প্রচার করিয়া দিবার জন্য সব কুলীনদের লইয়া সভা করেন। সভায় সব বড় বড় কুলীন উপস্থিত ছিলেন। সভা হয় গুরু শোভাকরের বাড়ীতে। গুরুর বাড়ী ছিল আয়দায়। কাল্‌না হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম। এই সভায় যত কুলীনের এক রকম দোষ ছিল, তাহাদের এক একটি মেল করিয়া দেওয়া হয়, তাহারা সেই মেলের মধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, এ দিক্‌ ও দিক্‌ করিতে পারিবে না। সে সকল দোষ নানা রকম। সে সব পুরাণো কাশুন্দি আর ঘাঁটিয়া কাজ নাই। এইরূপে ছত্রিশটি মেলের উৎপত্তি হয়। বড় দোষে বড় মেল হয়।

শোভাকর ২।৩ দিন দেবীবরের কার্য্যকলাপ দেখিয়া একদিন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবীবর! আমার কি কুল হইল? তাহাতে দেবীবর উত্তর করিলেন,—

ডাক দিয়ে কয় দেবীবর।
নিষ্কুল শোভাকর।

শোভাকর বলিলেন,—

ডাক দিয়ে কয় শোভাকর।
নির্ব্বংশ দেবীবর॥

শোভাকরের কুল হইল না বটে, কিন্তু শোভাকরের বংশ নানা কারণে বাঙ্গালায় খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিল। শোভাকরের বংশ আয়দার চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই বংশে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের জন্ম।

আয়দা হইতে গুপ্তিপাড়া বেশী দূর নয়। সেখানে শোভাকরের বংশ থাকা বিচিত্র নয় গুপ্তিপাড়া একটি গণ্ডগ্রাম। সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্র নামে এক ঠাকুর আছেন। তাঁহার বিস্তর

* ১৩৩৮। ২৭এ অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সম্পত্তি। একজন সন্ন্যাসী সেই সম্পত্তির মালিক। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। রথে বেশ জাঁক হয়। রামসীতারও একটি মন্দির আছে। মন্দিরের কিছু সম্পত্তি আছে। অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেখানে ছিলেন। গুপ্তিপাড়ায় পত্র দিতে হইলে ৫।৭ খানা পত্র প্রায় দিতে হইত। একখানি মাত্র পত্র দিতে হইলে একজন বড় নৈয়ায়িককে দিতে হইত; তাঁহাকে একপত্রী বলিত।

• শোভাকরের বংশে গুপ্তিপাড়ায় রাম নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নৈয়ায়িক ছিলেন। বিচারে তাঁহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। বিচারকালে তাঁহাকে সিংহের মত বলিয়া মনে হইত; অথচ তিনি বেশ কবিও ছিলেন, তাঁহার কবিতায় অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র রাঘবেন্দ্র; তাঁহার খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র বিষ্ণু সিদ্ধান্তবাগীশ; ইঁনি পিতার নিকট মন্ত্র পাইয়া সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার কাব্যে পাথরও গলিয়া যায়, বজ্রও শিরীষফুলের মতন নরম হইয়া যায়। তাঁহার বিদ্যার যশঃ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পুত্র রামদেব তর্কবাগীশ। রামদেবের পুত্র বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।•

•বাণেশ্বর ছেলেবেলায় খুব চালাক-চতুর ছিলেন, এবং বোধ হয়, বড় দুষ্টও ছিলেন। পিতা রামদেব বাণেশ্বরের আকার-প্রকার দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—কালে বাণুও পণ্ডিত হবে। হইয়াছিলও তাই। বাণেশ্বর গুপ্তিপাড়ার লোকের মত সাহসী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। টোলের পড়া শেষ করিয়া তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু একদিন কি রসিকতা করিয়া তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কোপে পড়েন। তাই তিনি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে যান এবং সেখানে রাজা চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত হন। খ্রীষ্টীয় ১৬৯৬ সালে বরদা পরগণার রাজা শোভাসিংহ যখন উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত মিলিয়া রাঢ়দেশে মহা উৎপাত আরম্ভ করেন, তখন রাজা কৃষ্ণরাম বর্দ্ধমানের রাজা। তাঁহার কন্যাকে আক্রমণ করিয়া কিরূপে শোভাসিংহ সেই কন্যার হাতে প্রাণ হারান, সে কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরায়। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র। কীর্ত্তিচন্দ্রের খুব নাম হইয়াছিল। তাঁহার পর চিত্রসেন রাজা হন। চিত্রসেন রাজার সময় রাঢ়ে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। রাজা চিত্রসেন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে গুপ্তিপাড়া হইতে আনাইয়া আপনার সভাপণ্ডিত করেন এবং তাঁহাকে চিত্রচম্পূ নামে আপনার এক জীবনচরিত লিখিতে বলেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন বর্গীর হাঙ্গামা খুব চলিতেছে, সেই সময়ে চিত্রচম্পূ লেখা হয়। গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত হইয়া যে কাব্য হয়, তাহার নাম চম্পূ। বাণেশ্বরের এই চম্পূ বাঙ্গালার এক অপূর্ব্ব কাব্য। এখন ইহার পুথি বড় পাওয়া যায় না। কোলব্রুক সাহেব একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিসে দিয়াছেন। আর একখানি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানায় আছে। ইহা হইতে আমরা বর্গীর হাঙ্গামার অনেক কথা জানিতে পারি। বর্গীর হাঙ্গামার সময় মহারাজা চিত্রসেন বর্গীদের সহিত অনেকবার লড়াই করিয়াছিলেন।• তিনি বর্গীদের হাত হইতে প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণ-প্রয়াগে অর্থাৎ ত্রিবেণীতে গমন করেন এবং ত্রিবেণী হইতে সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার পূর্ব্বপারে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সে দুর্গের চিহ্ন এখনও আছে; উহাকে কাউগাছির গড় বলে। শ্যামনগর ষ্টেসনের প্লাটফরমের কিছু

পূর্ব্বে ঐ গড়ের খাদ এখনও দেখা যায়। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে বড় বড় ফটক ছিল। সে ফটকের ভিতর দিয়া হাতী অনায়াসে চলিয়া যাইত। এইখান হইতে মহারাজা চিত্রসেন রাঢ়ে বর্গী'দের উপর খুব উৎপাত করিতেন ও তাহাদের তাড়াইয়া দিতেন। বর্গী'রা গঙ্গা পার হইতে পারে নাই। এখন যেখানে হুগলীর পোল হইয়াছে, গঙ্গা সেখানে অতি সরু থাকায় পার হইয়া বর্গী'রা একবার গরিফার হাতীবাগানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেখান হইতে মাঠ দিয়া দক্ষিণ মুখে আসিতেছিল। সে সময়ে যশোরের চাঁচড়ার রাজারা আতপুরে থাকিতেন, সেখানে তাঁহাদের গঙ্গাবাসের বাটী ছিল। তাঁহারা মাঠে পগার কাটিয়া, তাহার উপর পাকাটী বিছাইয়া, তাহার উপর ঘাসের চাপড়া দিয়া এমন করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বর্গী'রা টের পায় নাই, এখানে গর্ত্ত আছে। যেমন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিবে, অমনি গর্ত্তে পড়িয়া ঘোড়ার পা খোঁড়া হইয়া গেল। তার পর তাহারা আর এ পারে আসিবার চেষ্টা করে নাই।

চিত্রসেন রাজার মাণিক্যচন্দ্র নামে একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার বাড়ীও গুপ্তিপাড়ায় ছিল। কারণ, প্রেম-ভক্তি দেবী যখন চিত্রসেন রাজাকে স্বপ্নে নানা তীর্থ দেখাইয়া তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তিনি গুপ্তিপাড়ার উপর হইতে মাণিক্যচন্দ্র ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছিলেন,—তুমি ইহাদিগকে প্রতিপালন করিও। বড় রাজার দাওয়ান হইতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, মাণিক্যচন্দ্রের সে সকলই ছিল। বাণেশ্বর বলিয়াছেন,—তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন;—নিজেও গদ্য-পদ্য লিখিতেন এবং অন্যে গদ্য-পদ্য লিখিলে তাহার গুণদোষের বিচার করিতে পারিতেন এবং তাহার রসগ্রহণ করিতে পারিতেন।

তিনি খুব যোদ্ধা ছিলেন। শত্রুপক্ষের সৈন্যসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের বিহত বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারিতেন। তিনি যখন ধনু হইতে বাণ ছাড়িতেন অথবা তরবারি চালাইতেন, তখন শত্রুর মুণ্ডে পৃথিবী ছাইয়া যাইত। তিনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান্—ইঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তিনি মন্দির দিয়াছিলেন। নীতিশাস্ত্রে তিনি সুনিপুণ ছিলেন। বর্দ্ধমানরাজের প্রকাণ্ড জমীদারী তিনি নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পারিতেন। তিনি যাহার উপর সুনজর করিতেন, সে অট্টালিকায় বাস করিত, তাহার দ্বারে হাতী বাঁধা থাকিত। একজন কবি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—

রে বিদ্যা বিবিধাঃ কলাশ্চ সকলাঃ সঙ্গীতনৃত্যাদয়ো
রে বৈদগ্ধ্যবিলাস দেবি কবিতে ধীরাঃ কবীনাং করাঃ।
ব্রূত ব্রূত কথং কুতঃ ক নু ভবেদ্বিশ্রান্তিলেশোঽদ্য বঃ
শ্রীমান্ বিজ্ঞশিরোমণিঃ ক্ষিতিতলে মাণিক্যচন্দ্রো ন চেৎ॥

• বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহারাজ চিত্রসেনের মৃত্যুর পর বর্দ্ধমান ছাড়িয়া আবার কৃষ্ণনগরে আসেন এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত হন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পুরাণ পড়িয়া শুনাইতেন। এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজের রাজত্ব আরম্ভ হয়। বাণেশ্বর সকল সময়ই ইংরাজদের সহায়তা করিতেন। ইংরাজেরা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা লইতে হইলে তাঁহারই কাছে লইতেন। কিন্তু অল্প দিন পরে তাঁহার একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। তিনি ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।•

• একবার কোম্পানীর বহর কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ যাইতেছিল। সে দিন একটা যোগ ছিল। ত্রিবেণীর ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। সকলেই স্নান করিতে উৎসুক; কিন্তু কোম্পানীর হুকুম হইল—বহর যতক্ষণ না চলিয়া যায়, ততক্ষণ কেহ জলে নামিতে পারিবে না। জগন্নাথ দেখিলেন,—তাহা হইলে যোগ বহিয়া যায়; লোকের স্নান করা হয় না। তিনি অধ্যক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন,— বহর বরং একটু পরে যাইবে। ইহাদের যোগ বহিয়া যাইতে দেওয়া উচিত নয়। অধ্যক্ষ বলিয়া পাঠাইলেন,—আমরা বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের ব্যবস্থা পাইয়াছি। তখন জগন্নাথ হুকুম দিলেন, 'তোমরা সব গঙ্গায় নাব'। কাজেই বহর ঘণ্টা দুই আটকাইয়া রহিল। বাণেশ্বর মরিলে কৃষ্ণনগরের রাজার বাড়ীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের খুব প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং ইংরাজ কোম্পানীও তাঁহাকে খুব খাতির করিতেন।•

• বাণেশ্বর বলিতেছেন,—কলিযুগের যখন ৪৮৪৩ বৎসর এবং শকাব্দ ১৬৬৪ অর্থাৎ খ্রীঃ ১৭৪২, সেই সময় বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি রাজা সাহুর সৈন্যগণ বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িল। রাজা সাহু শিবাজীর পৌত্র। খ্রীঃ ১৬৮৯ সালে আওরঙ্গজীব শিবাজীর ছেলে শম্ভুজীকে ধরিয়া ফেলেন এবং তাঁহার জিব কাটিয়া ফেলিয়া তাঁহার প্রাণ নাশ করেন। সেই সময়ে শম্ভুজীর পুত্র ছোট শিবাজীকে আপনার রঙ্গমহলে আটক করিয়া রাখেন। শিবাজীর বয়স তখন অতি অল্প। আওরঙ্গজীব বড় শিবাজী ও শম্ভুজীকে চোট্টা বা চোর বলিতেন; এই জন্য ছোট শিবাজীকে তিনি সাহু বা সাধু বলিতেন। এমনি বিধাতার বিড়ম্বনা—শিবাজীর পৌত্র সাহু নামেই চলিয়া গেলেন। মহারাষ্ট্র এই সময় নামে রাজা সাহুর অধীন হইলেও কাজে অনেকগুলি রাজত্ব হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম—তাঁহার প্রধান মন্ত্রী (পন্তপ্রধান) পেশোয়া, রাজার সব ক্ষমতা নিজে গ্রাস করিয়াছিলেন এবং মালোয়ার সুবেদারী বাদশার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সিন্ধিয়া, হোলকার ও উদোজী পোয়ারকে ভাগ করিয়া দেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রধান সেনাপতি কুন্দেরাও ধাবাড়ে প্রায় সমস্ত গুজরাটই দখল করিয়া লন। কিন্তু পেশোয়া লড়াই করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করেন। বন্দোবস্ত হয় যে, গুজরাটের অর্দ্ধেক পেশোয়ার ও অর্দ্ধেক কুন্দেরাও ধাবাড়ের ছেলের হইবে। কুন্দেরাও-এর ছেলে তখন খুব ছোট; কাজেই পিলেজি গুইকোয়াড় তাঁহার অভিভাবক হইলেন। ছেলেটি অল্পদিনেই মারা গেল। পিলেজির বংশ এখনও গুজরাটের অর্দ্ধেক ভোগ করিতেছেন। নাগপুরের ভোঁসলা রাজা সাহুর এক বংশের লোক এবং রাজা সাহুকে কিছু মানিয়াও চলিতেন। বাঙ্গালার বর্গীর হাঙ্গামা তাঁহারই কীর্ত্তি। • বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রাজা সাহুর উপর দোষ দিলেও, নাগপুরের রাজা যে বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার কারণ—ইহা সকলেই জানে। মহারাষ্ট্র ভাষায় ঘোড়সোয়ার সৈন্যকে বারগির বলে; সেই জন্য তাহাদের বাঙ্গালা আক্রমণকে বারগির হাঙ্গামা বলে। বাঙ্গালায় আমরা উহাদের বর্গী বলি। সুতরাং 'বারগির' কথার শেষ র-টি বাঙ্গালায় সম্বন্ধের চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।•

বাণেশ্বর বর্গীর হাঙ্গামার কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নমুনা দেওয়া যাইতেছে। লোকে বলে,—সংস্কৃতে ইতিহাস নাই; আছে কি না, তাহা এই নমুনা হইতেও বুঝা যাইবে।*

---

* শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৩৫শ ভাগে 'বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ' নামক প্রবন্ধে বাণেশ্বর লিখিত সংস্কৃত সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় প্রবাসীতে (১৩৩৮—১ম খণ্ড) 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

বর্গীরা দিনে শত যোজন পথ অতিক্রম করে। যাহাদের অস্ত্র নাই, যাহারা দীন—তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। স্ত্রী বালককেও ছাড়ে না। সমস্ত ধন হরণ করে। সাধ্বী স্ত্রীদিগকে লইয়া যায়। আর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে চুপি চুপি দেশান্তরে পলাইয়া যায়। তাহাদের প্রধান বল—ছোট ছোট ঘোড়া। তাহাদের বেগ অপরিসীম।

বর্গীদের এরূপ স্বভাব-চরিত্র দেশময় রাষ্ট্র ছিল। তাহারাই আবার মিলিত হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের রোধ করা অতি কঠিন। তাহাদের সৈন্য সাগরের মত। এই কথা ভাবিয়া গৌড়ের প্রজারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যেহেতু তাহারা স্বভাবতঃই ভীরু এবং অল্পেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে শব্দ হইতে লাগিল—কি করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়; কোথায় থাকা যায়, কি উপায়, কে আমাদের সহায় হইবে! হা দেবতা! তুমি এ কি অতি নিষ্ঠুর কার্য্য করিলে। মনে হইল, যেন অকস্মাৎ প্রকাণ্ড প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে গণ্ডশৈল-সকল খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে ও তাহাতে প্রচণ্ড ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হইতেছে। বোধ হইতে লাগিল, যেন মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিতেছে; মহাসমুদ্রের মহাজলরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া এমন ভীষণ শব্দ করিতেছে, তাহাতে দশদিক্‌ পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের মধ্যে অন্য শব্দ গ্রহণের অবসরও দিতেছে না।

সকলেই পলায়নপর। কেহ গাড়ীতে, কেহ পাল্কিতে, কেহ হাতীতে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ নৌকায় পলাইতেছে। যানবাহন দিনরাত চলিতেছে। উটগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। যেন দশদিক্‌ ছাইয়া ফেলিতেছে। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থান ভরিয়া দিতেছে। অথচ যাহারা পলাইতেছে, তাহারা দ্রুত যাইতে পারিতেছে না। তাহাদের ধনজন, ভার সব সঙ্গে রহিয়াছে। সুতরাং ধীরে ধীরে যাইতে হইতেছে। মহাধনীরা যখন যাইতেছেন, তাঁহাদের ঘরের যত কিছু মূল্যবান্‌ বস্তু, সব সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মণগণ যাইতেছেন—তাঁহাদের কোলে চঞ্চল বালক, গলদেশে গৃহদেবতা শালগ্রামশিলা ঝোলান, পৃষ্ঠে সঞ্চিত নানাবিধ পুঁথির বিষম বোঝা;—দেহ এই প্রকার নানা ভাবে পীড়িত, মনটিও এতদিনে সঞ্চিত পুঁথিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, এই চিন্তায় সন্তপ্ত। স্ত্রীলোকেরা যাইতেছেন;—কেহ বা গর্ভভারহেতু, কেহ বা আপন দেহের গুরুত্ব হেতু মন্থরগমনা;—পথে এখানে কর্দ্দম, ওখানে কুশাঙ্কুর, সেখানে কণ্টক—এই ভয়ে পদে পদে শিহরিয়া উঠিতেছেন, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে রৌদ্রের তীব্র তাপ সহ্য করিতে পারিতেছেন না, সঙ্গের ছেলেপুলেরা যথাসময়ে পানাহার না পাওয়ায় কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে, তাঁহারা নিজেরাও ব্যাকুল হইয়া অতি করুণভাবে রোদন ও বিলাপ করিতেছেন,—তাঁহাদের মনে হইতেছে, যেন সমস্ত পৃথিবীই বর্গীপূর্ণ। এইরূপ নানাবিধ আর্ত্তনাদ ও বিলাপে সমগ্র পৃথিবী যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বর্গীর হাঙ্গামায় রাঢ়দেশে বহু সম্পন্ন গৃহস্থকে দেশত্যাগ করিয়া গঙ্গার এ পারে আসিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামেই তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। যখন স্বয়ং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ কাউগাছির গড়ে আসিয়াছিলেন, তখন 'অন্যে পরে কা কথা'।

আমাদের কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামা লেখা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের জীবনচরিত লেখা। তিনি অতি সাহসী পুরুষ ছিলেন। সে কালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা চাকরী করিতেন

না, মাইনে লইতেন না, কাহারও হুকুমের তাঁবে থাকিতেন না। তবে কথাই আছে—'অনাশ্রিতা ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ'; সেই জন্য পণ্ডিত মহাশয়েরা একজন না একজনকে ধরিয়া থাকিতেন। পঠন-পাঠন তখন ব্যবসায় ছিল। যে যেমন পড়াইতে পারিত, তাহার তেমনি বিদায়-আদায় বেশী হইত। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়া রাজা চিত্রসেনকে আশ্রয় করেন, আবার বর্দ্ধমানের আশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে আসেন, আবার কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া মহারাজা নবকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসেন এবং তাঁহার দেওয়া জমীতে কলিকাতায় বাড়ী তৈয়ারী করেন।৹

তিনি অতি সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। প্রতিদিন অরুণোদয় কালে অবগাহন স্নান করিয়া, তান্ত্রিক এবং বৈদিক সন্ধ্যা সমাপন করিয়া তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। সেখানে সোনা ও রূপার পূজার পাত্রে নানাবিধ পূজার উপকরণ সাজান থাকিত। পুষ্পপাত্রে বকুল, বঞ্জুল, কেতক, কেতকী, কমল, কৈরব, চম্পক, কুরুবক, বক, ফোটা মুচুকুন্দ, কুন্দ, করবীর, কাঞ্চন, পলাশ, কদম্ব, কহ্লার, রক্তপদ্ম, কঙ্কেলি, মালতী, মহুয়া, মাধবী, পুন্নাগ, নাগকেশর, যূথী, জাতী প্রভৃতি পুষ্প রাশি রাশি থাকিত; মন্দিরটি তাহাদের গন্ধে আমোদিত হইত। সেখানে কুঙ্কুম, মৃগনাভি, চন্দন, বেণা, গুগ্‌গুলু এবং নানা রকম ধূপের গন্ধ তাহার সহিত মিশিয়া যাইত। পানিশঙ্খের উপর অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য সাজান থাকিত। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরা ক্ষীর, ননী, দধি, চিনি, নানারূপ মোদক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পিঠে, লাড়ু এবং তিপ্পান্ন ব্যঞ্জন দিয়া ভোগ উপস্থিত করিয়া দিতেন। রাজা তাহা দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিতেন। সেই সকল ভোজ্য বস্তু দ্বারা পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। রাজা সোনার আসনে বসিয়া, সোনার অলঙ্কার পরিয়া, দুইখানি উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবমতে আচমন করিতেন। তাহার পর সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, দ্বারদেবতা ও গুরুপরম্পরাকে নমস্কার করিয়া ভূতশুদ্ধি করিতেন। পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভিতর ও বাহিরে সংহারমাতৃকান্যাস করিতেন। পরে আটত্রিশ ও পঞ্চাশ কলা কেশবাদিমাতৃকা, শ্রীকণ্ঠ, কেশব, কীর্ত্তি প্রভৃতি ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিতেন। তার পর পীঠমন্ত্র, ঋষ্যাদিমন্ত্র পড়িয়া ও সর্ব্বাঙ্গে ছাপা দিয়া 'মুদ্রারচিতমূর্ত্তিপঞ্জরকিরীটেন্দ্রিয়ব্যাপকন্যাসো ধ্যাত্বা' বিশেষার্ঘ্যস্থাপন করিয়া জলের ভিতর জপ আরম্ভ করিতেন।

চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, নূতন প্রবাল, পদ্মরেখা, গোমেদ, হীরা, সবুজমণি, পুষ্পরাগ, নব্য ইন্দ্রনীলমণি, রূপা, মহামরকত, চিন্তামণি প্রভৃতি দিয়া মন্দিরের প্রাচীর তৈয়ারী হইয়াছে, এবং কল্পবল্লী দ্বারা কুঞ্জাবলী প্রস্তুত হইয়াছে। সেখানে তাহার তোরণ, দ্বার উজ্জ্বল এবং অদ্ভুত মহারত্নসমূহে প্রস্তুত। সে তোরণের মস্তক পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে মুক্তার আসন বিছান। তাহার উপর নানা মণিমাণিক্যযুক্ত কালীর মূর্ত্তি, তাহা হইতে আলোর ছটা বাহির হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন নূতন মেঘ হইতে বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতেছে। দেবীমূর্ত্তি মুক্তাময় মঞ্চের উপর স্থাপিত; তাঁহার অঙ্গে নানা রত্নাদি নির্ম্মিত কেয়ূর, কঙ্কণ, কিরীট, হার, মঞ্জীর প্রভৃতি অলঙ্কার। তিনি দুইখানি স্বর্ণখচিত বিচিত্র প্রভাময় বস্ত্র এবং মনের মত সুন্দর ও স্বাদু ভোগ-রাগের দ্বারা দেবীকে পূজা করিলেন। তার-পর পুরাণাগমপ্রোক্ত স্তোত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নূতন কবিদের রচিত এবং নিজেরও রচিত স্তোত্র পাঠ করিলেন। তার পর মন্দির হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, শ্রীতরুর পলাশ দিয়া জালান অগ্নিতে ধুনা, চন্দন, ঘৃতযুক্ত গুগ্‌গুলু, অগুরু

প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য দেওয়ায় তাহার ধূমে চারি দিক্ ভরিয়া গিয়াছে। কোথাও রুদ্রাধ্যায় পাঠ হইতেছে, কোথাও ত্রিয়ম্বক-সূক্ত পাঠ হইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনবরত গঙ্গাজল ঢালিয়া শিবের স্নান হইতেছে, কোথাও নারায়ণস্তব, কোথাও রাসপঞ্চাধ্যায়ী পড়া হইতেছে, কোথাও গণেশের স্তব পড়া হইতেছে, কোথাও পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্ব-রচিত মহিম্নঃস্তব পাঠ হইতেছে, কোথাও উচ্চৈঃস্বরে নীলকণ্ঠ-স্তব পাঠ হইতেছে, কোথাও শৈলপুত্রীমাহাত্ম্য সপ্তশতী পাঠ হইতেছে। সেখানে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত পুরুষার্থের চরম উৎকর্ষরূপ মহামন্দিরের মধ্যে অবস্থিত প্রসন্নমূর্ত্তি লিঙ্গময় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, গুরুর চরণে নমস্কার করিয়া গঙ্গা নামে গোরুটিকে ডাকিলেন। গঙ্গাও তাঁহার ডাক শুনিবামাত্র মহাহর্ষভরে অনেক পক্ক ফল আহারের লোভে রাজার দিকে দৌড়িয়া আসিল। কামধেনুও বুঝি কল্পবৃক্ষের কাছে এরূপ ছুটিয়া আসে না। নানারূপ ফলে গঙ্গার তৃপ্তি সাধন করিয়া, তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার পুঁচ্ছ দ্বারা নিজের সমস্ত অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া তাহার আরতি করিলেন। অবশেষে তাহাকে রাশীকৃত উত্তম ভোজ্য দ্রব্য দিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া, বন্ধু-বান্ধব সমেত আহার করিতে বসিলেন।

•১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজরা একরকম বাঙ্গালার মালিক হইয়া উঠিলেন। সে সময়ের কৃষ্ণনগরের রাজা ইংরাজদের একজন প্রধান সহায়। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত। সুতরাং বাণেশ্বরও ইংরাজদের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন।•

•পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজরা দেশের কর্ত্তা হইলেন বটে; কিন্তু আইন-মত তাঁহারা কেহই নহেন। দিল্লীর বাদশাহ্ ভারতের সম্রাট্; মীরজাফর বাঙ্গালার সুবেদার; রাজা দুর্ল্লভরাম বাঙ্গালার দেওয়ান। অথচ ইংরাজ নহিলে বাঙ্গালা বেহারের কোন কাজই হয় না। ১৭৬৫ অব্দে এ রকম বে-আইনী অনেকটা উঠিয়া গেল। ইংরাজরা সেই বৎসর দিল্লীর বাদশাহের নিকট বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইলেন। দুর্ল্লভরাম এবং তাঁহার বংশের দেওয়ানী লোপ হইল। কিন্তু ইংরাজরাও দেওয়ানী করিতে পারেন না; কাজেই মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সীতাব-রায়কে নায়েব দেওয়ান রাখিয়া বাঙ্গালা-বেহারের কাজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও ইংরাজের মনঃপূত হইল না। ১৭৭২ অব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ গবর্ণর হইয়া আসিয়া বলিলেন,—আমি দাওয়ান হইয়া দাঁড়াইতে চাই। সুতরাং নায়েব দেওয়ানদের চাকরী গেল। কোম্পানী দেওয়ানী লইলেন। কিন্তু দেওয়ানী লইলে দেওয়ানী মোকদ্দমা ত করিতে হইবে। মুসলমানদের দেওয়ানী আইন ছিল, সেই মতে কাজ চলিতে লাগিল। হিন্দুদের বেলায় কি হইবে? দেওয়ান মোকদ্দমার ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতেন, তাহার পর আইন বা ধর্ম্ম কি, জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রশ্ন পাইয়া তাহার উত্তর লিখিয়া দিতেন ও তজ্জন্য তৌলবট পাইতেন। মুসলমান আমলে এই ভাবেই দেওয়ানী চলিয়া আসিত। হেষ্টিংস উহা পছন্দ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—কোড চাই, সংহিতা চাই। তখন ইংরাজদের মধ্যে কেহই সংস্কৃত জানেন না; মুসলমানদের মধ্যেও অতি অল্প লোকে জানে। সুতরাং বাঙ্গালী বন্ধুদিগের সহযোগে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস এগার জন বড় বড় পণ্ডিত সংগ্রহ করিলেন। এই এগার জনের প্রথমেরই নাম হইতেছে—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাহার পর পশপুরের কৃপারাম; তাহার পর নবদ্বীপের জোড়াবাড়ীর দুই পণ্ডিত—একজনের নাম

রামগোপাল তর্কপঞ্চানন, আর একজনের নাম কালীকিঙ্কর। আর সাত জনের কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার ভিতর একজন ছিলেন—তাঁহার নাম সীতারাম ভাট। ইঁহারা এগার জনে একত্র হইয়া, দেওয়ানী আদালতের বহু দিনের নজীর দেখিয়া একখানি বই প্রস্তুত করিয়া দেন; সেখানির নাম—বিবাদার্ণবসেতু। হেষ্টিংস একজন সংস্কৃত-জানা মৌলবীকে দিয়া উহা পারসীতে তর্জ্জমা করাইয়া লন এবং হালহেড নামক একজন ইংরাজকে দিয়া সেই পারসী হইতে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করাইয়া ১৭৭৬ সালে ছাপাইয়া দেন। উহার নাম হয় —হাল্‌হেড্‌স্‌ জেণ্টু ল। পণ্ডিত মহাশয়েরা যত দিন এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তত দিন তাঁহাদের টোল খরচের জন্য রোজ একটি করিয়া টাকা পাইতেন। কার্য্য শেষ হইয়া গেলেও তাঁহারা সকলেই যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, একটি করিয়া টাকা রোজ পাইতেন। কেহ বা তাঁহাদের বাড়ীতে টোল থাকা পর্য্যন্ত সে টাকা পাইয়াছিলেন।

এই পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। সুতরাং এ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং তিনিই যে সকলকে চালাইয়া লইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর এই কোডই সুপ্রীম কোর্টের ভরসা ছিল। তার পর সার উইলিয়ম জোন্‌স্‌ আসেন। তিনি নিজে সংস্কৃত জানিতেন এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে দিয়া বিবাদভঙ্গার্ণব নামে একটি নূতন কোড তৈয়ারী করিয়া লন।

সুতরাং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার যে শুধুই কবিতা লিখিয়া, চম্পূ লিখিয়া বেড়াইতেন, তাহা নহে, স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরাজের হাতে হিন্দু ল'এর ব্যবস্থা দিবার ভার তুলিয়া দিবার তিনিই একজন প্রধান হেতু। এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নিজেদের প্রাধান্য হারাইতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে এখন সব হারাইয়া বসিয়া আছেন।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নামে অনেক উদ্ভট শ্লোক চলিত আছে। উদ্ভটসাগর শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি এ মহাশয়ের নিকট হইতে কয়েকটি সংগ্রহ করিয়াছি। নীচে সেগুলি তাহাদের প্রাসঙ্গিক ঘটনার সঙ্গে তুলিয়া দিলাম।

১। একবার কৃষ্ণচন্দ্র কয়েকটি পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। ত্রিবেণীতে আসিয়া দেখেন যে, সেখানে গঙ্গায় স্রোতঃ কমিয়া গিয়াছে। তখন বাণেশ্বরকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—

সগরসন্ততিসন্তরণেচ্ছয়া
প্রচলিতাতিজবেন হিমাচলাৎ।
ইহ হি মান্দ্যমুপৈতি সরস্বতী-
যমুনয়োর্ব্বিরহাদিব জাহ্নবী॥

২। একদিন সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বর প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে লইয়া ৺ কালীপূজার পূর্ব্বে ৺ কালীদেবীকে দর্শন করিতে যান। কুম্ভকার সেখানে উপস্থিত ছিল। মহারাজ তাহাকে ও দেবীমূর্ত্তিকে দেখিয়া বলিলেন,—"কিমদ্ভুতম্।" তখন বাণেশ্বর বলিলেন,—

শিবস্য নিন্দয়া হি যাঽত্যজদ্ বপুঃ স্বকীয়কম্।
তদঙ্ঘ্রিপঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতম্॥

ইহা শুনিয়া রামপ্রসাদ সেন বাণেশ্বরকে ঠকাইবার জন্য কহিলেন,—

মহাযুদ্ধমধ্যে সদানন্দরূপা-
পদস্পর্শমাত্রাচ্ছবোঽভূন্মহেশঃ।
শিবে পাদপদ্মং ন দত্তং কদাচি-
চ্ছিবে পাদপদ্মং ন দত্তং কদাচিৎ॥

৩। মাঘ মাসে কৃষ্ণচন্দ্রের মাতৃশ্রাদ্ধে বড়ই ধূমধাম হইয়াছিল। দানসাগর হইবে বলিয়া হাতী, ঘোড়া প্রভৃতিকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আনা হইয়াছিল। হাতীগুলি শীতে কাঁপিতেছে দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বরকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাণেশ্বর বলিলেন,—

হস্তন্যস্তকুশোদকে ত্বয়ি ন ভূঃ সর্ব্বংসহা কম্পতে
দেবাগারতয়ৈব কাঞ্চনগিরিশ্চিত্তে ন ধত্তে ভয়ম্।
অজ্ঞাতদ্বিপভক্ষ্যভিক্ষুভবনপ্রস্থানদুঃস্থাশয়া
বেপন্তে মদদন্তিনো নরপতে হস্ত্যুক্তমাস্তাবকাঃ॥

৪। বাণেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানরাজের শরণাগত হন। কিন্তু সেখান হইতে পুনর্ব্বার কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আসেন। কৃষ্ণচন্দ্র দেখিবামাত্র তামাশা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে? আপনার পরিচয় দিন।" ইহা শুনিয়া বাণেশ্বর বলিলেন,—

চিন্তাচক্রে ভ্রমতি নিয়তং মন্মনোমৃত্তিকেয়ং
আর্দ্রীভূতা নয়নসলিলৈর্ভ্রাম্যতে দৈন্যদণ্ডৈঃ।
আশাকুম্ভাঃ কতি কতি কৃতাশ্ছেদিতাঃ কর্ম্মসূত্রৈ-
র্জাত্যা বিপ্রঃ পুনরহমহো কুম্ভকারোঽস্মি বৃত্ত্যা॥

৫। একবার বাণেশ্বর, বর্দ্ধমানের মহারাজের নিকট ছুটি লইয়া গুপ্তিপাড়ায় আসেন। বর্দ্ধমানে ফিরিলে মহারাজ তাঁহার পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কৌশলপূর্ব্বক আপনার দারিদ্র্য বর্ণনা করিতেছেন,—

লজ্জা মানসুতা মমাদ্য বনিতা ভিক্ষাঽপরা দৈন্যজা
তাতৈশ্বর্য্যবিগর্ব্বিতা বলবতী ভিক্ষা প্রগল্ভাঽভবৎ।
সা লজ্জা নিহতা তয়ৈব তনয়া শোকেন মানো মৃতো
ভিক্ষা দৈন্যসুতা চিরাৎ পতিরতা নাদ্যাপি মাং মুঞ্চতি॥

৬। বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া বাণেশ্বর কৃষ্ণনগরে যাইলে, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীর অবস্থা জিজ্ঞাসা

করিলেন। উত্তরে তিনি বলিতেছেন,—

ন ভালে সিন্দূরং ন চ নয়নয়োরঞ্জনরসো
ন গাত্রে স্নেহার্দিন্ ন চ খদিররাগোঽধরপুটে।
অবৈধব্যং কিঞ্চিৎ কথয়তি মদম্ভোরুহদৃশো-
লুঠত্যগ্রে বাহোর্বিগতকলহো লোহবলয়ঃ ॥

৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী.

গোপালদাসের 'রসকল্পবল্লী'*

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৭শ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় এই পুথিখানার বিস্তৃত পরিচয় দিয়া চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তদীয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে এই পুথির উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। পদাবলী-সাহিত্যের গহন বনে এই জ্ঞাতরচনাকাল অপূর্ব্ব রস-গ্রন্থখানা যে কেমন চমৎকার পথপ্রদর্শকের কাজ করিতে পারে, সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধই তাহা বাঙ্গালার প্রাচীন-সাহিত্য-রসিকগণকে প্রথম দেখাইল। এই জন্য সাহিত্যরত্ন মহাশয় সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদার্হ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার যে পুথিখানা অবলম্বন করিয়া সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই পুথিখানা তেমন প্রাচীন বা সুলিখিত নহে। সৌভাগ্যক্রমে ঢাকা মিউজিয়মের পুথিশালায় রসকল্পবল্লীর চমৎকার একখানা পুথি আছে। এই পুথিখানা ৩১ পত্রে সম্পূর্ণ। অতিসুদৃশ্য পাকা হাতের লেখা। নকলের তারিখ ১৬৬[০] শকাব্দ। অর্থাৎ পুথি-রচনার মাত্র ৬৫ বৎসরের পরের নকল। তারিখ না থাকিলেও এই পুস্তকে ৫ এর 5 রূপ দেখিয়া এবং ৭ এর ৭ রূপ দেখিয়া পুথিখানা যে প্রায় ২০০ শত বছরের প্রাচীন, তাহা কতকটা নিশ্চিততার সহিতই বলা যাইত। পুথিখানার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১২ ছত্র করিয়া লেখা। ঢাকার উকীল, প্রথম যৌবনে প্রশংসনীয় প্রত্নোৎসাহসম্পন্ন শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর ঢাকার পশ্চিমস্থ সাভার হইতে এই পুথিখানা সংগ্রহ করিয়া ঢাকা মিউজিয়মে উপহার দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পুথিখানি অভ্যন্তরে প্রায় এক তৃতীয়াংশ খণ্ডিত—২, ৩, ৪, ৯, ১১, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, এই এগার পাতা নাই। যাহা হউক, যাহা আছে, তাহাই অমূল্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের আলোচিত প্রসঙ্গগুলিতে এই পুথিখানা অবলম্বনে কোন নূতন আলোকপাত করা যায় কি না, তাহাই দেখা যাক্।

১। গ্রন্থরচনাকাল

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে আছে,—

আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শকে॥

আমাদের পুথিতে অবিকল ইহাই আছে (৩০ পাতা ২য় পৃষ্ঠা), কিন্তু 'অঙ্ক' স্থানে পরিষ্কার 'অঙ্ক' লিখিত আছে। কাজেই ১৫৯৫ শকাব্দ যে গ্রন্থ রচনার তারিখ, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল।

---

* সন ১৩১৮, ৪ঠা পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

২। জস রাখা (?)। হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধ, পৃঃ ১০১, ছত্র ২২

আত্মপরিচয়াত্মক পদ্যাবলিতে আমাদের পুথিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে বিস্তর পাঠ-ভেদ আছে। পাঠকগণের তুলনার স্থবিধার জন্য দুই পুথি হইতে এই স্থানের পাঠ উদ্ধৃত করিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি	ঢাকা মিউজিয়মের পুথি
একমাত্র জন্ম খণ্ডে বৈদ্যবংশে।	একমাত্র ভাগ্য জর্ম্ম বৈদ্য বংশে।
দুই চারি উপর পুরুষ বৈষ্ণবে প্রশংসে ॥	দুই চারি বৈষ্ণব পূর্ব্ব পুরুসে প্রসংশে ॥
বৈষ্ণবের নাম কহিতে অন্যের নাম হয়।	বৈদ্যখণ্ড গ্রাম রাঘবসেন নাম।
উপাধি করিয়ে নাহি কেবল পরিচয় ॥	সমাজ করিল বৈদ্য অতি অনুপাম ॥
ধনন্তরি কুলে বীজ রাঘব সেন নাম।	তাহার বংশাবলি অনেক বিস্তার।
নানা সমাজ হইতে বৈদ্য আনিল অনুপাম ॥	কবি পণ্ডিত আর বৈষ্ণব আপার ॥
তাহার বংসাবলি অনেক বিস্তার।	জসরাজ খান্ দামোদর মহাকবি।
কবি পণ্ডিত খ্যাত বৈষ্ণব অপার ॥	কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবি ॥
দামোদর কবিবর চিরঞ্জীব স্থলোচন।	চিরঞ্জিব স্থলোচন মহাভাগবত।
জস রাখা (?) আর শ্রীকবিরঞ্জন ॥	চৈতন্যচরিতামৃতে এষব বিদিত ॥
চিরঞ্জীব স্থলোচনের কথা আছয়ে বর্ন্নন।	চক্রপানি মহানন্দ দুই মহাসয়।
চক্রপানি মহানন্দ আর তঁহি দুইজন ॥	নীলাচলে দুই ভাই প্রভুকে মিলয় ॥
নীলাচল গেলা দোহে মহাপ্রভুর গোচর।	রঘুনন্দনের সেবক বলি প্রিত করিলা।
রঘুনন্দনের সেবক কৃপা করিল বিস্তর ॥	দুই জনার মস্তকে নিজ চরণ ধরিলা ॥
দুই ভাইএর শিরে চরণ ঠেকাইল।	মহানন্দেকে কহেন বৈষ্ণব অকিঞ্চন।
কৃষ্ণ সেবা করিতে দুইজনে আজ্ঞা দিল ॥	সেবাধর্ম্ম করি করহ সাধন ॥
মহানন্দে কহিল ইহো অকিঞ্চন বৈষ্ণব।	চক্রপানিকে কহেন সংশারী বৈষ্ণব।
চক্রপানিকে কহিলেন ইহার হইবে বৈভোব।	পুত্র পৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব ॥

আর অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। মিউজিয়মের পুথির পাঠ যে সঙ্গততর, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। রসমঞ্জরী-ধৃত যে পাঠের উপর সাহিত্যরত্ন মহাশয় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই যে প্রকৃত প্রাচীন পাঠ, তাহাও সপ্রমাণ হইল।

৩। কবিরঞ্জন

গোপালদাস লিখিয়াছেন, তাঁহার বংশের যশোরাজ খাঁ, দামোদর, কবিরঞ্জন, চিরঞ্জীব, স্থলোচন ইত্যাদি বিখ্যাত পুরুষের কথা চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। প্রকৃতই পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধেয়। হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন,—"গোপালদাস গ্রন্থমধ্যে শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে কবিরঞ্জনের নাম করিয়াছেন—।" প্রকৃতপক্ষে গোপালদাস কবিরঞ্জনকে নিজবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"উদসল কুন্তল ভারা" পদটি আমাদের পুথিতে স্পষ্ট বিদ্যাপতির নামেই আছে ; কাজেই

কবিরঞ্জনের দাবী এখানে অগ্রাহ্য। (ঢা-মি-পুঃ, ২৮।১) উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র দুইটি ছত্র আছে। যথা,—"উদসল কুন্তল ভারা। কামিনি করত পুরুস ব্যবহারা॥"

কবিরঞ্জনের একটি চমৎকার পদ ক-বি-পুথিতে এলোমেলো এবং অসম্পূর্ণভাবে আছে। ঢা-মি-পুথি হইতে উহার পাঠ উদ্ধৃত হইল।

পন্থ পিছল নিষি কাজর কাঁতি।
পাতরে বৈ গেল দিগভর রাঁতি॥
চরণে বেঢ়ল অহি তাহে নাহি সঙ্ক।
সুন্দরি হৃদয়ে নুপুর পরিবঙ্ক॥
কি কহব মাধব পিরীতি তোহারি।
তুয়া অনুরাগে না জিয়ে বর নারী।
বরাহ-মহিশ-মৃগ পাল পলায়।
অনুরাগিনি দেখি বাঘ ডরায়॥
কহে কবিরঞ্জন না করহ রোষ।
আজুকার বিলম্বে খেম সব দোষ॥

এই পদটি নগেন্দ্রবাবু তাঁহার বিদ্যাপতিতে (পৃঃ ১৮১) রসমঞ্জরী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার পাঠ হইতে ঢা-মি-পুথির পাঠ স্থানে স্থানে সঙ্গততর বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু নগেনবাবুর পাঠে দুইটি চমৎকার ছত্র বেশী আছে,—

ফনি মনি দীপভরমে দেই ফুক।
কত বেরি লাগল নগিনি মুখে মুখ॥

নগেনবাবু পাঠ দিয়াছেন,—

"সুন্দরি হৃদয় নূপুর পুর বঙ্ক।" এবং অর্থ করিয়াছেন,—"সুন্দরীর নূপুরের হৃদয়ে (ভিতরে) পঙ্ক পূর্ণ হইল"! বর্ত্তমান সঙ্গততর পাঠে অর্থ অতি সরল—সাপে পা জড়াইয়া ধরিল—সুন্দরীর হৃদয়ে তাহা বাঁকা নূপুর বলিয়া অনুভূত হইল।

পরবর্ত্তী পদের পাঠে হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন,—

চরণ নখ রমনিরঞ্জন ছান্দ।
ধরনি লোটাঅল গোকুলচান্দ॥

এখানে কলহান্তরিতা রাধার পায়ে কৃষ্ণের পড়িবার প্রসঙ্গ হইতেছে। কাজেই রাধার পায়ের নখ 'রমণীরঞ্জন' ছন্দের হইবার কোন সার্থকতা নাই। প্রকৃত পাঠ হইবে,—

চরণ নখর মণিরঞ্জন ছান্দ।

এবং এই পাঠেই ছন্দ বজায় থাকে; হরেকৃষ্ণবাবুর পদচ্ছেদে ছন্দভঙ্গ হয়। পদটি ঢা-মি-পুথিতে কবিরঞ্জনের নামেই আছে। (১৯।২)

৪। বড়ু চণ্ডীদাস

রসকল্পবল্লীতে বড়ু চণ্ডীদাসের নাম পাইয়া হরেকৃষ্ণবাবু ভরসান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমাদের পুথি তাঁহাকে নির্ভরসা করিবে। "কিনা হৈল্য মোরে সেই কানুর পিরিতি" পদটি

ক-বি-পুথিতে কাটাকুটি করিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের নামে আছে;—ঢা. মি. পুথিতে উহা স্পষ্ট জ্ঞানদাস ঠাকুরের বলিয়া লিখিত আছে (ঢা-মি-পুথি—১৬১২)। আবার পদামৃতসমুদ্র (আনুমানিক ১৬৫০ শকাব্দ অর্থাৎ বর্ত্তমান পুস্তকের রচনার অর্দ্ধশতাব্দী পরের সংগ্রহ) খুলিয়া দেখিলাম—পদটি নরহরির নামে আছে (৪১৫ পৃঃ)। আশ্চর্য্য! বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের নাম আমাদের পুথিতে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না, বিলুপ্ত পত্রগুলিতে ছিল কি না, কে জানে? হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন,—"গোপালদাসের পূর্ব্বেই দীন চণ্ডীদাসের পদ প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত।" এই তথাকথিত দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। যাহা হউক, "সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম" ইত্যাদি বিখ্যাত পদও নাকি দীন চণ্ডীদাসের রচনা। ভাল কথা। কিন্তু দীন বা বড়ু কাহাকেই যে রসকল্পবল্লীতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা চণ্ডীদাস-সমস্যা কঠিনতর করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই। গোপালদাস-পীতাম্বরদাসেরা পিতাপুত্রে এবং ক্ষণদায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এমন কঠিন চণ্ডীদাস-বর্জ্জন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন, বড়ই রহস্যের বিষয়।

১৩৩৭ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪৮ পৃষ্ঠায় হরেকৃষ্ণবাবু দীন চণ্ডীদাস-রচিত একটি নরোত্তমবন্দনার পদ উদ্ধৃত করিয়া, ইহাকে কবি এবং নরোত্তমশিষ্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে সমুৎসুক। এই পদটি কোথায় পাইলেন, হরেকৃষ্ণবাবু এই স্থানে তাহার আভাস মাত্র দেন নাই। পরে পত্র লিখিয়া জানিতে পারিয়াছি, তিনি এই পদটি "একটা পাতড়ায়" পাইয়াছেন। কবি দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রকৃত পক্ষে এই পদটিই মাত্র। হরেকৃষ্ণবাবু আর একবার চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত বিখ্যাত চারি ছত্র,—

"হাহা প্রাণপ্রিয় সখি, কিনা হৈল মোরে" ইত্যাদি আরও ছয় ছত্র সমন্বিত একটি পূর্ণ পদের আকারে "এক টুকরা জীর্ণ কাগজে" পাইয়াছিলেন (ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩১, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)। এই দুই আবিষ্কারই মহামূল্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের নরোত্তম-বন্দনার পদটির প্রাপ্তিস্থান প্রবন্ধের যথাস্থানে জানাইতে বিস্মৃতি এবং পাতড়ায় অথবা জীর্ণ এক টুকরা কাগজে পদাবলি-সাহিত্যের এই সকল শকটত্রাণ আবিষ্কার, মন্দমতি লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে পারে, ইহাই হিতৈষী জনের বিনীত নিবেদন।

প্রাচীন পদাবলি যতই পড়িতেছি, ততই পূর্ব্বে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সদর্পে প্রচারিত আমার মতবাদ (ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৪, "দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মাথুর পদাবলি") ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। এবং ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে, ঋষিকল্প ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার আজীবন পদাবলি চর্চ্চার ফলে ঠিকই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, চণ্ডীদাসের নামে বর্ত্তমানে প্রচলিত পদাবলির দুই চারিটিও চণ্ডীদাসের রচিত কি না, সেই বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। কি করিয়া এই অদ্ভুত জাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, কি করিয়া দ্বিজ, দীন, দীনহীন ইত্যাদি নকল চণ্ডীদাস জন্ম লাভ করিল, এই বিষয়ে কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। "চণ্ডীদাসের নির্ব্বাণ ও পুনর্জ্জন্ম" প্রবন্ধে বিদ্বজ্জনসমক্ষে ঐ সকল প্রমাণ যথাসময়ে দাখিল করিব।

"থির বিজুরী বরণ গোরী" পদটি গোপালদাসের নামেই আছে।

৫। অন্যান্য পদকর্ত্তাগণ

অন্যান্য পদকর্ত্তাগণের সমস্তগুলি পদের পাঠ বিচার করিতে বসিলে পুথি বাড়িয়া যাইবে। এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, ক-বি-পুথির পাঠের অনেক গলদ ঢা-মি-পুথির সাহায্যে সংশোধিত হইতে পারে। জ্ঞাতরচনাকাল পদসংগ্রহ হিসাবে রসকল্পবল্লীখানার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ক-বি এবং ঢা-মি পুথি মিলাইয়া এই ক্ষুদ্রায়তন পুথিখানির একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়া উচিত।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

'গোপালদাসের রসকল্পবল্লী' প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিবেদন*

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ মহাশয়ের 'গোপালদাসের রসকল্পবল্লী' নামক যে মূল্যবান্ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল, তৎসম্বন্ধে আমি কিছু নিবেদন করিতেছি।

এ পর্য্যন্ত রসকল্পবল্লীর চারিখানা পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গত ১৩০৬ বঙ্গাব্দে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্তৃক পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' প্রকাশিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকার পাদটীকায় রসকল্পবল্লী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পীতাম্বর দাসের পিতা রামগোপালের পরিচয় প্রদান করেন। রামগোপাল (সংক্ষেপে গোপাল) দাসই রসকল্পবল্লীর রচয়িতা। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের উল্লিখিত পুথিখানা দক্ষিণখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া স্বর্গীয় রসিক দাস মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল। আমি দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম দাসের নিকট পত্র লিখিয়া জানিয়াছি, পুথিখানি তাঁহাদের বাড়ী হইতে লইয়া গিয়া কোন একজন বৈষ্ণব আর ফেরত দেন নাই। সম্ভবত পুথিখানা আর পাওয়া যাইবে না।

দ্বিতীয় পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। পুথিখানি সম্পূর্ণ, কিন্তু লিপিকর-প্রমাদে পূর্ণ। পুথি নকলের তারিখ নাই। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় আমি এই পুথি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম।

তৃতীয় পুথি ঢাকা মিউজিয়মে আছে। শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় একটি প্রবন্ধে এই পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

চতুর্থ পুথি বীরভূমের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের রতন লাইব্রেরীতে আছে। পুথির নম্বর ২৯২০, পুথিখানি গোড়ার দিকে খণ্ডিত, ১৪ পৃষ্ঠা হইতে ৪৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আছে। কোন পৃষ্ঠায় ৮ সারি, আবার কোন পৃষ্ঠায় ১১ সারি লেখা। পুথির লিপিকাল ১৬৯৭ শকাব্দা, খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭৫। মিত্র মহাশয় পুথিখানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় পুথি অবলম্বন করিয়া লিখিত আলোচ্য ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধের বিষয় ধরিয়া আমাদের বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

১। গ্রন্থরচনার কাল

ভট্টশালী মহাশয়ের আলোচ্য পুথিতে 'বাণ অঙ্গ' স্থলে 'বাণ অঙ্ক' পাঠ আছে। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পুথির রচনাকাল ১৫৯৫ শকাব্দ। রতন লাইব্রেরীর পুথিতে "অঙ্গ" পাঠই আছে; কিন্তু কবিতাটির উপরে ১৫৯৫ অঙ্কে লিখিত আছে। ভট্টশালী মহাশয়ের সঙ্গে এই পুথির লিপিকারের মত মিলিতেছে।

* ১৩৩৮ সালের ৪ঠা পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

রসমঞ্জরীর ভূমিকায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম' পাঠ ধরিয়া ১৫৬৫ শকাব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বীরভূম-বিবরণ, তৃতীয় খণ্ডে আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের হিসাবে ১৫৮৫ শকাব্দ হইবে, আমি এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। পদকল্প-তরুর ভূমিকায় স্বর্গগত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আমার মতের প্রতিবাদ করিয়া ১৫৬৫ শকাব্দই রসকল্পবল্লীর রচনা-কাল স্থির করিয়া গিয়াছেন। নানা কারণে এখন এ বিষয়ে মতামত প্রদান করা নিরাপদ্ মনে হইতেছে না। কারণ, যদি ধরিয়া লওয়া যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহ-ত্যাগের পর অন্ততঃ ১৫ বৎসর পরে চক্রপাণি ও মহানন্দ পুরীধামে গিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং সে সময় চক্রপাণির পুত্র-পৌত্রাদি অনেক বৈভব,—এই কথিতাংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে পাঁচ পুরুষে ১২৫ বৎসর ধরিয়া ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পরে পহুঁছানো অসম্ভব হইয়া উঠে। ১৫৬৫ শকাব্দ লিপিকাল ধরিলে ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পাই। অবশ্য ঢাকার পুথি এবং রতন লাইব্রেরীর পুথি হইতে দেড় শত দুই শত বৎসর পূর্ব্বের লোকে যে ১৫৯৫ শকাব্দই ঐ পুথির রচনা-কাল মনে করিতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। এ দিকে পুরুষ গণনায় অত দূর পহুঁছিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছে। তবে প্রতি পুরুষে গড়ে ত্রিশ বৎসর ধরিলে কোন গোল থাকে না। এ বিষয়ের বিচারভার ঐতিহাসিক ভট্টশালী মহাশয় গ্রহণ করিলেই ভাল হয়। পঁচিশ ত্রিশের হেরফের তাঁহারাই ভাল বুঝিবেন।

২। জসরাজ খাঁন বা যশরাজ খান

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে জসরাজ খান ভণিতার এই পদটি পাওয়া যায়—

সঙ্করাভিসারিকা

'এক পওোধর চন্দন লেপিত আরে সহজই গৌর।
হেম ধরাধর কনক ভুসন কোলে মিলন জোর॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ পদ চালন করিঞা সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে॥ (ধ্রু)
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল দুঅ চান্দ পূজল কত কোটী কাম॥
শ্রীযুত হসন (হুসন) জগত ভুবন সোহ এ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভনে জসরাজ খান'॥

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'ভোগ পুরন্দর' হইতে পুরন্দর বসু এই পদের রচয়িতা এবং তাঁহার জসরাজ খান উপাধি ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু 'ভোগ পুরন্দর' শব্দটি যে 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ'-এর বিশেষণ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ দেখি না। 'ভোগ পুরন্দর'—'মর্ত্ত্যের ইন্দ্র', অথবা 'ভোগে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্র' এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে

হইতেছে। পুরন্দর বসু, মালাধর বসুর আত্মীয়; এবং মালাধরের 'গুণরাজ খান্' উপাধি ছিল; অতএব পুরন্দরের জসরাজ খান্ উপাধি ধরিয়া তাঁহাকেই পদকর্ত্তা স্থির করিলে দেখিতে শুনিতে মন্দ হইত না। কিন্তু রামগোপাল চৌধুরী মহাশয়ের রসকল্পবল্লী সে সাধে বাদ সাধিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে কবির যে আত্মপরিচয় আছে, তাহা লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়। রতন লাইব্রেরীর পুথিতেও এক স্থানে এমনি লেখা আছে, কিন্তু স্থানটি ঢেড়াসই দ্বারা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা মিউজিয়মের পুথির অনুরূপ পাঠ রতন লাইব্রেরীর পুথির ৪২ পত্রাঙ্কের পূর্ব্বপৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। যথা,—

'যশরাজ খাঁ দামোদর মহাকবি।
কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবি॥'

এই কবিতাংশ হইতে যশরাজ খান্, দামোদর এবং কবিরঞ্জন—এই তিন জন কবির নাম পাওয়া যাইতেছে। 'রাজসেবী' অর্থে রাজসেবক অর্থাৎ রাজকর্ম্মচারী বলিয়া মনে হইতেছে। যশরাজ খানের সঙ্গে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ্-এর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা উপরি উদ্ধৃত যশরাজ ভণিতাযুক্ত পদ হইতে পাওয়া যায়। রামগোপালের উক্তি ইহা সমর্থন করিতেছে। শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ সরকার মহাশয় গৌড়ের দরবারে চাকরী করিতেন, তিনি রাজবৈদ্য ছিলেন। যশরাজ খান্ কোন্ পদে নিযুক্ত ছিলেন, আজি আর তাহা জানিবার উপায় নাই। চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি গুণরাজ খান ও কবি কৃত্তিবাসের নাম সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু ইঁহাদের রচিত কোন পদ পাওয়া যায় না। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কোনো পদ আছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। সুতরাং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সমকালে বাঙ্গালা দেশে যশরাজ খানই আদি বাঙ্গালী পদকর্ত্তা, পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা নিঃসংশয়িত সত্যরূপে গৃহীত হইতে পারে। অতঃপর রামানন্দ রায়ের ন্যায় যশরাজ খান্‌কেও ব্রজবুলির পদরচনার অন্যতম প্রবর্ত্তকরূপে উল্লেখ করিতে হইবে। শ্রীখণ্ডের এই বৈদ্য কবির অপরাপর পদ এবং বিস্তৃত পরিচয় অনুসন্ধানযোগ্য।

মহাকবি দামোদর সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজের মাতামহ। দামোদরের জামাতা চিরঞ্জীব সেনও শ্রীখণ্ডেরই অধিবাসী ছিলেন। চিরঞ্জীব সেন নরহরি সরকার মহাশয়ের সম-সাময়িক, এবং প্রেমবিলাস-রচয়িতা শ্রীখণ্ডনিবাসী নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের রচনা হইতে জানা যায় যে, চিরঞ্জীবের সঙ্গে নরহরি সরকার মহাশয়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। সুতরাং কবি দামোদরকে নরহরি সরকার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে। এই দামোদরের কথা ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। যশরাজ খান্ ইঁহার উপাধি হইলে ঐ সমস্ত গ্রন্থে নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ থাকিত। কবিরাজ গোবিন্দ দাস স্বরচিত 'সঙ্গীতমাধব নাটকে' লিখিয়াছেন,—

পাতালে বাসুকির্ব্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥

দামোদরের কোন গ্রন্থ বা সংস্কৃত কিংবা বাঙ্গালা পদ পাওয়া যায় না। ইনি গৌড়ে কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহারও কোন পরিচয় পাই না।

৩। কবিরঞ্জন

কবিরঞ্জন একজন বিখ্যাত কবি। রামগোপাল দাস স্বরচিত 'শাখানির্ণয়' গ্রন্থে রঘুনন্দন শাখায় ইহাঁকে কালিদাস ও বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। দেখিতেছি, ইনিও রাজ-সেবক ছিলেন। বীরভূম জেলায় বোলপুরের নিকটবর্ত্তী রূপপুর গ্রামে ইহাঁর সমাধি আছে। প্রবাদ, ইনি রূপপুরের তদানীন্তন জমিদারের সভাকবি ছিলেন। যশরাজ ও দামোদরের ন্যায় ইনিও কি গৌড়ের দরবারে চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন? অথবা রাজবৈদ্য মুকুন্দ সরকার মহাশয়ের সুপারিশে এই তিন জন কবি গৌড়-দরবার হইতে কোন বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে মাঝে মাঝে দরবারে হাজিরা দিতেন বলিয়া রামগোপাল ইহাঁদিগকে 'রাজসেবী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন? গত ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে 'বাঙ্গালী বিদ্যাপতি' শীর্ষক প্রবন্ধে আমি কবিরঞ্জনের পরিচয় দিয়াছি। ইহাঁর রচিত কয়েকা উৎকৃষ্ট পদ আজিও মিথিলার বিদ্যাপতির নামে চলিতেছে।

চরিতামৃতে চিরঞ্জীব সুলোচনের কথা আছে, যশরাজ খান্ বা কবিরঞ্জনের কথা নাই।

'উদসল কুন্তল-ভারা' পদটি ঢাকার পুথিতে বিদ্যাপতির নামে পাওয়া গিয়াছে। ঢাকার পুথিতে এই পদের মাত্র দুইটি পংক্তি আছে। ভণিতা থাকিলে বুঝা যাইত, পদটি কাহার! আমার প্রধান আপত্তির কথা এই যে, মিথিলার বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্জন' উপাধি ছিল না। সুতরাং পদে কবিরঞ্জন ভণিতা থাকিলে এ পদ মিথিলার বিদ্যাপতির হইবে না, ইহাই আমার বক্তব্য। আর পদের ভণিতায় যদি বিদ্যাপতির নাম থাকে, তবে এ পদ শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। কারণ, রামগোপাল বা তৎপুত্র পীতাম্বর দাস, মিথিলার বিদ্যাপতির কোন উপাধির উল্লেখ না করিয়া তাঁহার পদে বিদ্যাপতি নামই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কবিরঞ্জনের পদে ছোট বিদ্যাপতি বা বিদ্যাপতি উপাধি ব্যবহার করেন নাই। এইরূপেই পিতা-পুত্রে কল্পবল্লী ও রসমঞ্জরী গ্রন্থে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন ও রঘুনন্দনের অন্যতম শিষ্য রায়শেখরকে বিদ্যাপতি হইতে পৃথক্‌ভাবে চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন। 'উদসল কুন্তল-ভারা' পদটি রতন লাইব্রেরীর পুথিতে নাই।

ভট্টশালী মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের পদসংগ্রহের উদাহরণস্বরূপ কবিরঞ্জনের একটি পদ তুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নগেনবাবুর ভুল তো ঐ একটিই নয়। তিনি যে বিদ্যাপতির নামে পদ বোঝাই করিতে গিয়া পদকর্ত্তা সিংহভূপতিকেও বিদ্যাপতির উপাধিরূপে জুড়িয়া দিয়াছেন। নগেনবাবুর হস্তে কবিরঞ্জন, চম্পতি, শেখর রায় সকলেই বিদ্যাপতিতে লীন হইয়া গিয়াছেন।

'চরণ নখ রমনিরঞ্জন ছান্দ' অথবা 'চরণ নখর মণিরঞ্জন ছান্দ'—কবিরঞ্জনের এই পদের কোন্ পাঠ ঠিক, ভট্টশালী মহাশয় তৎসম্বন্ধে সংশয় তুলিয়াছেন। পদের যে পাঠই ঠিক্ হউক, এখানে রাধার পায়ের কথা আসিতেই পারে না। যে গোকুলচান্দ শ্রীরাধার পায়ে ধরিয়া ধরণী লোটাইয়াছিলেন, কবি এখানে তাঁহারই পদনখের কথা বলিয়াছেন। 'চরণ নখর মণিরঞ্জন ছান্দ'—ইহার কোনও অর্থগ্রহ হইতেছে না। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও 'চরণ-নখ রমণিরঞ্জন-ছান্দ' পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। বড় চণ্ডীদাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে 'কিনা হৈল মোরে সই কানুর পীরিতি' পদটি অন্য জনের নামে ছিল। সেই নাম কাটিয়া কেহ বড়ু চণ্ডীদাসের নাম বসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মাথুর-বিরহের একটি পদের পূর্ব্বে সুস্পষ্টরূপে বড়ু চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। পদটির আরম্ভ এইরূপ—'আজ গোকুল শূন্য ভেল। হরি কিয়ে মধুপুর গেল॥' এই পদটি ঢাকার পুথিতে পাওয়া যায় কি না, ভট্টশালী মহাশয় তাহা লেখেন নাই। পদকল্পতরু গ্রন্থে এই পদ বিদ্যাপতির ভণিতায় আছে (১৬৩৮ সংখ্যক পদ)। অন্যত্রও ইহা বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত। কিন্তু রতন-লাইব্রেরীর পুথিতে এই পদ মহাজনস্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, অথচ ভণিতায় গোবিন্দদাসের নাম পাওয়া যাইতেছে ("গোবিন্দ দাস দুখদাতা")। ইহা একটি জটিল রহস্য। আরও পুথি না পাওয়া গেলে এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ হইবে না। বাঙ্গালা সাহিত্যে—বিশেষ পদাবলী-সাহিত্যে—চণ্ডীদাস একটি জটিলতম সমস্যা। এ সমস্যা মীমাংসা করিবার মত উপকরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। কবে পাওয়া যাইবে, কখনও পাওয়া যাইবে কি না, কে জানে? তবে বাঙ্গালার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়া আরও হাতের লেখা পুরাতন পুথি-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে হয় তো এই সমস্যার দুর্গম পথে কথঞ্চিৎ আলোকসম্পাত হইতে পারে।

দীন চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে ভট্টশালী মহাশয় কেন যে আজিও সংশয়হীন হইতে পারিলেন না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। গত ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে আমিই দীন চণ্ডীদাসের পরিচয় প্রকাশ করি। তাহার পর ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ মহাশয় দীন চণ্ডীদাসের পদের পুথির সংবাদ প্রদান করেন। দীন চণ্ডীদাসের রচিত নরোত্তম-বন্দনার পদটি আমি অন্যান্য পুথির সঙ্গে বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়ায়) একটি পাতড়ায় পাইয়াছিলাম। পাতড়াটি আমার নিকট আছে। বিষ্ণুপুরের তদানীন্তন সাবডেপুটী কালেক্টর সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র শীল মহাশয়ের উদ্যোগে ইহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। আমার ধারণা, দীন চণ্ডীদাস ছাতনায় বাস করিতেন, এবং সেখানকার রাজবাটীর কুলদেবতা বাসলী ঠাকুরাণীর সেবাইত ছিলেন। ছাতনার রাজারা রাধাকৃষ্ণ-লীলার পদ লিখিতেন, অথচ দানপত্রাদিতে 'বাসলীচরণ শরণ' লইতে বিস্মৃত হইতেন না। দীন চণ্ডীদাসও সেইরূপ রাজবাটীর মন জোগাইতে গিয়া পদে বাসলীর ভণিতা দিতেন। এই জন্য নান্নুরের বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে দীন চণ্ডীদাসের পদের এমন গোলযোগ ঘটিয়াছে। ছাতনার বাসলী বৌদ্ধ দেবতা; নান্নুরের বাসলী বাগীশ্বরী, চতুর্ভুজা, জপমালা, বীণা ও পুস্তকহস্তা সরস্বতী। ছাতনার চণ্ডীদাসের সঙ্গেই শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির মিলন ঘটিয়াছিল। এবং সেই মিলনের পদ লইয়াই মিথিলায় ও নান্নুরে মিলনের গোঁজামিল গবেষণার সৃষ্টি হইয়াছে। পরিষৎ হইতে যে চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

'হাহা প্রাণপ্রিয় সখি, কি না হৈল মোরে'—চণ্ডীদাসের এই পদটি সম্পূর্ণরূপে যে পাতড়া-

খানিতে আমি পাইয়াছিলাম সেখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে অর্পণ করিয়াছি, সেটি এখন পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত আছে।

'কেবা শুনাইল শ্যামনাম' পদ দীন চণ্ডীদাসের লেখা, এ কথা কে বলিল?

ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধে 'রসকল্পবল্লী'র পাঠোদ্ধারে বিশেষ সাহায্য হইবে। কবির আত্মপরিচয় হইতে পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইবে। ভট্টশালী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া 'রসকল্পবল্লী'র একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মালাধর-বসু (গুণরাজ-খান)-প্রণীত শ্রীকৃষ্ণবিজয়*

গ্রন্থকার ও গ্রন্থের রচনাকাল

শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কাব্যেতেই কবির পরিচয় ও কাব্য-রচনা কালের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। ইহা এই কাব্যটির একটি বড় বিশেষত্ব। কাব্যটি ১৩৯৫ শকে আরব্ধ হইয়া ১৪০২ শকে সমাপ্ত হয়। সুতরাং কাব্যটি চৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণ করিবার ৫ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

কবি গ্রন্থের আরম্ভের দিকে ও শেষে কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বাপ ভ গী র থ মোর মাতা ই ন্দু ম তী।
যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি॥
যক্ষ রক্ষ সর্ব্ব জনে করিয়া বিনয়।
মা লা ধ র ব সু কহে শ্রী কৃ ষ্ণ-বি জ য়॥ [২+]॥
গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌ ড়ে শ্ব র দিলা নাম গু ণ রা জ-খা ন॥
স ত্য রা জ-খা ন হয় হৃদয়-নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুজন॥ [২১৭]॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম কু লী ন গ্রা মে বাস। [২১৭]॥

গ্রন্থমধ্যে কবি ভণিতায় স্বীয় নাম এবং গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত উপাধি দুইই ব্যবহার করিয়াছেন।

হেনক অদ্ভুত কথা শুন একমনে।
মা লা ধ র ব সু বলে গোবিন্দচরণে॥ [১২]॥
কৃষ্ণ চিন্ত কৃষ্ণ গাও না করিহ আন।
হরির চরণে ভণে গু ণ রা জ-খা ন॥ [৭৬]॥

একস্থলে কবি গুণরাজ খান-এর পরিবর্ত্তে রাজা গুণরাজ এই ভণিতা দিয়াছেন [৭০]।

গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত এই রকম উপাধি পরে আরও দুই একটি পাওয়া যায়। মালাধর বসুর এক পুত্রের উপাধি সত্যরাজ-খান। কবি এই নামেই আত্মজের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় গ্রন্থের প্রকাশকের মতে ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল ল ক্ষ্মী কা ন্ত ব সু। আমরা অতঃপর দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ইঁহারই নামান্তর রা মা ন ন্দ ব সু। ইনি মহাপ্রভুর একজন পুরাতন পার্ষদ ছিলেন। অপর এক য শো রা জ-খা নে র একটি ব্রজবুলি পদ পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে পাওয়া যায়। ইনি ভণিতায় হু সে ন শা হ্-এর উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উপাধিটি ইঁহারই প্রদত্ত।

---

* ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৪এ মাঘ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

২+ পৃষ্ঠাঙ্ক। পুস্তকের নাম উল্লেখ না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় বুঝিতে হইবে। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত-প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বিত হইয়াছে।

সত্যরাজ-রামানন্দ

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় গ্রন্থের প্রকাশকের মতে রা মা ন ন্দ ব সু গুণরাজ খানের পুত্র নহেন পৌত্র, সত্যরাজের পুত্র [উপক্রমণিকায় বংশলতা দ্রষ্টব্য ; সতীশচন্দ্র রায়, পদকল্পতরু, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ২০২]। ইহা কুলীনগ্রামের বসুবংশের কুলজী-মত কি না জানিনা। তবে ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ, শ্রীচৈতন্যের একতম পারিষদ সত্যরাজ ছিলেন এবং রামানন্দও ছিলেন (যদি অবশ্য তিনি সত্যরাজ হইতে ভিন্ন হন)। কিন্তু গুণরাজ-খান শ্রীচৈতন্যের জন্মগ্রহণের অত্যল্প কাল পূর্ব্বেই কাব্যটি রচনা করিয়া যান। সুতরাং তিনি যে ১৪০২ শকাব্দের পরেও জীবিত ছিলেন, তাহা অযৌক্তিক নহে। এই কারণে তাঁহার পৌত্রের পক্ষে শ্রীচৈতন্যের গৃহস্থাশ্রমের পারিষদ হওয়া অনেকটা অসঙ্গত প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় প্রমাণ আরও প্রবল। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাপ্রভুর চরিতগ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং সর্ব্বাপেক্ষা ঐতিহাসিকতানুগত। ইঁহার রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামীর মতে সত্যরাজ রামানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি। কবিরাজ গোস্বামী যে যে স্থলে সত্যরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পরেই রামানন্দের নাম করিয়াছেন [আদি লীলা, দশম পরিচ্ছেদ ; মধ্য লীলা, একাদশ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]। ইহা হইতেই অবশ্য প্রমাণ হয় না যে, ইঁহারা অভিন্নাত্মক। আরও প্রমাণ আছে।

দক্ষিণ হইতে ফিরিবার পর মহাপ্রভু গৌড়ীয় ভক্তদিগের সহিত রথযাত্রার সময় মিলিত হইলেন। সেই বৎসর রথযাত্রার দিন মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্য এক অদ্ভুত এবং স্মরণীয় ব্যাপার। ইহা রূপ-গোস্বামী প্রমুখ সকল বৈষ্ণব কবি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নৃত্যের প্রারম্ভে মহাপ্রভু কীর্ত্তনীয়াগণকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিলেন, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ে এক একটি মহাজনকে নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন।

নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালিগান॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব-পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্ শুভানন্দ।
শ্রীরামপণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুইজন।
হরিদাস-ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
গোবিন্দ ঘোষ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥

মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুর-আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥ [মধ্যলীলা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ] ॥

ইহা হইতে দেখি যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একজন করিয়া মহাজন নৃত্য করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সত্যরাজ রামানন্দ একই ব্যক্তি ছিলেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল দেখিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া উৎকলে যাইবার সময়ে মহাপ্রভু কুলীনগ্রামে উপস্থিত হইলেন। জয়ানন্দ ইহা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—

গুণরাজছীত্র (?) তনয় মহাশয়
নানা মহোৎসব করি।
দেখিঞা প্রকাশ ঠাকুর হরিদাস
রহাইল চরণে ধরি॥
জত পুর-রমণী জত মহা গুণী
সভে দেখিল গৌরচন্দ্রে।
তিন দিবসে চলিলা গৌর
কৃপা করিঞা রামানন্দে॥

আরও একটি অবান্তর প্রমাণ আছে। গুণরাজ-খান কবি ছিলেন। তাঁহার পুত্র অবশ্যই শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। আর সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যের পারিষদের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সকলেই কিছু না কিছু পদ লিখিয়া নিজেদের ভক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সত্যরাজের ভণিতাযুক্ত দুই একটি পদের অস্তিত্ব আমরা স্বচ্ছন্দেই আশা করিতে পারিতাম। কিন্তু এরূপ কোন পদের অস্তিত্ব নাই। উপরন্তু রামানন্দ বসুর অনেকগুলি কবিতা আছে। সুতরাং ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি না কি যে, সত্যরাজ-রামানন্দ একই ব্যক্তি ছিলেন, এবং তিনি পদরচনার সময় নিজের প্রকৃত নামই ভণিতায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন? ইহার কারণও ছিল। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, সেই জন্য তিনি ভণিতায় এমন নাম ব্যবহার করিতে পারেন না, যাহা ভগবানের নাম নহে পরন্তু যাহা নিজের ঐশ্বর্য্য বা দম্ভ-প্রকাশক মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের রচনা-কাল ১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দ। ইহা কবি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন।

তের শ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥ [২১৭]

মুদ্রিত গ্রন্থের বিবরণ

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কোন প্রাচীন পুথির অস্তিত্ব জানা নাই। বটতলা হইতে এই বই প্রথম

ছাপা হইয়াছিল। যে সংস্করণ অবলম্বন করিয়া আমরা বর্ত্তমান আলোচনা করিতেছি, তাহা "সম্ভ্রাত শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, কর্ত্তৃক ১৮১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রামবাগান, বৈষ্ণব-ডিপজিটারী বা ভক্তিগ্রন্থালয়ার্থে শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে" ৪০১ শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দে প্রকাশ করেন। প্রকাশক মহাশয় উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, "আমরা যে হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম তাহাতে পাওয়া যায় যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৪০৫ শকাব্দায় শ্রীদেবানন্দ বসু কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়।... হস্তলিপি খানি মণ্ডের তুলট ছাঁচের কাগজে লিখিত, অত্যন্ত জীর্ণ ও স্থানে স্থানে উদ্ধার করা হইয়াছে।" মোটামুটি বইটি বটতলারই শুদ্ধ সংস্করণ। প্রকাশক মহাশয়েরা প্রাচীন পুথিটি ব্যবহারে লাগাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে আধুনিক কালে এই পুস্তকের প্রচলন বেশী না থাকার দরুণই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, বর্ত্তমান ছাপা পুস্তকটিতে গ্রন্থখানির প্রাচীন রূপ ও ধারা অনেক অংশে রহিয়া গিয়াছে।

অনেক স্থলেই কিন্তু প্রকাশক বা সম্পাদক প্রকৃত পাঠ ধরিতে না পারিয়া গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন; এবং এই গোলযোগ অনেক সময় সাংঘাতিক রকম। একটি উদাহরণ দিতেছি। একস্থলে আছে—যেমতে পাইল আ মা দে র চক্রপাণি [১৭৩]। আ মা দে র এই পদের -দে র বিভক্তিটি যথেষ্ট অর্ব্বাচীন, ইহার অস্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের মধ্যে থাকার কথা নহে। এই পাঠ প্রামাদিক; প্রকৃত শুদ্ধ পাঠ হইবে—

যেমতে পাইল আ মা দে ব চক্রপাণি।

কাব্যের পরিচয়

কাব্যের নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের চরিত-বর্ণনা। কবি শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের গল্পাংশ আদ্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। একাদশ স্কন্ধের তাত্ত্বিক অংশেরও সার-সংগ্রহ দিয়াছেন। কাব্যটির কোন পরিচ্ছেদ নাই। কেবল রাগ-রাগিনীর ভাগ আছে। ইহা প্রাচীন ধারারই অনুগত বটে। সাধারণতঃ একটি রাগের শেষে (বা একই রাগের অন্তর্গত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে একটির বর্ণনার শেষে) কবির ভণিতা দেওয়া আছে। সেইখানেই কাব্যের আংশিক বিরাম।

কাব্যের আরম্ভ এইরূপ।—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণেভ্যো নমঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
প্রণমহোঁ[১] নারায়ণ অনাদি-নিধন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যত তাহার কারণ॥
একভাবে বন্দোঁ[২] হরি যোড়়·করি·হাত।
ন ন্দ-ন ন্দন কৃ ষ্ণ মো র প্রা ণ না থ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দোঁ সৃষ্টির সহায়।
গণপতি প্রণমহোঁ বিঘ্ন-হরতায়॥

১ মুদ্রিত পাঠ সর্ব্বত্র 'প্রণমহ'। ২ মুদ্রিত পাঠ সর্ব্বত্র 'বন্দ'।

সর্ব্বদেবগণের বন্দিয়া চরণ।
কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করিল রচন॥
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দোঁ তাঁহার দুই নারী।
যাঁহার প্রসাদে সর্ব্বলোক পুরস্করি॥
ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী জগতজননী।
প্রকৃতি-স্বরূপা দেবী সৃষ্টির পালনী॥
যাঁহার পাদপদ্ম স্মরি ইন্দ্র ত্রিজগতের রাজা।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণে করে যাঁর পূজা॥
শুম্ভ-আদি অসুরের করিয়া নিধন।
দেব ঋষি রক্ষা কৈল চরাচর-গণ॥
যাঁহার প্রসাদ মোরে হৈল আচম্বিত।
মুক্তি দাও করি বলি কৃষ্ণের চরিত॥
গোসাঞীর জন্ম-কর্ম্ম কে বলিতে পারে।
লোক-হিত কারণে যতেক অবতারে॥
আকাশের তারা যদি একে একে গণি।
সমুদ্রের জল যদি ঘটে প্রমাণি॥
পৃথিবীর রেণু যদি করিয়ে গণন।
তবু কি বলিতে পারি কৃষ্ণের কারণ॥
বরিষার বৃষ্টি ধারা গণিবারে পারি।
কৃষ্ণের চরিত তবু বলিবারে নারি॥
সংসার-সাগর লোক করিবে তারণ।
ভাগবত অবতারি হিতের কারণ॥
ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে॥
ভাগবত-অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক-নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণ ভাগবত গীতচ্ছন্দে গাই॥
কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর।
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর॥
গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার॥
সাদরে শুনিহ লোক না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে এই হইল ভেলা॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে যার বাসনা।
যেই যাহা কৈল তাহা করায়ে ঘটনা॥

ইহা বুঝি লোক সব শুন সাবধানে।
যাইবে বৈকুণ্ঠ পুরী চড়িয়া বিমানে॥
সংসারের সার গোসাঞী কমল-লোচন।
সবাকার বল গোসাঞী দেব নিরঞ্জন॥ [১—২]॥

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের আরম্ভের চতুর্থ চরণটি উদ্ধৃত করিয়া কুলীনগ্রামী সত্যরাজ-রামানন্দ ও তাঁহার সহযাত্রী-দিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। যথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া॥
গুণরাজ-খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥ [মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]॥

গুণরাজ-খান প্রকৃতপক্ষেই একজন ভক্ত-কবি ছিলেন। এবং খুব সম্ভব তাঁহারই প্রযত্নে এবং প্রভাবে কুলীনগ্রাম একটি বৈষ্ণব-প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়ায়। হরিদাস ঠাকুর, যিনি সাধারণতঃ যবন হরিদাস নামে পরিচিত, তিনি কিছুকাল যাবৎ কুলীনগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসীকে অত্যন্ত স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন।

প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥
কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥ [আদিলীলা, দশম পরিচ্ছেদ]॥

কাব্যটি বর্ণনাত্মক এবং ঘটনাবহুল বলিয়া ইহার মধ্যে কবিত্ববাহুল্য নাই। তথাপি সরল ভাষায়, আড়ম্বরহীন সাবলীল পয়ারছন্দের দ্রুততালের মধ্যে মধ্যে কবির ভক্ত-হৃদয়ের ও সহজ কবিত্বের পরিচয় পাঠককে মুগ্ধ করিয়া দেয়। যেমন—

অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে॥ [৫৯]॥

কাব্যের শেষ এই রকম—

সব ঘটে থাকি সেহ সকল করায়।
কেহ তাঁরে নাহি দেখে তাঁহার মায়ায়॥
সূক্ষ্ম রূপ ব্রহ্মপদ ভাবিতে না পারি।
সকল হৃদয়ে গোসাঞী রন তনু ধরি॥

গোসাঞীর তনু চিন্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞানে।
একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব একমনে॥
সবাতে আছেন হরি এমন ভাবিহ।
আপনা হইতে ভিন্ন কাকে না দেখিহ॥
নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তাঁরে জানে।
তার চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে॥
কর্ণধার বিনে যেন নৌকা নাহি যায়।
তেমতি প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রময়॥
ইহা বুঝি পণ্ডিত ভাই স্থির কর মন।
একভাবে চিন্ত প্রভু কমললোচন॥
যত বুদ্ধি যত শক্তি যত মোর চিত।
ভাব মত রচিল কিছু কৃষ্ণের চরিত॥
যত কর্ম্ম কৈল প্রভু নর-রূপ ধরি।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা আদি বলিতে না পারি॥
ভক্ত অনুকম্পায় প্রভু ধরি নর-কায়।
সে তনু চিন্তিয়া ভক্ত ব্রহ্মপদ পায়॥
অল্প বুদ্ধি অল্প মতি অল্প মোর জ্ঞান।
প্রভুর চরিত্র কিবা করিব বাখান॥
অনেক আছয় শাস্ত্র বেদ পুরাণ।
বিস্তর কহিল তায় প্রভুর বাখান॥
সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে না পারে।
পাঁচালি প্রবন্ধে বৈল প্রভু অবতারে॥
বিষম বিষয় বশে সবার বন্ধন।
ইহার আলাপে হয় সকল ভঞ্জন॥
এ কথা শুনিতে যাহার হয় মতি।
ইহা হৈতে তার হয় বৈকুণ্ঠে বসতি॥
অহর্নিশি লোক সব আছে মিছা কাজে।
অবশ্য শুনিবে ইহা দিবসের মাঝে॥
শুনিতে শুনিতে হব মন যে নির্ম্মল।
ঘরে বসি পাবে নর সর্ব্ব তীর্থ ফল॥
পুরাণ পড়িতে নাহি শূদ্রের অধিকার।
পাঁচালি পড়িয়া তার এ ভব সংসার॥
তার আগে পড়হ যাহার শুদ্ধ মতি।
শুনিতে শুনিতে তার কৃষ্ণে হবে মতি॥
পাষণ্ড নিন্দুক জনে কভু না শুনাইহ।
যোড় হাতে বলি আমি বচন পালিহ॥

স্ত্রী পুরুষ শিশুগণে শুন একমনে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় কথা অতি সাবধানে ॥
বন্ধ্যা স্ত্রী শুনিলে হয় পুত্রবতী।
দারিদ্র্য [১] খণ্ডিবে যদি শুনে একমতি ॥
রোগ শোক নাশ হয় সর্ব্বদুঃখ হরে।
বন্ধন মুক্ত হয় যদি থাকে কারাগারে ॥
তের শ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥
গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ-খান ॥
সত্যরাজ-খান হয় হৃদয়-নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুজন ॥
দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞী।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা-ভিক্ষা চাই ॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস ॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্ব্বজন ॥
ধর্ম্ম মোক্ষ দুই হবে ইহাকে শুনিলে।
ইহা বৈ ধন আর নাহি কলিকালে ॥
তপ জপ যজ্ঞ দান যত ফল পাও।
তাহা হৈতে অধিক সুখ ঘরে বসি গাও ॥
স্ত্রী পুরুষ শিশু সব শুন একমনে।
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গুণরাজ খান ভণে ॥ [২১৬-১৭] ॥

কবি শ্রীমদ্‌ভাগবতের গল্পাংশ বর্ণনা করিয়াছেন। আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা খুব অল্প স্থানেই দেখা যায়। যেমন—

জল-জন্তু স্থল-জন্তু সুন্দর রূপ ধরে।
বৈষ্ণব-শরীর যেন সেবিয়া হরিরে ॥
বরিষার ধারা পাইয়া গিরি স্নিগ্ধ হইল।
হরি সেবি লোক সব চৈতন্য পাইল ॥
দুই দিকে বন বাড়ি পথ আইসা (?) দিল।
বেদ না জানিয়া যেন দ্বিজ নষ্ট হইল ॥

---

১ মুদ্রিত পাঠ 'দরিদ্র'।

মেঘের শবদে যেন বিজুলি আসি যায়।
নিধন পুরুষ যেন কামিনী না পায়॥
মেঘের সঙ্গেতে যেন ময়ুর নৃত্য করে।
বৈষ্ণব জন যেন বিষ্ণু-অনুচরে॥
নানা রূপ ধরে গিরি বরিষার জলে।
কৌতুকে খেলায় কৃষ্ণ ছাওয়ালের মিসালে॥ [৩২]॥

ইহার সহিত মূল-গ্রন্থ তুলনীয়—

জলস্থলৌকসঃ সর্ব্বে নববারিনিষেবয়া।
অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া॥ [দশমস্কন্ধ, বিংশ অধ্যায়,১৩]

গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ।
অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ॥ [১৫]॥

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব॥ [১৬]॥

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।
স্থৈর্য্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব॥ [১৭]॥

মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ।
গৃহেষু তপ্তা নির্ব্বিণ্ণা যথাঽচ্যুতসমাগমে॥ [২০]॥

রুক্মিণীর রূপবর্ণনায় কবি যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছেন,—

শ্যামা সুকেশী রামা উন্নত পয়োধর।
গভীর নাভি কম্বুকণ্ঠে শোভে হার॥
রতন পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বদন।
সিন্দুরে মার্জ্জিত দন্ত (?) মুক্তা জিনিয়া দশন॥
পদে পদে ধ্বনি যেন রাজহংস করে।
বাহু মৃণাল-সম কঙ্কণ দুই করে॥
কুটিল কুন্তল চূড়া মাথার উপরে।
তাহা বেড়ি রত্নমালা শোভে থরে থরে॥
কৌস্তুরির মাঝে শোভে চন্দনের বিন্দু।
রাহু গরাসিল যেন পূর্ণিমার ইন্দু॥
কামের কামান[১] জিনি ভুরু-যুগ বঙ্ক।
দিব্য বস্ত্র পরিধান হাতে দিব্য শঙ্খ॥

---

১ মুদ্রিত পাঠ 'কামিনী'।

শঙ্খের উপরে শোভে কণকের চুড়ী।
পাট থোপ বাজুবন্দ তার মাঝে বেড়ি ॥
তাহার উপরে সাজে বিচিত্র কেয়ূর।
সুবলিত বাহু তাহে রতন প্রচর ॥
কনক অঙ্গুরী সাজে অঙ্গুলীর মাঝে।
করতল উৎপল রাতুল বিরাজে ॥ [৮২] ॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী বামা গরুয়া[১] নিতম্ব।
বাম হাতে সখী কান্ধে করি অবলম্ব ॥
জানু জঙ্ঘা সুরতরু পায়েতে নূপুর।
নূপুরের ধ্বনি অতি শুনিতে মধুর ॥
মত্ত-গজ-গামিনী রামা যায় ধীরে ধীরে।
জগত-মোহিনী রামা লক্ষ্মী অবতারে ॥
রূপে আভরণে দেবী করে ঝলমল।
চাহিতে লাগয়ে যেন সূর্য্যের মণ্ডল ॥
ষোল বৎসরের রামা রূপেতে অদ্ভুত।
গুণরাজ-খান কহে (দেখি) কৃষ্ণের কৌতুক ॥ [৮৩] ॥

কবি রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের চারিধারে দণ্ডায়মানা গোপীগণের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রচলিত বিবরণের সহিত একেবারেই মিলে না। কবি এখানে সম্ভবতঃ তাঁহার সময়ে প্রচলিত শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব-সাধনার বা বৈষ্ণবীয় তন্ত্র-পুস্তকের অনুসরণ করিয়াছেন। এ জায়গায় কবি স্পষ্টতই তন্ত্রের নাম করিয়াছেন। ঐ অংশটি সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। একটা কথা বলা দরকার যে, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত, রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন নহে।

সম্মুখেতে চন্দ্রাবলী বামেতে রাধিকা।
তিনে বেড়ি দাণ্ডায়েছে ষোড়শ নায়িকা ॥
ষোড়শ নায়িকা বেড়ি রমণী মণ্ডল।
রূপ আভরণে সব করে ঝলমল ॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী সব চন্দনে সজ্জিতা।
ভুবন মোহন রূপ গুণে অলঙ্কৃতা ॥
রম্ভা মেনকা রতি শচী উর্ব্বশী পার্ব্বতী।
ইহারে জিনিয়া রূপ ব্রজের যুবতী ॥
ত্রিভুবনে নাহি ব্রজ-কন্যার তুলনা।
তার রূপ গুণ সব তাহাতে গণনা ॥

১ মুদ্রিত পাঠ 'গেরুয়া'।

গমন নাচন[১] তার কথা সব গীত।
যার রূপ গুণে কৃষ্ণ হইল মোহিত ॥
বড় প্রিয়তমা কৃষ্ণের রাধা চন্দ্রাবলী।
শশীরেখা চিত্ররেখা[২] দুহে সমতুলি ॥
প্রিয়া বনপ্রিয়া[৩] রমা মদনমঞ্জরী।
ভুবন মোহন রূপ এ চারি সুন্দরী ॥
শ্রীমতী মধুমতী মাধবী কাদম্বিনী।
নবরঙ্গা রতিলেখা কুন্তিনী সীমন্তিনী ॥
ষোড়শ নায়িকা সব কৃষ্ণের প্রিয়তমা।
মধুরস মাধুরী কৃষ্ণের সব সমা ॥
ষোড়শ নায়িকা মধ্যে দুজনে প্রধান।
রাধা চন্দ্রাবলী দুঁহে একই সমান ॥
সমান রূপ সমান বেশ সমান গুণ ধরে।
রাধা কৃষ্ণ দুই জন একি কলেবরে ॥
একলা রাধিকা ধরে এই তিন নাম।
বৃন্দাবন-বিলাসিনী নাম অনুপাম ॥
বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাধা কৃষ্ণপ্রিয়া।
তন্ত্রে ছিল তিন নাম দিল প্রকাশিয়া ॥
সকল গোপীর শ্রেষ্ঠ একলা রাধিকা।
রাধার অংশতে এই সকল গোপিকা ॥
অষ্টাদশ নায়িকা রাধা চন্দ্রাবলী সনে।
চন্দ্রাবলীর অংশেতে জানি অষ্ট জনে ॥
রাধার অংশেতে জানিহ আর অষ্টজনে।
পরমতত্ত্ব কহি আমি তন্ত্রের বচন ॥
ষোল জনের অংশে হয় ষোল জন আর।
অংশা-অংশী গোপীগণ কহিতে অপার ॥
ষোল জনায় অংশ আর ষোল জন কহি।
এতেক কহিল যবে আছে ইহা বহি ॥
ষোল অংশে শুন আর ষোল জনার নাম।
ভুবনে মোহন রূপ অতি অনুপাম ॥
রূপে গুণে অনুপমা ললিতা সুন্দরী।
স্তন-পরি লেপিয়াছে সুগন্ধ কৌস্তুরি ॥
সামলা ধবলা-রতি তাঁহার সমান।
ভদ্রা পদ্মা হরিপ্রিয়া বিশাখা প্রধান ॥

১ মুদ্রিত পাঠ 'না চান'। ২ মুদ্রিত পাঠ 'চিত্তরেখা'। ৩ মুদ্রিত পাঠ 'প্রিয় বন প্রিয়'।

ইন্দুমুখী সুমুখী বল্লবী চন্দ্রিকা।
বিলাসতি নিবসন্তি (?) অপ্ সরা গোপিকা॥
চতুরা মধুরা সনে ষোড়শ নায়িকা।
যূথে যূথে অংশা-অংশী সকল গোপিকা॥
এ সব গোপিকা সঙ্গে নিতি নিতি রাস।
ইহা শুনিতে লোকের বড় অভিলাষ॥ [৫০-৫১]॥

কাব্যটির মধ্যে পয়ারচ্ছন্দেরই আধিক্য। দুই এক স্থলে কেবল দীর্ঘ-ত্রিপদী দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাগ-রাগিনীগুলির উল্লেখ আছে,—

শ্রী, করুণাশ্রী, ললিত, পঠমঞ্জরী, কল্যাণ, কল্যাণী, মল্লার, গৌড়ীয়া মল্লার, মেঘমল্লার, কৌ, বেলাবলী, বিভাস, সুহই, রামক্রীড়া, বসন্ত, কর্ণাট, বাবাড়ী (=? বরাড়ী), তুড়ি, সারেঙ্গ, যমক (ছন্দ), মাবাটী (?), ধানশ্রী, ভৈরব, ভৈরবী, পাহিজা (=? পাহিড়া), গৌড়, পাহাড়ি, সিন্ধুড়া, আসওয়ারী, হিল্লোল, কামোদ, মাউর, শ্যামগড়া, গুজ্জরী, মাথুর, বঙ্গাল বাবাড়ী (=? বরাড়ী), ভূপালী, কেদার, গৌরী।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন দুইই শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যের রচনা। এই কারণ ইহাদের মধ্যে ভাব-গত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উভত্রই শ্রীকৃষ্ণ পরৈশ্বর্য্যময়, দেবতাদিগের অধিপতি, 'ত্রিদশ-অধিকারী', 'দেবরাজ'। তবে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে শুদ্ধ-ভক্তি ভাবের প্রাবল্য লক্ষণীয়। চণ্ডীদাস ছিলেন মূলতঃ কবিমাত্র, আর মালাধর-বসু প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ভক্ত, তাঁহার কবিত্ব আনুষঙ্গিক মাত্র।

দুইটি কাব্যের মধ্যে সময়গত ব্যবধান অল্প নহে। তাহা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে বাক্য ও বাক্যাংশ-গত মিল আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের মূলপুঁথি বা প্রাচীন প্রতিলিপি না পাওয়া গেলেও ইহার মূলাংশ অনেক পরিমাণে অবিকৃত রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে সাদৃশ্যের উদাহরণ দিতেছি। [বি = শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ; কী = শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]।

(১) বাক্যগত মিল

আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবরে [বি ২৩];
আহুঠ হাথ কলেবর তোর [কী ৫৫]।

হরি হরি কিনা বিধি লিখিল কপালে [বি ৪৭];
কে না বিধি আগ বড়ায়ি লেখিল কপালে [কী ৫১]।

আপনা চিহ্নিয়া দেহ বস্ত্র অলঙ্কার [বি ৩৩];
আপনা চিহ্নিআঁ [রাধা] বাঁশী দেহ মোরে [কী ৩১৯]।

ঘরে ঘরে বুলে সে পাতিয়া স্ত্রীকলা [বি ১২] ;
তিরীকলা পাতি ভাণ্ডিবারেঁ চাহ কাহ্নে [কী ৩১৯]।
নহেত স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে [বি ৪৪] ;
তিরীবধ দিবোঁ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার উপরে [কী ১৫৭]।
সম্মুখে আনিয়া তারে ভেটী দেয় কোল [বি ৫০] ;
ভিড়ি দেহ আলিঙ্গন দানে [কী ১৪৯]।

(২) বাক্যাংশ-গত মিল

কেনে হেন কৈলি পাপ কু লে র খাঁ খা র [বি ১৪০] ;
যে কামে হএ কু লে র খাঁ খা রে [কী ২৬৩]।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী রামা গ রু য়া নি ত ম্ব [বি ৮৩] ;
গ রু অ নি ত ম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে [কী ১৯৫]।
মরি জিলে বাছা মোর রূ পে র মু রা রি [বি ১৪] ;
বাহুড় এ কাহ্ন রূ প মু রা রী [কী ২৩২] ;
মহাবংশে পুত্র হইল যেন রূপের মুরারি [কৃত্তিবাস উত্তরকাণ্ড]।
কাঁধে উঠ বহি সব ত্রৈ লো ক্য সু ন্দ রী [বি ৪৫] ;
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈ লো ক্য সু ন্দ রী [কী ১১]।
ধাইতে যশোদা হইল ঘা মে তো ল বো লে [বি ১৬] ;
তে কারণে দেহ মোর ঘা মে তো ল ব লে [কী ১৯৬]।
চি য়া ই ল প্র হ রী সব ক্রন্দনের শব্দ শুনি [বি ১০] ;
তার রাএ কংসের প হু রী চি আ ই ল [কী ৫]।
রুষ্ট হইয়া তুমি যদি ক রি বে গো হা রী [বি ৩৩] ;
রাজা কংসাসুরে মোএঁ ক রি বোঁ গো হা রী [কী ৫৮]।
কৃষ্ণকে চা হি য়া বু লে সব গোপীগণে [বি ৪৫] ;
বাপ নান্দঘোষ চা হি আঁ বু লে [কী ১০৮]।
অ নু মা ন ক রি সব গোপী গেলা ঘরে [বি ৫৮] ;
ভাল অ নু মা ন তোঁ ক রি লি রাহী [কী ৩৮৭]।
বৃন্দাবনে বং শী বাএ নন্দের নন্দন [বি ৩২] ;
কে না বাঁ শী বা এ বড়ায়ি [কী ২৯৪]।
রাবণের আগে বিস্তর বি রূ প ব লি ল [বি ১৫৫]।
কাহ্নাঞীঁ বু ই ল মোরে অনেক বি রূ প [কী ১৩৬]।
ব্রাহ্মণে পু ছি ল কিছু ঘরের উ ত্ত র [বি ১৭০] ;
আপনার মুখে বড়ায়ি ক হ তোঁ উ ত্ত র [কী ১৬]।

এত শুনি মেলানি দিল নন্দ মহাশয় [বি ১২];
এবেঁ মেলানী দেহ আহ্মারে [কী ৩৮৪]।
কেমতে পুতনা মইল কর স্তি বাখান [বি ১২];
আহ্মা সমে রাধা তোএঁ না কর বাখান [কী ১১৬]।
যত দড়ি আনে রাণী বাঁধিতে না আঁটে [বি ১৭];
লাভেঁ মূলেঁ বিত্ত দানকে নাঁটে [কী ১৯৩]।
পরিহার করিব গো শুন সর্ব্বজনে [বি ১৯];
পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী [কী ৩৬৯]।
কৌতুকে বাছুর রাখে নন্দের নন্দনে [বি ১৯];
গোকুলত থাকে বাছা করাখে [কী ৩০২]
চোর-রাজা খেড়ি খেলে দেব বনমালী [বি ৫৬];
খেড়ী খেলাই এ আহ্মে নান্দের ঘরে [কী ৭৯]।
মনে মনে প্রভাবতী গুণে পাঁচ সাত [বি ১৫৯];
কেহ্নে রাধা মনত গুণসি পাঁচ সাত [কী ১২৭]।

গ্রন্থ দুইটীর মধ্যে শব্দগত মিলও কম নাই। যথা—

করুণা (= কাতরোক্তি)

ব্রহ্মার করুণা শুনি দেব শ্রীহরি [বি ২৪]; করএ করুণা বিনায়িআঁ [কী ২৩৩]।

দারুণী (= নিষ্ঠুরপ্রকৃতি)

বিপরীত রা কাড়ে রাক্ষসী দারুণি [বি ১২]; দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণ-দান [কী ৩৩৬]।

পরিহার (= দোষাপনয়ন)

সত্যভামা দেবী বলে পরিহার করি [বি ৯৪]; পরিহার বোলে বনমালী [কী ২৮৮];
বিনয় বচনে হেমন্ত করে পরিহার [কৃত্তিবাস উত্তর কাণ্ড ৪]।

অবস্থা (= দুর্গতি)

কি কারণে ভুঞ্জিলে তুমি এতেক অবস্থা [বি ১২২]; নিজ পতি বিহানে আবথা মোর দেখ [কী ১৩৫]।

রূপস (= সুন্দর)

ত্রৈলোক্যে না দেখিনু তোমা হেন রূপস [বি ১৫১]; এবেঁ তোকে দেখিএ রূপসে [কী ৪৫]।

স্বরূপে (= যথার্থতঃ)

সরূপে আমারে যদি বিধি অনুকূল [বি ১৫৯]; স্বরূপেঁ তোরে কহিলোঁ [কী ২০]।

পিরীতি (= প্রীতি, সন্তোষ)

অতিথির মুখে আমার বড়ই পিরীতি [বি ২০১, ইত্যাদি]; তাতে জগন্নাথ পাইল আধিক পিরিতী ॥ [কী ১৬২]। বারেক কাহ্নের মোর করাহ পিরিতী [কী ২৭৯]; কাহ্নের পিরিতী কর

রাহী [কী ৩২৮] ; পুরী মনোরথ রাধার পিরিতী [কী ৩৮২] ; রাবণের ঠাই প্রহস্ত পাঠাইল পিরীতি [কৃত্তিবাস, উত্তর কাণ্ড, ৩১ ; ইত্যাদি]। একটি কথা এখানে বক্তব্য মনে করি, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, কৃত্তিবাসের অযোধ্যা-উত্তরকাণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বা পুথিতে কুত্রাপি পিরীতি শব্দ অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রচলিত নরনারীর প্রেম, এই অর্থে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে এই শব্দটি কেবল উদ্ধৃত স্থানচতুষ্টয়েই পাওয়া গিয়াছে।

সত্বর (= সাবধান)

বুঝিয়া সত্বরে থাক না করিহ আন [বি ৭] ; সত্বর হঞাঁ রাহি থাক মাঝ নাএ [কী ১৫৭]।

চাহ্ (= অন্বেষণ করা)

বাছুর চাহিতে গেলা আপনি গোপাল [বি ১২] ; দুহেঁ মেলিঅাঁ কাহ্নাঞি চাহিল [কী ৩৭৬]

ঘুচ্ (= সরিয়া যাওয়া)

কেমনে ঘুচয় কালী চিন্তিল তথাই [বি ২৫] ; এহা জাণী ঝাট ঘুচ আহ্মার পাশে [কী ১১৫]।

পাত্ (= কর্)

পাতিয়া স্ত্রীকলা [বি ১২] ; পাতে নিতি নিতি খেলা [বি ১৯] ; নানা মায়া পাতি [বি ১৯] ; পাতিল অনর্থ [বি ১৫৩] ; পাতিয়া চাতুরী [বি ১৬১] ; তিরী-কলা পাতি [কী ৩১৯] ; পাতসি নেহা [কী ৭৯] ; পাতসি মায়া [কী ১০১] ; কমণ ঝগড় রাধা পাতসি তোঁ [কী ৩৫৭] ; ইত্যাদি।

বাস্ (= অনুভব করা)

শত যুগাধিক বাসি সকল সুন্দরী [বি ৪৭] ; না বাসসি লাজ [কী ৪৮] ; ইত্যাদি।

বিচার, বিচার কর্ (= অন্বেষণ করা)

করিনু বিচারে [বি ৯৩] ; বিচারি [বি ৯২] ; থানে থানে বন বিচারিঅাঁ [কী ২৯০] বিচারিঅাঁ চাহ মোর দধির পসারে [কী ৩২২]।

পুর্ (= সুস্বর শব্দ করা)

কতিহোঁ কোকিল-পাখি সুস্বর নাঁদ পুরে [বি ২৪] ; হরিষে পুরিঅাঁ কাহ্নাঞিঁ তাহাত ওঁকার। বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার॥ [কী ২৯৩]।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, এমন অনেক প্রাচীন শব্দ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে পাওয়া যায়। কতকগুলি উদাহরণস্বরূপ দিতেছি,—

মহাদেই, মহাদেবী (= রাজমহিষী) ; **উভ** (= **উর্দ্ধ**) ; **মুকাইয়া** (= **মুক্ত করিয়া**) ; **বাস ঘর** (= living room) ; গাণ্ডি (= ধনু) ; আটু (= হাঁটু) ; হুনে (= হোম করে) ; **আক্ষটী** (= **পাখী-মারা**) ; **কর্ত্তা** (= **ঈশ্বর**) ; **সমঝিল** (= **বুঝিল**) ; (পতিপদ) যাঁতি (= **সম্বাহন করিয়া ; প্রাচীন অসমীয় দ্রষ্টব্য**) ; **ইত্যাদি।**

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের ভাষা

মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে পদের বানানের মধ্যে কোনরূপ প্রাচীনত্ব নাই বটে, কিন্তু শব্দ ও ধাতুরূপে ও পদের প্রয়োগাদিতে যথেষ্ট প্রাচীনত্ব বর্ত্তমান আছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে নির্দ্দেশাত্মক খা নি ও গো টা শব্দের প্রয়োগ আছে, যেমন,—কন্যাখানি, কানিখানি, পো-খানি, অঙ্গুর-গোটা, মংস্ত-গোটা, চারি-গোটা ইত্যাদি। কেবল "একটি" শব্দ ভিন্ন অন্যত্র 'টী' প্রত্যয়ের অস্তিত্ব নাই। সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত 'টী' প্রত্যয়ের প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে পাওয়া যায়, যথা,—সোণার কটুআ দুটি মাণিকে পুরাআঁ [৭৫]। কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ডে [১৪৫] "একটা" শব্দ পাওয়া যায়।

বহুবচনের -রা প্রত্যয় শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে কেবল সর্ব্বনামের মধ্যেই সীমা-বদ্ধ, বিশেষ্যের সহিত একেবারেই প্রযুক্ত হয় নাই। যথা, তোরা দুজনাকে [১৬০]; আমরা দোঁহারে [১৬০]; তারা দুজনে [১৬০]; তোমরা দুই জনে [১৬০, ১৬০]; তারা তিনে [১৬৪]; কে তোমরা [১৮৫]; তারা জন কত [২০৮]; ইত্যাদি। সর্ব্বনামের সহিত -রা প্রত্যয় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে শুধু তিন স্থানে পাওয়া যায়। [The Origin and Development of the Bengali Language পৃ ৭৩৫ দ্রষ্টব্য]। বিশেষ্য পদের সহিত -রা প্রত্যয়ের প্রয়োগ সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ডে [১৫৮০ ও ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের হস্তলিপি হইতে প্রস্তুত পরিষদ্ সংস্করণ]। যথা—রাবণের সে না রা সম্মুখ নহে রণে [৮৪]। এই স্থলেই -রা প্রত্যয়ের প্রয়োগও ব্যক্তির নামে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,

স্নান সন্ধ্যা করি রা মে রা চারি ভাই।
সঙ্কল্প করি সভে হৈলা একু ঠাই ॥ [২৬৪]।

বহুবচনের -দিকে (-দি গে) বা -দের প্রত্যয় শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে একেবারেই নাই। মুদ্রিত পুস্তকে এক স্থলে আ মা দে র পাঠ আছে, তাহা আ মা দে ব হইবে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। -দিকে (-দিগে),-দের প্রত্যয় কিন্তু কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ডে (পরিষৎ-সংস্করণ) পাওয়া যায়। যথা—

মধুদৈত্য রাবণে একোই স্থানে বসি।
তা হা দি কে অন্ন আনি দেন কুম্ভনসী ॥ [১০৫]॥
কেশরী পনস বটে দ্বোসহ ভাই।
তা হা দি গে ধরিআ আনহ মোর ঠাঁই ॥ [১৩৫]।
তোমাদের বরে জীবুক ব্রাহ্মণ কোঙর ॥ [১৯৪]।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের এক স্থলে -কের প্রত্যয়ান্ত সম্বন্ধ-পদের প্রয়োগ আছে। যথা,—

দেখিয়া রাম দামোদর বৎসকের সঙ্গে।
হাসিতে খেলিতে শিঙ্গা বাজাইয়া রঙ্গে ॥
রথে হৈতে উলি অক্রূর প্রণাম যে করি। [৫৭]।

আর একটি আপাত -কের বিভক্ত্যন্ত পদ আছে, নৃ ত্য কে র; কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে "নর্ত্তকের" এই পদের "শুদ্ধ" রূপ।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে এই প্রত্যয়ান্ত পদ দুইটি পাওয়া যায়।

যেহ্ন নদীকের বাণে। [১০৯]।

ল ক্ষ কে র বৃন্দাবন মোর ফুল বাড়ী। [২১৯]।

ইহার মধ্যে লক্ষকের পদটি -কের প্রত্যয়ান্ত না হইতেও পারে। ইহাকে ল ক্ষ ক এই শব্দের -এর প্রত্যয়ান্ত পদ বলিয়া গণ্য করিলে অসঙ্গত হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে লক্ষক পদের প্রয়োগও আছে [৫৫]। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আর একটি আপাতদৃষ্টিতে -কের প্রত্যয়ান্ত পদ আছে,—

লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাথ দাণ। [২৭৯]।

এই পদটি -কের প্রত্যয়ান্ত নহে। ইহা লা খে ক (=লক্ষৈক) শব্দের -এর প্রত্যয়ান্ত সম্বন্ধ-পদ। লাখেক পদের প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আছে। যথা,—

মাথাত গুলাল ফুলে।

তোর নহে সে লা খে ক মূলে॥ [২৭৬]।

কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ডে -কের প্রত্যয়ান্ত সম্বন্ধ-পদের একটি উদাহরণ আছে। যথা,—

দুই ভা ই কে র পবন হৈঞা গেল সখা। [১৯]।

এই -কের বিভক্তিটি প্রকৃতপক্ষে যুগ্ম-সম্বন্ধ-বিভক্তি (ক+এর)। আধুনিক বাঙ্গালায় -কের প্রত্যয় কেবলমাত্র এই দুইটি পদে পর্য্যবসিত—ক ত কে র, য ত কে র। এখানে ষষ্ঠী-বিভক্তি-পরিমাণ বা মূল্য-বাচক। ক ত কে, য ত কে, এই দুই চতুর্থ্যন্ত পদেরও প্রয়োগ আছে। এইগুলি কেবল মূল্য-বাচক। প্রাচীন বাঙ্গালায় এ তে ক, য তে ক, ত তে ক ইত্যাদি পদের খুবই প্রয়োগ আছে [শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, ইত্যাদি]।

ষষ্ঠীর -কার প্রত্যয় শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের মধ্যে কেবল একটি সর্ব্বনাম পদে পাওয়া যায়, স বা কা র [২, ইত্যাদি]। এই পদটির প্রয়োগ পুরাতন সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। আরও দুই একটি পদ পাওয়া যায়, দো হাঁ কা র, কো থা কা র [শ্রীচৈতন্যভাগবত]। আধুনিক বাঙ্গালায় -কার প্রত্যয় কেবল দিক্ ও সময়-বাচক শব্দেই ব্যবহৃত হয়। যেমন, দু প র বে লা-কা র, পূ ব দি ক্-কা র, নী চে কা র, ক বে কা র, য খ ন কা র, ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে এই বিভক্তিটি (একবার মাত্র) কালবাচক শব্দের সহিত প্রযুক্ত দেখা যায়। যথা,—

যবেঁ মো চুরী কৈলোঁ হআঁ নারী সতী।

তবেঁ কালসাপ খাইএ আ জি কা র রাতী॥ [৩২২]।

-কার বিভক্তিটিও যুগ্ম সম্বন্ধ-বিভক্তি। আ জ কে, কা ল কে, ইত্যাদি আধুনিক বাঙ্গালার পদে পূর্ব্ববিভক্তিটি বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছে [তুলনীয়—The Origin and Development of the Bengali Language, পৃ ৭৫৫, পাদটীকা]। আস্সুম্পসাঁও-এর "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"-এ আ জি কা শব্দের প্রয়োগ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে কচিৎ দুই এক স্থলে পয়ার-পংক্তির শেষে -রে বিভক্ত্যন্ত সম্বন্ধ-পদ পাওয়া যায়। যথা,—

পাশে পাশে রক্ষক তা হা রে। [১৪৭]।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে ঠিক অনুরূপ স্থলে ঈদৃশ সম্বন্ধ-পদের প্রয়োগ মোটেই বিরল নহে। কিন্তু ছন্দঃ-পংক্তির ভিতরে—অর্থাৎ চরণের শেষ ভিন্ন অন্য স্থলে—একেবারেই পাওয়া যায় না। যেমন,

ডালিম সদৃশ তন তো হ্মা রে।
তাহাত মজিল মন আ হ্মা রে॥ [২৪৩]।
ছত্র ধরিলেঁ বোল ধরিবোঁ তা হা রে॥ [১৯৬]। ইত্যাদি।

নিম্নে প্রদর্শিত পদগুলি শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের ভাষার প্রাচীনত্ব প্রখ্যাপন করে। আ মা, রা জা য়ে, তা হা তে, কং শে তে (দ্বিতীয়া); লী লা য়ে-ত (তৃতীয়া) মো হে, তোঁ হে (চতুর্থী); মে ঘে রে, কা রে, র থে হৈ তে, জ লে তে থা কি (পঞ্চমী); স প ত্নী ক (ষষ্ঠী); সা জি য়ে, বে লে (সপ্তমী); ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে অনেক সর্ব্বনাম শব্দে প্রাচীন রূপ বর্ত্তমান আছে। যথা,—তি হেঁা, তিঁ হে, জি নি হেঁা, কা হা (=কাহাকে), ক তি হেঁা (=কোথাও), য বে (=যদি,) হে ন ক (=এইরূপ), যে ন ক, ক হি, য তি (য থি=সে স্থানে) ত থি, যে ন, তে ন, হে ন ম তে, যে ন ম তে, তে ন ম তে, যে-ম নে, কে ম ন (উপায়ে), ইত্যাদি।

কথার মাত্রা হিসাবে প্রযুক্ত -ত প্রত্যয় শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের ভাষার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। এই প্রত্যয়টি বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়ানির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

ছ লি য়া ত বলি নিল রসাতল পুর। [২]।
ব লি ব ত বাল্য ক্রীড়া যত যত কৈল। [৩]।
দে খি ল ত শ্রীহরি প্রতি ঘরে ঘরে। [৪]।
অ সু রে করয়ে নিধনে। [৫] ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনেও এই প্রয়োগ বিরল নহে। যথা,—

না জাণোঁ কি দি লেঁ ত (রাহী)॥ [১০৮]।
নেত আঞ্চল সে দি আঁ ত ওহাড়ী॥ [১০০]।
তো হ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞী আ হ্মে ত মাউলানী॥ [৭৭]। ইত্যাদি।

ব ই ল (=বলিল), ক ই ল (=করিল), ম ই ল (=মরিল), মা ই ল (=মারিল), ইত্যাদি প্রাচীনতর ধাত্বংশ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে প্রচুর পাওয়া যায়।

'আমি' এই পদের সহিত ক্রিয়ার বহুবচনের রূপ (প্রকৃত পক্ষে প্রথমপুরুষের একবচনের রূপ) লক্ষণীয়। যথা,—

ভাগবত শু নি ল আ মি পণ্ডিতের মুখে। [১]। ইত্যাদি।

উত্তম-পুরুষের নিম্নোক্ত রূপগুলি প্রাচীনত্বসূচক। প ড় হুঁ, ক র হুঁ, ভু ঞ্জ হোঁ, প ড় হোঁ, হোঁ, ক রোঁ, ক রো, চ লো, ইত্যাদি।

প্রথম-পুরুষের ভবিষ্যতের রূপ উত্তম-পুরুষের ন্যায়। ইহাও প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। যথা,—

কলিকালে পাপচিত্ত হ ব সব নর।
পাচালীর রসে লোক হ ই ব বিস্তর ॥ [১]। ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে ই-কারান্ত অতীত কালের ক্রিয়ার প্রয়োগ অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই অতীতের সংখ্যা -ল কারান্ত অতীতের সংখ্যার অপেক্ষা কিঞ্চি ন্যূন। যেমন,—

পিড়ির উপর পিড়ি দিয়া উদুখলে চ ড়ি।
সিকায় হাত দিয়া সিকায় ভাণ্ড পা ড়ি ॥ [১৬]।
আসিয়া ধেনুক বলাইর গলা চাপি ধ রি।
ক্রোধে বলদেব তাকে এক লাথি মা রি ॥ [২৫]।
রাক্ষসী বেলাতে নন্দ যমুনাতে না ই।
ধরিয়া বরুণদূতে নন্দ লইয়া যা ই ॥ [৪০]।
লাথি মা রি ভৃগু কৃষ্ণে পরীক্ষা লইতে। [৪]। ইত্যাদি।

মধ্যম-পুরুষ কর্তৃ-পদের সহিত তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়ার (প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম-বাচ্যের পদ) প্রয়োগ লক্ষণীয়। যথা,—

ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল কেবা তু মি হ ই ॥ [৯৫]।

নিত্য-বৃত্ত অতীতের ভবিষ্যৎকালে প্রয়োগ এক স্থলে পাওয়া যায়। এই প্রয়োগটি খুবই লক্ষণীয়। যথা,—

প্রসেন উদ্দেশে আমি ক রি তা ম (=করিব) গমন ॥ [৮৬]।

এইরূপ ত-কারান্ত অতীত বাঙ্গালার কোন কোন প্রত্যন্ত কথিত ভাষায় দেখা যায় [The Origin and Development of the Bengali Language ৯৬২]।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে ল-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের বিশেষণরূপে প্রয়োগ (যাহা হইতে ইহার সমাপিকা ক্রিয়া-রূপে প্রয়োগ নিষ্পন্ন হইয়াছে) একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। যেমন,—

উ প জি ল পু ত্র নিল কংস বরাবরে। [৬]।
এখানে জ ন্মি ল ক ন্যা তোমার শত্রু নহে ॥ [১০]।
ম ই ল শ রী রে যেন পাইল পরাণি ॥ [২৯]।
তবে কত দূরে দেখিল ম রি ল কে শ রী। [৮৬]
বলী বড় বলভদ্র জি নি ল কভু নয়। [১৪২]।
পা কি ল নারেঙ্গ হেন চাঁদের মণ্ডল। [১৫৮]।

-ল প্রত্যয়ান্ত পদের ভাববচনরূপে প্রয়োগ দ্রষ্টব্য। যথা,—

বিনা কৃষ্ণে না মারিলে না আসিব ঘরে। [৮৪]।

বিণি রতি পাইলেঁ কাহ্নাঞিঁ না এড়িব তোরে। [১২১]।

শীঘ্রার্থ অতীত, দুই একবার সামান্য অতীত (বা বর্ত্তমান)রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা,—

পাশরিল চিন্তিল উদরে।
হরির মায়া সব হরি করে তারে ॥
কত দিনে বাপ মায়ে পালন করিতে।
ধরিতে অদ্ভুত দেহ দেখিতে অদ্ভুতে ॥
যৌবন প্রবেশ হইলে আন নাহি মানে।
কেমনে বিষয় ভুঞ্জে চিন্তে সর্ব্বক্ষণে ॥ [১৯৭]।

তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন,—

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুথান গাছের ডালে। [১১৬]।
ষোল শত গোপীজন করি কোলাহল।
জায়িতেঁ হরষিত মণে গায়িতেঁ মঙ্গল ॥ [১৪৪]।

নিম্নোদ্ধৃত তুমর্থ ভাববচনটি লক্ষণীয়। যথা,—

যার যাতে অধিকার সেই তাতে থাকে।
দেব ভিন্ন কেহ কারে না পারে দিবকে ॥ [১৬১]

ইহার সহিত তুলনীয় বৌদ্ধগান ও দোহা,—

কেড়ুআল নাহি কেঁ (কি) বাহবকে পারঅ (পারই) ॥ [৮, ৮]।

-ইয়া ভাগান্ত অসমাপিকার সমাপিকারূপে প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে বিরল নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা অসমাপিকা নহে, ইহা নিষ্ঠা প্রত্যয়ান্ত অতীত ক্রিয়া। যথা,—

শৃগালীর রূপে আগে দেবী মহামায়া।
ফণা ছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছে যায়া ॥ [২৩]।
নন্দ ঘোষ যশোদা পূর্ব্বে তপ করি।
তপ করি একমনে আরাধিয়া হরি ॥ [১৩]।
কৃষ্ণের বচনে হেঠ শুনিয়া যুবতি।
যোড় হাতে সবে তবে করিয়া প্রণতি ॥ [৩৪]।
তিন তালি মারি আমি সবাকে বলিয়া।
ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্র কভু না দেখিয়া ॥ [৯৪]।
সফল হইয়া আজি আমার জীবন ॥ [১৮৩]।
তথা যুধিষ্ঠির রাজা শোকাকুল হৈয়া।
বৃদ্ধ রাজা গান্ধারী কুন্তীকে না দেখিয়া ॥ [২১৬]।

তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন,—

বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল ॥ [৪৯]।

ক্রিয়াপদের সহিত স্বার্থে -ড়ি প্রত্যয় খুবই লক্ষণীয়। পদটি যে ভ্রান্ত পাঠ হইতে উদ্ভূত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অন্যথায় ছন্দ মিলিবে না।

ইঙ্গলা পিঙ্গলা তাহে দোঁহে আছে বেড়ি।
পিঙ্গলার দক্ষিণে বসি ইঙ্গলা আ ছ ড়ি ॥ [২০৩]।

[The Origin and Development of the Bengali Language ৯৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে তিনটি -হে বিভক্ত্যন্ত বর্ত্তমানের ক্রিয়াপদ আছে। ক্রিয়াপদ দুইটি লিঙর্থ (optative বা subjunctive)। যথা,—

শুনহ প্রলম্ব ভাই ব লি হে তোমারে। [৩০]।
মদে মত্ত ভাই তুমি তোমার যোগ্য নহে।
সত্যভামা লয় যদি তোমাকে ছা ড় হে ॥ [৯৪]।
না লি হে স্বামী মোর সেই ভাল হইল। [৩৫]।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে এই রকম পদ কতকগুলি আছে। এই ক্রিয়াপদগুলি ভবিষ্যৎ কালের নয় [তুলনীয়—The Origin and Development of the Bengali Language, ৯৬৪-৬৫], পরন্তু লিঙর্থ (optative-subjunctive)। যথা,—

যবে তোরে মা রি হে পরাণে।
তবে তোক রাখিব কোণ জনে ॥ [৬৫]।
পাছে কাহ্নাঞিঁ মোকে না দি হে দোষে ॥ [১০০]।
হাথ দিতেঁ লি হে কলিআঁ। [১৮০]।
কেহো যবেঁ বেকত ক রি হে এহা কাজ [২৫১।
আর বার হেন না ক রি হে।
পুরুষের আখি নি বা রি হে ॥ ॥ [২৬২]।
নিষধ কাহ্নাঞিঁকে মোক না জু ড়ি হে বাণে। [২৭৯]।
সুণী কি বু লি হে বাপ নান্দে। [৩১৪]।
সুণীআঁ কি বু লি হে বলভদ্র ভাই। [৩২৩]।
সুণী সব দেবগণ কি বু লি হে আহ্মারে। [৩২৪]।
যবেঁ কাহ্ন না মি লি হে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥ [৩৩৬]।

কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ডেও এইরূপ দুইটি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। যথা,—

সংসারের দুর্ল্লভ বর তাকে দিলেন্ত পার্ব্বতী।
তাহার হেন গর্ব্বে ধারা ধ রি হে স্ত্রীজাতি ॥ [২২]।
আইসুক ভৃগুরাম তবেসি প্রাণ জা ই হে ॥ [৫৯]।

এখানেও ইহা লিঙর্থ, ভবিষ্যৎ নহে।

এইরূপ পদের উৎপত্তি দুই রকমে হইতে পারে। এক, ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা + কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়া (ক রি হে— ক রি হ + ক রি এ)। কর্ম্ম-(বা ভাব-) বাচ্যের ক্রিয়ার লিঙর্থ প্রয়োগ প্রাচীন বাঙ্গালায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন,—

ঝাঁট যবেঁ হাটক জা ই এ। তবেঁ লাভেঁ পসার বিচিএ ॥ [কী ২.৭১]। ইত্যাদি।

অথবা, -হে অংশটি স্বার্থিক বা নিশ্চয়াত্মক। স্বার্থিক বা নিশ্চয়াত্মক -হে প্রত্যয় প্রাচীন বাঙ্গালায় বিরল নহে। যেমন,--

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন—দিবেহেঁ, পসরিলহে (২৮০), ইত্যাদি।

কৃত্তিবাস উত্তরকাণ্ড—দিবহে (১৯৪)।

অতএব ক রি হে = ক রি (কর্ম্মবাচ্য বর্ত্তমান) + হে। তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন—ধর্ম্ম ছাড়ী কেহে হেন ক রী (৭৮)। ভবিষ্যৎ (-স্য-) হইতে ইহার উৎপত্তি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

অথবা -হ-টি দুইটি স্বরবর্ণের মধ্যে আগত ধরা যাইতে পারে। যদিও ইহা সম্ভব নহে। এইরূপ আগত হ-কারের দুই একটি উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে পাওয়া যায়—প ড়ি হা হে (৩২৪), পুড়িহাএ (প্রতিভাতি, প্রতিভাতয়তি); স্থ ই হে (১৪৪) = স্থইএ (<স্থপ্তায়তি)।

শ্রীসুকুমার সেন

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস*

১৮১৬—১৮২২

হাতে-লেখা সংবাদের

আজকাল কোন সভ্য, জনপূর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী দেশেই সংবাদপত্র প্রকাশ ও বিতরণের সুবন্দোবস্ত না থাকিলে চলে না। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে গত দুই শত বৎসর ধরিয়া ছাপা সংবাদপত্রের বহুল প্রচার হইয়া আসিতেছে। তাহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের মফস্বলবাসী বড়-লোকেরা হাতে-লেখা সংবাদের চিঠি রাজধানী লণ্ডন হইতে পয়সা দিয়া আনাইতেন।

আমাদের দেশেও মোগল আমলে বাদশারা প্রতি প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে চর রাখিতেন; এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কখনও মাসে একবার, কখনও বা সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহাদের লিখিয়া পাঠাইত। রাজকীয় গোপনীয় কথা না থাকিলে এই সব সংবাদের চিঠি রাজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হইত, এবং এইরূপে সভায় উপস্থিত সকল লোক নানা স্থানের সংবাদ পাইত। সেইরূপ বাদশাহের অধীন সেনাপতি শাসনকর্ত্তা এবং করদ-রাজারা বাদশাহের দরবারের ঘটনা, তাঁহার উক্তি এবং রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ জানিবার জন্য সম্রাটের সভায় নিজ নিজ সংবাদ-লেখক—'ওয়াকেয়া-নবিস'—রাখিতেন। ফৌজদার, থানাদারের মত ছোটখাট রাজকর্ম্মচারীরাও নিজ উপরিতন কর্ম্মচারী, অর্থাৎ সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সভায় নিজস্ব পত্র-লেখক নিযুক্ত করিতেন। এই সকল লেখক নিজ নিজ প্রভুর নিকট নিয়মিতরূপে যে-সংবাদ লিখিয়া পাঠাইত তাহাই সাধারণতঃ মুখে মুখে সমাজে প্রচারিত হইত। বড় বড় মহাজন এবং ধনী বণিকেরাও নিজ নিজ কারবারের দূরবর্ত্তী শাখাগুলিতে অথবা বড় বড় শহরে প্রবাসী স্বকীয় প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নিয়মিত-রূপে স্থানীয় সংবাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। এইরূপে মোগল-যুগে সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোকেরই মধ্যে সংবাদ জানিবার জন্য মানুষের যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে, তাহা নিবৃত্তি করিবার উপায় ছিল। এই সকল সংবাদ-লিপির নাম ছিল 'আখ্‌বার' বা ডবল বহুবচনে 'আখ্‌বারাৎ'। এগুলি ফার্সীতে লিখিত; মাড়ওয়ারী মহাজনদের প্রতিনিধিরা হিন্দী ভাষা ব্যবহার করিত। সংবাদপূর্ণ হইলেও এই পত্রগুলি আধুনিক সুপরিচিত সংবাদপত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ছিল। আখ্‌বারাতে শুধু ঘটনার উল্লেখ মাত্র থাকিত,—রাজনৈতিক মন্তব্য অথবা শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন সমালোচনা থাকিত না।

প্রথম মুদ্রিত ইংরেজী সংবাদপত্র

ইংরেজ আমলে এই প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম স্থাপিত হয়। সেই সুযোগে সকল শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য দেশময়

---

* ১৩৩৮।১৫ই ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উৎসাহ জাগিয়া উঠিল,—বিশেষতঃ সংবাদপত্র-প্রকাশে। ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হিকি সাহেবের 'বেঙ্গল গেজেট'ই ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র। গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্ত্রী ও জনকয়েক পদস্থ লোকের বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ফলে, দুই বৎসর যাইতে-না-যাইতেই এই সাপ্তাহিক কাগজখানির প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা' ও আরও কতকগুলি কাগজ বাহির হয়। সে-যুগের অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই রচনা-ভঙ্গী উগ্র, এবং ভাষা ও ব্যবহার ইতর ও অশ্লীল বলিয়া গভর্ন্মেণ্ট মনে করিতেন। ১৭৯৯ সালের মে মাসে লর্ড ওয়েলেস্‌লী সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচবিধান করিলেন। নিয়ম হইল, অতঃপর সেক্রেটারীর দ্বারা পরীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে কোন সংবাদপত্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে না; নিয়ম ভঙ্গ করিলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। মনে রাখা দরকার, তখন পর্য্যন্ত সকল সংবাদপত্রই ইংরেজী ভাষাতে এবং ইউরোপীয়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত।

১। বাঙ্গাল গেজেট—প্রথম বাংলা সংবাদপত্র

ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। ১৮১৬ সালের পূর্ব্বে এদেশে কোন বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন, শ্রীরামপুরের ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনরীগণ কর্ত্তৃক ১৮১৮ সালের ২৩এ মে তারিখে প্রচারিত 'সমাচার দর্পণ'ই বাংলার আদি সংবাদপত্র। এই মত সুনিশ্চিত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কারণ একজন বাঙালী হিন্দুই যে ১৮১৬ সালে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রচার করেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

১৮৩১, ২৮এ মে তারিখের (৬৮০ সংখ্যক) সমাচার দর্পণে 'ধর্ম্মদত্তস্য' এই নামে একজন লেখক একখানি পত্র প্রকাশ করেন; সেই পত্রের গোড়ায় আছে,—

"এতদ্দেশে বাঙ্গলা সমাচারপত্র এইক্ষণে অষ্টস্থানে অষ্টপ্রকার সৃষ্ট হইয়া অষ্টাহে অষ্টাহে স্পষ্টরূপে চলিতেছে। তদ্বিশেষঃ প্রথম সমাচার দর্পণ, দ্বিতীয় সম্বাদ কৌমুদী, তৃতীয় সমাচার চন্দ্রিকা, চতুর্থ সম্বাদ তিমিরনাশক, পঞ্চম বঙ্গদূত, ষষ্ঠ সম্বাদ প্রভাকর, সপ্তম সুধাকর, অষ্টম সভা রাজেন্দ্র।"

এই পত্রে 'সমাচার দর্পণ'কে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বলায় 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে অপর একখানি বাংলা সংবাদপত্রে জনৈক পাঠক আপত্তি করিয়া লিখিলেন,—

"শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু।—

বাঙ্গলা সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম গত ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে—

'এই অপূর্ব্ব দর্পণাবতারের পূর্ব্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে বাঙ্গালা সমাচারপত্র নামে কোন পদার্থ আছে।'

উত্তর ঐ লেখক মহাশয় বুঝি এতন্নগরবাসী না হইবেন কেননা ৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল

কিন্তু ঐ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বাধিত হইয়া তাঁহার নিজ ধাম বহরাগ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে দর্পণাবতার ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন। অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" (১৮৩১, ৬ই জুন—২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

এই চিঠিখানি সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মার্শম্যান সাহেব মন্তব্য করিলেন,—

"ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে।" (সমাচার দর্পণ—১৮৩১, ১১ই জুন, পৃ. ১৯৪)

দেখা যাইতেছে, 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক অতি স্পষ্টভাবে 'বাঙ্গাল গেজেট' পত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, তবে তাঁহার "অনুমানে" উহা না-কি প্রথম সংখ্যা সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হইবার দুই সপ্তাহ পরে বাহির হয়। এ অনুমান সত্য না-ও হইতে পারে।

'সমাচার চন্দ্রিকা' একখানি সমকালিক সংবাদপত্র। ইহার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ধারণা ছিল যে বাঙ্গাল গেজেটই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। ডাকমাশুল বৃদ্ধির ফলে ১৮৩৪ সালের নভেম্বর মাসে দ্বিসাপ্তাহিক সমাচার দর্পণের 'বুধবাসরীয়' কাগজ বন্ধ করিবার প্রস্তাব উঠিলে ভবানীচরণ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এসকলের অগ্রজ অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচারপত্র সর্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কালপ্রাপ্তি হয়। অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ।" (সমাচার দর্পণ—১৮৩৪, ১৫ই নভেম্বর, পৃ. ৫৪৭)

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে ১২৫৯ সালের ১ বৈশাখ (১২ই এপ্রিল ১৮৫২) তারিখে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। এই মূল্যবান্ প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদ সাপ্তাহিক 'ইংলিশম্যান' পত্রে প্রকাশিত হয়।* গুপ্ত-কবির মূল প্রবন্ধটি সংগ্রহ করিতে না পারিলেও ইংরেজী অনুবাদ হইতে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

"In the year 1222 or 23 (B. E.) appeared the first native paper. It was conducted by Gangadhar Bhattacharjee of Calcutta, who is said to have made a fortune by publishing an edition of Bharat Chundar's works. Thus it appears that journalism in Bengalee was not, as some would have us believe, projected by foreigners, nor has Serampore any right to arrogate to itself the credit of being

---

* "আমরা গত বৎসর [১২৫৯] প্রথম বৈশাখীয় পত্রে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস প্রকাশ করাতে তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন...বিশেষতঃ ১৮৫২ সালের ৮ই মে দিবসের সাপ্তাহিক ইংলিসম্যান্ পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় তদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ অবিকলানুবাদ প্রকটন করত...।"—সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩)।

the cradle of the indigenous press. Gangadhar's paper, the *Bengal Gazette*, did not continue long."*

বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র যে শ্রীরামপুরের সমাচার দর্পণ নহে—কিন্তু গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেট'—একথা গুপ্ত-কবি দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

গুপ্ত-কবির বাংলা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পরে—১৮৫৫ সালে—পাদরি লঙ-ও, ১৮১৬ সালে প্রকাশিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেট'কেই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া উল্লেখ করেন।† ১৮৫০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি কিন্তু সমাচার দর্পণকেই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন।‡ পাঁচ বৎসর পরে তিনি যে এই মত পরিবর্ত্তন করেন তাহার নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত কারণ ছিল। আমার মনে হয়, পাদরি লঙ 'বাঙ্গাল গেজেট' সম্বন্ধে গুপ্ত-কবির কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

গুপ্ত-কবি ও লঙ সাহেব উভয়েই 'অন্নদামঙ্গল'-প্রকাশক গঙ্গাকিশোরকে ভ্রমক্রমে 'গঙ্গাধর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই গঙ্গাকিশোরের বাড়ি ছিল শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বড়া গ্রামে। তিনি প্রথমে কিছুদিন শ্রীরামপুর মিশনরীদের ছাপাখানায় কম্পোজিটার ছিলেন, 'সমাচার দর্পণ' হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে,—

> "এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন।" (১৮৩০, ৩০এ জানুয়ারি)

গঙ্গাকিশোর পুস্তকের ব্যবসা করিয়া বেশ দু-পয়সা করিয়াছিলেন। ১৮১৮ সালের অক্টোবর মাসেও যে কলিকাতায় তাঁহার আপিস ছিল তাহার প্রমাণ 'সমাচার দর্পণ' পত্রে প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটিতে পাওয়া যাইবে,—

> "নূতন কেতাব। ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে...। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা

---

* "The Probhakar's History of the Native Press"—*The Englishman and Military Chronicle*, 8 May 1852.

† "In 1816, the *Bengal Gazette* was started by Gangadhar Bhattacharji who had gained much money by popular editions of the Vidya Sundar, Betal and other works, illustrated with woodcuts; the paper was shortlived."—*Descriptive Catalogue of Bengali Works*, by Rev. J. Long, (1855), p. 66.

‡ "Early Bengali Literature and Newspapers"—*Calcutta Review*, 1850, p. 145.

মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দে রোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।" (১৮১৮, ৩রা অক্টোবর)

'বাঙ্গাল গেজেট'-এর অস্তিত্বের আরও একটি পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস মহাশয় আমাকে একখানি প্রাচীন পুস্তক দিয়াছেন। তাহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

অথ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ॥
প্রকৃতি খণ্ড ॥
তদ্ভাষা ॥
শ্রীল শ্রীযুক্ত রামলোচন দাস কবিরত্ন
কর্তৃক পদ্যছন্দে বিরচিত ।।

শিষ্ট বিশিষ্ট ধর্ম্মিষ্ট জনগণের হিতার্থে ॥
৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাসয়স্য
বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে
শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্যানুমত্যনুসারে
ছাপা হইল বহরা গ্রামে

শকাব্দা ১৭৬৬

বাঙ্গাল গেজেট অল্পদিনই জীবিত ছিল। এই কারণেই বোধ হয় ইহার নাম সাধারণের মধ্যে তেমন প্রচলিত ছিল না। ইহার কোন সংখ্যা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারা যায় না।*

---

* ১৩৩৬ সালের কার্ত্তিক মাসের 'পঞ্চপুষ্প' নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত "প্রাচীনপঞ্জী—বাঙ্গালার প্রথম" প্রবন্ধে (পৃ. ৯২৪) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"সমাচার-দর্পণের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির হইয়া থাকিলে...সমসাময়িক অন্য কোন কাগজে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। অন্ততঃ সমাচার-দর্পণও তাহার নাম করিত।...দুঃখের বিষয় কেহই প্রস্তাবিত Bengal Gazetteখানি দর্শন করেন নাই। বাঙ্গালা Bengal Gazette কোনদিন বাহির হয় নাই। এই ভ্রান্ত প্রবাদের মূল লঙ্ সাহেব। আর লঙ সাহেব তাঁহার লেখায় যথেষ্ট ভুল করিয়াছেন—এটা নূতন নয়। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কোনও বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির হয় নাই।"

সমাচার দর্পণে ও অন্য সমকালিক সংবাদপত্রে বাঙ্গাল গেজেটের অস্তিত্বের যে প্রমাণ আছে তাহা আমি দেখাইয়াছি। সুতরাং উপরিউক্ত মন্তব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

লর্ড হেষ্টিংসের নূতন বিধি

প্রকাশের পূর্ব্বে সংবাদপত্রের সমস্ত লেখাই—এমন কি বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত—মঞ্জুর করিবার জন্য সরকারের সেক্রেটারীর নিকট পেশ করিবার রীতি ছিল। সংবাদপত্র-শাসন কিরূপ কঠিনভাবে চলিয়াছিল তাহা শ্রীরামপুরের পাদরি জে. সি. মার্শম্যানের একখানি চিঠির এই অংশটি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যাইবে,—"সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদপত্রের অনেক স্তম্ভই তারকা-চিহ্নিত হইয়া বাহির হইত ; কেন-না সে-সব অংশে 'সেনসর' তাঁহার সাজ্ঘাতিক কলম চালাইয়াছেন,—শেষ মুহূর্ত্তে শূন্য অংশগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই।" সংবাদপত্র-শাসন এইভাবে প্রায় ১৭ বৎসর চলিবার পর, ১৮১৮ সালের ১৯এ আগষ্ট বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস সম্পাদকদের এই বন্ধন-দশা মোচন করিলেন। তিনি সংবাদপত্র-পরীক্ষকের পদ তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সম্পাদকদের পথনির্দ্দেশ-স্বরূপ এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন যাহাতে সরকারের কর্ত্তৃত্বহানিকর অথবা লোকহিতের পরিপন্থী কোন আলোচনা সংবাদপত্রে স্থান না পায়। তখন দোষী সম্পাদকের একমাত্র শাস্তি ছিল ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসন, এ দণ্ড ভারতীয় সম্পাদকের উপর প্রয়োগ করা অসম্ভব। সুতরাং দেশীয় সম্পাদকগণকে শাসন করিবার ক্ষমতা তখন সরকারের হাতে না থাকায় কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকগণের জন্য সেন্সারের পদ বাহাল রাখা লর্ড হেষ্টিংস সঙ্গত মনে করেন নাই।

২। সমাচার দর্পণ

প্রথম পর্য্যায়, ১৮১৮—১৮৪১

বাঙ্গাল গেজেট প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পরে, ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীরা 'দিগদর্শন' নামে একখানি বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহার মাসখানেক যাইতে-না-যাইতেই মিশন 'সমাচার দর্পণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। সমাচার দর্পণ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র। জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮, ২৩এ মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। প্রথম তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া হইয়াছিল। সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইত।

প্রথমাবস্থায় পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারই প্রধানতঃ 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন। এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ১৮২৪ সালে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। ১৮৩৬, ২ জুলাই তারিখে সমাচার দর্পণ-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

> "ঐ কবিবর [জয়গোপাল তর্কালঙ্কার] পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশবৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন।"

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশবাসীর মধ্যে ইংরেজী শিখিবার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল ; এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সাল হইতে সমাচার দর্পণকে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১১ই জুলাই ১৮২৯ (২৯ আষাঢ় ১২৩৬) তারিখের কাগজে দেখিতেছি :—

"পাঠকবর্গেরদের প্রতি বিজ্ঞাপন। সমাচারদর্পণ প্রকাশক এগার বৎসরের অধিক কালাবধি কেবল বাঙ্গলা ভাষায় এই কাগজ প্রকাশকরণানন্তর বর্তমান তারিখ অবধি সম্বাদ ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু কাগজের মূল্য মাসিক এক টাকা করিয়া যেরূপ পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল তদতিরিক্ত কিছু না লইতে স্থির করা গিয়াছে। বাঙ্গলা তর্জ্জমায় মূল কথার ভাব থাকিবে কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় পত্তের সহিত ঐক্য থাকিবে। প্রকাশক এই ভরসা করেন যে যাঁহারা সম্বাদ-প্রাপণেচ্ছুক আছেন কেবল যে তাঁহারদের উপকারক এমত নহে কিন্তু যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাকরণবিষয়ে ব্যগ্র আছেন তাঁহারদেরও উপকার দর্শিবে। কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় সমাচারপত্র হইতে যাহা বাচনী করিয়া লওয়া যাইবে তাহাকেও ইঙ্গরেজী পরিচ্ছদ দেওয়া যাইবে।"

১৮৩২ সালে সমাচার দর্পণ দ্বিসাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৮৩১, ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে লিখিত হইল :—

"প্রতিসপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশকরণের আবশ্যক হওয়াতে দেড় টাকা করিয়া মূল্য স্থির করা গেল...।

"অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্যা আগামি ১১ জানুয়ারি বুধবার প্রকাশ পাইবে।"

সমাচার দর্পণের দ্বিসাপ্তাহিক সংস্করণ বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮৩৪, ৫ই নভেম্বর বুধবার তারিখের কাগজে লিখিত হইল :—

"পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপূর্ব্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে যে মাস্থল নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ইহার পর অবধিই আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল।"

সমাচার দর্পণ ১৮৩৪, ৮ই নভেম্বর হইতে পুনরায় প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখনও জে. সি. মার্শম্যান সম্পাদকতা করিতেছিলেন।* ১৮৪০ সালে মার্শম্যানের উপর অন্য একখানি বাংলা কাগজের সম্পাদন-ভারও পড়িল। ১৮৪০, ১লা জুলাই 'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হইল। মার্শম্যান এই রাজকীয় বার্ত্তাবহের সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণ করিবার অল্পদিন পরেই সমাচার দর্পণের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। ১৮৪১, ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

সমাচার দর্পণ বন্ধ করিবার মূল কারণ যে সম্পাদকের কর্ম্মবাহুল্য, তাহা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (The *Friend of India*) নামক সাপ্তাহিক পত্রের ৩০ ডিসেম্বর, ১৮৪১ তারিখের সংখ্যায় পাওয়া যাইতেছে :—

* ১৮৩৪, ১৫ই নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৪১) তারিখের কাগজে পাইতেছি :—"চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়... লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তর কেরী সাহেবকর্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় ভাষাতে কোন সম্বাদপত্র যদ্যপি

"THE SUMACHAR DURPUN.—The Editor of the *Sumachar Durpun* finds himself under the necessity of closing that journal with the termination of the present year. With two other journals, the ***Friend of India*** and the ***Bengalee Government Gazette***, to attend to, it is not possible to do that justice to the *Durpun*, whether in reference to the supply of editorial observations and intelligence, or to the translation of them into Bengalee, which a due regard for the interests of his subscribers and his own reputation, require. The claims of this paper, coming as they did week after week, immediately between those of two others, left none of that leisure which the mind of every individual who attempts to write for the public, demands. The pleasure which the publication of the journal once afforded, has changed into a severe task, and it appeared most judicious to bring it at once to a close…" (P. 817).

দ্বিতীয় পর্য্যায় ১৮৪২—৪৩

শ্রীরামপুর মিশন হাল ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীদের চেষ্টায় সমাচার দর্পণ শীঘ্রই পুনর্জ্জীবিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তের ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশ, সমাচার দর্পণের প্রচার রহিত হইলে বাবু দীননাথ দত্তের আনুকূল্যে উহা কিছুদিনের জন্য পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ইংরেজী ও বাংলা—উভয় ভাষায় ১৮৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ ১৮৪২, ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় দেখিতেছি :—

"NATIVE NEWSPAPERS.—We are happy to perceive that the *Sumachar* ***Durpun***, which the Editor was constrained to discontinue at the close of last year for want of sufficient leisure to do it justice, has been taken up and continued in Calcutta. Two numbers have already appeared. The first efforts of the Editors necessarily demand indulgence ; and they will, we hope, receive it. They exhibit a strong desire to satisfy public expectations, but leave much room for improvement. We trust the spirited proprietors will not be discouraged by the disappointments inseparable from a novel undertaking,…Theirs is the only journal which now appears in both English and Bengalee ; and they must not lie on their oars because there is no direct competition…"

ইহা সম্পাদন করিতেন—কলিকাতার অপর একজন বাঙালী সম্পাদক। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় আছে,—

অতিবিবেচনাপূর্ব্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ হইতে পারে অতএব তিনি এই বৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া বরং একপ্রকার প্রতিকূলই ছিলেন…।"

"THE SUMACHAR DURPUN.—...It was discontinued in 1841, or rather transferred to a native editor in Calcutta, in whose hands it soon drooped or died." (May 15, 1851, p. 309.)

তাহা হইলে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, ১৮৪১ সালে সমাচার দর্পণের প্রচার রহিত হইলে, "কলিকাতার জনৈক দেশীয় সম্পাদকের" হস্তে কাগজখানি কিছুদিনের জন্য পুনর্জ্জীবনলাভ করিয়াছিল। কলিকাতার এই দেশীয় সম্পাদকটি কে?

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমাচার দর্পণের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। * ইহা ভুল। যিনি দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ বাহির করিয়াছিলেন তিনি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নহেন,—১২৪৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'জ্ঞানদীপিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। কারণ ১৮৫১, ১৪ই এপ্রিল (২ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশিত "তিরোধান প্রাপ্ত" সংবাদপত্রগুলির দীর্ঘ তালিকার † মধ্যে (পৃ. ৪) তাঁহার নাম পাইতেছি,—

"সাপ্তাহিক।

সমাচার দর্পণ	...	জান মার্সমন সাহেব
"	...	ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।"

অন্য প্রমাণও আছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮) কিছুদিন পরে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'র "হেড" ক্রয় করিলে গুপ্ত-কবি লিখিয়াছিলেন ঃ—

"বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি একবার মৃত দর্পণের প্রাণ দান করত মার্সম্যান সাহেব হইয়াছিলেন, তিনিই আরবার চকোর হইয়া চন্দ্রিকায় চঞ্চুপ্রহার পূর্ব্বক সুধাপান করিবেন।" (সংবাদ প্রভাকর, ১৭ এপ্রিল ১৮৫২—৬ বৈশাখ ১২৫৯)

তৃতীয় পর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হইলে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁহার 'সম্বাদ ভাস্করে' (৬ মে ১৮৫১) লিখিয়াছিলেন ঃ—"একবার শ্রীরামপুরের গঙ্গায় দর্পণ বিসর্জ্জন হয়, দ্বিতীয়বারে ভগবতীর খড়্গে বলিদান হইয়াছে, এইবার তৃতীয়বার দিব্যদেহ হইয়া দেখা দিয়াছে,......।"

তাহা হইলে দেখা গেল, "কলিকাতার যে দেশীয় সম্পাদক" কিছুদিনের জন্য সমাচার দর্পণ পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি 'জ্ঞানদীপিকা'-সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

---

* "Journalism in Bengal," by Nabogopal Mitter. *The Bengal Academy of Literature*, I. No. 6, Jany. 6, 1894.

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার "বাংলা সংবাদ পত্রের ইতিহাস" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"কলিকাতা, কলুটোলা নিবাসী বাবু দীননাথ দত্তের সাহায্যে বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্সমান সাহেবের অনুমতি লইয়া কিছুকাল 'সমাচার দর্পণ' পুনরায় প্রকাশ করেন। দীনবাবু প্রাণত্যাগ করিলে, 'সমাচার দর্পণ' আবার উঠিয়া যায়।"—অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "নবজীবন," ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আষাঢ় ১২৯৩, পৃ. ৭২৫-৩৭।

† এই তালিকাটি ১৮৫১, ২২এ এপ্রিল তারিখের 'ইংলিশম্যানে' ভাষান্তরিত হয়; তাহা হইতে আবার 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পরবর্ত্তী ১ মে তারিখে তালিকাটি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন (পৃ. ২৮১)।

তৃতীয় পর্য্যায়, ১৮৫১—১৮৫২

সমাচার দর্পণ বন্ধ হইবার কয়েক বৎসর পরে ১৮৫০, ৪ মে শনিবার (২৩ বৈশাখ ১২৫৭) 'সত্যপ্রদীপ' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হয়। ইহা 'শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীটৌসেণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।' সত্যপ্রদীপ এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া সমাচার দর্পণ পুনঃপ্রকাশের কল্পনাজল্পনা চলিতে লাগিল। ১৮৫১, ২৯এ মার্চ (১৭ চৈত্র ১২৫৭) ৪৮ সংখ্যক সত্যপ্রদীপে ঘোষিত হইল :—

"সমাচার দর্পণ। ঐ সুপ্রসিদ্ধ নাম কে না শুনিয়াছেন। ১৮১৮ সালের ২৩ মে দিবসে শুভলগ্নে ভারতবর্ষে জন্ম লইয়া দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত রাজা প্রজা ইতর বিশেষ সর্ব্ব শ্রেণীর মঙ্গলার্থী ও সদুপকারী হইয়া ১৮৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখে * নিধনগত হন।...পাঠক ও গ্রাহক মহাশয়েরদের আনুকূল্যক্রমে সত্যপ্রদীপের এক বৎসর অবসান হইলে তৎপরিবর্ত্তে সমাচার দর্পণ পুনঃপ্রকাশ করিব।...

"সমাচার দর্পণ আগামি মে মাসের ৩ তারিখ শনিবারে প্রকাশিত হইবেক।"

যথাসময়ে ১৮৫১, ৩ মে শনিবার (২১ বৈশাখ ১২৫৮) তারিখে নবপর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ "১ বালম, ১ সংখ্যা" প্রকাশিত হইল। ইহার মুখপত্র হইতে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' এই অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"সমাচার দর্পণের নমস্কার। পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকার-প্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগের বহুকালীন বৃদ্ধবন্ধুস্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরোদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনরুত্থিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের। পূর্ব্বকার দর্পণে সাধারণ লোকের অনেক হিত বিষয় প্রতিবিম্বিত হইত। বর্ত্তমান দর্পণেও তদনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছা। বিশেষ ব্যক্তিদের গ্লানি প্রকাশ করণ সম্বাদপত্রের প্রধান অভিপ্রায়, এমত যাঁহারা বোধ করেন তাঁহারদের সঙ্গে আমারদের কোনমতে ঐক্য নাই। তাদৃশ ব্যাপার হইতে সর্ব্বতো-ভাবেই নির্লিপ্ত থাকিব। গোপাল যদি রামের চতুর্দ্দশ পুরুষের গ্লানি করিয়া দ্বেষপূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন করুন কিন্তু এমন সৎকার্য্য দর্পণের দ্বারা করিতে পারিবেন না কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তিদিগের কদাচরণ প্রকাশ করণ সমুচিত হইলে ক্ষান্ত হইব না। অনেক প্রতিজ্ঞা ও অনেক ত্রুটি এই দুই প্রায় সমান কথা। অতএব এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিতেছি এক বৎসর পর্য্যন্ত যথাসাধ্য উদ্যোগে যাহা করিতে পারি তাহাই করিব।

"দর্পণের দ্বিভাষিতা গুণের বিষয়ে এই বক্তব্য। দুই ভাষার বিশেষ বিধ্যনুসারে আমারদের মত প্রকাশ করিতে মনস্থ করিতেছি এই হেতুক কখন২ পদের অবিকল অনুবাদ করা হইবেক না সামান্যতঃ উভয় ভাষার রস যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া ভাষান্তরী কৃত হইবেক। অনেকে কহিয়া থাকেন বঙ্গভাষা অতি নীরস প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয়

* এই তারিখটি ভুল,—ইহা ১৮৪১, ২৫ ডিসেম্বর হইবে।

কথার সম্পূর্ণ রস তাহাতে প্রকাশ হয় না। পরন্তু এই কথার অনর্থকতার প্রমাণ এই পত্র হয় এতদ্রূপ আমাদের সম্পূর্ণ আশা। দর্পণ, ২১ বৈশাখ।"*

নবপর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' দেড় বৎসর চলিয়া একেবারে লুপ্ত হয়। ইহার প্রমাণ আছে। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত "১২৫৯ সালের সাম্বৎসরিক ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ" মধ্যে পাইতেছি :—

"অগ্রহায়ণ (১২৫৯)।...সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে।"

ঐ সংখ্যা সংবাদ প্রভাকরে গুপ্ত-কবি সম্পাদকীয় মন্তব্যের একস্থলে লিখিয়াছিলেন :—

"গত বৎসর [১২৫৯] যেমন কয়েকখানি পত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি আবার কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে।...শ্রীরামপুরে দর্পণ, জ্ঞানারুণোদয় এবং শশধর তিনখানি পত্রেরি পঞ্চত্ব লাভ হইল।"

সমাচার দর্পণ একখানি উৎকৃষ্ট সমাচারপত্র ছিল। দেশী বিলাতি সংবাদ, নানাবিষয়ক প্রবন্ধ, ইংরেজী বাংলা সাময়িক পত্রের সারসঙ্কলন প্রভৃতিতে ইহার কলেবর পূর্ণ হইত।

'সমাচার দর্পণ'-এর ফাইল।—

(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার :—২৩ মে ১৮১৮ (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১ (৩২ আষাঢ় ১২২৮)। ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে এই ফাইলগুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য তাঁহার 'সমাচার দর্পণ' শীর্ষক প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৪, পৃ. ১৪৯-৭০) উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু সমাচার দর্পণের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক খবর ঠিক মত দিতে পারেন নাই।

(২) বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি :—১৮২৪ সাল।

(৩) কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :—১৮৩১ সাল হইতে ১৮৩৭ সাল (অসম্পূর্ণ)।

(৪) রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—১৪ এপ্রিল ১৮২১ (৩ বৈশাখ ১২২৮) হইতে ১১ এপ্রিল ১৮৪০ (৩০ চৈত্র ১২৪৬)। আমি এই-সকল ফাইল হইতে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সঙ্কলন করিয়া "ভারতবর্ষে" (চৈত্র ১৩৩৭—আশ্বিন ১৩৩৮) প্রকাশ করিয়াছি।

৩। সম্বাদ কৌমুদী

সংবাদ-প্রকাশ বিষয়ে লর্ড হেষ্টিংসের নূতন নিয়ম-প্রবর্ত্তন লোকে অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল এবং উৎসাহবশে কলিকাতায় দেশীয় ভাষায় ও ইংরেজীতে অনেকগুলি সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইল। তন্মধ্যে সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জর্নাল' (২ অক্টোবর ১৮১৮) ও 'সম্বাদ কৌমুদী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সম্বাদ কৌমুদীর আবির্ভাবের আরও একটা কারণ ছিল। পরধর্ম্মের কুৎসা বা খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার 'সমাচার দর্পণে'র উদ্দেশ্য না হইলেও প্রথমাবস্থায় তাহাতে এমন কতকগুলি "প্রেরিত পত্র" প্রকাশিত হয় যাহাতে হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলীনদের কুৎসা প্রভৃতি ছিল। ইহার ফলে হিন্দুরা একখানি বাংলা সমাচার পত্রের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছিলেন। এমন সময় কলুটোলা-নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন। প্রথম সংখ্যায় বঙ্গীয় জনসাধারণকে

* সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়—৫ই মে, ১৮৫১ (২৩ বৈশাখ, ১২৫৮)।

উদ্দেশ করিয়া এই মর্ম্মে লেখা হইয়াছিল :—"লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র-প্রচারের প্রধান লক্ষ্য।... দেশবাসীর অভাব-অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে।"

সম্বাদ কৌমুদীর প্রচার-কাল লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর (২০ অগ্রহায়ণ ১২২৮) সম্বাদ কৌমুদীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২২এ ডিসেম্বর ১৮২১ (৯ পৌষ ১২২৮) তারিখে 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"সম্বাদ কৌমুদী। এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে ইহাতে আমরা অধিক আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতুক দর্পণ বল কিম্বা কৌমুদী বল অথবা প্রভাকর বল যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের জ্ঞান সীমা বিস্তার হয় তাহাতে আমরা তুষ্ট...।"

সম্বাদ কৌমুদী প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইত। রাজা রামমোহন রায় ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে প্রবন্ধদানে সাহায্য করিতেন।* তিনি সম্বাদ কৌমুদীতে সহগমনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে ধর্ম্মহানি এবং সমাজে মানহানির আশঙ্কা করিয়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বাদ কৌমুদীর সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ইহার প্রথম ১৩ সংখ্যা পরিচালন করিয়াছিলেন মাত্র।

ভবানীচরণের পর, তারাচাঁদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্তের নামে কাগজ চলিতে লাগিল। কার্য্যতঃ সম্পাদক ছিলেন—রামমোহন রায়। আড়াই মাস পরে স্বত্বাধিকারী হরিহর দত্ত 'কৌমুদী'র আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবসর গ্রহণ করেন (মে, ১৮২১)। গোবিন্দচন্দ্র কোঙার নামে এক ব্যক্তি কৌমুদী পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। ২৪ সংখ্যক (১৪ মে ১৮২২) সম্বাদ কৌমুদীর গোড়ায় যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

১। পাঠকগণের প্রতি পূর্ব্ব সম্পাদক—হরিহর দত্তের বিদায়-বাণী।

২। বর্ত্তমান সম্পাদক—গোবিন্দচন্দ্র কোঙারের নিবেদন।†

* "The *Cowmoody* set up by Baboo Ram Mohun Roy, to counteract the force of the ***Chundrika***, has been engaged in treating on general subjects, taking liberal views of them, though coming only as far as half the way on religion and politics.—*Enquirer*."—"The Bengali Newspapers," *Asiatic Journal*, Jany.—Apr. 1833, (Asiatic Intelligence—Calcutta, p. 9.)

রামমোহন রায়ের এক বিশিষ্ট বন্ধুও লিখিয়াছিলেন :—

"He [Rammohun] established and conducted two native papers, one in Persian, and the other in Bengali, and made them the medium of much valuable political information to his countrymen."—*A Lecture on the Life and Labours of Rammohun Roy*, by W. Adam, p. 20.

† "Contents of the *Sungbaud Cowmoody*, No. xxiv"—The *Calcutta Journal*, 14 May 1822, p. 193.

এই নূতন ব্যবস্থাতেও সম্বাদ কৌমুদী বেশীদিন চলিল না। চারি মাস পরেই ইহার প্রচার বন্ধ হইল। সম্বাদ কৌমুদী হিন্দুর কতকগুলি প্রচলিত প্রথা—বিশেষতঃ সহগমনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছিল
'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে গোঁড়া হিন্দুপক্ষীয় এক [illegible] নূতন বাংলা [illegible] পত্র প্রচার [illegible]
'কৌমুদী'র অনেক গ্রাহক ভাঙাইয়া লইয়াছিলেন।

কিন্তু 'সম্বাদ কৌমুদী' একেবারে মরিল না; পর বৎসর (১৮২৩) এপ্রিল মাসে আনন্দ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে পুনরায় দেখা দিল। মিলিটারী বোর্ড আপিসের কেরাণী গোবিন্দচন্দ্র কোঙার ছিলেন ইহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক।†

১৮২৯ সালের ১৯এ ডিসেম্বর (পৃ. ৩৪৬-৪৭) তারিখের "বঙ্গদূত" নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রে প্রচলিত ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রের একটি তালিকা মুদ্রিত হয়। তাহাতে 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদকরূপে হলধর বসুর নাম পাইতেছি।

১৮৩০ সালের গোড়া হইতে সম্বাদ কৌমুদী দ্বিসাপ্তাহিক হয়। ১৮৩০, ৩০ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি :—

"সম্বাদ কৌমুদী এখন সপ্তাহে তুইবার প্রকাশ হইতেছে।"

রামমোহনের বিলাতগমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায় কিছুদিন সম্বাদ কৌমুদী পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের সমাচার দর্পণে 'সম্বাদ তিমিরনাশক' নামক বাংলা সংবাদপত্র হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

> "এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদীনামে কাগজ করিতেছেন ঐ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেষী কএক মহাশয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয়নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে কোন স্থানে মিলাইয়া যাইতেন…।"

* "The Paper which was considered so fraught with danger, and like to explode over all India like a spark thrown into a barrel of gunpowder, has long since fallen to the ground for want of support; chiefly we understand because it offended the Native community, by opposing some of their customs, and particularly the Burning of Hindoo Widows...The innocent *Sungbad Cowmuddy*, the object of so much unnecessary alarm, was originally established in the month of December 1821, and relinquished by the original Proprietor for want of encouragement in May 1822, after which it was kept alive by another native till the September following, when about the commencement of the Doorga Pooja Holidays, it first was suspended, and then fell to rise no more."—"Danger of the Native Press," —*Calcutta Journal*, 14 Feby. 1823, pp. 618-19.

† . Affidavit dated 18 Apr. 1823.—*Public Consultation 8 May 1823, No 42.*

১৮৩২ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের সমাচার দর্পণে 'কৌমুদী' হইতে এই অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

"সর্ব্বজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহায্যকারী যিনি ছিলেন তেঁহ কোন আবশ্যকতাতে বাধিত হইয়া ঐ কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর মাসের প্রথমহইতে হইলেন...।—কৌমুদী।"

ইহার কিছু দিন পরেই 'সম্বাদ কৌমুদী' উঠিয়া যায়।

'সম্বাদ কৌমুদী'র ফাইল।—

সম্বাদ কৌমুদীর কোন ফাইল আমি দেখি নাই। তবে ১৮২১—২২ সালের "ক্যালকাটা জর্নাল"-এর 'এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্ট' বিভাগে ইহার অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচি ও অনেক প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে। ইহার কতকাংশ আবার বিলাত হইতে প্রকাশিত "এশিয়াটিক জর্নাল" নামক মাসিক পত্রেও ১৮২২ সালে (আগষ্ট পৃ. ১৩৬-৩৭, সেপ্টেম্বর পৃ. ২৮৪-৮৭, ও অক্টোবর পৃ. ৩৮৪-৯৪) পুনর্মুদ্রিত হয়।

সম্বাদ কৌমুদী সম্বন্ধে আমি ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসের Modern Review পত্রে প্রকাশিত "Rammohun Roy as a Journalist" প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

৪। সমাচার চন্দ্রিকা

সতীদাহ প্রথাকে উৎখাত করিবার জন্য রামমোহন রায়কে বদ্ধপরিকর দেখিয়া রক্ষণশীল হিন্দুর দল চটিলেন। প্রধানতঃ এই প্রথার সপক্ষে আন্দোলন চালাইবার জন্যই তাঁহাদের পক্ষ হইতে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের আবির্ভাব হইল। সেখানি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা'। এই ভবানীচরণই সম্বাদ কৌমুদীর প্রথম ১৩ সংখ্যা পরিচালন করিয়াছিলেন। সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশের সঠিক তারিখ কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ১৮২২ সালের ৫ই মার্চ (২৩ ফাল্গুন ১২২৮) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮২২, ২৩এ মার্চ (১১ চৈত্র ১২২৮) তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি :—

"ইস্তাহার। কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুন মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে। এবং এতৎ পত্র গ্রহণে আকাঙ্ক্ষী যেং মহাশয় হইবেন তাঁহার নাম সম্বলিত পত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পাঠাইবামাত্রে তাঁহার নিকট চন্দ্রিকা পত্র পাঠান যাইবেক ইতি।"

সম্বাদ কৌমুদীর সহিত সমাচার চন্দ্রিকার ঘোর মসিযুদ্ধ চলিল। ১৮২২, ৩০এ মার্চ তারিখের সমাচার দর্পণে দেখিতেছি :—

"প্রেরিত পত্র।...সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়েরা পূর্ব্বে এক হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতে ছিলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদ জনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। নানাদেশীয় নানাবিধ নূতন সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল পরগ্লানি সূচক হইলে নামের বিপরীত হয়।..."

১৭৫১ শকের বৈশাখ (১৮২৯ এপ্রিল) হইতে সমাচার চন্দ্রিকা সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইতে থাকে :—

"এই চন্দ্রিকা পত্র ১৭৪৩ শকে সাপ্তাহিক অর্থাৎ প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইত ১৭৫১ শকের বৈশাখাবধি দুইবার অর্থাৎ সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রকাশমান হইতেছে।"*

"সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংগ্লণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে" কলিকাতার বড়লোকেরা মিলিয়া ১৮৩০, ১৭ই জানুয়ারি তারিখে ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সম্পাদক হন। ১৮৩০, ১৩ই ফেব্রুয়ারি সমাচার দর্পণ লিখিয়াছিলেন,—"চন্দ্রিকাকার ধর্ম্মসভার কৌমুদীকার ব্রহ্মসভার সাহায্যকারক।... সতীবিষয়ক ব্যাপার সংপ্রতি ঐ উভয় সমাচারপত্রে লিখিত বাদানুবাদমাত্রের আশ্রয় হইয়াছে...।"

এই সময় সমাচার চন্দ্রিকার প্রাধান্য বিশেষরূপে বাড়িয়াছিল; গ্রাহক-সংখ্যাও অন্য বাংলা সাময়িকপত্রগুলির তুলনায় বেশী ছিল। ইহা গোঁড়া হিন্দুসম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল।

১৮৪৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি (৯ ফাল্গুন ১২৫৪) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন।† সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের বার্ত্তাবহের আবির্ভাবে সমাচার চন্দ্রিকার প্রসার-প্রতিপত্তি কমিয়া আসিয়াছিল। রাজকৃষ্ণবাবু শীঘ্রই ঋণজালে জড়িত হইয়া ইন্‌সলভেণ্ট হইলেন। সমাচার চন্দ্রিকার "হেড" ক্রয় করিলেন—ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ১৮১২, ১৭ই এপ্রিল তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি :—

"এত দিনের পর আমারদিগের পিতামহী প্রাচীনা চন্দ্রিকা দেবী পর হস্তে পতিতা হইলেন। এসাইনি সাহেব ২৫০ টাকা মূল্যে ঠাকুরাণ্ দিদীর 'হেড' অর্থাৎ মস্তক বিক্রয় করিয়াছেন, শুনিতে পাই 'ভবানীচরণস্য চন্দ্রিকা' 'ভগবতীচরণস্য চন্দ্রিকা' হইবেন।"

অচিরে নূতন 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হইল। ১৮৫২, ৭ই মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি :—

---

* সমাচার চন্দ্রিকা, ১ বৈশাখ ১২৩৭ (১২ এপ্রিল ১৮৩০)।—"ভারতী," ভাদ্র ১৩২৯, পৃ. ৪২৮।

† ১৮৪৮, ১৬ই মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আছে,—"ধর্ম্মসভা তথা চন্দ্রিকা সম্পাদক।—অবগতি হইল, গত রবিবার বৈকালে কলুটোলার ধর্ম্মসভার গৃহে ধর্ম্মসভার এক অতিরেক সভা হইয়াছিল, ঐ সভাতে আমারদিগের প্রধান সহযোগি চন্দ্রিকার অভিনব সম্পাদক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, উক্ত বাবু পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া পিতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হয়েন......।" ১৮৫২, ১৪ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়।

"শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন চন্দ্রিকা আমারদিগের দৃষ্টিপথে বিহার করিয়াছেন, ইহার আকার প্রকার পুরাতন চন্দ্রিকার ন্যায়। এবং পূর্ব্বকার সেই অসংখ্য সংখ্যা ও শ্লোকটিও রহিয়াছে...।

"এই বিষয় যন্ত্রারূঢ় হওন কালে শ্রবণ করিলাম পুরাতন চন্দ্রিকার নূতন সম্পাদক নূতন চন্দ্রিকার নূতন এডিটর ও নূতন প্রোপ্রাইটরের নামে উকিলের চিঠি দিয়াছেন, ফলে তিনি দিতে পারেন, কারণ রাজকৃষ্ণ বাবু ইন্সালবেণ্ট গ্রহণের অনেক পূর্ব্বেই চন্দ্রিকা বিক্রয় করিয়াছেন।"

পুরাতন সমাচার চন্দ্রিকাও মাঝে মাঝে বাহির হইতে লাগিল। ১৮৫৩, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

"কোন দৈব ব্যাঘাতে প্রাচীনা চন্দ্রিকা এত দিন বিড়ম্বনা-রূপ বারিদ জালে আচ্ছাদিত ছিলেন, পাঠক চকোরের তৃপ্তি জন্মাইতে পারেন নাই, অবগতি হইল অদ্য প্রচুরতর প্রযত্ন-রূপ প্রবল প্রভঞ্জন প্রঘাতে উক্ত মেঘমালা দূরীকৃতা হওয়াতে চন্দ্রিকা পুনর্ব্বার প্রকটিতা হইয়াছেন।"

কিন্তু কয়েক মাস পরেই পুরাতন চন্দ্রিকার মৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৩ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখের সংবাদ প্রভাকরে লেখেন :—

"আমারদিগের প্রাণাধিক প্রিয়বন্ধু বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় যেমন এসাইনির নিকট হইতে হেড ক্রয় করত নূতন চন্দ্রিকা প্রকাশ করিলেন তেমনি আবার এ পক্ষের পুরাতন চন্দ্রিকাখানি একবার জন্ম, একবার মৃত্যু, একবার মৃত্যু, একবার জন্ম, এইরূপ পাঁচ ছয় আছাড় খাইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।"

১৮৫২ সালে প্রকাশিত ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন 'সমাচার চন্দ্রিকা' সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কিছুদিন সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৫৮ সালের চৈত্র মাসের 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত একটি সমালোচনায় দেখিতেছি :—

"এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন সম্পাদক ও সমাচারচন্দ্রিকা নামক সংবাদপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক পণ্ডিতপ্রধান মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্ম সভাবিলাস নামে একখানি সংস্কৃত চম্পূ প্রকাশ করেন।"

সমাচার চন্দ্রিকা পরে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং শেষ দিকটায় 'দৈনিক'-এর সহিত মিলিত হইয়া বাহির হইত।

'সমাচার চন্দ্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—১৮৩১, এপ্রিল—মে (অসম্পূর্ণ)।
১৮৭৭—১৮৭৮ ফেব্রুয়ারি (অসম্পূর্ণ)—এগুলি প্রাত্যহিক পত্র।

শ্রীযুত রামকমল সিংহ :—১৮৩১ সালের শেষ ছয় মাসের (ছিন্ন)।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :—১৮৪৩—১৮৪৬ (অসম্পূর্ণ)।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১৮৩০, ১২ এপ্রিল—১২ এপ্রিল ১৮৩১। ইহা হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে 'ভারতী' ("সমাচার চন্দ্রিকা"—১৩২৯ ভাদ্র, পৃ. ৪২৭-৩২) এবং Calcutta Review (Aug. 1922) পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

[১৮২২ সালের Calcutta Journal পত্রে সমাচার চন্দ্রিকার অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচি ও কোন কোন প্রবন্ধের চুম্বক ইংরেজীতে দেওয়া আছে]

বাংলা মাসিকপত্র

১। দিগ্‌দর্শন

১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীরা "দিগদর্শন। অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" নামে একখানি বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ছাপার অক্ষরে ইহাই প্রথম বাংলা মাসিকপত্র।

'দিগ্দর্শন' ২৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। প্রথম খণ্ড—এপ্রিল ১৮১৮ হইতে মার্চ ১৮১৯; দ্বিতীয় খণ্ড—জানুয়ারি ১৮২০ হইতে ফেব্রুয়ারি ১৮২১।

'দিগ্দর্শন'-এর ফাইল।—

সম্পূর্ণ ফাইল :—রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার।

২। গস্‌পেল মাগাজীন

এই মাসিক পত্রখানি দ্বিভাষিক ছিল। প্রত্যেক পাতার বাঁদিকে ইংরেজী, ডানদিকে তাহার বঙ্গানুবাদ। "গস্‌পেল মাগাজীন"-এর প্রথম সংখ্যার তারিখ—ডিসেম্বর, ১৮১৯। ইহার প্রকাশক—"B. A. M. S." অর্থাৎ Baptist Auxiliary Missionary Society. ছাপাখানার নাম দেওয়া আছে,—"Printed at the School-Press, 38 Mot's Gully, Dhurumtula." এই কাগজখানিতে কেবল খৃষ্ট-তত্ত্ব আলোচিত হইত। কিছুদিন চলিয়া ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

'গস্‌পেল মাগাজীন'-এর ফাইল।—

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—তিন চার সংখ্যা।
ব্রিটিশ মিউজিয়ম :— প্রথম চারি সংখ্যা।

৩। ব্রাহ্মণ সেবধি

১৮২১, ১৪ই জুলাই তারিখের সমাচার দর্পণে প্রশ্নচ্ছলে হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতার উল্লেখ করিয়া একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায় এই পত্রখানিকে মিশনরীদের তরফ হইতে অযথা আক্রমণ, এবং তাহার প্রতিবাদ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তিনি 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' এই ছদ্মনামে প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রকাশার্থ সমাচার দর্পণে পাঠাইলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে সমাচার দর্পণ-সম্পাদক মন্তব্য করিলেন,—

> "শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্ম প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।"

অগত্যা রামমোহন 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' এই নাম দিয়া ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে * 'Brahmunical Magazine ও ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে একখানি কাগজ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাহারই সাহায্যে মিশনরীদের প্রচারিত হিন্দুশাস্ত্র-সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইত।

শিবপ্রসাদ শর্ম্মার ছদ্মনামে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' বাহির হইলেও, প্রকৃতপক্ষে রামমোহন রায়ই তাহার পরিচালক ছিলেন। রায়জীর প্রতিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লিখিয়াছিলেন :—

> "...সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে [রামমোহন রায়কে] ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রপ্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি...তিনি ব্রাহ্মণীকেল মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেবধিপ্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনরিপ্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন..."।†

'ব্রাহ্মণ সেবধি'র ফাইল।—

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—Brahmunical Magazine এর চতুর্থ খণ্ড।

রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি (১৭৯৫ শক) : —ইহার ৪৫৫-৮৫ পৃষ্ঠায় প্রথম তিন সংখ্যা ব্রাহ্মণ সেবধি মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। পশ্বাবলী

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক এই বাংলা মাসিক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। এক এক সংখ্যায় এক একটি জন্তুর বিবরণ, এবং পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় সেই সেই জন্তুর ছবি থাকিত। "পশ্বাবলী"র প্রথম সংখ্যার তারিখ দেখিতেছি—ফেব্রুয়ারি, ১৮২২। এই "পশ্বাবলী—Natural History of Beasts" পত্রের প্রথম পর্য্যায় লসন্ ও পিয়ার্স সাহেব পরিচালনা করেন।

প্রথম পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলী'র ফাইল।—

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি—কয়েক সংখ্যা।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের "পশ্বাবলি" পরিচালন করেন—শ্রীরামচন্দ্র মিত্র। ইহা ১৮৩২ সালে ‡

---

* ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড খুব অল্পদিনের ব্যবধানেই বাহির হইয়াছিল, কারণ শ্রীরামপুর মিশনরীদের প্রচারিত The Friend of India পত্রের ১৮২১ আগষ্ট সংখ্যায় (নং ৩৮) দ্বিতীয় খণ্ড ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতেছি। ইহা হইতে হঠাৎ মনে হইতে পারে যে ১৮২১ সালের জুলাই মাসেই ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহা হওয়া যে সম্ভব হইতে পারে না তাহার প্রমাণ—১৪ই জুলাই ১৮২১ তারিখের সমাচার দর্পণে প্রশ্নগুলি বাহির হইবার পরে 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' তাহার উত্তর রচনা করিয়া প্রকাশার্থ শ্রীরামপুরে পাঠান, এবং এ-সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়। এই কারণে আমি ব্রাহ্মণ সেবধির প্রকাশকাল ১৮২১, সেপ্টেম্বর বলিয়া মনে করি। ১৮২১ আগষ্ট মাসের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† ১৮২৯, ১২ই ডিসেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

‡ Long's *Descriptive Catalogue of Bengali Works*, p. 68.

প্রকাশিত হয়। প্রথম সাত সংখ্যা বাংলায়, এবং পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলি ইংরেজী ও বাংলায় বাহির হইয়াছিল। ইহা নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইত না।*

'পশ্বাবলি'র "Part II No. 1. Compiled and Translated by Ramchunder Mitter" প্রকাশিত হয় ১৮৩৪ সালের শেষাশেষি।

১৮৩৪ সালের ২৫এ অক্টোবর তারিখের সমাচার দর্পণে "জ্ঞানান্বেষণ" পত্র হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

> "পশ্বাবলি। শ্রীযুত রামচন্দ্র বাবু কর্তৃক কৃত পশ্বাবলিনামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ ইঙ্গরেজী হইতে সংক্ষেপ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন...।"

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলি'র ফাইল।—

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—১৮৩৪ হইতে ১৮৪৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত কয়েক সংখ্যা।

উর্দ্দু সংবাদপত্র

১। জাম-ই-জাহান-নুমা

সেকালে আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই ইংরেজী জানিত, আর হিন্দী বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষাগুলি তখন পর্য্যন্ত এত সংস্কৃত-ঘেঁষা ও কঠিন ছিল যে সে-ভাষা সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হইলে তাহা কেহই সহজে পড়িতে পারিত না। অন্যান্য ভাষার তুলনায় তখন ভারতবর্ষে উর্দ্দু ভাষার—অবশ্য চলিত কথাবার্ত্তায়—বহুল প্রচলন ছিল। প্রথম হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু সংবাদ-পত্রের নাম—জাম-ই-জাহান-নুমা, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যরাজ জমশেদ যে-পেয়ালাতে সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেন। ইহা ১৮২২, ২৮এ মার্চ তারিখে কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত

* কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির দশম কার্য্যবিবরণীতে আছে :—"The *Natural History* in *Bengalee*, of which one volume was completed by Messrs. Lawson and Pearce, is now taken up by Ram Chunder Mitr, who was formerly a scholar, but is now a teacher, in the Hindoo College. He has furnished the *History of the D g*, enlivened with a great number of interesting anecdotes, each arranged under the species of the animal of which he is treating. The first seven numbers of the work were printed only in Bengalee, but it was proposed that all succeeding numbers shall be Bengalee and English ; and under existing circumstances, it did not appear wise to reject this proposal."—The Tenth Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings,...Read the 21 Mar. 1834.

হয়।* মৌলভী মুহম্মদ হুসেন আজাদ তাঁহার 'আবে হায়াৎ' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতাই ১৮৩৩ সালে দিল্লী হইতে উর্দ্দু ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার অনেক পূর্ব্বে একাধিক উর্দ্দু সংবাদপত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রাহকের অপ্রতাবশতঃ ১৮২২ সালের ১৬ই মে (৮ম সংখ্যা) হইতে জাম্-ই-জাহান-নুমার পরিচালকেরা উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষায় কাগজখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন।† অল্পদিন পরেই উর্দ্দু অংশ বর্জ্জিত হইয়া শুধু ফার্সীতেই কাগজখানি প্রকাশিত হইতে থাকে।

'জাম্-ই-জাহান্-নুমা'র ফাইল।—

ইম্পিরিয়াল রেকর্ড আপিস, কলিকাতা :— ১৮২৪ হইতে ১৮৪৫ পর্য্যন্ত।

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি : ১৮২৪ ১৮২৯-৩০ সাল।

'ক্যালকাটা জর্নাল' পত্রে জাম-ই-জাহান-নুমার কয়েক সংখ্যার বিষয়-সূচি উদ্ধৃত হইয়াছিল। ইহার ৮ম সংখ্যার বিষয়-সূচিতে (ibid., 22 June 1822, p. 739) 'ফার্সী' ও "হিন্দুস্থানী" বিভাগের প্রবন্ধের তালিকা দেখিতেছি। সুতরাং ৮ম সংখ্যা হইতেই কাগজখানি যে দ্বিভাষিক হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

ফার্সী সংবাদপত্র

চলিত কথাবার্ত্তায় উর্দ্দু ভাষার বহুল প্রচলন থাকিলেও লেখ্য ভাষা হিসাবে ইহার তেমন চলন ছিল না। তখনকার দিনে দেশী সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা ছিল কম। যাঁহারা সংবাদপত্র পড়িতেন তাঁহারা দেশের সম্ভ্রান্ত লোক। এই শ্রেণীর লোকেরা আবার ফার্সী ভাষায় শিক্ষালাভ করিতেন, কাজেই তাঁহাদের নিকট উর্দ্দু সংবাদপত্রের আদর ছিল না। সভ্যসমাজের ভাষাই ছিল ফার্সী। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে প্রায় ১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালতের রায়, নিম্ন রাজকর্ম্মচারীদের রিপোর্ট এবং রাজনৈতিক পত্রাদি ফার্সী ভাষায় লিখিত হইত। কাজেই ফার্সী সংবাদপত্র পড়িবার ও পয়সা দিয়া কিনিবার মত গ্রাহক তখন এদেশের বড় বড় শহরে যথেষ্ট ছিল।

* "The Jam-i-Jahan Numa made its first appearance on the 28th March last...is understood to be the property of, and to be principally conducted by an English Mercantile House in Calcutta."—W. B. Bayley's Minute, dated 10 Octr. 1822 (See *Modern Review*, Novr. 1928, pp. 553-60.)

† "By a notice among our advertisements it will be seen that the Hindoostanee Paper [*Jam-i-Jahan Numa*] set on foot some time ago and which had reached the Sixth Number, is to undergo considerable modification as regards the language in which it is written."—'Native Press'—The *Calcutta Journal*, 8 May 1822, p. 109.

১। মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার

ফার্সী ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব রামমোহন রায়ের। ইহার নাম—'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার,' বা সংবাদ-দর্পণ। কলিকাতার ধর্ম্মতলা হইতে মুদ্রিত হইয়া, ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল (১ বৈশাখ ১২২৯) শুক্রবার এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংখ্যা মীরাৎ-উল্-আখ্‌বারের গোড়ায় রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

> "সম্পাদক জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে পাঠকগণের মনোরঞ্জনের জন্য এই শহরে অনেকগুলি সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত অথচ ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ—বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা—তাঁহাদের পাঠের জন্য একখানিও ফার্সী সংবাদপত্র নাই ; এই কারণে তিনি একখানি সাপ্তাহিক ফার্সী সংবাদপত্র প্রকাশের ভার লইয়াছেন।"

অতীব কৃতিত্বের সহিত এক বৎসর কাগজখানি চালাইয়া রামমোহন ইহার প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার কারণ পরে জানা যাইবে।

'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার'-এর ফাইল।—

এই ফার্সী সংবাদপত্রের ফাইল আমি কোথাও দেখি নাই। তবে ১৮২২-২৩ সালের 'ক্যালকাটা জর্নাল' ও 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে ইহার অনেকগুলি সংখ্যার বিষয়-সূচি এবং অনেক প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সেগুলি সঙ্কলন করিয়া আমি ১৯৩১ সালের এপ্রিল ও আগষ্ট মাসের 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত "Rammohun Roy as a Journalist" প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

নূতন প্রেস-আইন

ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে—বিশেষতঃ সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জর্নালে'—অনেক লেখা বাহির হইতে লাগিল যাহা সরকারের নিকট আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর, অতএব লর্ড হেষ্টিংসের নিয়ম বিরোধী, বলিয়া মনে হইল। সরকার রুষ্ট হইয়া সংবাদপত্র শাসনের জন্য বিধি-প্রবর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কলিকাতার লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্যেরা ইংরেজী সংবাদপত্র সম্বন্ধে প্রতিকূল মত নিজ নিজ মিনিটে প্রকাশ করিলেন। উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেলী তাঁহার ১৮২২ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের দীর্ঘ মিনিটে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি হইতে সরকারের চক্ষে আপত্তিজনক অনেক অংশ উদ্ধৃত করেন। তিনি লিখিতেছেন,—

> "বর্ত্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয় ; দুইখানি বাংলায় এবং দুইখানি ফার্সীতে। চারিখানিই সাপ্তাহিক।...ফার্সী কাগজগুলির নাম—'জাম-ই-জাহান-নুমা' এবং 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার'।...দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে—ইহা জানা কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকারক।...

"ফার্সী ও বাংলা উভয় ভাষার সংবাদপত্রেই অনেক আপত্তিজনক অংশ আছে। 'সতীদাহ' লইয়া বাংলা সংবাদপত্রে বহু তীব্র আলোচনা প্রকাশ করা হইতেছে। ইউরোপীয় মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, দেশের লোকেরা স্ব-ইচ্ছায় এই-সকল আলোচনা চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে।"

বেলী সাহেব দেখিতেছি স্পষ্টবাদী লোক; তিনি তাঁহার মিনিটে খোলাখুলি-ভাবে লিখিয়াছেন,—

"The liberty of the Press, however essential to the nature of a free State, is not in my judgment, consistent with the character of our institutions in this country, or with the extraordinary nature of their interests."

বেলীর সুদীর্ঘ মিনিট * হইতে আমি যৎসামান্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের প্রতি সরকারের মনোভাব যে প্রসন্ন ছিল না তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

১৮২২, ১৭ই অক্টোবর সকৌন্সিল লর্ড হেষ্টিংস সংবাদপত্রগুলিকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নূতন ক্ষমতা প্রার্থনা করিলেন। পর বৎসরের ৯ই জানুয়ারি তারিখে লর্ড হেষ্টিংস বিলাত-যাত্রা করেন। অ্যাডাম অস্থায়িভাবে গভর্ণর-জেনারেল হইলেন। তিনি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের সমর্থন পাইয়া ১৮২৩ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে এক কড়া প্রেস আইন লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসের ৪ঠা তারিখে সুপ্রীম কোর্টে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়া এই আইন জারি হইল। এই নূতন আইনের প্রথম ফলস্বরূপ রামমোহন রায়-সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল্-আখ্বারে'র প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল। পত্রের শেষ সংখ্যায় রামমোহন জানাইলেন যে এরূপ অপমানজনক সর্ত্তে রাজী হইয়া তিনি কাগজ প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসের Modern Review পত্রে আমি সমগ্র মিনিটটি প্রকাশ করিয়াছি।

'হিন্দু মহিলা নাটক'

বর্ত্তমান সালের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের জীবনী ও তৎসহ তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলীর পরিচয় প্রসঙ্গে তৎসমসাময়িক অপর গ্রন্থমালারও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ১৮৪১ খ্রীঃ হইতে ১৮৭৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত যে সকল নাট্যগ্রন্থ রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ সেই পরিচয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু "হিন্দু মহিলা" নামে একখানি নাটকের তাহাতে স্থান হয় নাই। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, তাঁহার তালিকা সম্পূর্ণ নহে; কারণ, ১৮৬০ সালের পর নাট্যগ্রন্থের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সবগুলির তালিকায় স্থান দেওয়া সম্ভব নয় বা বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা বলি, সম্ভব না হইলেও 'হিন্দু মহিলা নাটক'-এর ন্যায় তৎকালের শিক্ষিতসমাজে সমাদৃত এবং জোড়াসাঁকো নাট্যসমাজের প্রচারিত দুই শত টাকা পুরস্কারপ্রাপ্ত একখানি গ্রন্থের স্থান দেওয়া উচিত ছিল।

যৎকালে তর্করত্ন মহাশয় জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটির দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা-প্রণোদিত হইয়া 'নব নাটক' রচনা করেন, ঠিক সেই সময়েই সেই জোড়াসাঁকো নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান ঘোষণার ফলেই "হিন্দু মহিলা নাটকে"র উদ্ভব। ইহার রচয়িতার নাম বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, নিবাস হুগলী জেলার সোমড়া গ্রামে। তিনি গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখিতেছেন,—

'মান্যবর শ্রীযুক্ত যোড়াসাঁকোস্থ নাট্যশালাধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদনমেতৎ।

হিন্দু মহিলাগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিষয়ে একখানি নাটক রচনা করিলে উৎকৃষ্ট রচয়িতাকে মহাশয়েরা দ্বিশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, এই বিজ্ঞাপন "সোমপ্রকাশে" ও ইংরেজী সংবাদপত্রে দৃষ্টি করায় এই নাটকখানি প্রণীত হইল। নাটক লেখা এই আমার প্রথমোদ্যম; এতন্মধ্যে যে কএকটী সচরাচর ঈঙ্গিত বিষয় সন্নিবেশিত হইল, তাহাতে বোধ হয় সহৃদয় মহোদয় মাত্রেই প্রাগুক্ত মহিলাগণের হীনাবস্থা সবিশেষ হৃদ্বোধ করিতে পারিবেন। অভিনয়-অনুপযোগী হওনাশঙ্কায় ইহাতে পদ্যাদি নানা ছন্দ সাধ্যপক্ষে পরিত্যাগ করিয়াছি, তবে যে স্থলে দুই একটী না রাখিলে নিতান্ত নাট্যালঙ্কারবিহীন হয়, এমত স্থানেই তত্তাবৎ নিবেশিত হইয়াছে। যাহা হউক, যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ইহা আপনাদিগের স্বদেশ-হিতৈষী এই সাধিয়সী চেষ্টার ফলোপধায়কতা সম্বন্ধে সাফল্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে স্বীয় যত্নায়াসে পূর্ণাভীষ্ট বোধে, সর্ম্মাধিক সুখী হইব নিবেদনমিতি

সোমড়া বাটী
৩০শে বৈশাখ
শঃ ১৭৮৮।

ভবতামেকান্ত বশম্বদ
শ্রীবিপিন মোহন সেনগুপ্তস্য,

গ্রন্থকার নাটকখানি প্রণয়ন করিয়া নাট্যশালা-কমিটির নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহারা এই গ্রন্থ পুরস্কার লাভের যোগ্য কি না, তাহার বিচারার্থ পরীক্ষকদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাঁহার গ্রন্থের পরীক্ষক ছিলেন,—সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক মনীষী প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত কৃষ্ণকমল বিদ্যাম্বুধি ভট্টাচার্য্য। তাঁহারা এই নাটকখানি পাঠান্তে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

২৫এ ফেব্রুয়ারী—১৮৬৭।

দুইখানি নাটক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে যে বিপিনমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত গ্রন্থখানিই সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। যে যে গুণ বিদ্যমান থাকিলে দৃশ্যকাব্য উপাদেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে,—অর্থাৎ বর্ণিত ব্যক্তিগণের চরিত্র নির্ব্বাচন, ইতিবৃত্ত রচনার চাতুরী, ভাষার লালিত্য ও অবসরোচিত ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গী ধারণ প্রভৃতি যে যে বিষয় নাটকে থাকিলে লোকের মনোরঞ্জন ও তৎসহকারে সদুপদেশ প্রদান হইবার সম্ভাবনা, বিপিনমোহন সে সকল বিষয়েই তাঁহার প্রতিদ্বন্দী অপেক্ষা সমধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ... ...

তথাপি ন্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আমাকে বিনা সঙ্কোচে জানাইতে হইতেছে যে, যে উদ্দেশে এই পারিতোষিক বিতরণের অভিসন্ধি বিতরণ-কর্ত্তাদিগের মনে উদয় হইয়াছিল, আমার মতে সে উদ্দেশ্য বিপিনমোহনের গ্রন্থ রচনার দ্বারাই বিশিষ্ট চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং অখণ্ড পারিতোষিক তাঁহারি পাওয়া উচিত বলিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে। ইতি—

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

আমার পরীক্ষা কার্য্যের সহযোগী মহাশয় যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বাংশেই আমার নিরবচ্ছিন্ন ঐকমত্য আছে।...

(স্বাক্ষর) শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

'হিন্দু মহিলা নাটক' কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থকারের উৎসর্গপত্রের দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে গল্পাংশের কথা।—

নাটকখানি যখন দুই জন প্রবীণ পরীক্ষকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, তখন যে ইহার গল্পাংশ সুন্দর ও সুশ্রাব্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহার ভাষা যে কিরূপ, তাহা জানাইবার জন্য এ স্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

গদ্য

"গৃহী হওয়া বহু দুঃখের আকর, তার সন্দেহ কি? এই সংসারে সার পদার্থ কিছুই নাই, তবে যে ব্যক্তি বহু ক্লেশে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হন, তিনিই ধন্য; তিনি চরমে পরম পদ লাভে শক্য হন। সুখ দুঃখ অদৃষ্টায়ত্ত। তবে মন বুঝে না চেষ্টা করিতে হয়, বস্তুতঃ চেষ্টা করাও ভাল। যত্ন করিলে যদি সিদ্ধ না হয়, তবে দোষ কি? তবে কি জানেন, সুখ দুঃখ সকলই অদৃষ্টায়ত্ত।"

দিয়ে হাত তুড়ি, উঠি তাড়াতাড়ি
পতি সনে গাড়ি, হাঁকাবে সবে।
পুরীতে রবে না হাঁড়ি ধরিবে না,
মনের বেদনা ঘুচাবে এবে।
বাহিরে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া,
কাঁচলি কসিয়া গুড়ুক খাবে;
পতি-সেবা ধন, ভুলিয়ে তখন,
মনের মতন পুথী দেখিবে।
ছুটু করি গিয়া বুটু পায়ে দিয়া,
বাছিয়া বাছিয়া পতি বরিবে;

বিবাহের'তরে, জনকের ঘরে,
নতশির করে, নাহি রহিবে।
হয়ে পতিহীন, একাদশী দিন
দেহ করি ক্ষীণ, আর কি রবে।
বিধবা হইয়া, চুল বাঁকাইয়া,
ঢাকাই পরিয়া সধবা হবে।

হিন্দু মহিলার মুদ্রাঙ্কন-কাল ১৮৬৮ খ্রীঃ। পরীক্ষকদ্বয় নিজেদের অভিমত প্রদান করেন—১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন,—"দুঃখের বিষয় ইহার পরীক্ষক মহাশয়েরা কিছু কাল-বিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, গ্রন্থখানি ইহার অভিমত প্রদানের বৎসরাধিক পূর্ব্বে রচিত হইয়া পরীক্ষার্থে নাট্যশালা-কমিটির হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। আর একটী কথা, পরীক্ষকদ্বয় দুইখানি গ্রন্থ পরীক্ষার্থে পাইয়া "হিন্দুমহিলা নাটক" সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ও পারিতোষিক পাইবার যোগ্য বলিয়া মত প্রদান করেন। অপর যে নাটকখানি অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল, সেখানি কোন্ নাটক এবং কাহার রচিত, অনুসন্ধানবিশারদ প্রবীণ প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বলিয়া দিবেন কি?

'হিন্দু মহিলা নাটক'খানির টাইটেল-পেজ বা আখ্যাপত্র এইরূপ,—

A
DRAMA
ON THE HINDOO FEMALES.
ENCOURAGED BY THE LATE JORASANKO
THEATRICAL ASSOCIATION.
BY
BEPIN MOHUN SEN

হিন্দু মহিলা নাটক।

অর্থাৎ
হিন্দু যোষাদিগের হীনাবস্থা-ব্যঞ্জক দৃশ্য কাব্য
শ্রীবিপিন মোহন সেনগুপ্ত
প্রণীত।

"যদুচ্যতে পার্ব্বতি পাপবৃত্তয়ে
ন রূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ।
তথাহি তে শীলমুদারদর্শনে
তপস্বিনামপ্যুপদেশতাং গতম্।"
—— কুমারসম্ভব।

"———Of all the gifts that God
To man has given, the best is a good wife,
The bad, the bitt'rest curse of human life."
Sir Walter Scott.

CALCUTTA.
Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press
No. 22, Amherst Street.
1868.

নাটকখানি হইতে বিজ্ঞাপনটিও উদ্ধৃত করিতেছি :—

'বিজ্ঞাপন।

যোড়াসাঁকো নাট্যশালা-অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে লিখিত এতৎ পুস্তকে মুদ্রিত পত্রখানি পাঠে সাধারণ্যে এই নাটক প্রণয়নের উদ্দেশ্যাদি বিদিত হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার পরীক্ষক মহোদয়েরা কিছু, কালবিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। বিশেষতঃ তৎপরেও প্রোক্ত নাট্যশালা-সমাজ বিগতজীবন হওয়ায়, কোথা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তন্নির্ণয়ে সমধিক সময় অতিবাহিত হয়, পরে গুণগণযুক্ত শ্রীযুক্ত অধ্যক্ষবিশেষের সবিশেষ প্রয়াসে পারিতোষিকে পরিতুষ্ট হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করা গেল। এক্ষণে সাধারণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা, তাঁহারা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠে আমাকে উৎসাহান্বিত ও সফল-প্রযত্ন করুন।

বর্ত্তমানে বহুবিধ নাটক রচিত ও তৎপাঠনা প্রায় সর্ব্বত্রে প্রচলিত হওয়ায়, দেশীয় কুরীতি কলাপ পরিবর্ত্তন ও তনবিনিময়ে বিশুদ্ধ প্রণালী প্রভৃতি প্রবর্ত্তন বিষয়ে প্রভূত উপকার প্রদর্শিত হইতেছে, সন্দেহাভাব। কিন্তু তত্তাবৎ যদি সাধারণ উৎসাহ সহকারে অভিনয়-মন্দিরে প্রদর্শিত হয়, তাহাতে দ্বিবিধ উপকার লাভের সম্ভাবনা, প্রথমতঃ তত্তন্মূলক কুরীতি আদি নিবারণ, ও উদ্দেশ্য কল্প সংসাধন ও সংরক্ষণের সোপান দর্শকবর্গের হৃদয়মন্দিরে স্বতঃই সংস্থাপিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানে যাত্রাদি প্রণালীর পরিবর্ত্তনে নাট্যাভিনয়ের উপযোগিতা ও ঔচিত্য ক্রমশঃ সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। সত্য বটে, এতন্নগরীস্থ সম্পত্তিসম্পন্ন মহোদয়েরা সময়ে সময়ে অভিনয় সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ নহেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে চিত্তরঞ্জক পরিণতি মিলনসূচক সংস্কৃত অনুবাদিত ও অভিনব প্রণীত, নাট্টাভিনয় নিচয়, যখন অভিনয়ের সমীচীনতা সাধারণের অন্তর্নিহিত হইবে, তখন সহজেই তত্তাবৎ অনুষ্ঠিত ও আচরিত হওয়া সুদূরসম্ভব নহে। সে মতে স্বদেশহিতকরী চিত্তাকর্ষণী শোচনীয় ঘটনাবলীই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের ইপ্‌সিত ও অভিলষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

পরিশেষে, এ নাটকের পরীক্ষকদ্বয়, সংস্কৃত কালেজের ইংরাজী অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়, তথা প্রেসীডেন্সী কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল বিদ্যাম্বুধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে আমার এই প্রথমোদ্যমপ্রসূত নাটকখানি যে এতদূর সর্ব্বাঙ্গীন হইবেক, ইহা স্বপ্নেও বিবেচিত হয় নাই, কিমধিকং ইতি।

কলিকাতা
২৯শে কার্ত্তিক
শঃ ১৭৯০

শ্রীবিপিন মোহন সেনগুপ্ত।'

মোজাম্মেল হক্

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

জোড়াসাঁকো নাট্যশালার সূত্রপাত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—উভয়েরই বাল্যকালে নাটকাভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। তাঁহাদের দুইজনের সমবেত চেষ্টায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি হয়। অভিনয়ের আয়োজন, নাটক-নির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য Committee of Five গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্য ছিলেন,—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি অক্ষয় চৌধুরী এবং জ্যোতিবাবুর ভগ্নীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণবিহারী সেনই অভিনয়-শিক্ষক হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে [১৮৫৯ সনের এপ্রিল মাসে] 'বিধবা বিবাহ' নাটকে পড়ুয়ার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন।

ঠাকুর-বাড়িতে প্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' এবং তাহার কিছুদিন পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হইল। দুইবারই অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর এই দুই অভিনয়ে যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর মাতা ও সার্জ্জনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। শেষে 'কমিটি অফ ফাইভ' ঠাকুর-বাড়ির ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক—ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন এবং সামাজিক নাটকের উপযোগী বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। বিষয় ঠিক হইয়া গেলে উৎকৃষ্ট বাংলা-নাটক-রচনার জন্য সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা হইল।*

উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকের জন্য পুরস্কার-ঘোষণা

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি ১৮৬৫ সনের জুন (?) মাসে *Indian Daily News* পত্রে প্রথমে বহুবিবাহ-বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই কমিটি সংবাদপত্র হইতে প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক-রচনার ভার অর্পণ করেন।† সঙ্গে সঙ্গে কমিটি হিন্দু-মহিলাগণের দুরবস্থা ‡ এবং পল্লীগ্রামস্থ জমীদারগণের অত্যাচার—এই দুইটি বিষয়ে দুইখানি

---

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃ. ৯৬, ৯৯, ১০০।

† সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, তাঁহার বড় দাদা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত রামনারায়ণ ('ভারতী'—ভাদ্র ১৩১৯, পৃ. ৪৫৪)

‡ এই বিষয়টিতে সে-সময় অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৬৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দেখিতেছি,—

উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন। ১৮৬৫ সনের ১৫ই জুলাই তারিখের *The Indian Mirror* (তৎকালে পাক্ষিক) সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হয় :—

ADVERTISEMENTS.

The following Prizes are offered by the Committee of the Jorasanko Theatre for the best dramatic productions on the following subjects :—

No. 1.—Rs. 200.

The Hindoo Females, - Their Condition and Helplessness.

To be handed over to the Committee before the 1st of June 1866.

Adjudicators,—Babu Peary Chand Mitra.
Professor Krishna Comul Bhuttacharjee, B. A.
Pundit Dwarka Nauth Bidyabhoosun.

No. 2—Rs. 100.

The Village Zemindars

Period—Before the 1st of February 1866.

Adjudicators,—Pundit Eshwar Chunder Bidyasagar.
Pundit Dwaraka Nath Bidyabhoosun.
Baboo Raj Krishna Bannerjee.

The dramas are to be written in Bengalli, and must be dedicated to the Jorasanko Theatre.

The subject on Polygamy which, was advertized in the *Indian Daily News* of the 22nd instant [June ?], is, after due consideration, withheld from public competition, as the Committee have been able to secure the services of Pundit Ram Narian Turkorutno for the task. The following gentlemen have kindly taken upon themselves task of examining the same :—

Pundit Eshwar Chunder Bidyasagar.
Baboo Raj Krishna Banerjee.

১লা ও ১৫ই আগষ্ট তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রেও বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত তারিখের কাগজে সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন :—

"One of the most potent instruments of rectifying social vices and corruptions is popular drama, and every legitimate attempt to encourage it has our hearty sympathy. We feel sincerely gratified, therefore, to notice a movement in this direction set on foot by some of our countrymen

---

"হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা নামক এক খানি নূতন পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমারদিগের বন্ধুবর শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী এই পুস্তক খানি অতি সুললিত অথচ কোমল সাধুভাষায় বিরচনা পূর্ব্বক গুপ্ত যন্ত্রে অতি পরিষ্কাররূপে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন, আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠে পরিতুষ্ট হইলাম, হিন্দু নারী প্রণীত কোন পুস্তক আমরা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই, ললনাদিগের বিরচিত গদ্য পদ্য পূরিত প্রবন্ধ সকল আমরা সময়েং প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, অতএব এই বঙ্গদেশ মধ্যে বঙ্গভাষায় পুস্তক প্রকাশের প্রথা কৈলাসবাসিনীর দ্বারাই আরম্ভ হইল, ইহা সামান্য আনন্দজনক নহে,...।"

·শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকর' দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

" নূতন গ্রন্থ।— হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা। এখানি শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী গুপ্ত প্রণীত।... ইতিপূর্ব্বে একবার শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, স্ত্রীলোক প্রণীত এই দ্বিতীয় একখানি নূতন গ্রন্থ পাইলাম।..."
(সোমপ্রকাশ, ১৭ই কার্ত্তিক ১২৭০)।

in this city. The Jorasanko Theatre Committee, as will appear from our advertisement columns, have offered premia for the best dramatic productions on three very interesting topics, Polygamy, Hindoo Females and Village Zemindars."

'নব-নাটক' ও তাহার অভিনয়

উপরের বিজ্ঞাপনের শেষাংশেই প্রকাশ, বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি নাটক-রচনার জন্য জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর ভার দিয়াছিলেন। রামনারায়ণ ইতিপূর্ব্বেই কয়েকখানি নাটক—বিশেষতঃ 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' রচনা করিয়া যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই 'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক **নব-নাটক**' রচনা করিয়া দিলেন। পুস্তকের 'বিজ্ঞাপন' হইতে রচনার তারিখ—১৫ই বৈশাখ ১২৭৩—পাওয়া যাইতেছে। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে,—"আমি জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই বহুবিবাহ বিষয়ক নব-নাটক প্রণয়ন করিলাম।..."

অবিলম্বে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইল। ১৮৬৬ সনের ২রা জুন তারিখের *The Bengalee* নামক সাপ্তাহিক পত্রে "The Nobo Nattuck and the Bengalee Language" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে নাটকখানি সমালোচিত হইয়াছে।

১২৭৩ সালের ২৩ বৈশাখ (৬ মে ১৮৬৬) অপরাহ্ণ তিনটার সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে একটি প্রকাশ্য সভা আহূত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মিত্র মহাশয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিশ্রুত পুরস্কার-স্বরূপ একটি রৌপ্যপাত্রে রক্ষিত দুই শত টাকা পণ্ডিত রামনারায়ণের হাতে দিলেন।* শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' পুস্তকে এবং শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' পুস্তকে ভ্রমক্রমে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার-দানের কথা লিখিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই রামনারায়ণ তর্করত্নের আত্মকথা পড়েন নাই বলিয়া মনে হইতেছে। রামনারায়ণ লিখিয়াছেন,—

> "নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াসাঁকোবাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন।"

এইবার নাটকাভিনয়ের আয়োজন। নাট্যশালা কমিটি পুনর্গঠিত হইয়াছিল এবং 'বড়'র দল—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি—এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

* মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত 'রঙ্গভূমির ইতিহাস', পৃষ্ঠা ১৭ দ্রষ্টব্য জোড়াসাঁকো নাট্য-সমাজের অন্যতম অভিনেতা ও কমিটির সদস্য নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের লিখিত বর্ণনা হইতে বিদ্যানিধি-মহাশয় এই অংশ গ্রহণ করিয়াছেন

জ্যোতিবাবু বলিলেন—...এখন হইতে 'বড়'র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন্ (scene) আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবরতটস্থ 'জগমন্দির' প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত [?] ভগিনীপতি ৺নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি) সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি ৺ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় 'চিত্ততোষ,' আর এক ভগিনীপতি ৺ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশবাবুর বড় স্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। বাকী আমাদের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। (পৃ. ১০৪)...শ্রীযুক্ত মতিলাল চক্রবর্ত্তী 'কৌতুকে'র পাঠ লইয়াছিলেন। (পৃ.১১১)...আমার এক শ্যালক অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগিন্নির ভূমিকায়...। ৺বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ) সুবোধের ভূমিকায়,...(পৃ. ১১২)।

অতঃপর ভূমিকা সমস্ত স্থির হইয়া গেলে, দোতলার বড় ঘরে, খুব ঘটা করিয়া রিহার্শাল বসিয়া গেল।...ছয় মাস কাল যাবৎ দিনে রিহার্সাল, আর রাত্রে বিবিধ যন্ত্রসহকারে কন্সার্টের মহলা চলিল। আমি কন্সার্টে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতাম (পৃ ১০৭)...

অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (scene) অঙ্কিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীন্‌খানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া, অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত। (পৃ. ১০৮)

এই অভিনয়ে যে প্রোগ্রাম ছাপা হইয়াছিল তাহার শিরোবেষ্টনের প্রতিলিপি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা' প্রবন্ধে দেওয়া আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"রঙ্গমঞ্চে যবনিকার শিরোবেষ্টনী বিক্রমসভার নবরত্নের নামে অঙ্কিত—

ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু-
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ!
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্ন'ব বিক্রমস্য।

...এই নবনাটক আর মানময়ী নামক একটি গীতিনাট্য সর্ব্বপ্রথম আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হয়। পরে অলীকবাবু, হঠাৎ নবাব প্রভৃতি আরো অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়। 'বাল্মীকি প্রতিভা' আর 'রাজা ও রাণী' এই দুই নাট্য আমাদের বাড়ীর মেয়ে পুরুষ সকলে মিলে গ'ড়ে তোলা গিয়েছিল।" (ভারতী—আশ্বিন ১৩১৯, পৃ. ৬৫০)

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে নব-নাটকের প্রথম অভিনয় হয়—১৮৬৭ সনের ৫ই জানুয়ারি (২২ পৌষ ১২৭৩) তারিখে। নবগোপাল মিত্র-সম্পাদিত *The National Paper* নামক সাপ্তাহিক পত্রে ইহার প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে ৯ই জানুয়ারি (বুধবার) লিখিত হয়:—

JORASANKO THEATRE. On Saturday night last we had the pleasure of witnessing the *Jorasanko Theatre, established at the* family house of Baboo Gonendro Nauth Tagore, grandson of late Baboo Dwarka Nauth Tagore. The subject of the performance

was the celebrated *nobo natock*, a tragic drama, depicting the vices of polygamy, and other obnoxious practises, which of late, have grown much into fashion in our society. Various have been the comments upon that work, and without entering into any controversy as to the particular merits and demerits of that production, we shall only say, that whatever faults it had, if any, they were all covered by the acting on the stage, which was pronounced by all present on the occasion to be of the most superior order. To choose out one or two or more amateurs for especial commendation, would we fear, be doing gross injustice to the rest, each acquitted himself so creditably. Beginning with the graceful bow of the *natee*, the representation of every succeeding character, elicited loud shouts of applause from all sides, and rendered the whole scene an object of peculiar amusement to the audience. The concert was excellent. It had no borrowed airs, and was quite in keeping with national taste.

This was expected, Baboo Dwarky Nauth's family being the first to introduce refined amusements of the kind in Bengal. *

প্রথম অভিনয়-রজনীতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দর্শক-রূপে উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

"প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 'যা—রা পলাট (plot) নাই, পলাট নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক'—সমালোচকদের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে, তিনি আপনার আনন্দ-সাফল্যে গর্ব্বিত হইয়া খুব আস্ফালন করিয়াছিলেন।"

রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে জানা যায়, 'নব-নাটক' উপর্য্যুপরি নয় বার ঠাকুর-বাড়িতে অভিনীত হইয়াছিল। নব-নাটকের একটি অভিনয় দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬৭, ২৮ জানুয়ারি তারিখে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শনিবার আমরা যোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এখানে নাটক অভিনয়ের যে প্রণালী দর্শন করিলাম, তাহা যদি সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, আমাদিগের বিশুদ্ধ আমোদ ভোগের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হইয়া উঠে। নাট্যশালা প্রকৃত রীতিতে নির্ম্মিত ও দ্রষ্টব্যগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতিমনোহর হইয়াছিল। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই, এসমুদায়গুলি এতদ্দেশীয় শিল্পজাত। দর্শকদিগের উপবেশন প্রণালী অদ্যাপিও উৎকৃষ্ট হয়

* *The National Paper*, January 9, 1867 (Wednesday). শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৮৬৭ সনের 'ন্যাশনাল পেপার' আমাকে দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন।

নাই। এজন্য গালারি করা আবশ্যক। সংকীর্ণ স্থানে অধিকসংখ্য চৌকি সন্নিবেশিত হয়। এককালে দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়াতে যাবতীয় দর্শক প্রবেশ করিয়া সকলেই সম্মুখের আসন গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে গোলযোগ, গাত্রঘর্ষণ, ও আসনভঙ্গ ইহার ফল হইয়া উঠে। যত দিন গালারি না হইতেছে, তত্দিন আগন্তুক-দিগকে এক এক করিয়া উপবেশন করিতে দেওয়াই পরামর্শসিদ্ধ, নচেৎ প্রায় ১০ মিনিটি কাল রেলওয়ে ষ্টৈসনের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইবার ন্যায় গোলযোগ হইবে।

নবনাটকের গল্প এই,......

অভিনয়ের বিষয়ে বক্তব্য এই, অভিনেতৃগণ প্রায় সকলেই স্বকর্ত্তব্য অভিনয়ক্রিয়া সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। গবেশ ও চিত্ততোষের ত কথাই নাই, কৌতুক ও রসময়ীর অংশ উত্তম হইয়াছে এবং নাগর ও গ্রাম্যের চরিত্রও নৈসর্গিক হইয়াছে। রঙ্গ-ভূমির নাগর আদি যাবতীয় যুবক কৃতবিদ্যের আদর্শ হন, তাহা হইলে দেশের পরম মঙ্গল হয়। এ ব্যক্তির অভিনয় দর্শনে সবিশেষ পরিতোষ লাভ হইয়াছে। সুধীর পণ্ডিতের চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সাবিত্রী দাসীর অংশটী জঘন্য হইয়াছে। সকলেরই বেশ প্রায় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু সাবিত্রী না স্ত্রীলোক না হিজড়ে রূপ ধারণ করে। এ ব্যক্তির কথার ভাবও তুষ্টিকর হয়-নাই। সুবোধের শেষ অংশটি বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। অর্দ্ধ ঘটিকা পর্য্যন্ত কেবল ক্রন্দন কোন্ ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারেন? যে যুবক অভিমানে অনায়াসে দেশান্তরে গমন করিতে পারেন, তাঁহার স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন সঙ্গত নয়।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, কোন কোন অংশে কিছু কিছু ত্রুটি থাকুক, সাকল্যে বিবেচনা করিলে গ্রন্থ ও অভিনয় উভয়ই উত্তম হইয়াছে।

হিন্দু মহিলা নাটক

সংবাদপত্রে প্রকাশিত জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটির বিজ্ঞাপন হইতে দেখা যাইবে, বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি নাটক ছাড়া, আরও দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। তাহার একখানির বিষয়—হিন্দু মহিলাগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা; পুরস্কারের পরিমাণ দুই শত টাকা। 'হিন্দু মহিলা নাটক' রচনা করিয়া, সোমড়া-নিবাসী বিপিনমোহন সেন গুপ্ত ১৮৬৮ সনে এই পুরস্কারটি লাভ করেন।

১৮৬৮, ৩০এ নভেম্বর (১৬ অগ্রহায়ণ ১২৭৫) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' হিন্দু মহিলা নাটকের এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—
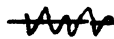
বিজ্ঞাপন।

"হিন্দু মহিলা নাটক।"

(যোড়াসাঁকো অভিনয়
সভা হইতে পুর-
স্কার প্রাপ্ত।)

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ঠনঠনে করণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৭৬ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্ত।

১৮৬৮, ৭ই ডিসেম্বর (২৩ অগ্রহায়ণ ১২৭৫) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' নাটকখানির যে অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

"নূতন পুস্তক।...

৪। হিন্দুমহিলা নাটক। শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। ইহা হিন্দু মহিলাগণের বর্ত্তমান হীনাবস্থাজ্ঞাপক দৃশ্য কাব্য। ইহার গল্পটী এই। কৃপুর গ্রামে কৃপারাম রায়নামক এক গৃহস্থের প্রসন্নকুমার ও বসন্তকুমার নামক দুইটী পুত্র এবং সুমতি ও গোলাপী নাম্নী দুটী বিধবা কন্যা ছিল। প্রসন্নকুমার পুত্র কামনায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন এবং দেশীয় প্রথানুসারে অল্প বয়সেই বসন্তকুমারের বিবাহ হয়। নটবর বন্দ্যোপাধ্যায়নামক এক জন প্রতিবেশী বংশজ ব্রাহ্মণের মনোরথনাম্নী একটী সপ্তম-বর্ষীয়া কন্যার অশীতি বর্ষাধিক বয়স্ক একটি বরপাত্রের সহিত বিবাহোপলক্ষে বাসর ঘরে এবং বসন্তকুমারের স্ত্রীর রজোদর্শন উপলক্ষে কাদার সময় স্ত্রীগণের নির্লজ্জ ব্যবহার; প্রসন্নকুমারের স্ত্রীদ্বয়ের পরস্পর সাপত্ন্য ব্যবহার ও কোন্দল; প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয় স্ত্রী শশীমুখীর শ্বশ্রু ও ননান্দৃদিগের সহিত দুর্ব্ব্যবহার; বসন্তকুমারের স্ত্রীর অল্প বয়সে গর্ভধারণ ও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সন্তানের মৃত্যু; গণক ও সন্ন্যাসিদ্বারা স্ত্রীদিগের অদৃষ্ট ও স্বামিসমাগমগণনা; হর নাপতিনীর নিকট শশিমুখী ও নিস্তারিণীর স্বামি বশীকরণ ঔষধগ্রহণ; স্বামিসুখে বঞ্চিত হইয়া কামিনীনাম্নী একটী প্রতিবেশী কুলীনকন্যার গৃহ-ত্যাগ ও সোণাগাজিতে অবস্থান এবং তথায় তৎস্বামিসমাগম; প্রসন্নকুমারের প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত শিশু সন্তানের পীড়া উপলক্ষে স্ত্রীদিগের ওঝাদ্বারা ডান ঝাড়ান; হর নাপতিনীর সাহায্যে কৃপারামের কনিষ্ঠা বিধবা কন্যা গোলাপীর গৃহত্যাগ; প্রসন্ন-কুমারের পুত্রের মৃত্যু ও তৎ স্ত্রীর গলদেশে ক্ষুরপ্রদান এবং এই উপলক্ষে প্রসন্নকুমারের সস্ত্রীক বরুণাবাদে মাজিষ্ট্রেটের কাছারী গমন প্রভৃতি বর্ণনায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। এখানি যেউদ্দেশে প্রণীত হইয়াছে, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে এদেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থাসূচক ব্যবহারাদি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।"

'হিন্দু মহিলা নাটক' জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। নাটকখানির 'বিজ্ঞাপন' হইতে জানা যায়, ১৮৬৭ সনেই ঐ "নাট্যশালা-সমাজ বিগত-জীবন" হইয়াছিল।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুত মোজাম্মেল হকের আলোচনায় হিন্দু মহিলা নাটকের আখ্যা-

পত্র ও 'বিজ্ঞাপন' মুদ্রিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে তিনি নাটকখানির পরীক্ষকদ্বয়ের মন্তব্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মন্তব্যে প্রকাশ, বিপিনমোহন সেন গুপ্তের হিন্দু মহিলা নাটক ছাড়া আরও একখানি নাটক পরীক্ষার্থ আসিয়াছিল। বিপিনমোহনের রচনাই অখণ্ড পুরস্কারলাভের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল, এবং তিনিই যে শেষ-পর্য্যন্ত এই পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নাটকখানির 'বিজ্ঞাপনে'ই প্রকাশ। শ্রীযুত হক প্রশ্ন করিয়াছেন,—"অপর যে নাটকখানি অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল, সেখানি কোন্ নাটক এবং কাহার রচিত ?"

আমার মনে হইতেছে, পরিত্যক্ত নাটকখানিও 'হিন্দু মহিলা নাটক'। ইহার রচয়িতা বটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং প্রকাশকাল আগষ্ট, ১৮৬৯ সন। বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির বাংলা পুস্তকের তালিকার (Vol. II, Pt. iv) ৬৪ পৃষ্ঠায় পর পর এই দুইখানি নাটকের নাম পাইতেছি :—

Hindumahila natak. The Unfortunate Condition of Hindu Women. By Vatuvihari Vandyopadhyaya. pp. 139. *Calcutta.* 1869.

Hindumahila natak. By Vipinamohana Sengupta. pp. 8, 116. *Calcutta,* 1868.

এই দুইখানি নাটকের কোনখানিই আমার দেখিবার সুবিধা হয় নাই। তবে শ্রীযুত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি হইতে বটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিন্দুমহিলা নাটক'খানির আখ্যাপত্র ও উৎসর্গপত্র নকল করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। নাটকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

হিন্দুমহিলা নাটক।

শ্রীবটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

A

Drama

on

Hindu Females,

Their Condition and Helplessness.

By

Butto Behary Bonnerjee.

Calcutta :

G. P. Roy & Co., Printers No. 67, Emambaree Lane, Bentinck Street.

1869.

নাটকখানির উৎসর্গপত্র এইরূপ :—

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ,
প্রফেসর্ প্রেসিডেন্সি কলেজ।

প্রিয় মহাশয়—

আজকাল সকলেই এক এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিতেছেন, ইহা দেখিয়া নিতান্ত নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না, দেখি না কিসে কি হয়, কিন্তু মনে এরূপ আশা করি না, যে আমার এই রচনা এতাবিধ সময়ে আদরণীয় হইবে, কারণ বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের নাটক প্রহসন্ ইত্যাদি পাঠ করিয়া বিরক্তি জন্মিয়াছে, ইহাতে যে আমার সামান্য রচনা পাঠ করিয়া আদর করিবেন এ কেবল দুরাশা মাত্র, আরো হিন্দুমহিলায় কোন নূতন কথা নাই, বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণ যাহা দেখিতেছেন বা করিতেছেন তাহারই প্রতিমূর্ত্তি, ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, হিন্দুমহিলা আমাদিগের সময়ে আদরণীয় না হইয়া বরং ভবিষ্যতের গর্ভস্থ লোকদিগের আদরণীয় হইতে পারে, কারণ সে সময়ে রীতি নীতির পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। আপনকার সহিত আমার গুরুতর সম্পর্ক ও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন, বিশেষ বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনে আপনার যথেষ্ট অনুরাগ আছে, এই ভাবিয়া হিন্দুমহিলা আপনকার হস্তে সমর্পণ করিলাম, ইহা দেখিয়া আপনি যদি মৃদুহাস্য করেন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব অধিক লেখা বাহুল্য।

সিমুলিয়া।
১লা ভাদ্র। ১২৭৬।

আপনকার চিরবাধিত
শ্রীবটুবেহারী বন্দোপাধ্যায়।

এই নাটকখানিতে গ্রন্থকারের কোন বিজ্ঞাপন নাই। ইহা পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। কলিকাতার কথিত ভাষায় ইহা রচিত হইলেও স্থানে স্থানে সংস্কৃতানুসারী বাংলা পাওয়া যায়, দু-এক স্থলে পদ্যেরও ব্যবহার আছে।

দেখা গেল, নাটকখানি পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যকে উৎসর্গীকৃত। কৃষ্ণকমলবাবু হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থাবিষয়ক নাটক দুইখানির পরীক্ষকদ্বয়ের একজন ছিলেন,—এ কথা শ্রীযুত হকের প্রবন্ধে আছে।

হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থা বিষয়ে আরও একখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। নাটকখানি ১৮৬৮ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বঙ্গকামিনী নাটক"। শ্রীযুত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত এই পুস্তকখানিরও আখ্যাপত্র ও বিজ্ঞাপনের নকল ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

বঙ্গকামিনী নাটক। শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। বি. পি. এম্‌স যন্ত্র। শ্রীকালীকুমার চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ১৫ নং ঝামাপুকুর লেন। ১২৭৫ সাল। মূল্য এক টাকা

নাটকখানির "বিজ্ঞাপন" পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করিতেছি,—

"মনুষ্যজাতির স্বেচ্ছানুসারে পরিণীত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কর্ত্তৃপক্ষীয়ের অনুরোধে বলপূর্ব্বক বিবাহিত হইলে,অসুখের সীমা থাকে না। যে সকল স্ত্রীলোক অতি শৈশবকালে বিবাহিত হয়, তৎকালে তাহাদের কোন প্রকার অসন্তোষ লক্ষণ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহারা প্রায়ই যৎপরোনাস্তি অসুখিত হইয়া থাকে। বাল্য বিবাহ যে একান্ত স্বভাববিরুদ্ধ ও নিতান্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। নানা কারণে বয়োবৃদ্ধি হইলে যে সকল স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, স্বদেশীয় কুপ্রথার অনুরোধে তাহারাও প্রায় অনুরূপ পতি লাভে সমর্থ হয় না; তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে তাহাদিগকে প্রায়ই অপাত্রে সমর্পণ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে বিবাহ সময় হইতেই তাহাদের সংসারে বিরক্তি জন্মে এবং তন্নিবন্ধন অশেষবিধ ভয়ঙ্কর অমঙ্গল সকল ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, আমাদের দেশে অসম্মত বিবাহ প্রবর্ত্তিত থাকাতে নানা প্রকার অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে।

এদেশের স্ত্রীগণের অত্যন্ত দুরবস্থা। ইহাদের ন্যায় হতভাগ্য রমণী প্রায় অন্য কোন সভ্য দেশে দৃষ্ট হয় না। অধিক কি, ইহারা জনক জননীর সন্তান বাৎসল্যেও বঞ্চিত হইয়া থাকে।

নিবাধই শ্রীহারাণচন্দ্র শর্ম্মা

১৫ই বৈশাখ, সংবৎ ১৯২৫

"বঙ্গকামিনী নাটক" ছয় অঙ্কে সমাপ্ত। নাটকের ভাষা কলিকাতার কথিত ভাষা হইলেও সংস্কৃতানুসারী বাংলারও প্রয়োগ আছে। তাহার উপর স্থানে স্থানে পদ্যেরও ব্যবহার আছে।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি কর্ত্তৃক ঘোষিত তৃতীয় পুরস্কার

পল্লীগ্রামস্থ জমীদারগণের অত্যাচারের বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্যও জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি এক শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পুরস্কার কেহ পাইয়াছিলেন কি না, এখনও জানিতে পারি নাই।

তবে এই বিষয় লইয়া রচিত একখানি নাটক ১৮৭২ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নাটকখানি—মদনমোহন মিত্রের "মনোরমা" নাটক। ১৮৭২ সনের ১৫ই এপ্রিল তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত, ইহার সমালোচনায় দেখিতেছি,—

"মনোরমা নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন মিত্র ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন।...ইহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা ও গ্রাম্য জমীদারদিগের অত্যাচার বৃত্তান্ত সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।"

মনোরমা নাটক ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ইহাও ন্যাশনাল থিয়েটারের সমকালিক একটি বৈতনিক থিয়েটার ছিল, কিন্তু নাট্যশালার ইতিহাসে কেহই ইহার নামোল্লেখ

করেন নাই। ১৮৭৩ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ন্যাশনাল পেপার' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে দেখিতেছি,—

NOTICE.

In the house of Babu Krishna Chunder Dev, Cornwallis Street No. 222, th) Oriental Theatre will be held on the 29th February 1873 at 8 P. M., precisely, where in Manorama Natuck a tragedy named Manorama by Moddun Mohun will be acted. Tickets are sold at the following rates in these premises.

Reserved Class	...	...	Rs. 2
First Class	...	...	Rs. 1
Second Class	...	...	As. 8

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার*

বরিশাল জেলায় কলশকাঠী নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। তথাকার রায় মহাশয়েরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভঙ্গ। তাঁহারা অনেক পুরুষ ধরিয়া কলশকাটীতে কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করাইতেছেন। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মুকুন্দরাম নামে এক ব্রাহ্মণ রায় মহাশয়দিগের আশ্রয়ে তথায় বাস করেন। তাঁহার বংশ বিস্তৃত না হইলেও অনেক পণ্ডিত এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের পৌত্র রামমাণিক্য ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মান। তাঁহার আর ভাই বা ভগিনী ছিল না। সুতরাং, তিনি বাপমার খুব আদরের ছেলে ছিলেন। তিনি বাড়ীতেই ব্যাকরণাদি বালশাস্ত্র পড়েন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কিছুদূর পড়িয়া, নৈহাটীতে মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিয়া ব্যাপ্তিখণ্ড ও শব্দখণ্ড অধ্যয়ন করেন। এখানে তাঁহার এক সহাধ্যায়ী জুটিয়া যায়। তাঁহার নাম শ্রীনাথ। তিনি তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যম পুত্র। দুজনেই খুব বুদ্ধিমান্ এবং খুব উৎসাহশালী ছাত্র ছিলেন। দুজনের খুব ভাবও ছিল। এমন কি দুজনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, একজনের ছেলে ও একজনের মেয়ে হইলে তাহাদের বিবাহ সূত্রে বদ্ধ করিয়া দুজনে বৈবাহিক হইবেন।

মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণের তখন খুব নাম। স্যর উইলিয়ম জোন্সের বিচারালয়ে তাঁহার কয়েকটি ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় তাঁহার নাম খুব পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার অনেক ছাত্র ছিল, একটা টোলে ধরিত না। তাঁহাকে দুইটা টোল করিতে হইয়াছিল। মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগণা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল এমন কি, বিক্রমপুর হইতেও ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোলে পড়িতেন। ক্রমে শ্রীনাথ ও রামমাণিক্য পাঠ শেষ করিলেন। সে কালে অনেকে দ্বিতীয়াদি ব্যুৎপত্তিবাদ ও কুসুমাঞ্জলি পড়িয়া পাঠ সমাপন করিত। ইঁহারা পাঠ সমাপন করিয়া একজন তর্কালঙ্কার ও আর একজন বিদ্যালঙ্কার উপাধি পাইলেন। উপাধি দিবার সময় অধ্যাপকই উপাধি দিতেন। কিন্তু ছাত্রদিগকে নিজ ব্যয়ে সমাজের সমস্ত পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইত। তাঁহাদিগকে থৈ দৈ-এর ফলাহার দিতে হইত ও কিছু কিছু বিদায়ও দিতে হইত। এই সকল পণ্ডিতেরা ঐ ছাত্রদের নাম নিজ নিজ তালিকা-ভুক্ত করিয়া লইতেন এবং কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দিতেন।

উপাধি পাইয়াই দুবন্ধু বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন। কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেহ স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য সন্দেহ করিলেন—তাহারা মুরশিদাবাদে গিয়াছে। সে কালে বড় বড় নৈয়ায়িকদের বিচারের এক একটা পদ্ধতি ছিল, যে কোনরূপ আপত্তি অর্থাৎ ফাঁকি হউক না কেন তাহার উত্তর দিবার এক একটা প্রণালী ছিল, নৈহাটির প্রণালী খুব প্রসিদ্ধ ছিল। যে পুথিতে এই পদ্ধতি বা প্রণালী লেখা হইত, তাহার নাম পাতড়া, পেঁতে বা ক্রোড় পত্র ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিলেন, আমার দুই ছাত্র আমাদের সব পাতড়া দুরস্ত করিয়া, কৃষ্ণকিঙ্করের পাতড়া

---

* ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই আশ্বিন তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শিখিবার জন্য মুর্শিদাবাদে গিয়াছে। তিনি ইহাতে চটিলেন। কারণ, কোন ভট্টাচার্য্যই ছাত্র ভিন্ন আর কাহাকেও আপন ঘরের পাতড়া দেখিতে দিতেন না। যক্ষের ধনের মত সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। আমার ছাত্র যদি আমার পাতড়া শিখিয়া অন্যের পাতড়া শেখে, সে ত উৎপাত ঘটাইতে পারে—এই ভাবিয়া তিনি উহাদের উপর চটিলেন। ফলিলও তাই। বছর খানেকে তাঁরা দুই বন্ধু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহারা যে মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকিঙ্করের পাতড়া অভ্যস্ত করাই যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বাবা বড়ই চটিয়া গেলেন। ছেলেকে বলিলেন, তুমিই এখন টোল কর, আমি আর টোলে যাব না। রামমাণিক্য বিদায় হইয়া দেশে গেলেন।

শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের অদৃষ্ট বড় খারাপ। এই সব ব্যাপারের ছয় মাসের মধ্যে বর্দ্ধমানের রাণী (যে প্রতাপচাঁদ পরে জাল হইয়াছিলেন তাঁহার মা) তুলাপুরুষ দান করিবেন কালনায়—তাঁহাদের গঙ্গাবাসের বাড়ীতে। তর্কভূষণের পত্র আসিল; তিনি গেলেন না, বলিলেন ' শ্রীনাথ যাক"। তিনি বাড়ী হইতে বড় বাহির হইতেন না। তাঁহার বয়স তখন প্রায় ১০০ হইয়াছিল। শ্রীনাথ গেলেন। অধ্যক্ষ বলিলেন, তর্কভূষণ আসেন নাই—প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে চতুর্থাংশ বাদ বিদায় দেওয়া হউক। শ্রীনাথ রাজী হইলেন না। বলিলেন, আমি কি তেমনি প্রতিনিধি, আমার সঙ্গে বিচার হউক, দেখুন আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়। তাহার পর বিদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে। বিচারে তাঁহার জয় জয়কার হইল। মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া হুকুম দিলেন যে, তর্কভূষণের ত পূরা বিদায় দেওয়া হউক, শ্রীনাথকেও সেই খুঁটের বিদায় দেওয়া হউক। বিদায়ের প্রধান সামগ্রী এক একটা রূপার ঘড়া। এখনকার মত বিদায় স্বধু টাকায় দেওয়া হইত না, তাহার সঙ্গে তৈজসপত্র ও বড় বড় সিধা থাকিত। শ্রীনাথ দুপ্রস্থ বিদায় লইয়া মহা আনন্দভরে বাড়ী ফিরিলেন। তখন যে রাস্তায় ঠেঙ্গাড়িয়ারা থাকে তাহা তাঁহার মনে পড়িল না। অন্য অন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পিছে পড়িয়া রহিলেন, তিনি ক্রোশ দুই আগাইয়া পড়িলেন। ডুমরদহের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বাবুদের ঠেঙ্গাড়িয়ারা তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার সমস্ত তল্পী লুটিয়া লইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা একটা বটগাছের নিকট একটা পুকুর পাড়ে দেখিলেন রক্তের দাগ আর সিধার জিনিস সব ছড়াছড়ি। কি হইয়াছে বুঝিতে আর বাকী রহিল না। ক্রমে বাড়ীতে সব সংবাদ পঁহুছিল। বৃদ্ধ পিতা উপযুক্ত পুত্রের অতর্কিত মৃত্যুতে ২।১ মাসের মধ্যেই দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীনাথের স্ত্রীও পতিশোক সহ্য করিতে না পারিয়া চার বছরের একটি ছেলে রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

এ দিকে রামমাণিক্য পাঠ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার শ্বশুর একজন তালুকদার ছিলেন এবং ভদ্রব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্রাদিও পড়িয়াছিলেন এবং মেয়েটিকে ব্যাকরণ সাহিত্য যথেষ্ট পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা নারায়ণী ৩০০।৪০০ কবিতা বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত মুখে মুখে বলিতে পারিতেন। কলাপ ব্যাকরণ তাঁহার খুব অভ্যস্ত ছিল, জ্যোতিষেও তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি পাজি দেখিতে পারিতেন। সে এখনকার মত ছাপা পাজি নয়। তালপাতায় শুদ্ধ অঙ্ক বসান—এখনকার পাজির

ডান দিকে যেটি থাকে ঐটা মাত্র। তিনি কোষ্ঠী দেখিতে পারিতেন, করকোষ্ঠীও দেখিতে পারিতেন। শ্বশুর জিদ করিতে লাগিলেন—রামমাণিক্য, তুমি আমার এইখানে টোল কর। রামমাণিক্য রাজী হইলেন না। কলশকাঠীতে টোল করিলেন। আবার একদিন নৌকাযোগে শ্বশুর বাড়ী গিয়া স্নানের ঘাট হইতে স্ত্রীকে চুরি করিয়া পলায়ন করিলেন। শ্বশুর পোষ্যপুত্র লইলেন। পোষ্যপুত্র লইলেও কন্যার একটা ভাগ পাওনা থাকে। নারায়ণী বা মাণিক্য তাহাও লইলেন না।

কিন্তু বেশীদিন তিনি কলশকাঠীতে থাকিতে পারিলেন না। অভয়াচরণ তর্কবাগীশ নামে আর একজন নৈয়ায়িক সেখানে টোল করিয়াছিলেন। দুজনের সেখানে সর্ব্বদাই ঠোকাঠুকি লাগিত। ছাত্রে ছাত্রে প্রায়ই লাগিত, অনেক সময় পণ্ডিতে পণ্ডিতেও লাগিত। জেলার লোক উত্যক্ত হইয়া উঠিল, দুই পণ্ডিতই দেশত্যাগ করিলেন। অভয়াচরণ গেলেন ঢাকায়, রামমাণিক্য আসিলেন বরাহনগরে।

কাশীপুরে তখন রামরত্ন রায় মহাশয় একজন বড় জমীদার। রাণী ভবানীর রাজত্ব ভাঙ্গিয়া যে দুজন বড় জমীদার হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামরত্ন রায় একজন। তাঁহার ঠিকানা ছিল নড়াইল। কলিকাতার কাছে কাশীপুরেও তিনি বাড়ী করিয়াছিলেন, কেননা তখন ইংরেজ রাজা। ইংরেজের কাছে থাকা অনেক সময়ে জমিদারদের দরকার হয়। রামরত্ন রায় মহাশয় রামমাণিক্যের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও আভিজাত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন এবং প্রথম সুযোগেই বরাহনগর হইতে উঠাইয়া আনিয়া কাশীপুর ঘাট রোডের উপর অনেক জমিজায়গা দিয়া টোল ও বাড়ী করিয়া দিলেন। রামমাণিক্যের অনেক ছাত্র জুটিল। সাতক্ষীরার জমিদারদের গুরুবংশের অনেকেই তাঁহার ছাত্র হইল। নেপালের রাজগুরুও তাঁহার নিকট পুত্রকে ন্যায়শাস্ত্র শিখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। রামমাণিক্য শ্রীনাথের ছেলের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দিয়া বাল্যবন্ধুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন।

বিচারে রামমাণিক্যের সহিত কেহ পারিয়া উঠিত না, দুই ঘরের যত কৌশল সব তাঁহার জানা ছিল। তাহার পর তিনি দেখিলেন, শিরোমণি মূলের উপর টীকা করিয়াছেন, তাহাতে অবচ্ছেদক স্মরণই বড় কাজ। মূলে যেখানে বলিলেন ধূম, শিরোমণি সেখানে বলিলেন ধূমত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ যেটা কথায় ব্যক্তিমাত্র বুঝাইত, তাহাকে জাতি বুঝাইয়া দিলে। গো বলিলে গলকম্বলাদিমান্ বুঝায়, গোত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বলিলে সব গোরুই বুঝাইবে। রামমাণিক্য তাহার উপরও সূক্ষ্ম বাহির করিলেন; "অবচ্ছেদকিতা" বলিয়া একটা পদার্থ স্বীকার করিলেন। অবচ্ছেদক হইতে অবচ্ছেদকিতা আরও সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার হইল। রামমাণিক্যের অবচ্ছেদকিতার ভিতর পড়িলে কাহারও উদ্ধার ছিল না।

বহুবৎসর এইরূপে দক্ষতা ও সম্মানের সহিত অধ্যাপনার পর রামরত্ন রায়ের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটিল। একদিন তিনি শুনিলেন, রামরত্ন রায় একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে চুনের গারদে দিয়াছেন। শুনিয়াই তিনি হায় হায় করিতে লাগিলেন এবং নিজে চুনের

গারদে গিয়া ছেলেটি উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং তাহাকে খাওয়াইয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। কলিকাতায় গেলে সেখানে জমিদারদের জোর জুলুম খাটিত না।

রামরত্ন রায় রাত্রে কাছারী করিতেন। তিনি যখন শুনিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার কয়েদী ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তখন তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তলপ করিয়া পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘুমাইতেছিলেন ; তিনি উপস্থিত হইলে রায় মহাশয় বলিলেন, আপনি আমার কয়েদী ছাড়িয়া দিয়াছেন কেন ? তিনি বলিলেন—চক্ষের উপর ব্রহ্মহত্যা হয়, আমি দেখিতে পারি না। রায় মহাশয় বলিলেন, দেখুন, শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনি যা বলিবেন, আমরা মাথা পাতিয়া লইব, কিন্তু বিষয় কর্ম্মে যদি আপনি হস্তক্ষেপ করেন ভাল হইবে না কিন্তু। তখন রামমাণিক্য বলিলেন, তবে ভাল না হউক, আমি এ অবস্থায় আপনার সভাপণ্ডিতি করিতে পারিব না।

এই বলিয়া রামমাণিক্য চলিয়া আসিলেন। ১৮২৪ সাল হইতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন হইয়া অবধি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারকে ন্যায়ের পণ্ডিত করিয়া লইয়া যাইবার অনেকবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বেতন লইয়া পড়ান—বিশেষ ম্লেচ্ছ গবর্ণমেণ্টের বেতন লওয়া তাঁহার অকার্য্য বলিয়া মনে হইত। এখন তিনি বলিলেন যে, খোষামোদ অপেক্ষা পাপ ভাল, খোষামোদ করিতে গিয়া ব্রহ্মহত্যাও দেখিতে হয়, পাপে আর সেটা হয় না। এইরূপ মনের ভাব লইয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই সব কথা বলিয়া তিনি কলেজে আসিয়া নিজে কর্ম্মপ্রার্থী হইলেন, তখন অন্য কাজ খালি ছিল না, এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ খালি ছিল। ১৮৪৫ সালের মে মাসে তিনি ঐ পদ পান এবং ১৮৪৬ সালের বারুণীর দিন তাঁহার মৃত্যু হয়। দশ মাস মাত্র চাকরী করিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এপ্রিল মাসে এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটরী হন।

এই পদের কার্য্য প্রধানতঃ পরীক্ষা করা ও কলেজ পরিদর্শন করা। কে আসিল, কে না আসিল, কে পড়াইতেছে, কে না পড়াইতেছে। প্রশ্ন ভাল হইল কি না হইল দেখিতে হইত এবং দরকার মত সকল শাস্ত্রেরই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতে হইত।

রামরত্ন রায়ের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে এই কবিতাটি এখনও শুনা যায়—

অস্মান্ বিচিত্রবপুষঃ চিরপৃষ্ঠলগ্নান্ কস্মাদ্ বিমুঞ্চসি বিভো যদি মুঞ্চ মুঞ্চ।
হা হন্ত কেবাবর হানিরিয়ং তবৈব গোপালমৌলিশিখরে ভবিতা স্থিতির্নঃ॥

আর একটি কবিতা তিনি যশোরে গিয়া তথাকার অবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন।

রাজা কিশোরঃ সচিবঃ কিশোরঃ পুরোহিতো দন্তময়ঃ কিশোরঃ
অহো যশোরে পরিতঃ কিশোরে কিশোরখেলাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি।

পুথি সংগ্রহ করা ও পুথি নকল করান বিদ্যালঙ্কারের বাতিক ছিল। তিনি দুজন কায়স্থকে মাহিনা দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা ক্রমাগত পুরাণের পুথি নকল করিত। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর পর কলিকাতার একজন বড় মানুষ ১৬টি টাকা দিয়া তাঁহার সমস্ত পুথি তুলিয়া লইয়া আসেন। তাহার মধ্যে তাঁহার অবচ্ছেদকিতার পুথিও ছিল।১

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১। এই প্রবন্ধলেখক বর্ত্তিত শাস্ত্রী মহাশয় এই রামমাণিক্যের প্রপৌত্র। -পত্রিকাধ্যক্ষ।

বাংলা ছন্দের মূলতত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২গ)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অক্ষর বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়। সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরের যেরূপ মর্য্যাদা, বাংলায় তদ্রূপ নহে। সাধারণতঃ পাশ্চাত্ত্য ছন্দঃশাস্ত্রের লেখকগণের মতে অক্ষর-ই ছন্দের অণু। কিন্তু অন্ততঃ একজন পাশ্চাত্ত্য ছন্দঃশাস্ত্রকারের (Aristotle-এর শিষ্য—Aristoxemos-এর) মত যে, পরিমিত কালবিভাগ অনুসারেই ছন্দোবন্ধ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমস্ত ভাষার ছন্দঃ সম্বন্ধে অবশ্য এ মত সত্য না হইতে পারে, কিন্তু Aristoxemos সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীক্ ও তৎসাময়িক প্রাচ্য ভাষায় প্রচলিত ছন্দের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, বাংলায় গদ্য বা পদ্যপাঠের সময় প্রত্যেকটি অক্ষর বা তাহাদের কোন বিশেষ ধর্ম্মের তারতম্য ততটা মনোযোগ আকৃষ্ট করে না বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্রের বা বাঙালীর উচ্চারণের লঘুতা বা তদ্রূপ অন্য কোন গুণের জন্য হয় তো এরূপ হইতে পারে। তবে এটা ঠিক্ যে, শব্দ ও তাহার মাত্রাই আমাদের কাণে স্পষ্ট ধরা দেয়, অক্ষরবিশেষ বা তাহার অন্য কোন ধর্ম্ম গদ্যে বা পদ্যে কোথাও তেমন স্পষ্টরূপে ধরা দেয় না। অক্ষর নয়,—পূরা শব্দই আমাদের ছন্দের মূল উপাদান এবং উচ্চারণের ভিত্তিস্থানীয়।

বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম হইতেও বাংলা ভাষার এই লক্ষণটি বোঝা যায়। বাংলায় শব্দ হইতে inflexion বা পদ-সাধনের সময় প্রায়শঃ শব্দের সঙ্গে আর একটি শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হয়। একবচন হইতে বহুবচন সাধনের জন্য, নানা কারক, নানা ল-কার, কৃৎ, তদ্ধিত ইত্যাদির জন্য শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয়সূচক অন্য শব্দ যোগ করাই বিধি; সংস্কৃতের ন্যায় মাত্র আক্ষরিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা বাংলায় এ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এ দিক্ দিয়া suffix-agglutinating বা 'প্রত্যয়-বাচক শব্দ-সংযোগময়' ভাষাবর্গের সহিত বাংলার ঐক্য আছে।

বাংলার আর একটি রীতি—প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা। বাংলায় দুই সন্নিকটবর্ত্তী অক্ষরের সন্ধি করিয়া একটি অক্ষর-সাধনের প্রথা চলিত নাই। কেবলমাত্র তৎসম শব্দের মধ্যেই এরূপ সন্ধি চলিতে পারে। সমাসবদ্ধ হইলেও বাংলা শব্দের মধ্যে এ ধরণের সন্ধি চলে না, 'কচু','আলু', 'আদা', এই তিনটি শব্দ সমাসবদ্ধ করিলেও 'কচ্বাদা' হইবে না। সেই রকম 'ভেসে-আসা', 'আলো-আঁধার' ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ হইলেও সেখানেও দুই অক্ষরের সন্ধি করিয়া এক অক্ষর করা হয় নাই, পদের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি শব্দ অযুক্ত আছে। এমন কি তৎসম শব্দকেও খাঁটি বাংলা

রীতিতে ব্যবহার করিলে তাহাদেরও সমাসের মধ্যে অযুক্ত রাখা চলে। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'য় 'স্নেহ-অশ্রু', 'বিচার-আগার' ইত্যাদি সমাস ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে গেলে বাংলা ভাষার এই রীতিগুলি মনে রাখা একান্ত দরকার। বাংলা ছন্দের এক একটি পর্ব্বকে কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মনে না করিয়া কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মনে করিতে হইবে। নতুবা বাংলা ছন্দের মূল সূত্রগুলি ঠিক বুঝা যাইবে না। 'এ কথা জানিতে তুমি' এই পর্ব্বটির মধ্যে ৮টি অক্ষর আছে শুধু তাহাই লক্ষ্য করিলে চলিবে না; ইহা যে, 'এ কথা', 'জানিতে', 'তুমি' এই তিনটি শব্দের সমষ্টি,—তাহাও হিসাব না করিলে বাংলা ছন্দের অনেক তথ্য ধরা যাইবে না।

সাধারতঃ বাংলা শব্দ দুই বা তিন মাত্রার, কখন কখন এক বা চার মাত্রারও হয়। সমাসবদ্ধ বা বিভক্তিযুক্ত হইলে অবশ্য শব্দ ইহার চেয়ে বড় হইতে পারে, কিন্তু মূল বাংলা শব্দ ইহার চেয়ে বড় হয় না। চার মাত্রার চেয়ে বড় কোনও শব্দ ব্যবহৃত হইলে উচ্চারণের সময় স্বতঃই তাহাকে ভাঙিয়া ছোট করিয়া লওয়া হয়। বাংলা উচ্চারণের এই আর একটি উল্লেখযোগ্য রীতি, এবং ইহার সহিত বাংলা ছন্দের রীতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। 'পারাবার' শব্দটি চার মাত্রার, কিন্তু 'পারাবারের' শব্দটি পাঁচ মাত্রার, এ জন্য উচ্চারণের সময় ইহাকে স্বতঃই 'পারা—বারের' এই ভাবে ভাঙিয়া পড়া হয়। 'চাহিয়াছিল' শব্দটিকে 'চাহিয়া—ছিল' এই ভাবে উচ্চারণ করা হয়।

পর্ব্বের মধ্যে যে কয়টি মূল শব্দ (বা সমুচ্চার্য্য শব্দাংশ) থাকে, তাহারা প্রত্যেকে স্বয়ং বা অপর দু' একটি শব্দের সহযোগে Beat বা পর্ব্বের উপরিভাগ বা অঙ্গ গঠিত করে। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন প্রত্যেকটি বিভাগ কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি, বাংলা ছন্দে তেমনি প্রত্যেকটি পর্ব্ব কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি। 'বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়' এই পংক্তিটির মধ্যে দুইটি পর্ব্ব আছে—'বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে' ও 'ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়।' প্রথম পর্ব্বটি 'বিদ্যুৎ', 'বিদীর্ণ', 'শূন্য' এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি; দ্বিতীয় পর্ব্বটি 'ঝাঁকে ঝাঁকে', 'উড়ে চ'লে', 'যায়' এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি। প্রত্যেকটি অঙ্গের প্রারম্ভে স্বরের intensity বা গাম্ভীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অঙ্গের শেষে গাম্ভীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কম। এই ভাবে স্বর-গাম্ভীর্য্যের উত্থান-পতন অনুসারে অঙ্গবিভাগ বোঝা যায়। এই প্রবন্ধের ২য় পরিচ্ছেদে এক একটি অর্থবিভাগের কোন একটি বিশেষ অক্ষরের যে স্বরাঘাতের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই স্বরগাম্ভীর্য্যের ঐক্য নাই। এই স্বরগাম্ভীর্য্যে সে রকম কোন বিশেষ জোর নাই, ভালরূপে লক্ষ্য না করিলে ইহা ধরা যায় না। কিন্তু এই ভাবে অঙ্গবিভাগ হইতেই কবিতার পর্ব্বে ছন্দোলক্ষণ প্রকাশ পায়, পর্ব্বের মধ্যে স্পন্দন বা দোলন অনুভূত হয়। বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট নিয়মানুসারে পর্ব্বাঙ্গগুলি না সাজাইলে ছন্দঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পর্ব্বাঙ্গগুলিকে বাংলা ছন্দের উপকরণ বলা যায় না—কারণ ইহাদের সমমাত্রা বা সমভাব হইতে ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে না। পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গের মাত্রা ইত্যাদির লক্ষণ পৃথক্ হইতে পারে, এবং তজ্জন্য পর্ব্বের মধ্যেই কতকটা বৈচিত্র্যের বোধ হয়।

বাংলা ছন্দের রীতি—যতদূর সম্ভব এক একটি শব্দ সম্পূর্ণভাবে কোন একটি অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অঙ্গ চার মাত্রার চেয়ে বড় হয় না, সুতরাং চার-মাত্রার চেয়ে বড় শব্দ ভাঙিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দিতে হয়; কিন্তু যদি সম্ভব হয়, শব্দের মূলধাতু না ভাঙিয়া একই অঙ্গের মধ্যে রাখিতে হইবে। আর সময়ে সময়ে যেখানে ছন্দোবন্ধের সূত্র অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট—বিশেষতঃ যে রকম ছন্দে স্বরাঘাতের প্রাধান্য খুব বেশী—সেখানে ছন্দের খাতিরে এই রীতির ব্যত্যয় করা যাইতে পারে। পরে এই সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

(৩)

অক্ষরের কোন না কোন এক বিশেষ ধর্ম্মের উপর কোন এক বিশেষ ছন্দঃ পদ্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজী ছন্দঃ মূলতঃ অক্ষরের উপর স্বরাঘাতের সহিত সংশ্লিষ্ট। উৎকৃষ্ট ইংরেজী কবিতায় অবশ্য অক্ষরের দৈর্ঘ্য ও 'রঙ্' ইত্যাদিও ছন্দ সৌন্দর্য্যের সহায়তা করে, কিন্তু স্বরাঘাতের অবস্থানই ইংরেজী ছন্দে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি বহু ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য অথবা মাত্রা অনুসারেই ছন্দোরচনা হইয়া থাকে। স্বরাঘাত ইত্যাদি যে বাংলা ছন্দে নাই এমন নহে, কিন্তু ছন্দের ভিত্তি—মাত্রা; স্বরাঘাত বা অন্য কিছু নহে।

মাত্রানুসারী ছন্দের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হইতে পারে। সংস্কৃতের বৃত্তছন্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সাজাইবার বৈচিত্র্যের উপর ছন্দের উপলব্ধি নির্ভর করে।

'ছা য়া প থে নে ব শ রৎ প্র স ন্নম্' 'যা সৃ ষ্টিঃ স্র ষ্টু রা দ্যা ব হ তি বি ধি হু তং যা হ বি র্যা চ হো ত্রী' ইত্যাদি চরণে হ্রস্বের পর হ্রস্ব বা দীর্ঘ এবং দীর্ঘের পর দীর্ঘ বা হ্রস্ব অক্ষর থাকার জন্য প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের বিচিত্র সমাবেশ হেতু নানাভাবে ভাবের বিচিত্র বিলাস অনুভূত হয়। ছন্দের হিসাবে সেখানে প্রতি অক্ষরটির মাত্রা ভাব উৎপাদনের সহায়তা করে, এবং স্পন্দন-বৈচিত্র্য আনাই সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। সেখানে ঐক্যবোধ জন্মে প্রতি পাদে অক্ষরের সংখ্যা হইতে। ঐক্যসূত্র সেখানে প্রধান নহে, বৈচিত্র্যই সেখানে প্রধান।

বাংলা ছন্দঃ কিন্তু মাত্রাসমক জাতীয়; অর্থাৎ ইহার প্রত্যেকটি বিভাগে মোট মোট একটা পরিমিত মাত্রা থাকা দরকার। চরণের, পর্ব্বের, ও পর্ব্বাঙ্গের মাত্রাসমষ্টি লইয়াই বাংলায় ছন্দোবিচার। বাংলা ছন্দে সাধারণতঃ বৈচিত্র্য অপেক্ষা ঐক্যের প্রাধান্যই অধিক। পরিমিত মাত্রার ছন্দোবিভাগগুলিকে উপকরণরূপে ব্যবহার করার উপরই ছন্দোবোধ নির্ভর করে। প্রত্যেকটি বিশেষ অক্ষরের মাত্রা বা কোন একটি ছন্দোবিভাগের মধ্যে তাহাদের সমাবেশের পদ্ধতি বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নহে। বাংলা ছন্দে যে সমস্ত জায়গায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সেখানেও দেখা যাইবে যে, হ্রস্ব ও দীর্ঘের পারম্পর্য্য হইতে ছন্দোবোধ আসিতেছে না। যেমন—

হোথায় কি : আছে | আলয় : তোমার— = (৪+২)+ (৩+৩)

উর্ম্মিমুখর | সাগরের : পার— = (৩+৩)+ (৪+২)

মেঘচুম্বিত অস্তগিরির— = (২+৪)+ (৩+৩)

চরণতলে ? = (৩+২)

এই কয় পংক্তিতে হ্রস্ব অক্ষরের সহিত দীর্ঘ অক্ষরের সুন্দর সমাবেশ হইলেও প্রতি পর্ব্বে ছয়টি করিয়া মাত্রা থাকার জন্যই ছন্দের উপলব্ধি হইতেছে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ হেতু, বৈচিত্র্যের জন্য নহে।

অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং উত্তর ভারতীয় সমস্ত তদ্ভব ভাষায় ছন্দের এই প্রধান লক্ষণ। ছন্দের এক একটি বিভাগের শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তদনুসারেই ছন্দোরচনা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উচ্চারণের এক এক ঝোঁকে যে পরিমাণ শ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাই উচ্চারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। ইহাতে ফুস্‌ফুসের দুর্ব্বলতা ও বাগ্‌যন্ত্রের শীঘ্র ক্লান্তি প্রভৃতি কয়েকটি জাতীয় লক্ষণ সূচিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে ভারতীয় জাতিতত্ত্বের কোন দুরূহ সূত্র লুক্কায়িত আছে। আর্য্যেরা ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের উচ্চারণ-পদ্ধতি ও ছন্দের প্রকৃতি একরূপ ছিল; কিন্তু তাঁহারা ভারতে আসার পর তাঁহাদের ভাষা অনার্য্যভাবিত হইতে লাগিল। অনার্য্যের বাগ্‌যন্ত্রের লক্ষণ ও উচ্চারণ রীতি অনুসারে আর্য্য ভাষা ও তদ্ভব ভাষাতে উচ্চারণ ও ছন্দের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ছন্দের রাজ্যে 'পরের সোণা কাণে দেওয়া' চলে না, এক-এক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর ইহার রীতি নির্ভর করে। যাহা হউক, বাঙালীর পক্ষে ঝোঁকে ঝোঁকে প্রশ্বাসত্যাগই উচ্চারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনবলীল ব্যাপার, সুতরাং ইহাকেই ভিত্তি করিয়া বাংলায় ছন্দোরচনা হইয়া থাকে। জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর পেশীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ ইত্যাদির দ্বারা অক্ষরের উচ্চারণ অত্যন্ত অবলীলায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং অক্ষরের সংখ্যা কম বা নানা রকমের অক্ষরের বিচিত্র সমাবেশ ছন্দের পক্ষে তেমন প্রধান নহে। প্রশ্বাসের ঝোঁকের মাত্রাই বাঙালীর কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

Symmetry বা প্রতিসমতা বাংলা ছন্দের আর একটি প্রধান গুণ। বাংলায় ছন্দের আদর্শ জোড়ায় জোড়ায় ছন্দোবিভাগগুলিকে সাজান। এই জন্য দুই বা দুইয়ের গুণিতক চার—এই সংখ্যাগুলিরই ছন্দ-গঠনে অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের তালবিভাগেও এই রীতি দেখা যায়; প্রতি আবর্ত্তে বিভাগের সংখ্যা এবং প্রতি বিভাগে অঙ্কের সংখ্যা সাধারণতঃ দুই কিম্বা চার হইয়া থাকে। বাংলা কবিতার প্রতি চরণেও দুই বা চার পর্ব্ব থাকে। প্রাচীন সমস্ত ছন্দেরই এই লক্ষণ। আপাততঃ ত্রিপদী ছন্দকে অন্তবিধ মনে হইতে পারে, কিন্তু আসলে ত্রিপদী চৌপদীরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ত্রিপদীর শেষ পর্ব্বটি অপর দুইটি পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে; লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই তৃতীয় পর্ব্বটি প্রথম দুই পর্ব্বের সমান একটি বিভাগ এবং অতিরিক্ত

একটি ক্ষুদ্রতর বিভাগের সমষ্টি। এই ক্ষুদ্রতর বিভাগটি চতুর্থ একটি পর্ব্বের প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধি। যাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, লঘু ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে অতি সহজেই একতালায় এবং দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে সহজেই কাওয়ালী-জাতীয় তালে গাওয়া যাইতে পারে। একতালা ও কাওয়ালী, উভয় তালেই প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া অঙ্গ থাকে। সুতরাং ইহা হইতেও ত্রিপদী ছন্দের গূঢ় তত্ত্বটি বোঝা যায়। প্রায় সমস্ত বাংলা কবিতা, ছড়া, পদাবলী, গীত ইত্যাদিতে ছন্দের প্রতিসমতা লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক বাংলা কাব্যে অবশ্য প্রতিসমতার আধিপত্য তত বেশী দেখা যায় না। নানা ভাবে লেখকগণ প্রতিসমতার স্থলে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের লক্ষ্য—বিভিন্ন প্রকারের আবেগের দ্যোতনা, এবং সেই জন্য তাঁহারা আবেগ-সূচক বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের রচিত ছন্দঃ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন দিক্ দিয়া বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রতিসমতা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় হইয়া আছে। যেমন, নূতন ধরণের ত্রিপদীতে অনেক সময় তৃতীয় পর্ব্বটি প্রথম দুইটি পর্ব্ব অপেক্ষা ছোট হইয়া থাকে, সুতরাং এ ধরণের ত্রিপদীকে প্রচ্ছন্ন চৌপদী বলা যায় না এবং তজ্জন্য এখানে প্রতিসমতা নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, এই সব স্থলে ত্রিপদী দ্বিপদীরই রূপান্তর মাত্র, তৃতীয় পর্ব্বটি অতিরিক্ত (hypermetric) পদ মাত্র। উদাহরণ স্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে,

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন এক মনে
জপিছেন নাম।
হেন কালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম॥

এই সব স্থলে চরণের তৃতীয় পর্ব্বটি যেন প্রথম দুই পর্ব্ব হইতে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন এবং প্রথম দুই পর্ব্বের ছন্দঃপ্রবাহের পর সম্পূর্ণ বিরাম আসিবার পূর্ব্বে বাগ্‌যন্ত্রের প্রতিক্রিয়াজনিত একরূপ প্রতিধ্বনি। ইংরেজীতে

Whe´re the qu´iet co´loured end´ of ‖ even´ing smiles´,
Miles´ and m´iles
On´ the so´litary pas´tures ‖ wh´ere our she´ep
Ha´lf-asle´ep

প্রভৃতি কবিতায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি যেরূপ প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষ পর্ব্বের প্রতিধ্বনি, এখানেও প্রায় তদ্রূপ।

এতদ্ভিন্ন বাংলা blank verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতার তথাকথিত free verse বা মুক্তবন্ধ ছন্দে প্রতিসমতা ত্যাগ করিয়া ভাবানুরূপ আদর্শে ছন্দঃ গঠন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর ও মুক্তবন্ধ ছন্দে ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য এবং অতিরিক্ত পদের সমাবেশ ইত্যাদি কারণে বৈচিত্র্যের ভাব অধিক

অনুভূত হইলেও, ছন্দের আসল কাঠামটিতে প্রতিসমতা আছে, অর্থাৎ যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া প্রতিসমতা আছে। যথা,—

নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা ॥
রে দূত !* * অমরবৃন্দ | যার ভুজবলে ॥
কাতর, * * সে ধনুর্দ্ধরে | রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ? * *

এই কয় পংক্তিতে ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য থাকিলেও যতির অবস্থানের দিক্ দিয়া প্রতিসমতা আছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে।

প্রায় সকল প্রকারের সুকুমার কলায় প্রতিসমতার প্রভাব দেখা যায়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য হইতে নৃত্যকলায় পর্য্যন্ত ইহা লক্ষিত হয়। মানবদেহে সমযুগ্মভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থানের দরুনই বোধ হয়, ছন্দঃসৃষ্টিতে প্রতিসমতার এত প্রভাব। যাহা হউক, সব ভাষার কবিতাতেই ইহা দেখা যায়। প্রাচীন ইংরেজী কবিতার প্রত্যেক চরণ দুই ভাগে বিভক্ত হইত, আধুনিক ইংরেজীতেও সাধারণতঃ প্রতি চরণের মাঝে একটি করিয়া caesura থাকে। সংস্কৃতে 'পদ্যং চতুষ্পদী' এই সংজ্ঞা হইতেই প্রতিসমতার প্রভাব বুঝা যায়। কিন্তু বাংলার ছন্দঃ ও অন্যান্য ভাষার ছন্দে প্রকৃতিগত পার্থক্য এই যে, বাংলায় প্রতিসমতা-বোধ ছন্দোবোধের মূল উপাদান। যতক্ষণ না দুইটি বিভাগের প্রতিসমতার উপলব্ধি হয়, ততক্ষণ বাংলায় ছন্দের ছন্দ-ত্ব প্রতীত হয় না। শুধু 'রাত পোহাল' বলিলে কোনরূপ ছন্দোবোধ হয় না,'রাত পোহাল ফর্‌সা হ'ল' যতক্ষণ না বলা হয়, ততক্ষণ কোনভাবে ছন্দের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু ইংরেজীতে accent-যুক্ত এবং accent-হীন syllable-এর সমাবেশ হইতেই ছন্দোবোধ আসে ; বিশেষ স্পন্দন ধর্ম্মবিশিষ্ট এক একটি foot-এর অস্তিত্ব বা accent-এর অবস্থান হইতেই ছন্দোবোধ আসে। When the hounds | of spring ॥ are on win | ter's tra | ces—এই চরণটির মাঝখানে একটি caesura থাকিয়া ইহাকে দুইটি প্রতিসম অংশে ভাগ করিতেছে, কিন্তু ছন্দোবোধের জন্য সমস্ত চরণটি পড়া দরকার হয় না। When the hounds of spring বলিলেই accent-এর অবস্থান হেতু ধ্বনিপ্রবাহে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ছন্দের বোধ জন্মে। সংস্কৃতেও স্রগ্ধরা, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দের এক একটি পাদ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই নানাবিধ গণের সমাবেশ-রীতিতে দীর্ঘ ও হ্রস্ব অক্ষরের বিচিত্র পারম্পর্য্য হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে, বিশেষ এক ধরণের ভাব জমিয়া উঠে। এই সমস্ত ছন্দের প্রভাব, ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর আলাপের যেরূপ প্রভাব, তাহার অনুরূপ।

এই ধরণের rhythmic variety বা স্পন্দন-বৈচিত্র্য যে বাংলায় একবারে হয় না, তাহা নয়। তবে তাহা অক্ষরগত নহে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ-বৈচিত্র্যের জন্য তাহা সমুদ্ভূত নহে। কারণ, বাংলায় উচ্চারণ-পদ্ধতি যেরূপ, তাহাতে প্রায় সমস্ত অক্ষরই প্রায় এক রকমের, এক ওজনের বলিয়া বোধ হয়। ইংরেজীতে accented ও unaccented এবং সংস্কৃতে দীর্ঘ ও হ্রস্ব যেরূপ দুই বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না।

এইখানে এ সম্বন্ধে একটি মত আলোচনা করা আবশ্যক। আধুনিক বাংলার মাত্রিক ছন্দের মধ্যে সংস্কৃতানুরূপ স্পন্দন-বৈচিত্র্য আনা যাইতে পারে, এরূপ কেহ মনে করিতে পারেন; কারণ, বাংলা মাত্রিক ছন্দেও দুই মাত্রার অক্ষরের বহুল ব্যবহার আছে। এ রীতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ লওয়া যাক্—

হঠাৎ কখন্ | সন্ধ্যে-বেলায়
নাম-হারা ফুল | গন্ধ এলায়,
প্রভাত-বেলায় | হেলাভরে করে
অরুণ কিরণে | তুচ্ছ
উদ্ধত যত | শাখার শিখরে
রডোডেন্‌ড্রন্ | গুচ্ছ।

আপাততঃ মনে হইবে যে, এখানে যখন এতগুলি দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে, তখন বাংলায় হ্রস্ব ও দীর্ঘের সমাবেশ-বৈচিত্র্য এবং সংস্কৃতের অনুরূপ ছন্দে আনা যাইবে না কেন? কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শেষ পংক্তিতে যেখানে একটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে ছাড়া আর কোন পর্ব্বেই উপর্যুপরি দুইটি দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার নাই, সুতরাং সংস্কৃতে পর পর অনেকগুলি দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহারের জন্য যে মন্থর গম্ভীর উদাত্ত ভাব জমিয়া উঠে এবং মধ্যে মধ্যে হ্রস্ব অক্ষরের ব্যবহারের জন্য ধ্বনি-প্রবাহ দ্রুতবেগে চলিয়া, আবার দীর্ঘ অক্ষরের গায়ে প্রতিহত হইয়া যেরূপ উচ্ছলিত হইতে থাকে, বাংলায় তাহার অনুকরণ করা এক রকম অসম্ভব; কারণ, বাংলায় দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার কম, এবং একই শব্দের মধ্যে বা একই পর্ব্বাঙ্গের মধ্যে উপর্যুপরি দুইটি দ্বিমাত্রিক অক্ষর পাওয়াই কঠিন। দ্বিমাত্রিক অক্ষর-পরম্পরা যদি একই পর্ব্বাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া বিভিন্ন পর্ব্বাঙ্গ বা পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তো যতি ইত্যাদির ব্যবধানের জন্য সেই পারম্পর্য্যের কোন ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং বাংলায় স্পন্দন-বৈচিত্র্যের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ।

কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেও চলিত মাত্রিক ছন্দে যেটুকু ধ্বনিতরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঠিক ইংরেজী ও সংস্কৃতের অনুরূপ ছন্দস্পন্দন বলা যায় কি না, খুব সন্দেহের বিষয়। এ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধ্বনির প্রকৃতি একটু সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক। বাংলায় সংস্কৃতের ন্যায় মৌলিক দীর্ঘস্বরের ব্যবহার নাই। মাত্রিক ছন্দে হলন্ত এবং যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণনা করা হয়, তাহাদের উচ্চারণের কালপরিমাণ অন্যান্য অক্ষরের চেয়ে অধিক হয়। কিন্তু যথার্থ ছন্দঃস্পন্দন সৃষ্টি করিতে হইলে, দুই প্রকারের অক্ষর দরকার;

এই দুই প্রকারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। কিন্তু বাংলা মাত্রিক ছন্দের দ্বিমাত্রিক অক্ষরের মধ্যে এমন কি কোন গুণ আছে, যাহার জন্য ইহাদের একমাত্রিক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বলিয়া মনে হইবে—অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণের জন্য কি বাগ্‌যন্ত্রের স্পষ্ট অতিরিক্ত প্রয়াস করিতে হয়?

পূর্ব্বেই (২ক পরিচ্ছেদে) বলিয়াছি যে, বাংলা উচ্চারণে স্বরের সেরূপ প্রাধান্য নাই, বাংলায় স্বর অন্যান্য বর্ণকে ছাপাইয়া রাখে না। অনেক সময় এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়া যায়। উপরের পদ্যাংশে 'অরুণ' শব্দটিকে দুই অক্ষরের বলিয়া দেখান হইয়াছে, কিন্তু যদি তাহাকে তিন অক্ষরের বলিয়া কেহ দেখান, অর্থাৎ অ রু ণ এই ভাবে পড়েন, তাহা হইলে ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না এবং পরিবর্ত্তন কানেও বিশেষ ধরা পড়িবে না। কিন্তু সংস্কৃত বা ইংরেজীতে এরূপ করিতে গেলে ছন্দঃপতন হইত। বাংলা উচ্চারণে—বিশেষ করিয়া মাত্রিক ছন্দের আবৃত্তির সময়—স্বরের খুব লঘুভাবে উচ্চারণ হয়, সুতরাং যথার্থ দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বরের পার্থক্য মাত্রিক ছন্দে নাই; কারণ, প্রতি স্বরই অতি লঘু। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মাত্রিক ছন্দে যৌগিক স্বরান্ত এবং হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া যখন ধরা হয়, তখন সেই অক্ষরগুলি কি দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট নহে? যদিও অনেকেই বলেন যে, মাত্রিক ছন্দে বাংলায় হলন্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট, তত্রাচ আমার মনে হয় যে, এ বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণে পার্থক্য আছে। ২গ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, বাংলার রীতি—প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্ত্তী শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা। 'অরুণ্ কিরণে' বা 'শাখার্ শিখরে' প্রভৃতিকে আমরা 'অরুণ্‌কিরণে' বা 'শাখার্শিখরে' এই ভাবে পড়ি না। সংস্কৃতে এই ভাবে পড়িতে হইত। ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত যত দূর সম্ভব, আমরা এড়াইয়া চলিতে চাই। ইহার কারণ হয়তো বাঙালীর ধাতুগত আরাম-প্রিয়তা। যাহা হউক, প্রত্যেক শব্দকে পরবর্ত্তী শব্দ হইতে অযুক্ত রাখার জন্য হলন্ত শব্দের পরে আমরা একটুখানি বিরাম লইয়া পরবর্ত্তী শব্দ আরম্ভ করি। সেই বিরামের কাল লঘু-উচ্চারিত একটি স্বরের সমান ধরা যাইতে পারে। তা' ছাড়া, বাংলায় প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে ঈষৎ একটা স্বরাঘাত পড়ে, তাহার জন্য বাগ্‌যন্ত্রকে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত বোধ হয়, একটু সময় দিতে হয়, নহিলে আমরা পারিয়া উঠি না। এই জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই পদান্তের হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক হইয়া থাকে। যাহা হউক, বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতিতে 'অরুণ কিরণে' এই শব্দগুচ্ছকে 'অরুন্ কিরনে= অ+রু+উন্+কি+র+নে' এই ভাবে পড়া হয় না, পড়া হয় 'অ+রুন্+( )+কি+র+নে'। এই জন্য বন্ধনী-নির্দ্দিষ্ট ফাঁকের স্থানে 'অ' স্বরটি বসাইয়া দিলে ছন্দের বা ধ্বনি-প্রবাহের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।—এই তো গেল পদান্তের হলন্ত অক্ষরের কথা। কিন্তু আধুনিক মাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরও দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরা হয় কেন? বলা বাহুল্য, বাংলার চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না; এবং আমাদের সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ-পদ্ধতি বা গদ্যের উচ্চারণ-রীতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক

ধরা হয় না (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে)। চলিত মাত্রিক ছন্দে একটু উচ্চারণের কৃত্রিমতা আছে, ইহার ধ্বনিপ্রবাহ বা ধ্বনিতরঙ্গ সাধারণ কথোপকথন বা গদ্যের অনুযায়ী নহে। ইহাতে বর্ণসংঘাত-বিমুখতা একেবারে চরমে আসিয়া উঠিয়াছে, বাগ্‌যন্ত্রের আরামপ্রিয়তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখানে যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্‌যন্ত্রকে একটু বিরাম দেওয়া হয়। পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণের পরও একটুখানি সময় পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনের ঝঙ্কার বা রেশ থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে আর একটি মাত্রা পূরণ হয়। 'সন্ধে বেলায়', 'উদ্ধত যত' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছকে 'সন্‌+ (ন্‌)+ধে+বে+লায়্‌+(.)' এবং 'উদ্‌+(দ্‌)+ধ+ত+জ+ত' এই ভাবে পড়া হয়। যৌগিক স্বরের বেলাতেও তাহা করা হয়, যেমন 'অতি ভৈরব'কে উচ্চারণ করা হয় 'অ+তি+ভৈ+(ই)+র+ব' এই ভাবে।

সুতরাং বাংলা মাত্রিক ছন্দেও সংস্কৃতানুরূপ যথার্থ হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার নাই, যদিও একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার আছে। সুতরাং সংস্কৃতে যেরূপ ছন্দঃস্পন্দন হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না। কবি সত্যেন্দ্র দত্তও সেই কথা বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত বা হিন্দী বা মারাঠি বা গুজরাটিতে 'দীর্ঘস্বরের দরাজ আওয়াজ বায়ুমণ্ডলে জোয়ার ভাটার যে কুহক সৃষ্টি করে, তা হয়তো বাংলায় সম্ভব হবে না'। মধ্যে মধ্যে একটু বিরাম বা ধ্বনির ঝঙ্কারের জন্য যেটুকু সৌন্দর্য্য হইতে পারে, তাহাই মাত্রিক ছন্দে সম্ভব। কিন্তু সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দঃস্পন্দন বাংলায় ঠিক অনুকরণ করা যায় না।

বাংলা স্বরমাত্রিক ছন্দে অবশ্য স্বরের প্রাধান্য অধিক, এবং সেখানে অক্ষর-বিশেষের উপর সুস্পষ্ট স্বরাঘাত পড়ে ; সুতরাং সেখানে গুণগত সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুসারে দুই জাতীয় অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায়। কিন্তু বাংলায় স্বরমাত্রিক ছন্দে বৈচিত্র্য একেবারে কম। মাত্র এক ধরণের স্বরমাত্রিক ছন্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। প্রতি পর্ব্বে চার অক্ষর ও চার মাত্রা, দুই মাত্রার দুইটি পর্ব্বাঙ্গ, এবং প্রথম পর্ব্বাঙ্গে (সাধারণতঃ প্রথম অক্ষরে) স্বরাঘাত— স্বরমাত্রিক ছন্দের পর্ব্ব-মাত্রেরই এই লক্ষণ। সুতরাং স্পন্দন-বৈচিত্র্য এ ধরণের ছন্দে দেখান যায় না।

বাংলায় চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষরের সুকৌশলে প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে বরং কতকটা সংস্কৃতের বৃত্ত-ছন্দের অনুরূপ একটা মন্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তই বাংলায় সব চেয়ে বড় কৃতী। 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে', 'কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে" প্রভৃতি পংক্তিতে এইরূপ একটা ভাব আসে। এ ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না, এবং তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না। সুতরাং এখানে ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত আছে। সুতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার-কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। অবশ্য এখানেও তরঙ্গের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ; কারণ, উপর্য্যুপরি দুইটির অধিক যুক্তবর্ণ ব্যবহার করিতে গেলে একটিকে টানিয়া দীর্ঘ করিতে হয় ; অর্থাৎ মাঝে একটু বিরাম দিতে হয়, তাহাতে ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত আর থাকে না। তা' ছাড়া বর্ণমাত্রিক ছন্দে এক প্রকারের দীর্ঘ টান আছে, সুতরাং এই ছন্দে স্বরের উচ্চারণ তত

লঘু না করিলেও চলে এবং ইচ্ছা করিলে স্বরের উপরই জোর দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইখানেই হলন্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরবর্ণ যথার্থ দীর্ঘ হইতে পারে, যদিও তজ্জন্য হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং এই রকমের ছন্দে বরং কতকটা সংস্কৃত বৃত্ত-ছন্দের প্রতিধ্বনি আনা যাইতে পারে; কারণ, এখানে দুই প্রকারের অক্ষরের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের দুই প্রকারের প্রয়াস আবশ্যক হয়। পরের পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

কিন্তু সাধারণতঃ বাংলায় যে স্পন্দন-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে, তাহা অক্ষর-গত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অক্ষরের সমাবেশ হইতে এই বৈচিত্র্য হয় না, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শব্দ ও শব্দসমষ্টির সমাবেশ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। বাংলা ছন্দে যতিপতন এবং তজ্জনিত ছন্দোবিভাগের দরুন ঐক্যসূত্র পাওয়া যায়; কিন্তু বৈচিত্র্য আনা যায়—ছেদের অবস্থান এবং তজ্জনিত শ্বাসবিভাগ বা অর্থবিভাগের পারম্পর্য্য হইতে। অমিতাক্ষর ছন্দে এই ভাবেই বৈচিত্র্য আনা হইয়া থাকে। তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে বৈচিত্র্য আনা হয় আর এক ভাবে। সেখানে যতি ও ছেদ প্রায় এক সঙ্গেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু পর্ব্বের মাত্রা এবং প্রতি চরণে পর্ব্ব-সংখ্যা খুব বাঁধা-ধরা নয়, আবেগের তীব্রতা অনুসারে বাড়ে বা কমে। অবশ্য এই ভাবে বাড়ার বা কমারও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা আছে। তা' ছাড়া, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পদ ব্যবহারের দ্বারাও কিছু বৈচিত্র্য আসে। রবীন্দ্রনাথ ইহার উপরে আবার চরণের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছেদ বসাইয়া এবং অন্ত্যানুপ্রাসের বৈচিত্র্য ঘটাইয়া আরও একটু বৈচিত্র্য বাড়াইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বের মধ্যে পর্ব্বাঙ্গগুলি সাজাইবার কায়দা হইতেও একটু বৈচিত্র্য আসিতে পারে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ক্ষীণ; কারণ, ছন্দঃপতন না হইলে অত ছোট ছোট ছন্দ-বিভাগের মাত্রা আমাদের শ্রবণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে না।

বাংলায় প্রতিসম ছন্দাংশগুলি সাধারণতঃ অবিকল এক ছাঁচের হয় না, কেবলমাত্র তাহাদের মোট মাত্রা সমান থাকে। বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ খোঁচ-খাঁচ অত্যন্ত কম, সুতরাং কোন একটা বিশেষ ছাঁচে পর্ব্বাঙ্গ বা পর্ব্ব গঠন করিলে, তাহা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না; এবং বরাবর সেই ছাঁচে লেখার মত শব্দও পাওয়া যায় না। এই জন্য বাংলা ছন্দে ছাঁচের কারিগরি দেখাইবার সুযোগ কম, এবং এ জন্য কবিরা বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাঝে মাঝে একটা বিশেষ ছাঁচের পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখার চেষ্টা করিতেন। এ দিক্ দিয়া তাঁহার 'ছন্দহিন্দোল' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনিও এই কবিতার দুই এক জায়গায় ছাঁচ বজায় রাখিতে পারেন নাই, এবং মাত্রাসমকত্ব হিসাব করিয়াই তাঁহাকে ছন্দ-বিভাগগুলি মিলাইতে হইয়াছিল। চলতি ভাষায় অবশ্য ঘন ঘন স্বরাঘাত স্পষ্ট পড়ে এবং হলন্ত অক্ষরের বহুল ব্যবহারের জন্য ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত প্রায়ই ঘটে, এবং সে জন্য অবশ্য স্বরাঘাতযুক্ত ও স্বরাঘাতহীন এবং স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের বিন্যাসের দ্বারা বিশেষ রকমের ছাঁচ গড়িয়া ওঠে ও অনেক দূর পর্য্যন্ত সেই ছাঁচ বজায় রাখাও সম্ভব। কিন্তু আবার স্বরাঘাতযুক্ত ছন্দে মাত্র এক ছাঁচের পর্ব্বই বাংলায় চলে। এক ছাঁচে ঢালা কবিতাতেও কিন্তু

ছন্দ-বিভাগগুলির মাত্রাসমষ্টিই আমাদের ছন্দোবোধের পক্ষে প্রধান। ছাঁচ বদ্‌লাইয়া দিলেও মাত্রা সমান থাকিলে বাংলা ছন্দের পক্ষে কিছুমাত্র হানিকর হয় না; এমন কি, পরিবর্ত্তনটাই অনেক সময় কানে ধরা পড়ে না।

মস্‌গুল্ : বুল্‌বুল্ | বন্‌ফুল্ : গন্ধে
বিল্‌কুল্ : অলিকুল্ | গুঞ্জরে : ছন্দে ॥

এই দুইটি পংক্তিতে পর্ব্বের ছাঁচ বরাবর একরকম নাই, দ্বিতীয় পংক্তিতে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তত্রাচ পড়িবার সময় ছাঁচের পরিবর্ত্তনটা বিশেষ লক্ষ্যীভূত হয় না, পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গের সংখ্যা ও মাত্রা সমান আছে বলিয়া বরাবর ছন্দের ঐক্যই বোধ হয়, বৈচিত্র্যের আভাস আসে না।

মানুষের অবয়বে প্রতিসম অঙ্গগুলি যেমন ঠিক এক মাপের হয় না, তেমনি ছন্দের প্রতিসম অংশগুলি মাত্রায় সর্ব্বদা ঠিক সমান হয় না। সময়ে সময়ে পূর্ণচ্ছেদের (major breath pause-এর) ঠিক্ পূর্ব্বের বিভাগটি একটু মাত্রায় ছোট হয়, এবং তদ্দ্বারাই পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান পূর্ব্ব হইতে বুঝা যায়।

এইখানে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্যের কথা একটু বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দের উপকরণ—পর্ব্ব, এবং এক এক বারের ঝোঁকে বাক্যের যতটা উচ্চারণ করা হয়, তাহাকেই বলা যায় পর্ব্ব। কিন্তু পর্ব্ববিভাগ বাঙালীর কথন-নীতির একটি লক্ষণ, এবং গদ্যেও এইরূপ পর্ব্ববিভাগ আছে। প্রায়শঃ গদ্যের পর্ব্বগুলিও সমান হইয়া থাকে, কিন্তু গদ্যের পর্ব্বগুলির পারম্পর্য্যের মধ্যে কোন নক্সা বা ছাঁচ দেখা যায় না। নিম্নের উদাহরণ হইতে সাধারণ গদ্যের লক্ষণ বুঝা যাইবে (বন্ধনীভুক্ত সংখ্যার দ্বারা পূর্ব্বের মাত্রাবিভাগ হইয়াছে)।

দুকড়ি। কি চাই ? (৩) ॥
কাঙালী। আজ্ঞে, (৩) ॥ মশায় হচ্চেন (৬) | দেশহিতৈষী (৬) ॥
দুকড়ি। তা' ত (৩) ॥ সকলেই জানে (৬) ॥ কিন্তু (২) | আসল ব্যাপারটা (৬) | কি ? (২) ॥
কাঙালী। আপনি সাধারণের (৮) | হিতের জন্য (৬) | প্রাণপণ—
দুকড়ি। —ক'রে (৬) |
ওকালতি ব্যবসা (৬)। চালাচ্চি ॥ তাও (৬) |
কারো অবিদিত নেই (৮) ॥

(হাস্যকৌতুক, রবীন্দ্রনাথ)

দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংলা কথোপকথনের ভাষাতেও বিশেষ এক প্রকারের অর্থাৎ ছয় মাত্রার পর্ব্ব বহুল ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিয়াই তাঁহার কবিতায় ছয় মাত্রার পর্ব্ব খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছেন।

ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্যে অনেক সময় সমমাত্রার বা কোন বিশেষ আদর্শানুযায়ী

পরিমিত মাত্রার পর্ব্বের সমাবেশ দেখা যায়। নিম্নের উদাহরণে আট মাত্রার পর্ব্বের পারম্পর্য্য পাওয়া যায়।—

তখন | রমণীয় চিত্রকূটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুষ্প (৮) | ফুটিয়া উঠিয়াছিল (৮), আম্র ও লোধ্র ফল (৮) | পক্ব হইয়া (৬) | শাখাগ্রে দুলিতেছিল (৮) |

(রামায়ণী কথা, দীনেশচন্দ্র সেন)

তবে পদ্যে ও ছন্দোলক্ষণাত্মক গদ্যে তফাৎ কি? গদ্যে পর্ব্ববিভাগ থাকিলেও, বিভাগের সূত্র ঝোঁকের বা ধ্বনির দিক্ দিয়া নহে—সেখানে অর্থের দিক্ দিয়া; প্রত্যেক পর্ব্ব একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগ (Sense Group)। ছন্দঃ সেখানে সম্পূর্ণরূপে অর্থবাচক বিভাগের অধীন। পদ্যে কিন্তু প্রত্যেকটি বিভাগের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিরই প্রাধান্য অধিক, যদিও অনেক সময়ই পদ্যের এক একটি বিভাগ এক একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগের সহিত অভিন্ন। তত্রাচ পদ্যের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস, স্বরাঘাত ইত্যাদির অবস্থান হইতে পদ্যে যে, ধ্বনি অনুসারেই এক একটি বিভাগ হইয়া থাকে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু গদ্য ও পদ্যের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট প্রতীত হয় যতির অবস্থান হইতে। পদ্যে প্রতি চরণের শেষে যতিও থাকিবে, পূর্ণযতি কিম্বা ছেদ না থাকিলেও অন্ততঃ অর্দ্ধযতি থাকিবে। যতির অবস্থান পদ্যে বিশেষ কোন নক্সা বা আদর্শ অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে। গদ্যে কিন্তু যতির অবস্থান কোন নিয়ম বা নক্সা অনুযায়ী হয় না; বাক্য বা বাক্যাংশের শেষে অর্থবোধের পূর্ণতা অনুযায়ী ছেদ পড়ে। পদ্যে চার পাঁচটি পর্ব্বের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়া দরকার। গদ্যে আট, দশ বা আরও বেশী সংখ্যক পর্ব্বের পরে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে।

মাত্রা

এইবার মাত্রার কথা কিছু বলা আবশ্যক। গানে কবিতায়, উভয়ত্রই মাত্রা অর্থে কাল-পরিমাণ বুঝায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাংলা কাব্যে যদিও অক্ষরের মধ্যে মাত্রাভেদ দেখা যায়, তথাপি সে ভেদের দরুণ অক্ষরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পনা করা যায় না। সেই জন্য গ্রীক্ iamb, trochee, spondee প্রভৃতি foot এবং সংস্কৃতে 'য' 'ম' 'ত' 'র' প্রভৃতি গণ বিভিন্ন গুণের অক্ষরের বিশেষ সমাবেশ বলিয়া—বিশিষ্ট স্পন্দন-ধর্ম্ম-যুক্ত; বাংলায় পর্ব্ব বা পর্ব্বাঙ্গ সে রকম কিছু নয়।

ছন্দঃশাস্ত্রে মাত্রা বা কালপরিমাণের আসল তাৎপর্য্য কি, বুঝা দরকার। ছন্দঃ-শাস্ত্রের কাল পদার্থবিদ্যার কাল নহে, অর্থাৎ বিষয়ি-নিরপেক্ষ (objective) নহে, কালমানযন্ত্রে ইহা ঠিক ধরা পড়ে না। পর্ব্বের মাত্রা বা কাল-পরিমাণ বলিতে পর্ব্বের প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষরের উচ্চারণ পর্য্যন্ত যে নিরপেক্ষ কাল অতি-বাহিত হয়, তাহাকে নির্দ্দেশ করা হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, পর্ব্বের মধ্যে বিরামস্থান, এমন কি—পূর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু মাত্রার হিসাবের সময় বিরাম বা ছেদের কাল যে কোন অক্ষরের উচ্চারণের কাল হইতে দীর্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয়। যেমন—

মৃগেন্দ্র কেশরী, |

(ক) করে, * হে বীর কেশরী | সম্ভাষে শৃগালে |

(খ) মিত্র ভাবে ? * অজ্ঞ দাস | বিজ্ঞতম তুমি, |

(গ) অবিদিত নহে কিছু | তোমার চরণে। |

এই কয়টি পংক্তিতে ছন্দের নিয়মে ক = খ = গ, অথচ কয়টি পর্ব্বের মধ্যে একটিতে কোনরূপ ছেদ নাই, একটিতে উপচ্ছেদ, অপরটিতে পূর্ণচ্ছেদ রহিয়াছে। যদি মাত্র নিরপেক্ষ কাল-পরিমাণের উপর মাত্রা-বিচার নির্ভর করিত, তবে এরূপ হইত না।

ছন্দের কাল বাহ্য জগতের নিরপেক্ষ কাল নহে। অক্ষরের উচ্চারণের নিমিত্ত বাগ্‌যন্ত্রের প্রয়াসের উপর ইহা নির্ভর করে। এই প্রয়াসের পরিমাণ অনুসারে অক্ষরের মাত্রাবোধ জন্মে। পর্ব্বের অন্তর্গত অক্ষরের মাত্রা-সমষ্টির উপরই পর্ব্বের মাত্রা-পরিমাণ নির্ভর করে। সুতরাং ছেদ বা বিরাম পর্ব্বের মধ্যে থাকিলে তাহাতে মাত্রাসংখ্যার ইতর-বিশেষ হয় না। মাত্রার ভিত্তি হইতেছে—বাগ্‌যন্ত্রের প্রয়াস, মাত্রার আদর্শ চিত্তের অনুভূতিতে। বিশেষ বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য প্রয়াসের কাল অনুসারে চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার উপলব্ধি হয়,—কোনটি হ্রস্ব, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি প্লুত বলিয়া জ্ঞান হয়। কিন্তু এইরূপ মাত্রার কাল, মোটামুটি উচ্চারণ-প্রয়াসের জন্য আবশ্যক নিরপেক্ষ কালের অনুযায়ী হইলেও, ঠিক তাহার অনুপাতের উপর নির্ভর করে না। যদি উচ্চারণের নিরপেক্ষ কাল হিসাব করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর সমান নহে, এবং হ্রস্ব বা একমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর সমান নহে; কিম্বা যে কোন দীর্ঘ অক্ষর যে কোন হ্রস্ব অক্ষরের দ্বিগুণ নহে। মাত্রাবোধের জন্য ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি, ছন্দের রীতি ইত্যাদিতে বুৎপত্তি থাকা দরকার। কোন বিশেষ স্থলে একটি অক্ষরের অবস্থান, শব্দের অর্থগৌরব ইত্যাদিতেও ছন্দোরসিকের মাত্রাজ্ঞান জন্মে।

শুধু বাংলা নহে, সমস্ত ভাষাতেই ছন্দে অক্ষরের মাত্রার এই তাৎপর্য্য। এই উপলক্ষে ইংরেজী ছন্দের long ও short সম্বন্ধে Professor Saintsbury-র মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—They (long and short) represent two values which, though no doubt by no means always identical in themselves, are invariably, unmistakably, and at once, distinguished by the ear ;—it is partly, and in English rather largely, created by the poet, but that this creation is conditioned by certain conventions of the language, of which accent is one, but only one.

যাহা হউক, বাংলাতেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অক্ষরের মাত্রা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হয় না। ইংরেজীতে যেমন বেশীর ভাগ অক্ষর Common Syllable অর্থাৎ অবস্থা অনুসারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে, বাংলাতেও তদ্রূপ। বাংলাতেও অনেক অক্ষরকেই ইচ্ছামত হ্রস্ব বা দীর্ঘ করা যাইতে পারে। বাংলা উচ্চারণে যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি। স্বেচ্ছায় অক্ষরের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের রীতি বাংলা ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দের তুলনায় বাংলা ছন্দের এই একটি প্রধান সুবিধা কিংবা এই একটি প্রধান দুর্ব্বলতা—উভয়ই বলা যাইতে পারে।

অধিকন্তু বাংলায় মাত্রা আপেক্ষিক ; অর্থাৎ সন্নিহিত অন্যান্য অক্ষরের তুলনাতেই কোন অক্ষরকে দীর্ঘ বলা হয়, নিরপেক্ষ মিনিট সেকেণ্ড হিসাবে নহে। উচ্চারণে সেই সময় লাগিলেও অন্যত্র সেই অক্ষরই সন্নিহিত অক্ষরের তুলনায় হ্রস্ব বলা যাইতে পারে। যেমন, 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব | বিবিধ রতন' এই পংক্তিতে 'বঙ্' একটি হ্রস্ব অক্ষর, আবার 'জননি বঙ্গ | ভাষা এ জীবনে | চাহি না অর্থ | চাহি না মান' এই পংক্তিতে 'বঙ' একটি দীর্ঘ অক্ষর। এই দুই জায়গাতে ঠিক 'বঙ' অক্ষরটির উচ্চারণে যে কালের বেশী তারতম্য হয়, তাহা নহে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে সমস্ত চরণটি একটু সুর করিয়া বা টানিয়া পড়া হয় এবং সুতরাং প্রত্যেকটি অক্ষরকেই প্রায় সমান করিয়া তোলা হয়। সুতরাং পরস্পরের সহিত সমান বলিয়া প্রত্যেক অক্ষরটিকেই হ্রস্ব বলা যায় ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় বলিয়া হলন্ত 'বঙ' অক্ষরটির উচ্চারণের কাল হইতে নিকটের অন্য অক্ষরের উচ্চারণের কাল স্পষ্ট কম বলিয়া অনুভূত হয় ; সুতরাং এখানে 'বঙ' অক্ষরটিকে দীর্ঘ বলা হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে,সাধারণ উচ্চারণে বিভিন্ন অক্ষরের মাত্রার বহু বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। একই অক্ষরেরও উচ্চারণে একই মাত্রা সব সময় বজায় রাখা যায় না, কিছু কিছু ইতর বিশেষ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। ধ্বনিবিজ্ঞানে সাধারণতঃ হ্রস্ব, নাতিদীর্ঘ, দীর্ঘ—অক্ষরের এই তিন শ্রেণী করা হইয়া থাকে। ছন্দঃশাস্ত্রে কিন্তু একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক —এই দুই শ্রেণীরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যদিও উচ্চারণের জন্য এক মাত্রা ও দুই মাত্রার মধ্যবর্ত্তী যে কোন ভগ্নাংশ-পরিমিত কালের আবশ্যক হইতে পারে। কারণ, আসলে ছন্দের মাত্রা নির্ণয় হয় চিত্তের অনুভূতিতে, বৈজ্ঞানিকের কালমান-যন্ত্রে নহে।

বাংলা ছন্দে কদাচ কোন অক্ষরকে ছন্দের খাতিরে ত্রিমাত্রিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।

এই স্থলে কাব্যছন্দের মাত্রা ও সঙ্গীতের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা উচিত। সঙ্গীতের মাত্রার একটি নির্দ্দিষ্ট নিরপেক্ষ কালপরিমাণ আছে ; ঘড়ির দোলকের এক দিক্ হইতে আর এক দিকে গতির কাল অথবা এইরূপ অন্য কোন নিরপেক্ষ কালাঙ্ক ইহার আদর্শ। সঙ্গীতে তাল-বিভাগের কালপরিমাণ ঠিক ঠিক বজায় রাখার জন্য উচ্চারণের ইতর-বিশেষ করা হইয়া থাকে। কাব্যছন্দে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় মাত্রার কালাঙ্ক বিভিন্ন হইয়া থাকে ; এমন কি, এক কবিতারই ভিন্ন ভিন্ন চরণে লয়ের পরিবর্ত্তন ও মাত্রার কালাঙ্কের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। লয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারাই কবিতাতে অনেক সময়ে আবেগের হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন বুঝা যায়। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার যথাযথ আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, কি সুকৌশলে লয়ের পরিবর্ত্তনের দ্বারা আসন্ন ঝটিকার ভয়ালতা, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ঝঞ্ঝার মত্ততা, বায়ুবেগের হ্রাসবৃদ্ধি, এবং ঝটিকার অন্তে স্নিগ্ধ শান্তি,—এই সব রকমের ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কাব্যছন্দে যত দূর সম্ভব, সাধারণ উচ্চারণের মাত্রা বজায় রাখিতে হয় ; সঙ্গীতে যেমন যে কোন অক্ষরকে সিকি মাত্রা পর্য্যন্ত হ্রস্ব এবং চার মাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘ করা যায়, কবিতায় ততটা করা চলে না।

অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ভারতীয়, তথা বাংলা কাব্য-ছন্দের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতের পদ্ধতি মূলতঃ একই, প্রাচীন সঙ্গীত ও প্রাচীন কবিতার মধ্যে সৌসাদৃশ্য এত বেশী যে, তাহাদের ভিন্ন করিয়া চেনাই কঠিন। বাংলা কবিতায় প্রচলিত ছন্দগুলি যে সঙ্গীতের তালবিভাগ হইতে উৎপন্ন, তাহাও বেশ বুঝা যায়। পরে কিন্তু সঙ্গীত ও কাব্য-ছন্দ ক্রমেই পৃথক্ পৃথক্ পথ অবলম্বন করিয়াছে। সঙ্গীতে সুরের সন্নিবেশের দিক্ দিয়া নানা বৈচিত্র্য আসিয়াছে, কিন্তু তাল-বিভাগের পদ্ধতি বরাবর প্রায় একরূপ আছে। বাংলায় কিন্তু পর্ব্ববিভাগের মধ্যে ক্রমেই বৈচিত্র্য আসিতেছে; বিশেষতঃ blank verse বা অমিতাক্ষর ছন্দে ও তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে নানাভাবে বৈচিত্র্যকেই মূল ভিত্তি করিয়া ছন্দঃ গঠনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

মাত্রাপদ্ধতি

এক হিসাবে বাংলা ছন্দের প্রকৃতি—সংস্কৃত, আরবী, ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলায় ছন্দঃ উচ্চারণের অনুগামী নহে। বরং এক একটি বিশেষ ছন্দ-পদ্ধতি অনুসারেই বাংলা কাব্যে উচ্চারণ স্থির হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনশীলতার জন্যই এরূপ হওয়া সম্ভব। অবশ্য বাংলা কবিতার যে কোন চরণে যে কোন ছন্দঃ চাপাইয়া দেওয়া যায় না; কারণ, যতদূর সম্ভব, সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ কবিতায় বজায় রাখা দরকার। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছন্দপদ্ধতি অনুসারেই কবিতায় শব্দের ও অক্ষরের মাত্রা ইত্যাদি স্থির হইয়া থাকে।

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে শব্দের যেটুকু উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম syllable বা অক্ষর। অক্ষরই উচ্চারণের মূল উপাদান। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাকে। অক্ষরের অন্তর্গত স্বরের পূর্ব্বে ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিতে পারে বা না-ও থাকিতে পারে। সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে,এক একটি অক্ষর syllabic ও non-syllabic-এর সমষ্টি মাত্র। সাধারণতঃ স্বরবর্ণই syllabic এবং ব্যঞ্জনবর্ণ non-syllabic হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ধ্বনিবিজ্ঞানের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, সময়ে সময়ে ব্যঞ্জনবর্ণও syllabic এবং স্বরবর্ণও non-syllabic হইয়া থাকে।

ছন্দের দিক্ হইতে নিম্নলিখিত ভাবে বাংলা অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে,—
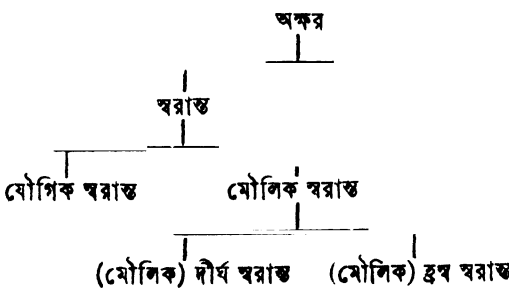
বলা বাহুল্য যে, ছন্দোবিচারের সময়, syllable বা অক্ষর, vowel বা স্বর, consonant বা ব্যঞ্জন, diphthong বা যৌগিক স্বর ইত্যাদি ভাষাতত্ত্বের ব্যবহৃত অর্থে বুঝিতে হইবে। লিখনপদ্ধতির বা লৌকিক ব্যবহারের চল্‌তি অর্থে বুঝিলে প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও বাংলা বর্ণমালায় মাত্র 'ঐ' এবং 'ঔ' এই দুইটি যৌগিক স্বর দেখান হয়, তত্রাচ বাংলায় বাস্তবিক পক্ষে বহু যৌগিক স্বরের ব্যবহার আছে। 'খাই', 'দাও' প্রভৃতি শব্দ বাস্তবিক একাক্ষর ও যৌগিক স্বরান্ত। তেমনি মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলায় মৌলিক স্বর মাত্রেই সাধারণতঃ হ্রস্ব; 'ঈ,' 'ঊ,' 'আ,' 'এ,' 'ও' প্রভৃতির হ্রস্ব উচ্চারণই হইয়া থাকে।

গঠনের দিক্ দিয়া অক্ষরের মধ্যে স্বরই প্রধান। স্বরের পূর্ব্বে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে তদ্দ্বারা স্বরের একটি বিশিষ্ট আকার দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু অক্ষরের মধ্যে যদি স্বরের পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, তবে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়া যায়। প্রায় সকল ভাষাতেই সাধারণতঃ স্বরের দৈর্ঘ্য অনুসারে মাত্রা-নিরূপণ হইয়া থাকে।

নিত্য-দীর্ঘ মৌলিক স্বরবর্ণ বাংলায় নাই। সুতরাং মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর মাত্রই সাধারণতঃ হ্রস্ব বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু হলন্ত অক্ষর ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একই লয়ে একটি যৌগিক স্বরান্ত ও একটি হলন্ত অক্ষর পড়িলে দেখা যাইবে যে, হলন্ত অক্ষরের উচ্চারণে কিছু সময় বেশী লাগে। কিন্তু কিছু দ্রুতলয়ে হলন্ত অক্ষর পড়িলে মধ্য লয়ের স্বরান্ত অক্ষরের সমান হইতে পারে। ইহাকেই বলে হ্রস্বীকরণ; বাংলা ছন্দের ইহা একটি বিশেষ গুণ। বাঙালীর বাগ্‌যন্ত্র নমনীয় বলিয়া যে কোন সময়েই হ্রস্বীকরণ চলিতে পারে। যেমন হ্রস্বীকরণ, তেমনি হলন্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণও বাংলায় চলে। বিলম্বিত লয়ে হলন্ত অক্ষর পড়িলে বা হলন্ত অক্ষরের অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণের পরে একটু বিরাম লইলে, হলন্ত অক্ষর মধ্য লয়ের স্বরান্ত অক্ষরের দ্বিগুণ হইতে পারে।

কিন্তু যথেচ্ছ হ্রস্বীকরণ বাংলায় চলে না। কোন এক পর্ব্বের মধ্যে পর পর দুইটি অক্ষর পর্য্যন্ত এইরূপ হ্রস্বীকরণ চলিতে পারে; তাহার বেশী আর চলে না, বাগ্‌যন্ত্রের ক্ষমতার অতিরিক্ত প্রয়াস আবশ্যক হয়, কিঞ্চিৎ বিরাম আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং পর পর দুইটি হলন্ত অক্ষরের হ্রস্বীকরণ করিলে ঠিক পরেও যদি সেই পর্ব্বের মধ্যে হলন্ত অক্ষর থাকে, তবে সেটিকে দীর্ঘ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এ জন্য 'দিঙ্মণ্ডল,' 'ধক্ ধক্ ধক্', 'খঞ্জন চোখ' প্রভৃতি পদ অন্ততঃ চার মাত্রার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর সম্বন্ধেও হলন্ত অক্ষরের অনুরূপ বিধি। যৌগিক স্বরের মধ্যে দুইটি স্বরের উপাদান থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটি পূর্ণোচ্চারিত ও প্রধান, দ্বিতীয়টি অপ্রধান, non-syllabic, প্রায় ব্যঞ্জনের সমান (consonantal)। অবশ্য যৌগিক স্বরকে ভাঙিয়া দুইটি পৃথক্ স্পষ্টোচ্চারিত স্বরে পরিবর্ত্তন করা চলে, কিন্তু যখন তাহারা দুইটি পৃথক্ অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'যাও' শব্দটি একাক্ষর যৌগিক স্বরান্ত; কিন্তু 'যেও' শব্দটি দ্ব্যক্ষর। 'ঘর থেকে বেরিয়ে যাও' এবং 'আমাদের বাড়ী যেও' এই দুইটি বাক্য

তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। যাহা হউক, যথার্থ যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ। সুতরাং ইহাকে হয় হ্রস্বীকরণের দ্বারা একমাত্রিক, না-হয় দীর্ঘীকরণের দ্বারা দ্বিমাত্রিক বলিয়া ধরিতে হইবে। এবং উপর্য্যুপরি দুইটির বেশী যৌগিক স্বরের হ্রস্বীকরণ একই পর্ব্বের মধ্যে চলিতে পারে না। এই জন্য 'আয় আয় সই' প্রভৃতি পদ অন্ততঃ চার মাত্রার সমান হইবে।

বাংলা ছন্দে যেমন হ্রস্বীকরণের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, ইংরেজী ছন্দে তেমনি accent বসাইবার ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। Professor Elton লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ইংরেজীতে the ear will not bear more than three consecutive accents without forming a new foot.

ছন্দের মধ্যে ব্যবহার করিতে হইলে হলন্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ আবশ্যক বলিয়া ইহাদের একটি পৃথক্ শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। Prof. Saintsbury যেমন Common Syllable নাম দিয়া যে সমস্ত Syllableকে ইচ্ছামত short বা long ধরা যাইতে পারে, তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ হলন্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরকে আমরা 'ইচ্ছাদীর্ঘ' বা 'সামান্য' অক্ষর বলিতে পারি।

অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে এই কয়টি রীতি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে—

[১] বাংলায় মৌলিক স্বরান্ত সমস্ত অক্ষরই হ্রস্ব বা একমাত্রিক।

[১ক] কিন্তু স্থানবিশেষে হ্রস্ব স্বরও আবশ্যক মত দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক হইতে পারে ; যথা—

(অ) Onomatopoeic বা একাক্ষর অনুকার শব্দ এবং interjectional বা আহ্বান আবেগ ইত্যাদিসূচক শব্দ।

যথা—হী হী শবদে | অটবী পূরিছে (ছায়াময়ী, হেমচন্দ্র)

না—না—না | মানবের তরে (সুখ, কামিনী রায়)

(আ) যে শব্দের অন্ত্য অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার শেষ অক্ষর—

যথা—নাচ' ত : সীতারাম | কাঁকাল : বেঁকিয়ে (গ্রাম্য ছড়া)

(ই) তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত-মতে দীর্ঘ, তাহাতে স্বরাঘাত পড়িলে—

যথা—ভীত বদনা | পৃথিবী হেরিছে (ছায়াময়ী, হেমচন্দ্র)

[২] সামান্য অক্ষর অর্থাৎ হলন্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে হ্রস্বও ধরা যাইতে পারে। কিন্তু একই পর্ব্বে পর পর দুইটির বেশী সামান্য অক্ষরের হ্রস্বীকরণ চলিবে না।

[২ক] শব্দের অন্তে হলন্ত অক্ষর থাকিলে তাহাকে দীর্ঘ ধরাই সাধারণ রীতি।

উপরি-লিখিত নিয়মগুলিতে মাত্র একটা সাধারণ প্রথা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ছন্দের আবশ্যক মতই শেষ পর্য্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির হয়। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের সূত্র নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংস্কৃত পুথি*

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, সমালোচন ও প্রকাশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম মুখ্য কার্য্য হইলেও, পরিষৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ও অন্য বিষয়ের কীর্ত্তিকলাপ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। পরিষদের পুথিশালায় তাই প্রচুর বাঙ্গালা পুথির মধ্যে সংস্কৃত, আসামী, তিব্বতী, উড়িয়া ও হিন্দী পুথিও দেখিতে পাওয়া যায়। পরিষৎ-পুথিশালায় সংগৃহীত সংস্কৃত পুথির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। এ যাবৎ যতগুলি পুথি তালিকাভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৬৫২। কোন কোন স্থলে একাধিক গ্রন্থ একই পুথির মধ্যে এক সঙ্গে লিখিত হওয়ায় তাহা একই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, পরীক্ষিত ও তালিকাভুক্ত হয় নাই, এরূপ সংগৃহীত পুথির সংখ্যাও প্রায় দুই শত। এতদ্‌ব্যতীত, পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কর্ত্তৃক পরিষৎ-পুথিশালায় প্রদত্ত পুথিসংগ্রহের মধ্যেও কতকগুলি সংস্কৃত পুথি রহিয়াছে।

অন্যান্য পুথিসংগ্রহের ন্যায় পরিষদের এই সংস্কৃত পুথিসংগ্রহেও প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, সুলভ দুর্লভ নানারকম পুথি আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থসঙ্কলয়িতা প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা সুধীগণের স্ব স্ব সংগৃহীত ও পরিষদে প্রদত্ত রত্নসম্ভারে এই সংগ্রহ সুসমৃদ্ধ। সম্প্রতি পরিষৎকর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে আমি এই সংগ্রহের বিষয়ানুক্রমিক বিবরণপূর্ণ তালিকা সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই কার্য্যে পরিষদের পুথিশালার কর্ম্মচারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। সে জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষদের পুথিসংগ্রহের যে সকল পুথি অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত বলিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ হইয়াছে, কেবল তাহাদেরই কিঞ্চিৎ বিবরণ আমি এই প্রবন্ধে প্রদান করিব।

অক্ষর

পরিষৎসংগৃহীত সংস্কৃত পুথিগুলির অধিকাংশই বাঙ্গালা দেশের; সুতরাং বঙ্গাক্ষরে লিখিত। তবে নাগরাক্ষরে লিখিত পুথির সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুথির মধ্যে কতকগুলি বৈদিক পুথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গাক্ষরে লিখিত উপনিষদের পুথিই সাধারণতঃ পাওয়া যায়। পরিষদের পুথিশালায় কিন্তু বঙ্গাক্ষরে লিখিত সংহিতা ও সূত্রাদির কয়েকখানি পুথিও রহিয়াছে। এই সকল পুথি এবং গুণবিষ্ণুকৃত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য (১০৪৯, ১৪৪), রামকৃষ্ণকৃত 'মন্ত্রকৌমুদী' (১০২৮), হলায়ুধকৃত 'নবগ্রহমন্ত্রব্যাখ্যা' (১৩২৪) প্রভৃতি একাধিক বঙ্গীয়-পণ্ডিত-রচিত বৈদিক মন্ত্র ব্যাখ্যার গ্রন্থ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, বাঙ্গালা দেশে বেদালোচনার অত্যন্ত অভাব ছিল না।

---

* ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রাচীনতা

বাঙ্গালা দেশে খুব বেশী প্রাচীন পুথি পাওয়া যায় নাই, প্রাচীন পুথির আলোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় যতগুলি প্রাচীন সংস্কৃত পুথি আছে, তাহাদের মধ্যে মহাভারত আদিপর্ব্ব (১২৭৩) একখানি ও রঘুবংশ একখানি প্রাচীনতম। মহাভারতের পুথিখানি ১৪২২ শকাব্দায় (১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত।[১] রঘুবংশের পুথিখানির নকলের তারিখ ১৪৫২ শক (১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ) ৩রা ভাদ্র। ইহা ছাড়া, শক অব্দের ষোড়শ শতকের আরও কয়েকখানি পুথিও আছে।

বেদ

বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে বাজসনেয়িসংহিতা দীর্ঘপাঠ, শ্রৌতাধান সাম, আনন্দবোধকৃত কাণ্ববেদমন্ত্রভাষ্যসংগ্রহ, শুক্লকুসুমশাখীয় অগ্নিহোত্রযজ্ঞপ্রমাণ ও প্রয়োগ (৫৪৪), দেবীসূক্ত, পুরুষসূক্ত ও রুদ্রাধ্যায়ের ব্যাখ্যা, জগন্নাথকৃত ঋগ্‌বেদসর্বানুক্রমণীবিবরণ, মাধবাচার্য্যের ছান্দসিকাবিবরণ (২৭৬), প্রণবাধ্বকল্প (১৪৭), বজ্রসূচ্যুপনিষৎ (১১৯৬), বিভিন্ন উপনিষদের কয়েকখানি টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

'শতপথরহস্য দেবীসূক্তের' বিদ্যারণ্যস্বামিকৃত ব্যাখ্যার রামানন্দকৃত সংগ্রহের দুইখানি পুথি (২২৪, ৫৭৮) পরিষদে আছে। এই গ্রন্থের পুথি অন্যত্র কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, রামানন্দ তাঁহার যথার্থমঞ্জরী[২] নামক গ্রন্থে স্বকৃত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে দেবীসূক্তটীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

রুদ্রাধ্যায়ের একখানি বেনামী ব্যাখ্যার পুথি (১৮৯) পরিষদে আছে। ব্যাখ্যাকার মঙ্গলাচরণে কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়াছেন।[৩] ইনি লিখিয়াছেন—'হলায়ুধ ও গুণবিষ্ণু যে সকল প্রসিদ্ধ মন্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই, আমি সেইগুলি ব্যাখ্যা করিতেছি।[৪]

গুণবিষ্ণুকৃত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের কয়েকখানি পুথি পরিষদে আছে। ইহাদের মধ্যে ১০৪৯ সংখ্যক পুথিতে গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে 'মন্ত্রব্যাখ্যান'। পুথিখানি অত্যন্ত জীর্ণ। ১৪৪ সংখ্যক পুথিতে গ্রন্থশেষে নিম্ননির্দ্দিষ্ট শ্লোকটী পাওয়া যায়।[৫] সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থের যে মনোরম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই শ্লোকটী পরিবর্ত্তিতরূপে একখানি পুথিতে গ্রন্থপ্রারম্ভে পাওয়া গিয়াছে।

১। সদ্‌গোষ্ঠীপতিসৎপণ্ডিতশ্রীমৎসনাতনসুবুদ্ধিমিশ্রসচ্চরিতে(?)র্মহাভারতমাদিপর্ব্বেতি। বৈদ্য-শ্রীকমলাকরদাসেন লিখিতমিদমিতি। শুভমস্তু শক[কা]ব্দা ১৪২২ আশ্বিন দিনে ১৬ ভৌমিবাসরে॥

২। রাজেন্দ্রলাল মিত্র—*Notices of Sanskrit Manuscripts* (এই গ্রন্থ অতঃপর 'মিত্র' এই সংক্ষিপ্ত নামে সূচিত হইয়াছে)—২। ১০২৭

৩। আনন্দমূর্ত্তিং ব্রজসুন্দরীণাং নেত্রোৎসবং নন্দকিশোরমস্তঃ।
নিধায় গূঢ়ার্থপদানি পদ্যাস্তশেষতঃ কশ্চিদভিব্যনক্তি॥

৪। হলায়ুধেন যে কাণ্বে কৌথুমে গুণবিষ্ণুনা।
ব্যাতা ন মন্ত্রা ব্যাখ্যাতাস্তান্ ব্যাখ্যাতুমিহোদ্যমঃ॥

৫। তত্তদর্থপ্রয়োগার্থং পাঠস্খলনভীরুণা।
গুণবিষ্ণুনা ছান্দোগ্যমন্ত্রোদ্ধারো বিধীয়তে॥

শ্রৌতাধানসাম (৮৩১) গ্রন্থে সামশাখীয় ও কাত্যায়নশাখীয় যজমানের পক্ষে লাট্যায়ন ও কাত্যায়নসূত্রানুসারে আধানসামগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নীলকণ্ঠ-কৃত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ব্যাখ্যার (২৬১) নাম নীলকণ্ঠী। এই গ্রন্থখানি অনালোচিত-পূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধে দেবতা, গুরু ও পিতামাতাকে প্রণাম করিয়াছেন। তিনি হরপার্ব্বতীর তৃপ্তির জন্য এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[১] শাঙ্কর ভাষ্য ও বার্ত্তিক আলোচনা করিয়া তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইনিই বোধ হয়, বিখ্যাত শৈব পণ্ডিত নীলকণ্ঠ। গ্রন্থারম্ভে এই উপনিষদের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের সম্বন্ধ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৯৩৬ সংখ্যক উপনিষৎ পুস্তকে টীকাকারের নামের উল্লেখ নাই। গ্রন্থারম্ভে একটী মঙ্গলাচরণ-শ্লোক আছে। উহাতে গ্রন্থকার গুরুকে ও ঢুণ্ঢিরাজকে নমস্কার করিয়াছেন।[২]

বজ্রসূচী উপনিষদে প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। হড্‌সন-কৃত ইংরেজী অনুবাদ সহ বজ্রসূচী ১৮৩৯ সালে ভূপালের পলিটিক্যাল এজেণ্ট এল্ উইল্‌কিন্‌সন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সঙ্গে সুবাজিবাপু-কৃত বজ্রসূচীর প্রত্যুত্তর 'লঘুটঙ্ক' নামক গ্রন্থও মুদ্রিত হইয়াছিল। উইল্‌কিন্‌সন-প্রকাশিত গ্রন্থ অশ্বঘোষ কর্ত্তৃক রচিত[৩] 'সূত্র', এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উইল্‌কিন্‌সন-প্রকাশিত গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র হইতে যত বচন-প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, পরিষদের পুথিতে তত নহে। পরিষদের পুথিতে অশ্বঘোষের নামগন্ধও নাই। বস্তুতঃপক্ষে বজ্রসূচীর রচয়িতার নাম লইয়া মতদ্বৈধ আছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা শঙ্করাচার্য্য-রচিত।

বেদের মন্ত্র অনেক স্থলে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। এই সমস্ত পরবর্ত্তী প্রয়োগের মধ্যে পরিষদের পুথিশালার পুরুষসূক্তের বেনামী টীকায় (১১৭৮) উক্ত বিনিয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরুষসূক্তের ঋক্‌গুলি সাধারণতঃ শালগ্রামশিলার স্নানে ব্যবহৃত হয়। এই টীকায় নরসিংহপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া

১। কাশীনাথগুরুং নত্বা শ্রীধরাখ্যগুরুং তথা।
শ্রদ্ধয়া সংযুতো ভাষ্যবার্ত্তিকে হ্যবলোক্য চ ॥৬॥
মাধ্যন্দিনীয়শাখায়াং বৃহদারণ্যকাভিধা।
যা চাস্ত্যুপনিষন্মুখ্যা তস্যা ব্যাখ্যা যথামতি ॥৭॥
নীলকণ্ঠীতি নাম্নেয়ং কলকণ্ঠীরুতোপমা।
শিতিকণ্ঠশিবাপ্রীত্যৈ নীলকণ্ঠেন তন্যতে ॥৮॥

গ্রন্থের শেষ পুষ্পিকা এইরূপ,—

ইতি শ্রীশৈবোপনামকরঙ্গনাথসুতলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠকৃতে মাধ্যন্দিনীয়শাখাস্থবৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ব্যাখ্যানে নীলকণ্ঠ্যাং ষষ্ঠঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ॥

বারাণসীপুরে তুলসীরাম এই গ্রন্থ লিখিয়া বিক্রয় করিয়াছিলেন, সে কথা স্পষ্টভাবে গ্রন্থান্তে স্বীকৃত হইয়াছে।

২। ধ্যাত্বা গুরুপদদ্বন্দ্বং ঢুণ্ঢিরাজং প্রণম্য চ।
টীকা তলবকারীয়বিবৃতেঃ ক্রিয়তে মুদা॥

৩। অশ্বঘোষো বজ্রসূচীং সূত্রয়ামি যথামতম্।

নরমেধে ইহার বিনিয়োগ, এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।[১] বোম্বাই গোপালনারায়ণ কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত নরসিংহপুরাণে (৬২।৯) টীকোক্ত বচনের প্রতীক পাওয়া যায় বটে, তবে তাহাতে নরমেধের কোনও উল্লেখ নাই। সেখানে নারায়ণপূজায় প্রতি ঋকের উপযোগ দেখান হইয়াছে। গুণবিষ্ণু-কৃত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যে (সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ—পৃঃ ১১৮) এই সূক্তের দুইটি বিনিয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বিনিয়োগ নরমেধ যজ্ঞে।

বেদের অনেক বিষয়ের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক রূপ পাওয়া যায়। রুদ্রযামলান্তর্গত এক দেবীসূক্তের পুথি পাওয়া গিয়াছে।[২] উড্ডামর তন্ত্র ও মার্কণ্ডেয়পুরাণের অংশবিশেষ দেবীসূক্ত নামে পরিচিত।[৩] পরিষদের পুথিশালায় বৃহন্মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীসূক্তের এক পুথি (৩২৫) পাওয়া গিয়াছে। এই সূক্তটি ছয়টি মাত্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। এইগুলি কোন বিরহিণীর বা কুমারীর উক্তি বলিয়া মনে হয়। পতির নিকট যাইবার বা পতিলাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষা ইহাদের মধ্যে সুব্যক্ত। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী স্তবকারিণীকে পতি দান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখও এই সূক্তমধ্যে আছে।[৪]

তন্ত্র

তন্ত্রের পুথির মধ্যে অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব্ব বা অল্পজ্ঞাত পুথি রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুর্লভতন্ত্র, বালাবিলাসতন্ত্র, ব্রাহ্মণচিন্তামণিতন্ত্র, বৈবস্বততন্ত্র, বিশ্বসারোদ্ধার, শ্রীরাসতন্ত্র, পূর্ণাভিষেকামৃততন্ত্র (১৪১৬), বৃহদ্‌যোনিতন্ত্র, বৃহদ্‌ভূতডামরতন্ত্র, বৃহদ্‌-গৌতমীয়তন্ত্র, কাকচণ্ডেশ্বরীতন্ত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'নিগমলতা' নামক গ্রন্থে বীরাচারের গৌরব-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে শিবের কুচনী-সংসর্গের আভাস দেওয়া হইয়াছে।[৫] তন্ত্রশ্রেণীর মধ্যে ঈশান-সংহিতা নামক গ্রন্থখানি (৮০৪) কৌতুকপ্রদ। এখানিকে শিবের ষষ্ঠ আনন হইতে বিনির্গত বলা হইয়াছে। পুষ্পিকার মতে এখানি কুলার্ণবীয় গুপ্তাম্নায়ের অন্তর্গত। পরন্তু ইহার আলোচ্য বিষয়—বৈষ্ণবধর্ম্ম, শ্রীগৌরাঙ্গের

১। পুরুষমেধপ্রাক্ক্ষণীয়-(প্রোক্ষণীয়—গুণবিষ্ণু)পুরুষস্তুতৌ বিনিয়োগঃ আদাবাবাহয়েদ্দেবমিত্যাদি নরসিংহপুরাণবচনাৎ।

২। Catalogus Catalogorum—২।৫৬

৩। তত্র রাত্রিসূক্ত দেবীসূক্তে দ্বিবিধে বেদোক্তে তন্ত্রোক্তে চ। ... ... তান্ত্রিকং তু রাত্রিসূক্তং সপ্তশত্যাং প্রথমাধ্যায়ে বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীমিত্যাদি পঠিতরূপম্। দেবীসূক্তং তু নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ ইতি পঞ্চমাধ্যায়পঠিতরূপম্। যদ্বা উড্‌ডামরতন্ত্রোক্তসহস্রাক্ষরমন্ত্ররূপম্ দেবীসূক্তম্।

—সরযূপ্রসাদ দ্বিবেদিকৃত সপ্তশতীসর্ব্বস্ব—পৃঃ ৮-৯।
(—Lucknow—Nawal Kisor Press, 1916)

৪। কাপি স্ত্রী পতিলাভায় দেবীং সংস্তৌতি নামভিঃ।

... ...

অতোঽহং পূজয়ামি ত্বাং নয় মাং পত্যুরন্তিকম্।
ইতি দেবী স্তুতা তস্যৈ পতিং দত্ত্বা তিরোদধে ॥৫॥
পুরা কোচবধূসঙ্গাদ্‌বীরাচারং ভবান্ কৃতঃ। (পত্র—২ক)

পরম উৎকর্ষ প্রভৃতি। ইহার একখানি মাত্র পুথি ইতঃপূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় কর্তৃক বিবৃত হইয়াছিল।[১]

কাকচণ্ডেশ্বরীতন্ত্র (৫৫৭) নামক গ্রন্থখানির একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালদরবার লাইব্রেরীর পুথির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে ইহার একখানি পুথির অতি সংক্ষিপ্ত এক বিবরণ দিয়াছিলেন।[২] পরিষদের পুথিতে ১৪টী পটল আছে। পুথিখানি ১২৩৬ সালে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া শনিবারে বারাণসী পুরীতে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। ইহার বিষয়বিভাগ এইরূপ—

৪ ক—প্রথম পটল, ৬ ক—দ্বিতীয় পটল, ৭ খ—তৃতীয় পটল, ৯ ক—ত্রৈলোক্য-সুন্দরী গুটিকা, ১৩ খ—চতুর্থ পটল, ১৬ খ—নিখিলসারনামে পঞ্চম পটল, ১৭ খ—ষষ্ঠ পটল, ১৯ ক—জারণ নামে সপ্তম পটল, ২০ ক—শাল্মলী কল্প, ২০ খ—ব্রহ্মদণ্ডিকল্প, ২২ খ—কাকচণ্ডেশ্বরী কল্প ২৩ খ—রণগন্ধগুলি তৈল, ২৪ ক—হরীতকী ব্রহ্মকল্প, ২৪ খ—পোটলিপারা রসেন্দ্র নামে অষ্টম পটল, ২৬ ক—জলৌকাসিদ্ধি নামে নবম পটল, ২৭ খ বিবর নামে ১০ম পটল, ৩১ খ—একাদশ পটল, ৩৩ খ—তালকেশ্বর নামে দ্বাদশ পটল, ৩৪ খ—লব্দসূতক নামে ত্রয়োদশ পটল (সূতভক্ষণমন্ত্র, শাল্মলীচ্ছেদন মন্ত্র), ৩৫ খ—মহারসায়ন নামে চতুর্দ্দশ পটল।[৩]

ব্রাহ্মণচিন্তামণিতন্ত্র (২৯৯) নামক গ্রন্থে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[৪] ইহা ১৪ পটলে সমাপ্ত। এই পটলগুলিতে যথাক্রমে (১) প্রাতঃকৃত্য, (২) সন্ধ্যা ও তর্পণ, (৩) সন্ধ্যা-মন্ত্রব্যাখ্যা, (৪) গায়ত্রীশতনাম, (৫) গায়ত্রীকবচ, (৬) গায়ত্রী-শাপোদ্ধার ও উপনিষৎ, (৭) গায়ত্রীমাহাত্ম্য ও গায়ত্রীতত্ত্ব, (১১) নিত্যলিঙ্গার্চ্চন, (১২) বিশ্বরহস্য, (১৩) বিষ্ণুপূজাবিধান, (১৪) তুলসীরহস্য—এই বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় পটল গদ্যে লিখিত।

শাম্ভবীতন্ত্র নামক গ্রন্থের চৌদ্দ পটল এবং পঞ্চদশ পটলের কিয়দংশ পরিষদের পুথি-শালায় আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবী শিবকে প্রাণত্যাগের ভয় দেখাইয়া শাম্ভবী দেবীর স্বরূপাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।[৫] দেবীর অন্নদাতৃত্বের উপাখ্যান বর্ণনার পরে

১। মিত্র—১।৮২৪

২। A Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal—১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫ প্রভৃতি।

৩। কিছুদিন হইল, কাশী সংস্কৃতসিরিজে কাকচণ্ডীশ্বরকল্পতন্ত্র নামে এই জাতীয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের পুথির মত ইহা হরপার্ব্বতীসংবাদরূপে নিবদ্ধ নহে। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনা-লেখক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ শর্ম্মার মতে ইহার প্রচারক কাকচণ্ডীশ্বর নামক সিদ্ধ।

পরিষৎ-পুথিশালার দত্তাত্রেয়তন্ত্র (৪৯৭) নামক পুথিতে যন্ত্রমন্ত্র ও অভিচারের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে কালচণ্ডীশ্বরমত তন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। কালচণ্ডীশ্বর ও কাকচণ্ডীশ্বর বোধ হয় অভিন্ন।

সন্তি নানাবিধানেকযন্ত্রমন্ত্রাভিচারকাঃ। আ......ডডীশেমদিতন্ত্রেচ কালচণ্ডীশ্বরে মতে। রাধাতন্ত্রে চ উচ্ছিষ্টে রাধাতন্ত্রে মৃত্যেশ্বরে॥

৪। দেবদেব মহাদেব সর্ব্বজ্ঞানমহেশ্বর।
ব্রাহ্মণানুষ্ঠানং দেব কৃপয়া কথয়স্ব মে॥

৫। শাম্ভবীতি সদানাথ কথং বদসি হে প্রভো।
কা বা সা শাম্ভবী দেবী তব কিং বা কৃতং তয়া॥
তৎ সর্ব্বং কথয়স্বাস্তু নো চেৎ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে॥—(১ক)

পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। এক স্থলে বীর, পশু প্রভৃতির পূজার প্রকারভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

বীরাণাং মানসী পূজা অন্যেষাং কায়িকী মতা।
যাবৎ পুরস্ক্রিয়া ন স্যাৎ তাবদ্ বৈ পাশবং মতম্ ॥—৮ ক।

পূর্ণাভিষেকামৃত নামক তন্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট দশমহাবিদ্যোৎপত্তি-প্রকরণে দেবীর বিভিন্ন নামের সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিগমলতা এবং নিগমকল্পদ্রুম (১৩১২) একজাতীয় গ্রন্থ। ইহারা নিগম; অতএব দেবী কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট উক্ত এবং পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ ইহাদের উদ্দেশ্য।

যোগসার তন্ত্রের (১৩১৩) চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের পুথি পরিষদে আছে। মনে হয়, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদেই গ্রন্থ শেষ। ইহা নিগমশ্রেণীর গ্রন্থ; দেবী কর্ত্তৃক শিব-সমীপে কথিত। কোন কোন পুষ্পিকায় ইহাকে শক্তসাহস্রী সংহিতা বলা হইয়াছে। ইহাতে হৃৎপদ্ম প্রভৃতি শরীরের বিবিধাংশ এবং তত্রত্য দেবাদির পূজা বর্ণিত হইয়াছে। নবম পরিচ্ছেদে জ্ঞানের প্রশংসা-প্রসঙ্গে যাহা উক্ত হইয়াছে, তান্ত্রিক দর্শনের দিক্ দিয়া তাহা প্রণিধানযোগ্য।[১]

মারণ, উচ্চাটনাদি বিবিধ কৃত্যের বর্ণনায় পরিপূর্ণ বীরভদ্র তন্ত্র অষ্টাদশ পটলে সমাপ্ত (১৩৯০)।

ভূতশুদ্ধিতন্ত্র (১৩০৩) ১৩ পটলে সমাপ্ত। নবম পটলে আগমের প্রশংসা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, বেদ, পুরাণ, চতুর্দ্দশ বিদ্যা ও দর্শনাদি আগম হইতে উৎপন্ন। দশম পটলে শক্তির সর্ব্বব্যাপকত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।[২] ভূতশুদ্ধি, ন্যাস ও প্রাণায়ামের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা গ্রন্থারম্ভে উক্ত হইলেও ইহাদের সম্বন্ধে তেমন বিশেষ আলোচনা গ্রন্থমধ্যে নাই।

স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে অনেক সময় এক অথবা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত নামে সম্পূর্ণ বা ঈষৎ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচলিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌খানি বা কতটুকু আসল, কোন্‌খানি বা কতটুকু নকল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে এ জাতীয় সমস্ত গ্রন্থের বিবরণ একত্র সংগৃহীত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই। তাই, পরিষদের পুথিশালায় তন্ত্রবিভাগে এ জাতীয় যতগুলি গ্রন্থ আছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। ক্রিয়াযোগাদ্‌জ্ঞানসিদ্ধির্জ্ঞানাদ্ধি যোগসিদ্ধিভাক্।
... ...
ব্রহ্মাণ্ডোদরতীর্থানি শরীরেঽস্তি কুলেশ্বর ॥
ব্রহ্মাণ্ডে যে স্থিতা দেবাস্তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
তদ্‌গুণং তদ্রূপং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা যোগং সমভ্যসেৎ ॥
শরীরমপি ব্রহ্মাণ্ডং যো বেত্তি চ স যোগবিৎ।
স যোগী নাপরঃ কোঽপি যো বেত্তি সচরাচরম্ ॥

২। শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবি শক্তিঃ সর্ব্বত্র বিদ্যতে।
... ...
বনমালাদিকং দেবি বিকোর্থদ্ যৎ শুচিস্মিতে।
তৎ সর্ব্বং পরমেশানি শক্তিরূপং ন চান্যথা ॥—(১৩ক)

কুলার্ণবের প্রচলিত পুথি বা সংস্করণগুলি সপ্তদশ উল্লাসে সমাপ্ত। পরিষদে দুইখানি পুথিতে অষ্টাদশ উল্লাসেরও অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ৬১২ সংখ্যক পুথিতে সপ্তদশ উল্লাসের পরে পঞ্চদ্রব্য দ্বারা উপাসনার প্রয়োজনীয়তা এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগিতার কথা বলা হইয়াছে।১

৯২৪ সংখ্যক পুথিতে অষ্টাদশ পটলের শেষ অংশটুকু মাত্র আছে। এই অংশে পঞ্চ-মকারের পরম উপযোগিতা বর্ণিত হইয়াছে: কলির শেষে কুলাচারের কথঞ্চিৎ পরাভব ও কুলাচারের সহিত বৈষ্ণব ভাবের মিলনে সিদ্ধির আতিশয্যের সম্ভাবনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।২

বৃহদ্‌ভূতডামর তন্ত্র (১৩৯৪) উন্মত্ত-ভৈরব ও উন্মত্তভৈরবীর কথোপকথনাকারে নিবদ্ধ। ইহাতে অলৌকিক বিবিধ সিদ্ধি লাভের উদ্দেশে সিদ্ধিচক্র, পক্ষভেদচক্র,

---

১। বারাণস্যাং মহাভাগে শিবশক্তিপরায়ণঃ।
একয়া মুদ্রয়া সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
অন্তর্বেদে প্রয়াগে চ মিথিলায়াং তথৈব চ।
মাগধে মেখলায়াঞ্চ মদ্যাৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
তত্র দেবাঃ প্রকুর্বন্তি ছিদ্রং মদ্যরসং বিনা।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু স্ত্রিয়া সিদ্ধির্ধ্রুবং ভবেৎ॥
তথা চ সিংহলাদৌ চ স্ত্রীরাজ্যে দ্রৌপদীকৃতে।
রাঢ়ায়াং মৎস্যমাংসৈশ্চ মুদ্রামঙ্গনয়াপি চ॥—১৫৬ (ক-খ)

১। কলৌ সিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং ভাবদ্রব্যৈস্তু পঞ্চভিঃ।
যাবদ্ বিদ্যা ন মে শপ্তা দ্রব্যৈশ্চৈব মনোরমে॥
ভবিষ্যতি কলেরব্দসহস্রদ্বিতয়ে গতে।
বিরূপাক্ষো মহাযোগী মম তুল্যপরাক্রমঃ॥
তেনৈব ত্র্যক্ষরী বিদ্যা জপ্তা সিদ্ধার্থমম্বিকে।
সুপ্তবন্তং হিত্বা সাধকাক্রান্তমানসা।
পরিবেশয়ন্তী রুদ্রাণী হঠাত্তু দর্শনং গতা।
ততঃ ক্রুদ্ধেন দেবেন শপ্তা বিদ্যা মহেশ্বরি।
সহস্রদ্বিতয়াস্তে চ পুনরন্যাং মনোহরাম্।
শঙ্করাখ্যো মহাযোগী সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনীম্॥
শপিষ্যতি বিশম্পস্তাং শাপং দত্বা সুদারুণম্।
জপিত্বা বৈষ্ণবং মন্ত্রং কৃষ্ণস্যাষ্টাদশাক্ষরম্॥
তেন সদ্যো ভবেৎ সিদ্ধিঃ শঙ্করোঽস্মাহমেবেব তু॥
তেন দেবি মহাবিদ্যে সর্বহীনে ভবিষ্যতঃ॥
ততঃ পরং দ্বিশতান্তে পঞ্চ পঞ্চাক্ষরং জপন্।
মম মন্ত্রপরো যস্তু বিষ্ণুমন্ত্রং জপেন্নরঃ॥
স পূর্ব্বকৃতপাপেভ্যো নির্মুক্তঃ স্যান্ন চান্যথা।
সর্ব্বথা মৈথুনে সিদ্ধির্যদি স্ত্রী স্যান্মনোরমা।
কার্য্যার্থং তত্র রমতে ন কামেন বরাননে॥
মৎস্যমৈথুনমাংসাদি চর ভোগাদিসাধনম্।
শৌরেস্তত্র বিরুদ্ধঞ্চ শৈবে শাক্তে মহৎ ফলম্।
যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তেনৈব বিষখণ্ডেন বিধিজ্ঞো নাশয়েদ্ বিষম্।
দধিনা সমভাগঞ্চ গুড়ং দত্বা দিনত্রয়ম্।
বদরীমূলসংযুক্তং দ্রব্যং ভবতি পার্বতি॥
ইতি কুলার্ণবে ... ... অষ্টাদশোল্লাসঃ।

কামভেদচক্র, সারনির্ণয়চক্র, বেদচক্র, কালচক্র প্রভৃতি নানা চক্রের বিস্তৃত বিবরণ আছে। নানা সাধনের কথাও ইহাতে আছে। গ্রন্থের শেষ পটলে দুর্গার সহস্রনাম-স্তোত্র। গ্রন্থ পঁচিশ পটলে সমাপ্ত। গ্রন্থপ্রারম্ভে বৃহদ্‌ভূতডামরকে নমস্কার করা হইয়াছে।[১] ভূতডামর তন্ত্রেও এইরূপ নমস্কার আছে (মিত্র ৪।১৫৯৮)।

'গোবিন্দবৃন্দাবনপরমরহস্য'—এই বিশেষণবিশিষ্ট বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র (১৫৮২) পঁচিশ পটলে সমাপ্ত। ইহাতে কৃষ্ণপূজা ও কৃষ্ণমন্ত্রানুসারে দীক্ষা, হোম প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। গৌতমীয় তন্ত্রের বিষয়ও অনেকটা এইরূপ।

ব্রহ্মা শিবের নিকট হইতে এই তন্ত্রোক্ত বিষয় শুনিয়াছিলেন। আবার তাঁহার নিকট হইতে ইহা শুনিয়া নারদ সুমেরুর উত্তর শৃঙ্গে পুণ্ডরীকপুরে সুখসমাসীন শৌনকাদি ঋষিদের নিকট ইহা বলিয়াছিলেন—গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থপ্রবৃত্তির এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। গৌতমের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

যোনিতন্ত্র (১৩৯০)ও বৃহদ্‌যোনিতন্ত্রের (১৩৮৯) মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তবে যোনিতন্ত্র আট পটলে এবং বৃহদ্‌যোনিতন্ত্র দশ পটলে সমাপ্ত। বৃহদ্‌-যোনিতন্ত্র গ্রন্থের শেষ পটলে ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র-বিবৃত (১।২৩৯) বৈষ্ণব সনৎকুমারতন্ত্র এগার পটলে সম্পূর্ণ। পরিষদে সনৎকুমারসংহিতা (২০৬) নামক গ্রন্থের ৩৬শ পটল পাওয়া গিয়াছে। ইহার বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণযুগলপ্রকাশ।

তন্ত্র সাধারণতঃ হরপার্ব্বতী বা অন্য দেবতার কথোপকথনরূপে প্রচলিত। দেবমুখ-নির্গত বলিয়াই তন্ত্রের প্রামাণ্য। কিন্তু কোন কোন স্থলে ঋষিবিশেষের সহিতও তন্ত্রের যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ যেমন ঋষিপরিদৃষ্ট—এইগুলিও সেইরূপ মহাদেবাদির নিকট হইতে সেই সেই ঋষিকর্ত্তৃক প্রাপ্ত। পরিষৎ-পুথিশালায় তাদৃশ গ্রন্থের মধ্যে দত্তাত্রেয়তন্ত্র ও সনৎকুমার-সংহিতা উল্লেখযোগ্য।

তান্ত্রিক স্তোত্রাদির মধ্যে মহিম্নঃ স্তোত্র, কর্পূরস্তব, উগ্রতারাসহস্রনাম স্তোত্র, আনন্দলহরীর গোবিন্দ তর্কবাগীশ-কৃত টীকা (৩৩৪), ভৈরবীতন্ত্রোক্ত শ্যামাকবচ (১০৬৮, ৩৯১, ৮৭৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পুষ্পদন্ত-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ মহিম্নঃ স্তোত্র ব্যতীত বিষ্ণু-প্রণীত শিবমহিম্নঃ স্তোত্র (৩০০)[২] ও গৌরপুষ্পদন্তাখ্য স্তব (২৫৩) নামক দুইটী স্তব এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গৌরপুষ্পদন্তাখ্যস্তোত্র—নিত্যানন্দচন্দ্র-রচিত গৌরাঙ্গের স্তব। পুষ্পদন্ত শব্দের অর্থ এখানে কি, তাহা বুঝা যায় না। শিবাষ্টকনামক প্রসিদ্ধ স্তবের অনুকরণে ইহা লিখিত।

মহিম্নঃ স্তবের টীকার মধ্যে আচার্য্য পরমানন্দ-কৃত টীকা (১৭১)[৩], বাচস্পতি-কৃত টীকা (১৭৮), স্তবকৌমুদীটীকা (১৬৪)[৪], ভগীরথ মিত্র-কৃত টীকা (৩৭১)[৫], রঘুনন্দন ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য-কৃত টীকা (১৪৮২) ও কয়েকখানি রচয়িতার নামশূন্য টীকা উল্লেখযোগ্য।

১। মহোগ্রং ব্যোমবদনং কোটিসূর্য্যাগ্নিভাস্বরম্।
মহাকালান্তকং নৌমি শ্রীবৃহদ্‌ভূতডামরম্॥

২। মিত্র—৮।২৬০৫। ৩। মিত্র—৯।৩১৬৮। ৪। মিত্র—১০।৩৫৮৪। ৫। মিত্র—৩।১০৬৫।

পরমানন্দের মতে পুষ্পদন্ত দক্ষিণাপথের শান্তিকর্ণি রাজার বাগান হইতে ফুল তুলিয়া বিপদে পড়িয়াছিলেন। পরিষদের পুথিশালার স্তবকৌমুদীটীকার পুথিতে রচয়িতার কোনও নাম নাই।[১] রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বর্ণিত এবং সংস্কৃত কলেজের পুথিশালায় রক্ষিত পুথিতে রচয়িতার নাম গোবিন্দানন্দ। 'কৌমুদী' নাম দৃষ্টে ইহাকে স্মৃতিকৌমুদী গ্রন্থের রচয়িতা গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে। পরিষদের পুথিশালার ১৫০২ সংখ্যক পুথিখানিও স্তবকৌমুদীর; কেবল শেষের দুই একটী শ্লোকে একটু পার্থক্য আছে। তবে তাহাতে টীকার নাম নাই এবং টীকাকারের নাম দেওয়া হইয়াছে শঙ্করাচার্য্য।[২] এই পুথিতে ৩২শ শ্লোকের পর শেষ পত্রে চারিটী শ্লোক রহিয়াছে। তাহাতে পুষ্পিকার অন্তে "সুরভুজগমুনীন্দ্রৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি রহিয়াছে।

স্তবকৌমুদীতে সপ্তম শ্লোকের টীকায় অতি সংক্ষেপে বিবিধ দর্শনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই পরিচয়ের কয়েকটী কথা উল্লেখযোগ্য। স্তবকৌমুদীকারের মতে সাংখ্যের তত্ত্বসংখ্যা চতুর্বিংশতি, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র দত্তাত্রেয়-প্রণীত, এবং পশুপতিমত নন্দিকেশ্বর-প্রণীত।[৩] দত্তাত্রেয়ের সহিত যোগশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও এবং তিনি দত্তাত্রেয়-সংহিতাদি গ্রন্থের রচয়িতৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাঁহাকে অন্য কোথাও বোধ হয়, যোগশাস্ত্রের আদিপ্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই। নন্দিকেশ্বর মুনির নামও নন্দিকেশ্বর-সংহিতা, নন্দিকেশ্বরোপপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পাশুপত শাস্ত্র স্বয়ং পশুপতিমুখবিনির্গত বলিয়াই অন্যত্র প্রসিদ্ধ।

মহিম্নঃ স্তোত্রের শ্লোকের সংখ্যা লইয়া গোলমাল আছে। ৩১শ শ্লোকের টীকার পর টীকাকার বাচস্পতি লিখিয়াছেন,—

"কুসুমদশননামেত্যাদিশ্লোকদ্বয়ং টীকাকারৈরধৃতমপি ময়া ব্যাখ্যায়তে।"

ইহা হইতে বুঝা যায়, 'কুসুমদশননামা' ইত্যাদি শ্লোক বোধ হয়, প্রাচীন কালে এই স্তোত্রের অন্তর্গত ছিল না। তখন ইহার রচয়িতৃরূপে কাহার নাম প্রসিদ্ধ ছিল, কে বলিবে? ৩৭০ সংখ্যক পুথির টীকাও ৩১শ শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে—ইহাতেও কুসুমদশন-নামা প্রভৃতি শ্লোক নাই।

১। ক্রিয়তে শ্রীমতা তাতপাদরেণূপদেশতঃ।
কেনচিৎ কৃতিনা শম্ভোর্মহিম্নঃ স্তবকৌমুদী ॥

২। ইতি শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতা মহিম্নটীকা সমাপ্তা। শঙ্করভগবৎপাদকর্তৃক এই টীকা রচিত হইয়া থাকুক বা না থাকুক, মহিম্নঃ স্তব যে খুব প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় শৈবকাব্যের উদাহরণ দিবার প্রসঙ্গে মহিম্নঃ স্তোত্র হইতে শ্লোক তুলিয়াছেন।

৩। মতভেদেন বিবিধমীশ্বরং বদন্তি। তত্র যজ্ঞেশ্বরমিতি বেদবিদঃ আদিবিদ্বাংসমিতি সাংখ্যাঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকমিতি পাতঞ্জলাঃ পশুপতিরিতি পাশুপতাঃ পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ। ... ... ত্রয়ী বেদত্রয়ং তত্র যজ্ঞেশ্বর এব বোধনীয়ঃ যজ্ঞাদেব মোক্ষ ইতি বিবেচনাৎ। সাংখ্যং কপিলমুনিপ্রণীত-শাস্ত্রং যত্র মহদাদিচতুর্বিংশতিতত্ত্বানি খ্যাতানি। প্রকৃতিপুরুষয়োর্ভেদ ইতি কথনম্। যোগঃ পাতঞ্জল-শাস্ত্রং দত্তাত্রেয়প্রণীতং যত্র ঈশ্বরঃ কুলালাদিকায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়ং প্রবর্ত্তয়তি। পশুপতিমতং নন্দিকেশ্বর-প্রণীতং শাস্ত্রং যত্র পার্ব্বতীশঃ শরীরী পশুপতিরেবেশ্বরো ব্যজ্যতে তৎসারূপ্যপ্রাপ্তিরেব মোক্ষ ইতি বিবেচনম্।

বাচস্পতি ও রঘুনন্দন ন্যায়বাগীশ-কৃত টীকার পুথি অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। ইহাতে হরি ও বিষ্ণু, এই দুই পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বাচস্পতি সন্ন্যাসি-কৃত বিবিধ ব্যাখ্যার সার সঙ্কলন করিয়া এই টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন।[১]

রঘুনন্দন খুব প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তিনি পূতিতুণ্ডিবংশ-সম্ভূত।[২]

ভগীরথ মিশ্রের টীকার নাম 'দয়িতা'। এই ভগীরথ বিবিধ কাব্যগ্রন্থের টীকাকার।[৩] ৩৭০ সংখ্যক পুথিতে টীকাকারের নাম নাই; কিন্তু নকলের তারিখ দেওয়া আছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, উহা ১৬৮৯ শকে লিখিত। এই পুথিতে ৩১টি শ্লোক আছে—'কুসুমদশননামা' প্রভৃতি শ্লোক ইহাতে নাই। ৭ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় যোগ শব্দের অর্থ বৈশেষিক দর্শন করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে—বৈশেষিকগণ যোগ ধর্ম্মে শিবের আরাধনা করিয়া থাকেন।[৪]

আনন্দলহরীর গোবিন্দতর্কবাগীশ-কৃত টীকার (৩৩৪) এক খণ্ড আউফ্‌রেখ্‌ট্ উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] ৩৩শ শ্লোকের টীকায় গৌড়ীয় ও দাক্ষিণাত্য ব্যাখ্যার পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। টীকাকারের কোনও মঙ্গলাচরণ পরিষদের পুথিতে নাই।

শ্যামাকবচের তিনখানি পুথির (১০৬৮, ৩৯১, ৮৭৭) মধ্যে একখানিতে ইহাকে ভৈরবীতন্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকে এবং অপর দুইখানি পুথিতে ইহাকে ভৈরবতন্ত্রোক্ত বলা হইয়াছে। ৮৭৭ সংখ্যক পুথিতে বোধ হয়, লিপিকর-প্রমাদ-বশতই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—ত্রৈলোক্যমঙ্গল।

কয়েকটি স্তোত্র প্রভৃতির আকরের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাতে কয়েকটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব নাম, প্রচলিত তন্ত্রের নূতন নূতন আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় এবং এ সম্বন্ধে বিস্তর আকরের মতভেদের আভাস পাওয়া যায়। তবে কথা এই যে, সকল সময় নামনির্দ্দেশ খুব বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। ৪৮৬ সংখ্যক পুথিতে জগন্মঙ্গল কবচকে চিন্তামণিতন্ত্রান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার ১১৯৪ সংখ্যক পুথির মতে ইহা ভূতশুদ্ধিনামক তন্ত্রের অন্তর্গত। যুগলাষ্টশত নামক রাধা ও কৃষ্ণের

১। তিষ্ঠন্তি যদি সন্ন্যাসিকৃতা ব্যাখ্যাঃ পরঃ পরম্।
তাসাং সারং সমাকৃষ্য দ্বিধেদানীং প্রতন্যতে॥

২। যঃ পূততুণ্ডিকুলপঙ্কজজন্মবাসো
যো ভারতীচরণসেবকদাসদাসঃ।
যন্নাম লোকবিদিতং রঘুনন্দনেতি
সোঽয়ং তদীয়বচনং বিশদীকরোতি॥
(তদীয়বচনম্=পুষ্পদন্তবচনম্)

৩। যঃ পীতমুণ্ডিকুলভূষণমগ্রজন্মা
মাঘাদিকাব্যনিবহস্য চকার টীকাঃ।
স শ্রীভগীরথকবির্দ্দয়িতাভিধানাম্
এতাঞ্চ মন্দমতিবোধকরীং করোতি॥

৪। যোগো বৈশেষিকদর্শনম্ অধ্যাত্মবিদ্যা।......বৈশেষিকা ইতি ষট্‌পদার্থজ্ঞানাদবিচ্ছিদ্যমানাত্মনি (?) তত্ত্বতো জ্ঞাতে সমাধিসমাপকোক্তযোগধর্ম্মেণ ত্বামারাধ্য..........আত্যন্তিকং দুঃখচ্ছেদং নিঃশ্রেয়সং গিরন্তে।

৫। মিত্র ১০।৩৩৭৩

অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র (১০১৭)[১] বৈবস্বততন্ত্রান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যুগলকিশোরাখ্য রাধাকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র (৯৬৭) শ্রীরাসতন্ত্রান্তর্গত।[২]

এইরূপ রাধিকাসহস্রনাম সনৎকুমারতন্ত্রান্তর্গত (২০৫), অন্নপূর্ণাস্তোত্র শাম্ভবীতন্ত্রান্তর্গত (৫৩৪), বগলামুখীকবচ বালাবিলাসতন্ত্রান্তর্গত (১১৯২), উগ্রতারাসহস্রনামস্তোত্র তারাতন্ত্রান্তর্গত (১২৪৬), দুর্গানামপুরশ্চরণবিধি দুর্লভতন্ত্রান্তর্গত (২৩১)।

কর্পূরস্তবের আকর ও রচয়িতা লইয়া তর্ক আছে। ইহা সাধারণতঃ মহাকালবিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। একখানি পুথিতে ইহাকে আদিনাথকৃত মহাকালসংহিতার অন্তর্গত বলা হইয়াছে (Catalogus Catalogorum, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯১)। পরিষদের একখানি পুথির (১০৬৮) মতে ইহা বীরতন্ত্রের শ্যামাকল্পের অন্তর্গত এবং মহাকালবিরচিত। পরিষদের বীরতন্ত্র নামক পুথির (১৪০৯) ষষ্ঠ পটলে মহাকাল ভৈরবকর্ত্তৃক এই স্তোত্র উক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় (১৪খ—১৬খ পত্র দ্রষ্টব্য)। পরিষদে নন্দরামকৃত কর্পূরস্তবের টীকার দুইখানি পুথি আছে। ইহার আর একখানি পুথি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার সংস্কৃত পুথির তালিকায় বিবৃত হইয়াছিল।[৩]

রুদ্রযামলান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, প্রকাশিত রুদ্রযামলগ্রন্থে অপ্রাপ্ত সদাশিবকবচ (২০৮), শিবসহস্রনামস্তোত্র (৫১০), ভবানীসহস্রনামস্তোত্র (১৬০০), বংশকবচ (৪৩৩), বগলামুখী-কবচ (৮০১), কুণ্ডলীশক্তিস্তোত্র (৮১০), কালীকবচ (৪২৭), অন্নপূর্ণাসহস্রনাম স্তোত্র (৫০০) প্রভৃতি স্তোত্রকবচ, ও রুদ্রচণ্ডী (৭২৫), রুদ্রচণ্ডীকবচ ও ধ্যান (১১৪৮), দুর্গানামমাহাত্ম্য (৩৮৩), রসকল্প (১০৮৩), ষট্‌চক্রপ্রপঞ্চ (১২১২) প্রভৃতি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ষট্‌চক্রপ্রপঞ্চ কার্ত্তিকেয়-মহাদেবসংবাদরূপে নিবদ্ধ। এই বিষয়গুলি রুদ্রযামলের পূর্ব্বভাগের অন্তর্গত কি না, তাহা বলিবার উপায় নাই। পূর্ব্বভাগের কোনও পুথি এ যাবৎ কোথাও পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা ছাত্রপুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত রুদ্রচণ্ডী প্রথম, মধ্যম, উত্তম ও তুরীয়, এই চারি অবচ্ছেদে সমাপ্ত। পরিষদের দুইখানি পুথিতে মাত্র একটী অবচ্ছেদ (উত্তম) আছে। তবে পুথিতে অবচ্ছেদের কোনও উল্লেখ নাই এবং উহা যে রুদ্রচণ্ডীর অংশমাত্র, তাহারও নির্দ্দেশ নাই।

১। ইহাতে রাধার নামগুলি রেফাদি এবং কৃষ্ণের নামগুলি ককারাদি। রাধার এক একটি নামের পর কৃষ্ণের এক একটি নাম দেওয়া হইয়াছে।

"কাদি রেফাদি নামেদং নামাষ্টশতকং প্রিয়ে।"

'রক্তপদ্মস্থিতা চৈব কামিনীকুঞ্জবাসনঃ। রক্তপদ্মাসনা কালীমন্ত্ররাজজপপ্রিয়ঃ।'

২। এই স্তোত্রে শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে কৃষ্ণের নাম ও পরার্দ্ধে রাধার নাম। যথা,—

নারায়ণো জগন্নাথঃ শ্রীবিষ্ণুঃ পুরুষোত্তমঃ।
জাম্বুবতী জগন্মাতা সত্যভামা সরস্বতী।—(২ক)

৩। Notices of Sanskrit Manuscripts—১ম খণ্ড, ৩১ সংখ্যক পুথি।

রুদ্রচণ্ডীর প্রারম্ভিক অংশ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইহার মুদ্রিত সংস্করণ হইতে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।[১]

রসকল্প (১০৮৩) রুদ্রযামলান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও ইহাকে অর্ব্বাচীন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার শিবকে নমস্কার করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে নানা স্থলে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের উল্লেখ আছে।[২] এক স্থলে গোবিন্দ নামক একজন আচার্য্যের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। উমা-মহেশ্বরসংবাদরূপে নিবদ্ধ এই গ্রন্থের বিভিন্ন উল্লাসে রসসঙ্কেত, রসশোধন, সত্ত্বপাতন, সর্ব্বলোহহৃতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে।

কুলার্ণবতন্ত্রান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব ঈশানসংহিতার কোনও খোঁজ কুলার্ণবের প্রচলিত পুথিতে বা সংস্করণে পাওয়া যায় না। তারাতন্ত্রান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট উগ্রতারা-সহস্রনামস্তোত্রও প্রচলিত তারাতন্ত্রে পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে এইরূপ আকর-নির্দ্দেশ ভ্রান্ত হইতে পারে সত্য—তবে কোন কোন স্থলে এইরূপ নির্দ্দেশ যে প্রচলিত পুথি বা সংস্করণের যথার্থই অসম্পূর্ণতা সূচিত করে না, তাহাই বা কে বলিবে ?

তান্ত্রিক নিবন্ধের মধ্যে তন্ত্রকৌমুদী (১৩৮১), শিবতাণ্ডবীয়াঙ্কযন্ত্রব্যাখ্যা (১৩৮০), শিবার্চ্চনতত্ত্ব (১০১৫), দামোদর-কৃত যন্ত্রচিন্তামণি (১০৯৮) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

১। মুনেন্দ্রস্তোপদেশেন মৃন্ময়ীং মধুমাসতঃ।
মূর্ত্তিং নির্ম্মায় তৌ পূজাঞ্চক্রতুর্বৎসরত্রয়ম্ ॥—প্রথমাবচ্ছেদ, পৃঃ ২৪।
পুনশ্চাসৌ শারদীয়ে শারদীয়ামিষে রমে।
অরণ্যো রঘুনাথোঽপি মহাপূজাং করিষ্যতি ॥—মধ্যমাবচ্ছেদ, পৃঃ ৩১।
এতাং চণ্ডীং জগদ্ধাত্রি ব্রাহ্মণস্তু সদা পঠেৎ।
নাত্যস্তু পাঠকো দেবি পঠনে ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥—উত্তমাবচ্ছেদ পৃঃ ৩৬।
ত্রিগয়াযাং ত্রিক শ্যাং বৈ যচ্চ পুণ্যং সমুত্থিতম্।—ঐ, ৩৮ পৃঃ।

২। শিবং নত্বা রসাধীশং চণ্ডিকাচরণং তথা।
করোমি রসকল্পোঽয়ং রসজ্ঞানবিশারদম্ ॥
... ...
ইত্যাদয়শ্চোপরসাঃ সর্ব্বাচার্য্যৈরুদীরিতাঃ।
... ...
কংকুষ্ঠাদীন রসান্ কেচিদাচার্য্যা বর্ণয়ন্তি বৈ।
অস্মাভিরিহ তন্ত্রোক্তং মুনিমার্গানুসারিভিঃ ॥
... ...
ইত্যেষ প্রোদিতো মার্গো রসশোধন কর্ম্মণি।
স্বচ্ছন্দভৈরবাদ্যুক্তো গোবিন্দাদিসমাদৃতঃ ॥
... ...
তদুক্তং দেবদেবেন রসাদিহৃদয়ে স্ফুটং ॥
... ...
ইতি সন্ধানযোগোঽয়ং কারণেঽস্তি গুণাবহঃ।
প্রকাশিতঃ সম্প্রদায়ক্রমপ্রাপ্তঃ শিবোদিতঃ ॥
... ...
ইতি সম্পাদিতো মার্গো সত্ত্বানাং পাতনে স্ফুটঃ।
সাক্ষাদস্মদ্বৈরিষ্টো ন শ্রুতো গুরুদর্শিতঃ।

তন্ত্রকৌমুদীর আংশিক বিবরণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় দিয়াছিলেন।[১] এই গ্রন্থে বহু তন্ত্রগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার প্রথম ছয়টী উল্লাসে নির্দিষ্ট বিষয়বিভাগ আছে। যথা—১ম উল্লাস (৫খ পত্র)—ব্রহ্মনিরূপণ ; ২য় উল্লাস (১০ খ —স্থাবরাদ্যুৎপত্তি ; ৩য় (১৪ খ)—ষট্চক্রনির্ণয় ; ৪র্থ (২০ ক)—যোগনির্ণয় ; ৫ম (২৬খ)—বাহ্য পূজানুষ্ঠান ; ৬ষ্ঠ (৩৩খ)—অন্তর্যজনাদ্যনুষ্ঠান। ইহার পর হইতে চৌরগণেশ মন্ত্র (৩৭খ), উল্কাকল্প (৪৪খ) প্রভৃতি প্রকীর্ণ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজের নাম উল্লেখ করেন নাই।[২] কৃষ্ণানন্দ তাঁহার তন্ত্রসারে তন্ত্রকৌমুদীকারের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থকারের নাম না করিয়া এইরূপ ভাবে নির্দ্দেশ করায় মনে হয়, তাঁহার উল্লিখিত তন্ত্রকৌমুদী ও আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ অভিন্ন। যদি তাহাই হয়, তবে এই গ্রন্থখানি নিতান্ত আধুনিক নহে।

নীলকণ্ঠকৃত শিবতাণ্ডবীয়াঙ্কমন্ত্রব্যাখ্যার আংশিক বিবরণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন।[৩] শিবতাণ্ডব ও তাহার ব্যাখ্যার কয়েকখানি পুথি এসিয়াটিক সোসাইটীতে আছে। পরিষদের পুথির তৃতীয় পত্রে নীলকণ্ঠের পৃষ্ঠপোষক রাজা অনুপরামের বংশবিবরণ আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার স্বকৃত মন্ত্রভাগবত, মন্ত্রমহাভারত ও মন্ত্ররামায়ণের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে তন্ত্রপ্রামাণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তন্ত্রকে পুরাণান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সংস্কৃত ও ভাষামন্ত্রের আপেক্ষিক প্রামাণ্যও এই প্রসঙ্গে বিবেচিত হইয়াছে।

দামোদরকৃত যন্ত্রচিন্তামণির কয়েকখানি পুথির উল্লেখ Catalogus Catalogorum গ্রন্থে আছে। কিন্তু ইহার বিস্তৃত বিবরণ কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। মারণাদি ষট্কর্ম্ম সম্পাদনোপযোগী বিবিধ যন্ত্রের বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। গ্রন্থখানি তিন পীঠিকায় সমাপ্ত। প্রথম পীঠিকায় গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ এবং দামোদরের বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জালন্ধর পীঠে নৃসিংহ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাদেব, তৎপুত্র দেবদত্ত, তৎপুত্র গঙ্গাধর, তৎপুত্র দামোদর। দামোদর শিবকর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বহু শিবাগম, সৌরাগম, দেবীশাপমহাগম (?) প্রভৃতি আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ নির্ম্মাণ করেন। এই গ্রন্থ উমামহেশ্বরের কথোপকথনরূপে বিবৃত হইয়াছে।[৪]

১। মিত্র—৬।২১৯০

২। যামাদ্যাং ব্রহ্মরূপাং হৃদয়সরসিজে ধ্যানগম্যাং মুনীনাম্।
তাং দেবীং চিন্তয়িত্বা নিখিলরসময়ীং কৌমুদীং প্রলিলেখ॥

৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—*Notices etc* ১।৩৬০

৪। দামোদরঃ সর্ব্বকলাপ্রবীণস্তস্মাদভূৎ শ্রীগণনাথভক্তঃ।
কল্পপদিষ্টো শঙ্করদেবভক্তো মান্যঃ সতাং ধর্ম্মপরায়ণোঽয়ম্॥
দৃষ্ট্বানেকশিবাগমাংশ্চ বহুশাংশ্চালোক্য সৌরাগমান্
দেবীশাপমহাগমাংশ্চ বিবিধানালোড্য বিস্তারতঃ।
কর্ত্তুং শাক্তিকসংগ্রহঃ সুমতিমান দামোদরাখ্যঃ স্বয়ম্
লোকানাঞ্চ হিতায় যন্ত্রনিকরং মন্ত্রেণ যুক্তং স্ফুটম্॥

জগদানন্দ মিশ্র-রচিত কৌলিকার্চ্চনদীপিকায় (৯৭৪) কৌলিক পূজার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে গ্রন্থ রচনার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে১।

রহস্যপ্রকাশে (১৩৭৯) তান্ত্রিকের দৈনন্দিন কৃত্য ও কালীপূজাবিষয়ক বিবিধ তথ্যের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।২ ইহাতে ১১টী পটল আছে।

শিবার্চ্চনতত্ত্ব (১০১৫)আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ। সংগ্রাহকের নাম নাই। গ্রন্থের কোন নাম পুথির মধ্যে পাওয়া যায় না। ইহাতে অধ্যায়ভাগ, পুষ্পিকা প্রভৃতি নাই। স্বর্ণাদি লিঙ্গ বিষয়ে 'শব্দকল্পদ্রুমধৃত বচন' উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাই এই গ্রন্থের আধুনিকত্ব প্রমাণ করিতেছে।

বৈষ্ণবাগমের মধ্যে ব্রহ্মযামলান্তর্গত চৈতন্যকল্প, কুলার্ণবীয় ঈশানসংহিতা, সনৎকুমার-সংহিতা, হনুমৎসংহিতা, বিদ্যাসারোদ্ধার তন্ত্র (উত্তর খণ্ড—একাদশ পটল, ৭৭০), রাধামোহনকৃত গৌতমীয়তন্ত্রতত্ত্বদীপিকা (৩২৬,৩৩৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

স্মৃতি

বঙ্গদেশে সংস্কৃত চর্চ্চার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ অঞ্চলে প্রাচীন স্মৃতির তেমন পঠন-পাঠন ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্রের বিবিধ নূতন নূতন নিবন্ধের রচনা ও অনুশীলনেই বঙ্গবাসী ব্যস্ত থাকিতেন। প্রধানতঃ বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত স্মৃতিগ্রন্থ হইতেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিষদে সংগৃহীত প্রাচীন স্মৃতির পুথির মধ্যে প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শূলপাণিকৃত যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার টীকা দীপকলিকা (১৪৮৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রাচীন স্মৃতির প্রতি বাঙ্গালীর আগ্রহাতিশয্যের অভাবে শূলপাণির অন্যান্য গ্রন্থের মত তাঁহার 'দীপকলিকা' তেমন আদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাই তাঁহার দীপকলিকার পুথি তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের পুথির মত বেশী পাওয়া যায় না।

স্মৃতির নিবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে রঘুনন্দনের গুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণির 'বিবেকার্ণব' ও 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব, কৃষ্ণমোহন সঙ্কলিত আনন্দসিন্ধু, পদ্মিনী ও ভবমগুনের পুত্র

প্রেরিতশ্চন্দ্রচূড়েন স্বপ্নেন দ্বিজপুঙ্গবঃ।
চকার কল্পং যন্ত্রাণাং চিন্তামণিরিতি স্ফুটম্॥
... ...
চিন্তামণৌ কল্পবরে স্বতন্ত্রে শ্রীচন্দ্রচূড়স্য মুখাদ্‌বিনির্গতে।
তস্মাদয়াদ্য কিল পীঠিকেয়ং কৃতাত্র দামোদরপণ্ডিতেন॥

ইতি শ্রীযন্ত্রচিন্তামণৌ নাম্নি মহাকল্পে প্রত্যক্ষসিদ্ধিপ্রদে উমামহেশ্বরসংবাদে দামোদরপণ্ডিতোদ্ধৃতে প্রথম-পীঠিকা সমাপ্তা।

১। নভো ব্যোমাঙ্গতন্দ্রাব্দে কাশ্যাং চৈত্রে সিতেতরে।
জগদানন্দমিশ্রেণ কৃতৈষা কুলদীপিকা॥

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের যে পুথির বিবরণ দিয়াছেন, তাহার পাঠ ব্যোমাব্ধিচন্দ্রাব্দে।

২। অথাহ্নিকং কর্ম্ম নিরূপয়ন্তি প্রভাতকৃত্যাবধি সাধকানাম্।
যদাচরন্তং ন ভিয়া স্পৃশন্তি কৃতানি পাপান্যপি মন্ত্রাণি॥

ক্ষেমরামকৃত রামপদ্ধতি, ভট্টরামেশ্বরপুত্র ভট্টনারায়ণকৃত স্মার্ত্তানুষ্ঠানপদ্ধতি, পুরুষোত্তমদেবকৃত 'ধান্যাচলপ্রয়োগতত্ত্ব',[১] মিথিলার ভৈরবেন্দ্র নৃপতিকৃত 'মহাদাননির্ণয়' (১৫৯২), দিব্যসিংহ মহাপাত্ররচিত 'শ্রাদ্ধদীপ', দামোদর-সঙ্কলিত 'গঙ্গাজল' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

বিবেকার্ণবের কোন পুথি এ পর্য্যন্ত অন্যত্র কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। এই গ্রন্থে (১৫৩৬) বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের সম্বন্ধে নানাবিধ মতের আলোচনা ও মীমাংসা করা হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রমাণভূত ষট্‌ত্রিংশৎ ধর্ম্মশাস্ত্রকারের নাম করা হইয়াছে। সাধারণতঃ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ হইলেও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রকারের উল্লেখ বিবিধ স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে তাঁহাদের সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশ বলিয়া আর কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন কি না, জানি না। পরিষদের পুথির শেষে (৪২ক) কৃত্যতত্ত্বার্ণব বা কৃত্যরত্নাকর গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।[২]

ভবমণ্ডন ও পদ্মিনীর পুত্র ক্ষেমরামকৃত রামপদ্ধতি (৬৭৯) নামক নিবন্ধ-গ্রন্থে নিম্ননির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—কর্ম্মপরিভাষা (১২ পত্র), বিবাহকর্ম্ম (২৪), সপ্তশলীয় চরু (২৫), ধৃতিহোম (২৭), চতুর্থীকর্ম্ম (২৯), গর্ভাধান (৩০), পুংসবন (৩০), শুংগাকর্ম্ম (৩২), সীমন্তোন্নয়ন (৩৪), শোষ্যন্তী হোম কর্ম্ম (৩৪), জাতকর্ম্ম (৩৫), ষষ্ঠীপূজাবিধি (৩৭) চন্দ্রদর্শন (৩৮), নামকরণ (৪০), জন্মতিথিকর্ম্ম (৪১), প্রবাসবিধি (৪২), অন্নপ্রাশনকর্ম্ম (৪৩), চূড়াকর্ম্ম (৪৬), কর্ণবেধকর্ম্ম (৪৭), উপনয়নকর্ম্ম (৫৫), বেদোপা-

১। এই গ্রন্থের একখানি পুথির বিবরণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার Notices of Sanskrit Manuscripts (II. 110)এ দিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের আলোচিত পুথিতে রচয়িতার কোনও নাম নাই।

২। ত্রৈলোক্যমোহনমহৌষধমদ্ভুতদারলাবণ্যসারময়মুজ্ঝিতহেতুরম্যম্।
সানন্দনন্দনয়নামৃতপারলাভং গোপালবালচরিতং স চিরং ভুনোতু॥
শ্রুতিস্মৃতিপথে মিথো বিবদমানবিদ্বদ্বচঃপ্রচারগুরুসংশয়প্রচয়দাবচঃসঙ্করে।
চিরাবতরণাক্ষমাকুলিতচেতসাং প্রীতয়ে বিবেকময়মর্ণবং রচয়তীতি চূড়ামণিঃ॥
শ্রীনাথলীলানিলয়ঃ সুযুক্তিরত্নাকরঃ প্রীতিকরঃ কবীনাং।
প্রসিদ্ধসিদ্ধান্তপরামৃতৌঘঃ শ্রীমান্ বিবেকার্ণব উজ্জহীতে॥
শ্রুত্যর্থসংবাদিনি যো বুধানাং নৈয়ায়িকে বর্ত্মনি পক্ষপাতঃ।
তত্রাসতাং গড্ডরিকাপ্রবাহভ্রমাপনোদায় মম শ্রমোঽয়ম্॥
স্মৃতিসংগ্রহটীকাসু প্রায়ো ন্যায়া নিরূপিতাঃ।
ময়া তদবশিষ্টানাং বিবেক ইহ তন্যতে॥
জৈমিনীয়মতং প্রায়ো লেখ্যং স্পষ্টাত্যপস্কৃতম্।
মন্যপ্যত্র তথাপ্যেতে ঘটনাপাটবং মম॥

কর্ম্ম (৬৩), সমাবর্ত্তনকর্ম্ম (৬৮)। কোন কোন পুথিতে এই গ্রন্থের নাম—রামনিবন্ধ।১ গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন।২

'কৃষ্ণমোহন কল্পিত' আনন্দসিন্ধু (৮৭৫) একখানি অনালোচিতপূর্ব্ব বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ। এই কৃষ্ণমোহন বিবিধ গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার রচিত কমলোদয় কাব্যের পুথি পরিষদে আছে। ইহা অষ্টাদশ লহরীতে সম্পূর্ণ। লহরীগুলির আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে এইরূপ,—শঙ্খচক্রধারণাদি প্রমাণ (২০পত্র), উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণাদি প্রমাণ (৩৮), মন্ত্রগ্রহণাদিপ্রমাণ (৪১), কৃষ্ণার্চ্চনাদি প্রমাণ (১০৫), জপাদি প্রমাণ (১০৮), ধ্যানাদি প্রমাণ (১১০), স্মরণপ্রমাণ (১১১), ভগবন্নামকীর্ত্তন প্রমাণ (১১৯), ভগবন্নামশ্রবণাদি প্রমাণ (১২০), বন্দনাদি প্রমাণ (১২৮), শ্রীপাদসেবা প্রমাণ (১৩০), পাদোদকপানাদি প্রমাণ (১৩৩), নৈবেদ্যশেষ-ভোজনাদি প্রমাণ (১৩৭), বৈষ্ণব লক্ষণ ও তৎসেবা প্রমাণ (১৩৯), একাদশ্যাদি প্রমাণ (১৪৬), তুলস্যাদিরোপণাদি প্রমাণ (১৫৬), মাসবিশেষাদিকৃত্যাদি প্রমাণ (১৭৬), প্রকীর্ণাখ্য নানাপ্রমাণ (১৮৬)। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে আলোচিত পুরাণ, আগম ও সংগ্রহ-গ্রন্থের ক্ষুদ্র তালিকা দিয়াছেন।৩ বৈষ্ণবগ্রন্থ হইলেও ইহাতে রুদ্রযামল, কুলার্ণব, তন্ত্রসার প্রভৃতি শৈব ও শাক্ত গ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে দেখা যায়।

১। Stein—Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Raghunath Temple Library. Kashmir—101.

২। প্রারম্ভ—গুরুং গণেশং গৌরীঞ্চ নত্বোদ্বাহাদিকর্ম্মণাম্।
স্বনাম্না ক্ষেমরামেণ ক্রিয়তে রামপদ্ধতিঃ ॥
শেষ— মাতা শ্রীপদ্মিনী যস্য পিতা শ্রীভবমর্দ্দনঃ।
তেন শ্রীক্ষেমরামেণ কৃতেয়ং রামপদ্ধতিঃ ॥
ইতি শ্রীমৎকান্যকুব্জদেশীয়কশ্যপবংশোদ্ভবদ্বিজঙ্কারণদগ্রন্থিঃ রামনারায়ণদীক্ষিতরাবৃন্দস্মীকান্তসুদাত্মজশ্ছন্দোগ-মুখতিলকঃ শ্রীলোকমণিসুদাত্মজাত্মজবরগুরুশর্ম্মণঃ পুত্রক্ষেমরামকৃতা রামপদ্ধতিঃ সমাপ্তা ॥

৩। নত্বা নিত্যানন্দং ভজত পরমাদ্বৈতমনসঃ
শরণ্যং চৈতন্যং নিখিলজননিভূতং কমপি তম্।
গুণাতীতশ্চাপি ত্রিভুবনহিতায়াচ্যুতমহো
সরূপাদ্যং যস্মাদ্‌ব্রহ্মতমখিলেশং শিবময়ম্ ॥
যৎপাদস্য রজঃ সমস্তশুভদং নিঃশেষ-তৈর্থং জলং
পুত্রাদিস্তু জগত্ত্রয়ার্চ্চনমতো কামপ্রদা চ স্মৃতিঃ।
চিহ্নঞ্চাপি বিভূতিমূর্ত্তি ভগবান্ বক্ষঃস্থলে মাধবো
বন্দেঽহং তাষ্টফলাপ্তয়েঽখিলহিতং তদ্বৈষ্ণবানাং পদম্ ॥
নানাপুরাণাগমসংগ্রহাদি ব্যালোড্য বিদ্যাঢ্যবৈষ্ণবজাতিভিঃ।
আহৃত্য সারান্ কলয়ত্যমন্দমানন্দসিন্ধুং কৃতকৃষ্ণমোহনঃ ॥
আদিশব্দাৎ সংহিতামিতি।
পুরাণে ভারতং পাদ্মং শ্রীভাগবতমেব চ।
স্কান্দঞ্চৈবাগমে রুদ্রযামলঞ্চ কুলার্ণবম্ ॥
সনৎকুমারতন্ত্রঞ্চ গৌতমীয়ঞ্চ সংগ্রহে।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তন্ত্রসারে হরিস্মৃতৌ ॥
গঙ্গাবাক্যাবলী চৈব শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকা।
আহ্নিকাচারতত্ত্বাদি বহুগ্রন্থাননেকশঃ ॥
নির্ম্মথ্য সারমুদ্ধৃত্য শ্রীকৃষ্ণারাধনক্রমঃ।
চিরেণ কল্পিতো হ্যেষ হিতায় জগতামহো ॥
যদত্র জ্ঞানদৌর্ব্বল্যাৎ স্খলনাদি প্রজায়তে।
কৃপয়া কোবিদৈস্তন্মে সম্পাদ্যং প্রীতয়ে হরেঃ ॥

প্রয়োগরত্ন বা স্মার্ত্তানুষ্ঠানপদ্ধতি (৭) একখানি অদ্ভুত রকমের বই। ইহার প্রারম্ভে দুই জন গ্রন্থকারের নাম আছে।[১] একজন ভট্টরামেশ্বরের পুত্র ভট্টনারায়ণ, আর একজন বিশ্বনাথের পুত্র অনন্তদীক্ষিত। দুই জনে গ্রন্থের নামও দুই রকম দিয়াছেন। ভট্টনারায়ণের মতে নাম প্রয়োগরত্ন; অনন্তদীক্ষিত নাম দিয়াছেন—স্মার্ত্তানুষ্ঠানপদ্ধতি। এই গ্রন্থের সকল পুথিতে অবশ্য দুইটী নাম নাই। কোন পুথিতে একজনের, কোন পুথিতে বা আর একজনের নাম আছে। Eggeling তাঁহার Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts, India Office Library পুস্তকে ভট্টনারায়ণের নাম-সংবলিত গ্রন্থের সহিত অনন্ত দীক্ষিত নাম-সংযুক্ত গ্রন্থের কিছু কিছু পার্থক্য দেখাইয়াছেন।

দিব্যসিংহকৃত শ্রাদ্ধদীপের পুথিখানি বঙ্গাক্ষরে হইলেও ওড়িয়া পুথির অনুকরণে লৌহশলাকাদ্বারা অঙ্কিত এবং মসীলিপ্ত। বঙ্গাক্ষরে এরূপ পুথি বড় পাওয়া যায় না। বঙ্গাক্ষরে লিখিত এই পুথি হইতে বুঝা যায়, বঙ্গদেশে মিথিলা প্রভৃতি দেশের স্মৃতিগ্রন্থ যেরূপ আলোচিত হইত, উড়িষ্যার স্মৃতিও সেইরূপ আলোচিত হইত। শ্রাদ্ধদীপের পুথি অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। দিব্যসিংহকৃত কালপ্রদীপ নামক একখানি গ্রন্থের পুথি Catalogus Catalogorum গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

আচার্য্য রাজগুরু দামোদর মিশ্র প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে 'গঙ্গাজল' নামক গ্রন্থ লেখেন। গঙ্গার জল যেরূপ সমস্ত পাপ দূর করে, এই গঙ্গাজল গ্রন্থেও সেইরূপ সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হইয়াছে।[২] প্রথম পরিচ্ছেদে বধপ্রয়োগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভুক্তচ্ছেদন, তৃতীয়ে স্তেয়নির্য্যাতন, চতুর্থে শঙ্করভ্রংশ, পঞ্চমে সংসর্গানির্ণয়, এবং ষষ্ঠে সর্ব্বসংগ্রহ আলোচিত হইয়াছে।

দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য। উহা রামকৃষ্ণকৃত দুর্গোৎসবপদ্ধতি (৫৬২)। রামকৃষ্ণ কোন্ মত অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।[৩] রামকৃষ্ণ কোন্ সময়ের লোক, তাহাও নির্ণয় করিবার কোনও উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার গ্রন্থের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ১৬৩২ সংখ্যক পুথিতে এইরূপ দুইটী নাম আছে। ঐ লাইব্রেরীর ক্যাটালগে এই পুথিখানি স্মৃতিগ্রন্থের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। আর কয়েকখানি পুথি (৪৭১—৪৭৭) বৈদিক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটীর ক্যাটালগেও ইহা বৈদিক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। (২।৩৬৫—৭০)

২। পুরাণস্মৃতিবেদেভ্যঃ সমাকৃষ্য বিবিচ্য চ।
দামোদরো মহামিশ্রঃ প্রায়শ্চিত্তবিধিং ব্যধাৎ॥
তাদৃশং দুরিতং নাস্তি গঙ্গাম্ভো ন নিহন্তি যৎ।
তদ্বদেতদ্যতো নাম কৃতং গঙ্গাজলং ময়া॥

৩। প্রণম্য দেবীং বরদামুক্তমালানুসারতঃ। [বরদাং মুণ্ডমালানুসারতঃ (?)]
তদর্চ্চনপ্রয়োগোঽয়ং রামকৃষ্ণেন তন্যতে॥

তাঁহার গ্রন্থে দুর্গার দুইটী অধুনা অপ্রচলিত ধ্যান পাওয়া গিয়াছে। একটী[১] কল্পারম্ভের, অপরটী[২] বোধনের ধ্যান। দশমীর দিন দেবীকে দোলায় আরোহণ করাইয়া বিসর্জ্জনের মন্ত্র পাঠ করিবার বিধান এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

পুরাণ

পুরাণের মধ্যে বরাহসংহিতা (১১৫৫), কেদারকল্পে বিক্ষাধপুরাণ (১৩৮৪), নৃসিংহপুরাণ (১৪৩২), মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পুরুষোত্তমদেবকৃত টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

বরাহসংহিতার একখানি পুথি এসিয়াটিক সোসাইটীতে আছে। পরিষদের পুথি চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত। তৃতীয় অধ্যায়ের পুষ্পিকায় ইহাকে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মনে হয়। প্রথম অধ্যায়ের বিষয় বৃন্দাবনদলাষ্টষোড়শসংখ্যা-নির্ণয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় বৃন্দাবনরহস্য এবং চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় নিত্যবৃন্দাবন-নির্ণয়রহস্য। শম্ভুকার্ত্তিকেয়সংবাদাত্মক কেদারকল্পান্তর্গত বিক্ষাধপুরাণ বা বিখ্যাদ পুরাণে একবিংশতি পটলে স্বর্গগমনবিধি আলোচিত হইয়াছে। ইহার কয়েকখানি পুথি এসিয়াটিক সোসাইটীতে আছে এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক ঐ সোসাইটীর গ্রন্থবিবরণের পঞ্চম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

পরিষৎপুথিশালার নৃসিংহপুরাণের (১৪৩২) অধ্যায়সংখ্যা—৬০। গোপাল-নারায়ণ কোম্পানী হইতে প্রকাশিত নরসিংহপুরাণের অধ্যায়সংখ্যা ৬৮; ইহা হইতে ৮ বেশী। তবে প্রকাশিত পুস্তকের পাদটীকা হইতে জানা যায় যে, শেষের কয়েকটা অধ্যায় সকল পুথিতে পাওয়া যায় না।

১। ধ্যায়েদ্দুর্গাং ত্রিনয়নাং চন্দ্রার্ককৃতশেখরাম্।
বাহুভির্দ্দশভির্যুক্তাং নানালঙ্কারভূষিতাম্॥
সিংহস্থিতাং ত্রিশূলেন ভিন্দন্তীং মহিষাসুরম্।
শূলখড়্গাবধাঙ্গানি শরশক্তী চ দক্ষিণে॥
চর্ম্মকোদণ্ডপাশাংশ্চ করৈর্ব্বামৈঃ স্থাণস্তথা।
ঘণ্টাঞ্চ বিভ্রতীং দেবীং মহর্ষিসুরবন্দিতাম্॥
ঈষৎপ্রসন্নবদনাং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাম্॥

২। কনকাভাং মহাদেবীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
নানারত্নৈঃ সমাকীর্ণাং কঙ্কণৈঃ কটকৈরপি॥
বিভ্রাজমানাং দশভির্ব্বাহুভিঃ সুমনোহরৈঃ।
শরদম্ভোজসঙ্কাশবিকাশিমুখপঙ্কজাম্॥
ইন্দীবরাভৈর্ব্বিমলৈর্লোচনৈস্ত্রিভিরুজ্জ্বলাম্।
ত্রিশূলং খড়্গচক্রে চ বাণং শক্তিঞ্চ দক্ষিণে॥
সপাশাসুরকেশঞ্চ চর্ম্ম শঙ্খং শরাসনম্।
ঘণ্টাং বামেষু দধতীং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্।
মাহিষং ছিন্নশিরসমধশ্চর্ম্মকৃপাণিনম্।
অসুরং তত্র সম্ভূতং শূলাগ্রেণ বিদারিতম্॥
সিংহস্কন্ধদক্ষিণপদাং দৈত্যস্কন্ধাক্রান্তবামপাদাম্।
বিল্ববৃক্ষস্থিতাং দুর্গাং ধ্যাত্বৈবং প্রতিপূজয়েৎ॥

ভগবদ্‌গীতা ব্যতীত পাণ্ডবগীতা (৩০৭) ও কূর্ম্মপুরাণান্তর্গত শ্রীভগবতীগীতার (৩০৮) পুথি উল্লেখযোগ্য। পরিষদের হস্তলিখিত ভগবতীগীতা ও পাণ্ডবগীতার পুথির সহিত বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গীতাগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ভগবতীগীতা ও পাণ্ডবগীতার কোনও মিল নাই। এই ভগবতীগীতা ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-বর্ণিত১ কূর্ম্মপুরাণের দশমাধ্যায়ান্তর্গত দেবীগীতা অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গীতাগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত দেবীগীতা কিন্তু স্বতন্ত্র। প্রকাশিত কূর্ম্মপুরাণে দেবীগীতা বা ভগবতীগীতা বলিয়া কোনও জিনিষ পাওয়া যায় না। বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ভগবতীগীতা ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়-বর্ণিত ভগবতীগীতা২ অভিন্ন হইতে পারে।

পুরাণের টীকার মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পুরুষোত্তমদেবকৃত মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর টীকার একখানি পুথি (১০৬৮) উল্লেখযোগ্য। পুথিখানি প্রাচীন ও অত্যন্ত জীর্ণ। সমস্ত পুথিখানির পাঠ উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব। গ্রন্থকারের কোনও পরিচয় আমরা জানি না। তবে গ্রন্থের বহু স্থলে ব্যাকরণের বিচার দেখিয়া, গ্রন্থকার একজন বৈয়াকরণ ছিলেন, এরূপ মনে করা স্বাভাবিক। একাধিক পুরুষোত্তমদেব সংস্কৃত সাহিত্যে পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে বৌদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। হিন্দুদিগের মধ্যে তীরভুক্তির রাজা পুরুষোত্তমদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার পিতার নাম ভৈরব। ইঁহার মাতা জয়ামহাদেবী সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। আর এক পুরুষোত্তমদেবের নাম পাওয়া যায়। তিনি গোপালার্চনবিধি নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। পরিষদে ধান্যাচলপ্রয়োগতত্ত্ব নামে এক পুরুষোত্তমদেব-রচিত একখানি গ্রন্থ আছে। ইনি শিবকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।

তান্ত্রিক স্তোত্রাদির আকর সম্বন্ধে বিভিন্ন পুথিতে যেরূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, পৌরাণিক স্তোত্র, ব্রত প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। উদাহরণস্বরূপ, শিবরাত্রি ব্রতকথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্রতের প্রচলিত কথাটি কোন কোন পুস্তকে শিবরহস্যান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে ইহাকে ভবিষ্যপুরাণোক্ত বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, হরিভক্তিবিলাস নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থের দিগ্‌দর্শনী টীকাকার শিবরাত্রি ব্রতের মূল নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনখানি গ্রন্থের নাম করিয়াছেন—ভবিষ্যোত্তর, স্কন্দপুরাণ ও শিবধর্ম্মোত্তর। এতদতিরিক্ত কোন গ্রন্থে শিবরাত্রিব্রত নাই, এমন কথাও অবশ্য তাঁহার উক্তি হইতে বুঝা যায় না। পরিষদের একখানি পুথিতে (৪১৭) ইহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের অন্তর্গত, এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। প্রচলিত কথার উপাখ্যানাংশের সহিত এই কথার মিল আছে সত্য, তবে ইহার ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মুদ্রিত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ইহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

১। *Notices etc.*—১।১৭৪

২। মিত্র—১।৪৪০

বীরাষ্টমীব্রতকথা সাধারণতঃ নারদীয়পুরাণান্তর্গত বলিয়া পরিচিত। পরিষদে এই ব্রতের যে পদ্ধতির পুথি আছে (৪১৮), তাহাতে সঙ্কল্পের মধ্যে এই ব্রতকে দেবীপুরাণোক্ত বলা হইয়াছে। এই পুথির কথার সহিত প্রচলিত কথার উপাখ্যানাংশে মিল থাকিলেও আকারগত কোনও মিল নাই।[১] তবে কোন কোন স্থলে পদ বা বাক্যাংশ দুই কথায়ই একরূপ।

দর্শন

পরিষদের পুথিশালায় অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও উল্লেখযোগ্য দর্শনশাস্ত্র-বিষয়ক পুথি তেমন বেশী নাই। এই বিভাগে অনূপনারায়ণ শিরোমণিকৃত বেদান্তসূত্রের সমঞ্জসানাম্নী বৃত্তি, নারায়ণতীর্থকৃত ভাষাপরিচ্ছেদের তর্করত্নাকর টীকা ও কণিকাসংগ্রহ, তত্ত্ববোধ, যোগসংগ্রহ, যুক্তভবদেব প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শনের প্রকরণ-জাতীয় গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

দর্শনবিভাগের পুথির মধ্যে কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নামের ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে প্রমেয়রত্নাবলীকার 'বলভদ্রের' নাম উল্লেখযোগ্য। (৫০১) লিপিকর অচ্যুতানন্দ ইহাকে গ্রন্থান্তে একটী শ্লোকে 'বালভদ্রী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সমঞ্জসাবৃত্তির রচয়িতা অনূপনারায়ণ স্বীয় গ্রন্থ চৈতন্যদেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রন্থের অবসানে তিনি রূপ ও স্বরূপের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[২] তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যই সমধিক প্রসিদ্ধ—অনূপনারায়ণের গ্রন্থ তেমন পরিচিত নহে।

পরমাদ্বৈত-মতেই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, এই তত্ত্বপ্রতিপাদন তীর্থস্বামিকৃত

১। নারদ উবাচ।
ব্রতেন কেন দেবেশ নৃণাং বংশস্থিতির্ভবেৎ।
তন্মে ব্রূহি হৃষীকেশ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রো ধর্ম্মদেব ইতি শ্রুতঃ।
তস্য চ ব্রাহ্মণী ধন্যা ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা॥:
অপুত্রা সর্ব্বরত্নাঢ্যা প্রহৃষ্টা প্রিয়বাদিনী।
একদা তাং সম'লোক্য ধর্ম্মদেবো মহামতিঃ।
পুত্রাভাবেন দুঃখার্ত্তাং জগাদ মধুরাক্ষরং॥

ধর্ম্মদেব উবাচ।
ত্বয়ি পুত্রা ন মে ধাতা কথং বংশস্থিতির্ভবেৎ।
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে চৈব বনেষু চ॥
বিবাহং কর্ত্তুমিচ্ছামি পুত্রার্থং যদি মন্যসে।

... ...

২। কৃষ্ণপ্রেমসুধাব্ধিমগ্নমনসো রূপস্বরূপাদয়ঃ
খ্যাতা যৎকৃপয়ৈব সম্প্রতি বয়ং সর্ব্বে কৃতার্থা যতঃ।
এষা বৃত্তিরনন্তবৈষ্ণবমনোমোদায় সাধীয়সী
শ্রীচৈতন্যহরেদ'য়াময়তনোস্তস্যোপহারায়তাম॥

এই শ্লোকটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথিতে আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক বিবৃত পুথিতে (মিত্র ২।৬৮৭) ইহা নাই।

কণিকাসংগ্রহ (৫৮৩) গ্রন্থের উদ্দেশ্য।[১] ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে কবীর, তুলসীদাস, সুরদাস, যোগী, জঙ্গম, মেহড়া, খাকী, সুথরা, সাহী, দরবেশী প্রভৃতি 'প্রাকৃতমতের'ও অদ্বৈতপরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সমুদ্রের বিবিধ নাম যেমন তাহার পর্য্যায়মাত্র, সেইরূপ বিভিন্ন মত একই মতের নামান্তর বই আর কিছু নয়। ভিন্ন মত না হইলে মুনি হওয়া যায় না; এই জন্য মুনিত্ব বাহাল রাখিবার উদ্দেশ্যেই ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা। এই প্রসঙ্গে রঘুত্তমকৃত অদ্বৈতানন্দসাগর (মিত্র ৭।২৫৪৫) নামক গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে সমস্ত দেবতার ঐক্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এই গ্রন্থের গঙ্গাভক্তিলহরী (মিত্র ১। ২৩৪, ৭। ২৪৮২, পরিষদের পুথি) অংশে দুর্গা সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে দুর্গার বিবিধ নামের ব্যুৎপত্তি বিচারিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে দুর্গাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করার চেষ্টা হইয়াছে। উপসংহারে সমস্ত দেবতারই অভেদ প্রচারিত হইয়াছে।

তত্ত্ববোধ (৮৩৫) প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত বেদান্তবিষয়ক অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত প্রকরণ-গ্রন্থ। গ্রন্থকার নিজের নাম করেন নাই। বাসুদেবেন্দ্র নামক নিজগুরুকে নমস্কার করিয়াছেন।[২]

প্রমোদযতি-কৃত যোগসংগ্রহ (১৬১১) পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে সরলভাবে সাধারণ যোগের মূল তত্ত্বগুলি বুঝান হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে গর্ভোৎপত্তির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; তাহার কারণ, শরীরের জ্ঞান হইতেই যোগের কারণভূত সকল জ্ঞান লাভ হয়।[৩] দ্বিতীয় খণ্ডে শরীরের নানা স্থানে স্বর্গমর্ত্ত্যাদির অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় এবং চতুর্থে আসন ও বায়ুসংযমের কথা। পঞ্চমে যোগ সম্বন্ধে সাধারণ কথা আছে। জ্ঞান না হইলে যোগ হয় না—প্রকৃত জ্ঞানী কে, এই সকল বিষয় এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।[৪]

১। নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নমিতি মুনিত্বপ্রকাশনায় মতানাং ভিন্নভিন্নত্বেন ভাষণং ন তু পরমার্থতঃ।...অম্ভোধির্জলধিশ্চৈব সমুদ্রঃ সাগরোঽর্ণবঃ। যথা এতে চ পর্য্যায়াস্তথৈতানি মতানি চ॥ (১ক)

২। বাসুদেবেন্দ্রযোগীন্দ্রং নত্বা জ্ঞানপ্রদং গুরুং।
মুমুক্ষূণাং হিতার্থায় তত্ত্ববোধো বিধীয়তে॥

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাধিকারিণাং মোক্ষসাধনভূতং তত্ত্ববিবেকপ্রকরণং বক্ষ্যামঃ॥ সাধনচতুষ্টয়ং কিম্—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমাদিসাধনষট্‌সম্পত্তিঃ মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি।

৩। তত্রাদৌ কথ্যতে জন্ম শরীরং যেন সম্ভবম্।
শরীরাৎ সকলং জ্ঞানং যোগানাম্যাদিকারণম্॥

৪। জ্ঞানমূলং যোগগম্যং সিদ্ধেস্তমেব কারণম্।
তদ্‌জ্ঞানঞ্চ ভবেন্নৃণাং বাসুদেবপ্রসাদতঃ॥
অজ্ঞানস্য যোগসিদ্ধিঃ নির্ধনস্যেপ্সিতং যথা॥
... ...
যস্তু কৃত্বা হরেঃ কার্য্যং ফলন্তত্র ন বাঞ্ছতি।
ন জানামীত্যহং কিঞ্চিৎ স জ্ঞানীত্যভিধীয়তে॥
... ...
কামং ক্রোধং তথা লোভং ভয়ং শোকং জহাতি যঃ।
সর্ব্বভূতহিতকরঃ স জ্ঞানীত্যভিধীয়তে॥

কৃষ্ণদেবপুত্র মৈথিল সন্মিশ্র ভবদেবকৃত যুক্তভবদেব (৩৪৪) যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ভবদেবকৃত কয়েকখানি যোগাদিশাস্ত্রীয় গ্রন্থের উল্লেখ ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগোরাম গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠায় আছে। যুক্তভবদেবনামক কোনও গ্রন্থের উল্লেখ উহাতে নাই। ইহার তিনটী উপদেশ বা পরিচ্ছেদ পরিষদের পুথিতে আছে।[১]

কাব্য

কাব্যবিভাগে কয়েকখানি প্রাচীন পুথি আছে। তাহাদের একখানির উল্লেখ ইতঃপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। নূতন কাব্যের মধ্যে কমলোদয় (১২৯৭) প্রভৃতি কয়েকখানির নাম করা যাইতে পারে।

কমলোদয় নামক কাব্যের রচয়িতা কবি কৃষ্ণমোহন। ইনি ইঁহার কাব্যের প্রতি সর্গের শেষ শ্লোকে স্বকৃত এক একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পরিষৎসংগৃহীত তাঁহার কাব্যের খণ্ডিত পুথিতে যে কয়টী সর্গের অন্তিম শ্লোক (৩, ৪, ৫, ৬) আছে, তাহাতে এইরূপ কয়েকখানি গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ষষ্ঠ সর্গের শেষে উল্লিখিত আনন্দসিন্ধুনামক গ্রন্থের একখানি পুথি পরিষদে আছে। স্মৃতিগ্রন্থ মধ্যে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, তৃতীয় সর্গের শেষে উল্লিখিত প্রাকৃত পারসীক মিশ্রিত 'বিশ্বানন্দ,' চতুর্থ সর্গের শেষে উল্লিখিত 'জয়যষ্টি' (?) এবং পঞ্চম সর্গের শেষে উল্লিখিত 'আগমচন্দ্রিকা'—ইহাদের কোনখানিরই কোনও সন্ধান আমরা পাই নাই। কৃষ্ণমোহনের কোন পরিচয়ও আমরা জানি না। তিনি কমলোদয় কাব্যের পঞ্চম সর্গের শেষে নিজেকে 'পূর্ব্বস্থলস্থায়ী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয়, ইঁহারই রচিত 'কৃষ্ণকেলি' কাব্য স্বর্গীয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের Notices of Sanskrit Manuscripts দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। কৃষ্ণকেলি কাব্যের সপ্তম সর্গের শেষ শ্লোকেও কবি নিজকৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

সনাতন গোস্বামিবিরচিত 'গীতাবলী' (৪৮৩-৪ প্রভৃতি) জয়দেবের ধরণে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে রচিত গানের সমষ্টি। উপক্রম ও উপসংহারের দুইটী গান নিদর্শনার্থ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

১। ত্রিভুবনপ্রভুরেকং যোগিভিদৃষ্টমূর্ত্তিস্ত্রিগুণমপি গুণেভ্যো যৎ পরং প্রাহুরীড্যাঃ।
তদহরহরচঞ্চদ্‌জ্ঞানমোদস্বরূপং দিশি দিশি বহুসন্তিব্রহ্ম সম্ভাবয়ামি॥
প্রণতজনহিতায় ব্রহ্মবিদ্ভিঃ পুরাণৈঃ প্রকটিতমনুসারং যোগশাস্ত্রস্য সারম্।
হরিয়বহুলমৌলেঃ কৃষ্ণদেবস্য সূনুর্বিলিখতি ভবদেবঃ সত্যবত্যাঃ সমৃত্যৈ॥
ভবেন যুক্তো যো দেবো বিষ্ণুরত্র নিরীক্ষতে।
তদ্‌যুক্তভবদেবেতি গ্রন্থনাম প্রকল্প্যতে॥
প্রজ্ঞা সত্যবতীনাম্নী গ্রন্থে যা ব্রহ্মভাবনা।
প্রোক্তা সা যোগসাধ্যেতি যোগোঽতঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
... ...

ইতি মৈথিলসন্মিশ্রশ্রীকৃষ্ণদেবতনয়শ্রীভবদ্বিরচিতে (?) যুক্তভবদেবনাম্নি যোগনিবন্ধে যোগজ্ঞানাদ্যুপদেশো নাম প্রথমোপদেশঃ॥

... ...

ইতি মৈথিলসন্মিশ্রশ্রীভবদেবরচিতে যুক্তভবদেবে শারীরোপদেশো নাম তৃতীয়োপদেশঃ॥

উপক্রম,—

ভৈরবীরাগঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

পুত্রমুদারমসূত যশোদা সমজনি বল্লবততিরতিমোদা ॥

কোঽপ্যাপনয়তি বিবিধমুপহারং নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারম্ ॥

কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতং বিকিরতি কোঽপি সদধি নবনীতম্।

কোঽপি তনোতি মনোরথপূর্ত্তিং পশ্যতি কোঽপি **সনাতন**মূর্ত্তিম্ ॥

উপসংহার,— ধানশ্রী

রাধে নিজকুণ্ডপয়সি কুরু রঙ্গং কিঞ্চ সিঞ্চ পিঞ্ছমুকুটমঙ্গীকৃতভঙ্গম্ ॥ ধ্রু ॥

অস্য পশ্য কুসুমোন্নতচূড়া ভীতিভিরতিনীলনিবিড়কুন্তলমনুগূঢ়া ॥

ধাতুরচিতচিত্রবীথিরম্ভসি পরিলীনা

মালাপ্যতিশিথিলবৃত্তিরজনি ভৃঙ্গহীনা ॥

শ্রীসনাতনমণিরত্নম্ অংশুভিরপি চণ্ডং

ভেজে প্রতিবিম্বভাবাত্তব গণ্ডম্ ॥

একখানি পুথিতে (১১০৬) ইহাকে রূপ গোস্বামিবিরচিত বলা হইয়াছে। রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর নানা গ্রন্থের বিভিন্ন পুথিতে এইরূপ বিভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায়।[১] গ্রন্থমধ্যে নিজ নাম প্রকাশের কার্পণ্যই এই ব্যাপারের মূল কারণ, সন্দেহ নাই। তবে বর্ত্তমান গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহার প্রত্যেক গানের ভণিতায় সনাতনের নাম আছে। তবে এই গ্রন্থকার সনাতন গোস্বামী ও তন্নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গোস্বামী এক কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা লঘুতোষিণীর উপসংহারে রূপ ও সনাতনের গ্রন্থাবলীর যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে গীতাবলীর কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। হয় ত কোনও পরবর্ত্তী কবি এই গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ সনাতনের নামে চালাইয়া দিয়াছেন।

মহানাটক বা হনুমন্নাটকের ছয়খানি পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে। ইহাদের মধ্যে একখানি নাগরী অক্ষরে—অন্যগুলি বঙ্গাক্ষরে। বঙ্গাক্ষরের পুথিগুলির পুষ্পিকায় সর্ব্বত্রই মধুসূদন মিশ্র সঙ্কলকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একই মধুসূদন মিশ্রের সঙ্কলিত গ্রন্থের যে কয়খানি পুথি পরিষদে আছে, তাহাদের মধ্যে অঙ্ক-সংখ্যা ও শ্লোক-সংখ্যা বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মহানাটকের পুথিগুলির এইরূপ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় Indian Historical Quarterly (৭ম খণ্ড) পত্রিকায় মহানাটক-বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য পরিষদের মহানাটকের পুথিগুলির অঙ্কসংখ্যাদি নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল। নাগরী অক্ষরের পুথিখানির পুষ্পিকায় কেবল 'হনুমদ্‌বিরচিত' এই কথা বলিয়াই গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

১। এ সম্বন্ধে মল্লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute—নবম খণ্ড)।

গ্রন্থসংখ্যা	সঙ্কলয়িতা	অঙ্কসংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
২৪০	মধুসূদন মিশ্র	৯	সংখ্যা দেওয়া নাই
৭৫১	মধুসূদন মিশ্র	১০	৭১৫
৭৫৮	মধুসূদন মিশ্র	৯	৭১২
৯০২ (নাগরী)	০	৮	৭৮৭
১২৬৩	মধুসূদন মিশ্র	১০	৭১৫
১৬২৪	ঐ	৯	৭৩৩

টীকাগ্রন্থের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামদেবকৃত ভট্টিকাব্যের পদকৌমুদীনাম্নী (৩৯৮) একখানি টীকা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থকার সুদর্শন নামক স্বগুরুকে নমস্কার করিয়া কলাপব্যাকরণানুসারে এই টীকা রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, নৈষধ-চরিতের ভবদত্ত ও বংশীবদন-প্রণীত দুইখানি টীকার অংশ পরিষদের পুথিশালায় আছে।

'রাক্ষসকাব্য' নামক গ্রন্থের রচয়িতা সম্বন্ধে বিবিধ মত দেখিতে পাওয়া যায়।[১] অনেকের মতে ইহা কালিদাস-রচিত। পরিষদের একখানি পুথিতে (১২২৭) ইহার টীকাকে কালিদাসকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।[২]

ছন্দোগ্রন্থের মধ্যে চন্দ্রশেখরকৃত পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রটীকা, যাদবেন্দ্রকৃত পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের তত্ত্বপ্রকাশিকানাম্নী টীকা ও কবিকর্ণপূরকৃত বৃত্তমালা উল্লেখযোগ্য। এই বৃত্তমালা অন্য কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

চন্দ্রশেখরকৃত গ্রন্থের নাম বৃত্তমৌক্তিক। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এই গ্রন্থের একখানি পুথি আছে। ঐ লাইব্রেরীর বিস্তৃত গ্রন্থবিবরণে (২য় খণ্ড, ১১১৪ সংখ্যক পুথি) উহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পরিষদের পুথির শেষে গ্রন্থরচনার তারিখ দেওয়া হইয়াছে এবং একটি বিস্তৃত পুষ্পিকা পুথির শেষে সংযোজিত হইয়াছে।[৩] এই দুইয়ের কোনটাই ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুথিতে নাই। পরিষদের পুথি হইতে জানা যায় যে, ১৬৭৫ শকাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

অলঙ্কারের গ্রন্থের মধ্যে বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের উপর মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য ন্যায়ালঙ্কার-কৃত টীকা (২৯৫) উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যদর্পণের মাত্র চারিখানি টীকা প্রসিদ্ধ।[৪] বর্ত্তমান গ্রন্থ এই চারিখানির অতিরিক্ত। কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি বহু অলঙ্কার গ্রন্থ আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।[৫]

১। Catalogus Catalogorum—I. 497 ; II. 117 ; III. 106.

২। ইতি শ্রীমৎকবিচক্রবর্ত্তিকালিদাসবিরচিতা রাক্ষসকাব্যটীকা সমাপ্তা।

৩। বাণমুনিতর্কচন্দ্রৈর্গণিতেঽব্দে বৃত্তমৌক্তিকং রুচিরং।
... ... চন্দ্রশেখরশ্চক্রে ॥
ইত্যালঙ্কারিকচক্রচূড়ামণিচ্ছন্দঃশাস্ত্রপরমাচার্য্যসকলোপনিষদ্রহস্যার্ণবকর্ণধারশ্রীলক্ষ্মীনাথভট্টাত্মজ-কবিশেখর শ্রীচন্দ্রশেখরভট্টবিরচিতে শ্রীবৃত্তমৌক্তিকে পিঙ্গলবার্ত্তিকে মাত্রাখ্যঃ প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

৪। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—*History of Sanskrit Poetics*—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩৯।

৫। দৃষ্ট্বা ভুরিতরধ্বনিপ্রভৃতিকালঙ্কারশাস্ত্রং মুহু-
স্তন্মূলং চ নিসৃষ্টমর্থনিখিলং কাব্যপ্রকাশস্য চ।
সাহিত্যোত্তরদর্পণং বিশদয়ন্নানন্দয়ন্ সজ্জনান্
ভট্টাচার্য্যমহেশ্বরো বিতনুতে বিজ্ঞপ্রিয়াং টিপ্পনীম্।

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ বিভাগে দুইখানি ছোট ছোট পুথি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। একখানি মন্নুদাস-প্রণীত বালবোধনী (৭১৫), আর একখানি অষ্টশব্দী (২৭০)। অষ্টশব্দীর গ্রন্থকারের কোনও নাম নাই। বালবোধনীতে মুখ্যতঃ ছয় কারকের প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালায় বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যথা,—

যাহারে শ্লাঘা করিয়ে তত্র চতুর্থী · যাহারে ধারিয়ে তত্র চতুর্থী · যাহারে স্পৃহা করি তত্র চতুর্থী · যাহারে কোপ করি তত্র চতুর্থী ॥···মঞ্জুশ্রিয়ং নমস্কৃত্য শিবং প্রণম্য ॥ নমস্কৃত্য মুনিত্রয়ং ॥···যাহারে ভয়ে করিয়ে, তত্র পঞ্চমী ॥···যাহারে শুনিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥···যাহাতে জন্মিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥···যাহা হইতে বারিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥···জাহা হইতে প্রভবিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥···যাহারে স্মরণ করিয়ে তত্র দ্বিতীয়াপঞ্চম্যৌ ভবতঃ ॥

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে সরস্বতীকে নমস্কার করা হইয়াছে এবং চতুর্থীর উদাহরণ প্রসঙ্গে 'মঞ্জুশ্রিয়ং নমস্কৃত্য' ও 'শিবং প্রণম্য' এই দুইটী প্রয়োগ দেখান হইয়াছে। এইরূপ ব্যবহারকে মধ্যযুগের সমাজে বৌদ্ধ ও হিন্দুভাব মিশ্রণের নিদর্শনস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে।

অষ্টশব্দী গ্রন্থে প্রথমতঃ ভূধাতুর পরস্মৈপদ, আত্মনেপদ, ভাববাচ্য, কর্ম্মবাচ্য ও শতৃপ্রত্যয়ে বিভিন্ন রূপ বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তার পর কিম্, যদ্, তদ্, এতদ্, ইদম্, অদস্, যুষ্মদ্, অস্মদ্ এই আটটি সর্ব্বনামের বিভিন্ন বিভক্তিতে রূপাবলী দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই ইহার নাম অষ্টশব্দী। গ্রন্থমধ্যে দুইটি মঙ্গলাচরণ আছে। গ্রন্থপ্রারম্ভে শিবকে নমস্কার করা হইয়াছে। যথা—

নমামি শৈলজাকান্তং সর্ব্বজ্ঞানময়ং শিবম্।
যস্য স্মরণমাত্রেণ নির্ম্মলা ভারতী ভবেৎ ॥

দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠে আর একটী মঙ্গলাচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে মঞ্জুশ্রীকে নমস্কার করা হইয়াছে। যথা,—

নত্বা মঞ্জুশ্রিয়ং নাথং বালানাং বোধহেতবে।
সংগৃহ্যন্তে ময়া শব্দাঃ সুবন্তা বহুসম্মতাঃ ॥

গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, ইহার পঠন-পাঠন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পুষ্পিকাটি এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে,—

ইতি অষ্টসব্দি সমাপ্ত হৈল। সন ১২৭৩ সাল তারিখ ৩০ আসাড় রোজ শুক্রবার······লেখক শ্রীকৈলাষচন্দ্র মিত্রি পাঠক শ্রীনটবর পতদার পঃ বিষ্ণুপুর নিজ সহর বিষ্ণুপুর বাহাদুরগঞ্জ।

সরাদিরাজকৃত 'সারাবলী' নামক সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণগ্রন্থের এক খণ্ডিত পুথি পরিষদে আছে। ইহার সংজ্ঞাগুলি কলাপব্যাকরণের অনুকরণে প্রস্তুত। Catalogus Catalogorum-এ বাদিরাজ-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সারাবলী এবং আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ এক কি না, বলিতে পারা যায় না। ইহার অন্য পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত সারাবলী ব্যাকরণের পুথি অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।[১]

১। মুদাং সুধাং পুস্তকমক্ষমালাং তুঙ্গস্তনৌ চন্দ্রকলাং বহন্তীম্।
প্রণম্য বিদ্যাং বিশদাং ত্রিনেত্রাং সারাবলীমাহ সরাদিরাজঃ ॥

ব্যাকরণের টীকার মধ্যে গোয়ীচন্দ্রকৃত সংক্ষিপ্তসারের টীকার উপর নারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননকৃত ব্যকারদীপিকানাম্নী টীকার পুথি উল্লেখযোগ্য। পুথিখানির লিপিকাল ১৫৩৩ শক, এই গ্রন্থের এত প্রাচীন পুথি এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ডাক্তার এস কে বেল্‌ভেলকর ১৬৩৪ শকে লিখিত ইহার এক পুথির উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

মুগ্ধবোধব্যাকরণের রাম তর্কবাগীশকৃত প্রসিদ্ধ টীকার কয়েকখানি পুথি পরিষদে আছে। ইহাদের মধ্যে একাধিক পুথিতে (১৩৪৭ প্রভৃতি) টীকার নাম দেওয়া হইয়াছে অশোকমালিকা। এই নাম অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কুমারহট্টনিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র গঙ্গাধর ১৭৫৮ শকে 'সেতুসংগ্রহ' নামে (৪৫) মুগ্ধবোধের এক টীকা রচনা করেন। গঙ্গাধরের মতে বোপদেব মাহেশাদি ব্যাকরণ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া মুগ্ধবোধ প্রণয়ন করেন। কবিকল্পলতায় বোপদেব যে আট জন শাব্দিকের নাম করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কিন্তু মহেশের নাম নাই। সেতুসংগ্রহের একখানি পুথি রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় কর্তৃক বিবৃত হইয়াছিল (৪.১৫৪০)। তাঁহার বিবৃত পুথিতে রচনাকালের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।[২]

অভিধান বা তজ্জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে দিগম্বরভট্ট কৃত ললিতাবলী (৮৪৭)[৩] রামকৃষ্ণ ও রায়মুকুট-কৃত অমরকোষের টীকা উল্লেখযোগ্য।

রামকৃষ্ণকৃত অমরকোষের টীকার নাম নামলিঙ্গকৌমুদী (১০২৭)। এই রামকৃষ্ণের কোনও পরিচয় গ্রন্থমধ্যে নাই। তবে তিনি যে বৈষ্ণব ছিলেন এবং নামকীর্ত্তন জন্য পুণ্য-লাভের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আভাস মঙ্গলাচরণ-শ্লোক হইতে পাওয়া যায়।[৪] ইণ্ডিয়া অফিসে নয়নানন্দ শর্ম্মকৃত অমরকোষকৌমুদী নামে অমরকোষের আর একখানি 'কৌমুদী'নাম্নী টীকা আছে।[৪]

জ্যোতিষ

জ্যোতিষের গ্রন্থের মধ্যে মুক্তাদিত্যকৃত বালবোধ, পরাশরস্ফুট (১১১০), শ্রীবিবুধচন্দ্র গণভৃৎশিষ্য সিংহতিলকসূরি-রচিত ভুবনদীপকবৃত্তি (১৪২২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভুবনদীপক পদ্মপ্রভ সূরীন্দ্র কর্তৃক রচিত। সিংহতিলক নানা শাস্ত্র আলোচনা

১। *Systems of Sanskrit Grammar*—পৃঃ ১১০।

২। গঙ্গাধরঃ শিবং নত্বা কুরুতে সেতুসংগ্রহম্।
দুর্গমামুগ্ধবোধাখ্যসরিৎসন্তরণার্থিনাম্ ॥
অত্র যৎ স্খলিতং স্যান্মে প্রমাদেন ভ্রমেণ বা।
যাচেঽহং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা সন্তঃ সংশোধয়ন্তু তৎ ॥

মাহেশব্যাকরণাদিভ্যঃ সারমাকৃষ্য সংক্ষেপেণ মুগ্ধবোধং নাম ব্যাকরণং কুর্ব্বন্ গ্রন্থকারঃ.........

ইতি কুমারহট্টনিবাসিশ্রীশিবপ্রসাদতর্কপঞ্চাননাত্মজগঙ্গাধরকৃতদুর্গমমুগ্ধবোধাখ্যসরিৎসন্তরণহেতু-সেতুসংগ্রহে ইক্ষ্বাদিপাদঃ ॥ ইতি কৃদন্তাধ্যায়ঃ ॥ দ্বিজগঙ্গাধরঃ শাকে বাজিবাণাদ্রিচন্দ্রমে। সংগ্রহং সককারেমং ধ্যাত্বেহহিখেলনং যথা ॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥

৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—*Notices etc.* ১।৩২৫

৪। প্রণম্য নন্দতনয়ং বাচাং সকলনামভিঃ।
তন্মতে রামকৃষ্ণেণ নামলিঙ্গাখ্যকৌমুদী ॥ *Descriptive Catalogue etc.* ২।৯৮২

করিয়া ইহার বৃত্তি রচনা করেন। বৃত্তির পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, ইহা ১৩২৬ শকে খালুপুরে লিখিত।[১]

সঙ্গীত-শাস্ত্র

সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে পরিষদে একখানি পুথি আছে। এই পুথিখানি নারদ-কৃত পঞ্চমসারসংহিতা নামক গ্রন্থের। এই গ্রন্থের একখানি খণ্ডিত পুথির অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় দিয়াছেন (মিত্র—১।৩২২)।

গ্রন্থের প্রারম্ভে সঙ্গীতশাস্ত্রের উৎপত্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মাপ্রণীত সঙ্গীতসংহিতা স্বর্গে প্রচলিত; তুম্বুরুসংহিতা পাতালে প্রচলিত আর দেবর্ষি ভরতরচিত সংহিতা ভূতলে অবস্থিত। সংহিতার প্রচারের জন্য ভরত ধ্যানপ্রভাবে ভদ্রনামক নটকে সৃষ্টি করেন।[২] ভদ্রের পুত্র সুভদ্র, সুভদ্রের পুত্র অতিভদ্র, অতিভদ্রের পুত্র বীরভদ্র। বীরভদ্র গানের দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া গণাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। বীরভদ্রের পুত্র বিশ্বভদ্র। বিশ্বভদ্রের পুত্র ভদ্রকর্ম্মা শাস্ত্রবিচক্ষণ ছিলেন। ভদ্রকর্ম্মা দেবগণকর্তৃকও স্তুত হইতেন। তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ নানা দেশে ছড়াইয়া পড়েন। ভদ্রকর্ম্মার বংশ কিরূপে ভারতের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল, এ গ্রন্থে তাহার বিবরণ দিতে যাইয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, প্রাচ্য দেশের লোক গুণবান্ ও নানা শাস্ত্রে বিচক্ষণ এবং রাঢ়ে অবস্থিত সেই বংশের লোকই প্রসিদ্ধ নট।[৩]

প্রথম অধ্যায়ে সঙ্গীত শাস্ত্রের উৎপত্তির কথা বলিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্গীত বিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে[৪] এবং সঙ্গীতের নানা অঙ্গের বিষয় বলা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রাগের আলোচনা। শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র গোপীর গান হইতে ষোড়শ সহস্র

১। রসযুগলগুণেন্দুবর্ষে (১৩২৬) শাস্ত্রে ভুবনদীপকে বৃত্তিঃ।
ব্যবরাঙ্গবাটকাদিহ বিশোধ্য খালুপুরে লিখিতা॥

২। রম্ভয়া রচিতা স্বর্গে ততঃ সঙ্গীতসংহিতা।
প্রচকার তয়া শক্রো নাট্যানুষ্ঠান মা (?) নাৎ॥
প্রচচার চ পাতালে হুহুস্তুম্বুরুসংহিতাম্।
দেবর্ষের্ভরতস্যাপি সংহিতা ভূতলে স্থিতা॥
সংহিতানাং প্রচারায় মনসা ভরতাদয়ঃ।
ভদ্রং নাম নটং চক্রুস্ততো ধ্যানপ্রভাবতঃ॥
অব্যাহতগতিঃ স্বর্গে পাতালে চ তথা ভুবি।
অনুষ্ঠানেন চ গীতানাং ততঃ সর্ব্বান্ অতোষয়ৎ॥

৩। তস্য পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বভূবুঃ পরমোজ্জ্বলাঃ।
দ্বারকামাশ্রিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ রুদ্রপুরে স্থিতাঃ।
কেচিৎ প্রাচ্যামুদীচ্যাঞ্চ দক্ষিণস্যাং তথাপরে॥
প্রাচ্যাং প্রায়েণ গুণিনো নানাশাস্ত্রবিচক্ষণাঃ।
রাঢ়ায়াং সংস্থিতা যে চ তে নটা পুরুষোত্তমাঃ॥

৪। সঙ্গীতকেন রম্যেণ সুখং যস্য ন চেতসি।
মনুষ্যপশুরুক্তোঽয়ং বিষয়ৈরথ বঞ্চিতঃ॥—(৩০ খ)

রাগের উৎপত্তি।[১] চতুর্থ অধ্যায়ে তালের উৎপত্তি। ভদ্র, সুভদ্র প্রভৃতি কে কত তাল প্রচার করেন এবং কোন্ দেশে কত তাল প্রচারিত আছে, এই অধ্যায়ে তাহা বলা হইয়াছে।[২]

কামশাস্ত্র

এই বিষয়ে পরিষদে অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থ আছে। মীননাথকৃত স্মরদীপিকায় গ্রন্থকার প্রথমে মহাদেবের অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তিকে ও কামদেবকে নমস্কার করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বালকদিগের ব্যুৎপত্তি ও স্ত্রীলোকের চিত্ততুষ্টির জন্য লিখিত।[৩] মীননাথ যখন কদলীপত্তনে কামমুগ্ধ অবস্থায় দিন কাটাইতেছিলেন, তখন এই গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকিতে পারে।

তান্ত্রিকের নামেও কয়েকখানি কামশাস্ত্রের বই পাওয়া গিয়াছে। বীরণ দেশিকেন্দ্র-রচিত স্মরতত্ত্বপ্রকাশিকা, স্মররহস্যব্যাখ্যা ও স্মরাদিমাতৃকাস্তোত্র মাদ্রাজ ওরিয়েণ্টল লাইব্রেরীর পুথিশালায় আছে। তান্ত্রিকদের মতে তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য দেহের বিস্তৃত জ্ঞান অর্জ্জন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যেই প্রমোদযতি-কৃত 'যোগসংগ্রহে'র (১৬।১) প্রথমেই গর্ভোৎপত্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তান্ত্রিকগণও এইরূপ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই কামশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আলোচনা করা দরকার।

কামদেব-কৃত রতিমঞ্জরীর প্রথমে শিব ও দেবীকে নমস্কার করা হইয়াছে। কামদেবের মতে কামশাস্ত্র জানিলে মানুষ দেবতার মত হয়, আর কামশাস্ত্র না জানিলে মানুষ পশুতুল্য হইয়া থাকে।[৪] রতিমঞ্জরীর একখানি পুথি Catalogus Catalogorum গ্রন্থে (২।১১৪) উল্লিখিত হইয়াছে।

১। গোপীভির্গেতুমারব্ধমেকৈকং প্রিয়সন্নিধৌ।
তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রাণি চ ষোড়শ॥—(৫ক)

২। অষ্টোত্তরশতং স্বর্গে পশ্চিমে পঞ্চমং তথা।
দক্ষিণে পঞ্চ লঙ্কায়াং সপ্ত সপ্ত চ সিংহলে॥— (৮ক)

৩। অনেককামশাস্ত্রাণাং সারমাকৃষ্য যত্নতঃ।
বালব্যুৎপত্তয়ে স্ত্রীণাং চিত্তসন্তোষণায় চ॥
শ্রীমতা মীননাথেন ক্রিয়তে স্মরদীপিকা॥

Catalogus Catalogorum (১।৭৪৬) গ্রন্থ হইতে জানা যায়, এই নামের একখানি পুথি টুবিন্‌জেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আছে।

৪। নত্বা ভক্ত্যা শিবং দেবং দেবীঞ্চৈব মনোরমাং।
রচিতা কামদেবেন সুবোধা রতিমঞ্জরী॥
কামশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি শতসারসমাবৃতং।
সুবোধং চাপি সংক্ষিপ্তং কামদং অল্পবোধিনাং॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মধ্যে কামোঽপি দৃশ্যতে।
পুরুষার্থো মহান্ কামস্তস্মাৎ কামং বিভাবয়েৎ॥
সম্যক্ কামং পরিজ্ঞায় দেববদ্ রমতে নরঃ।
কামশাস্ত্রমজানন্তো রমন্তে পশবো যথা॥

ইতিহাস

ইতিহাসবিষয়ক পুথি অতি অল্পই পরিষদে আছে। এই শ্রেণীর পুথির মধ্যে নৃপ-কীর্ত্তিচন্দ্রিকা ও দীপিকানাম্নী তাহার টীকা এবং কয়েকখানি কুলজী গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতাস্থ শোভাবাজার রাজবাড়ীর নবকৃষ্ণ, গোপীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, দেবীকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, যাদবকৃষ্ণ, নগেন্দ্রকৃষ্ণ, উপেন্দ্রকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ—এই কয় জনের কিছু কিছু বিবরণ দিয়া রাজকিশোর নামক কবি এই ইতিহাসকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মার বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী গ্রন্থে যেরূপ বিবিধ শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের এক সভার বিবরণ আছে, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর অনুবাদক কালীকৃষ্ণের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া রাজকিশোর সেইরূপ এক সভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।[১] এই গ্রন্থের দীপিকা-নাম্নী টীকার রচয়িতা আনন্দচন্দ্র।[২] পুষ্পিকায় ইনি আনন্দচন্দ্র ভিষক্ এই নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। দীপিকার পুথির সঙ্গে রাজকিশোরের স্বকৃত টীকার তিনটি পত্র পাওয়া গিয়াছে।[৩]

ইহা ছাড়া, পরিষদের সংগৃহীত পুথির মধ্যে কয়েক জন পাণ্ডিত্যোৎসাহী রাজা বা জমিদারের নাম পাওয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকদিগের নিকট আদর হইতে পারে বিবেচনায় এ স্থলে তাঁহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৭৩১ শকে বৈদ্যনাথ নামক ব্রাহ্মণ রাজার মন্ত্রীর আদেশে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ড (৪৬) সংশোধিত হইয়াছিল।[৪] কালী-ভক্ত হরিশ্চন্দ্র রাজার আদেশে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের বৃহস্পতিবার পদ্মলোচন শর্ম্মা সযত্নে উগ্রতারাসহস্রনামস্তোত্র নামক পুথি লিখিয়াছিলেন। পদ্মলোচন বলিতেছেন যে, তিনি অর্থ বা বস্ত্রের প্রার্থী ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে কিছু বৃত্তি দিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন।[৫] যে সময়ে মল্লদেব রাজা, সেই সময় কবি কর্ণপূর 'বৃত্তমালা' নামক এক ছন্দের বই লিখিয়াছিলেন।[৬]

১। নৃপকালীকৃষ্ণস্য বিদ্বৎসামাজিকচ্ছাত্রগণপরীক্ষণোপাখ্যান (৫২ক)। নৃপসভারম্ভনোপাখ্যান (৫৪খ)।

২। প্রকীর্ত্তিতা যা নৃপকীর্ত্তিচন্দ্রিকা লসদ্যশোরাজকিশোরধীমতা।
ত্রিপাদটীকাপি তদস্তিমং (?) সতাম্ আনন্দচন্দ্রস্তনুতে মুদে মুদা॥

৩। ব্যাহৃত্য যত্নৈর্নৃপকীর্ত্তিচন্দ্রিকাং তস্যাস্তনোতি স্বত এব টীকাম্।
নিজেপ্সিতার্থস্য পরং বিকাশকৃতে শ্রিয়া রাজকিশোর এব॥

৪। শাকে সিন্ধুদিগদ্রিভূবিগণিতে শ্রীবৈদ্যনাথাহ্বয়-
স্বাদেবোত্তমবঙ্গভূপসচিবাদেশাদ্ যথালোচনম্।
শ্রীরামাৎ পরমেশ্বরেণ ধরণীদেবেন সংশোধিতম্
খণ্ডং প্রাকৃতমুগ্রকং সদন্বিতাখ্যানাস্তমত্যাদরাৎ॥—(পুথিসংখ্যা ৪৬)।

৫। জ্যৈষ্ঠে মাস্যসিতে পক্ষে সমাপ্তং গুরুবাসরে।
যত্নেন লিখিতং তন্ত্রং পদ্মলোচনশর্ম্মণা॥
শ্রীহরিশ্চন্দ্রাখ্যভূপস্য কালীভক্তিযুতস্য চ।
আদেশাল্লিখিতং তন্ত্রং পদ্মলোচনশর্ম্মণা॥
মুদ্রাং ন যাচতে বিপ্রো যাচতে নৈব বস্ত্রকম্।
কিঞ্চিৎ বৃত্তিং প্রদত্ত্বা চ স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ॥—(পুথিসংখ্যা ১২৪৬)।

৬। কবিনা কর্ণপূরেণ গুরুসম্মতকর্ম্মণা।
মল্লদেবে মহীপালে বৃত্তমালেয়মারচি॥—(পুথিসংখ্যা ১০৩১)

মিথিলার রাজা ভৈরবেন্দ্র, বাচস্পতির সহকারিতায় মহাদাননির্ণয় (১৫৯২) নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে ভৈরবেন্দ্র নিজের এবং নিজের পূর্ব্বপুরুষগণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।[১]

রঘুনাথ সার্ব্বভৌম কামদেব নামক রাজার আদেশে সংকৃত্যমুক্তাবলী নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[২] বোধ হয়, ইনিই রত্নেশ্বর রায় ভূপতির আদেশে স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব প্রণয়ন করেন।[৩]

বিশ্বনাথ নামক লেখক গান্ধর্বীসরোবরের তীরে গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা সম্পূর্ণ করেন। বোধ হয়, সেই প্রতিলিপি দৃষ্টে হরিমোহন দাস ১২৭১ সাল, ৩রা মাঘ, রবিবার এই গ্রন্থের আর একখানি নকল করেন।[৪]

জ্যোতিষের গ্রন্থ ভুবনদীপকবৃত্তি ব্যবরাঙ্গবাটকে বিশোধিত এবং থালুপুরে লিখিত হইয়াছিল। বনমালী আচার্য্য-কৃত তান্ত্রিক নিবন্ধগ্রন্থ 'রহস্যার্ণব' ত্রিগর্ত্তের অধিপতির আদেশে রচিত হইয়াছিল (*Descriptive Catalogue Sanskrit Manuscripts in the India Office Library* ৪। ২৫৯১—২)

মিথিলার মহারাজাধিরাজ কর্ণের পুত্র অনুপসিংহের আদেশে নীলকণ্ঠ 'শিবতাণ্ডবীয়াঙ্ক-যন্ত্রব্যাখ্যা' রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থারম্ভে আছে। (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—*Notices* etc. ১।৩৬০)।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১। আসীন্মৈথিলমেদিনীশতমথপ্রত্যর্থিসীমন্তিনী-
নিত্যোদ্গীতভুজপ্রতাপতপনপ্রোত্তপ্তসপ্তার্ণবঃ।
চঞ্চৎকীর্ত্তিকুমুদ্বতীপরিমলপ্রাগ্‌ভাবিভূমণ্ডলো
রাজশ্রোত্রিয়বংশভূষণমণিঃ শ্রীমাণ্ডরেশঃ কৃতী ॥
অন্বায়বায়মমলং বিমলীকরিষ্যন্ কীর্ত্ত্যা দিশো দশ মুহুর্ধবলীকরিষ্যন্।
সংগ্রামসীমনি ভটাংস্ত্রিদশীকরিষ্যন্ আবির্বভূব তনয়ো হরিসিংহদেবঃ ॥
স্বদোর্লীলালেশপ্রতিবিজিতবৈরিক্ষিতিপতি-প্রিয়াভির্নিস্তন্দ্রং কৃতচরণসেবাবিধিবতঃ।
কৃতক্রীড়ো নিত্যং সমিতি নরসিংহো নৃপতি [নরপতি ?]
যশশ্চন্দ্রোদ্যোতৈরজনি রজনীজানিবিজয়ী ॥
বিরোধিবরবর্ণিনীনয়নবারিকল্লোলিনীবিলুপ্তঘনজাঙ্গলং জগ[দ]নুপমেবাভবৎ।
যদীয়সমরোদ্যমে বিকসতি স্ফুরদ্বিক্রমে ততো গুণমহার্ণবাদজনি ভৈরবেন্দ্রো নৃপঃ ॥
অয়ং বাগ্‌বিলাসানতীতঃ কবীনাং গুণৈর্দ্দোঃপ্রতাপানতীতো ভটানাম্।
ত্রিলোকীপতিপ্রেয়সীবাসভূমিঃ পুনীতে জগন্মণ্ডলং রাজচন্দ্রঃ ॥
বিধায় সরসীঃ শতং নগরপত্তনাদীনদাৎ বিজিত্য রিপুভূপতীন্ বহুবিধাংস্তুলাপুরুষান্।
স এব নৃপভৈরবঃ সমরসীম্নি পঞ্চাননো জয়ত্যরিবিদারকো জগতি রাজবৃন্দারকঃ ॥
শ্রীবাচস্পতিধীরং সহকারিতয়া সমাসাদ্য।
শ্রীভৈরবেন্দ্রনৃপতিঃ স্বয়ং মহাদাননির্ণয়ং তনুতে ॥

২। ধীরাঃ প্রণম্যাহথ নিবেদয়ামি
শ্রীকান্তদেবধরণীতলবাসবস্ত।—['স্ত'এর উপরে 'ম' অক্ষর রহিয়াছে]
আজ্ঞামবাপ্য রচিতো যদয়ং নিবন্ধো
দোষো ন মে বলবতীহ যতো নৃপাজ্ঞা ॥—(পুথিসংখ্যা ৭৩১)।

৩। নত্বা শ্রীরঘুনাথ ঈশ্বরপদাম্ভোজং গুরুকাদরাৎ
মন্বাদিস্মৃতিসংগ্রহার্থমবধার্য্যাচার্য্যবাক্যেন চ।
বালানাং পটুতাবিধায়কমমুং স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণবং
শ্রীরত্নেশ্বররায়ভূপতিলকস্যাদেশতো নির্ম্মমে ॥—(পুথিসংখ্যা ১৫৮৮)।

৪। শ্রীমদ্‌গোপালতাপন্যা বিবৃতিঃ পূর্ণতাং গতা।
গান্ধর্বীসরসস্তীরে বিশ্বনাথাখ্যলেখকাৎ ॥—(পুথিসংখ্যা ৫৭)।
মুক্তিময় ১২৭১। ৩ মাঘ রবিবারে লিখিতং শ্রীহরিমোহন দাসেন ॥০॥

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস

১৮২৩—১৮৩৫ সেপ্টেম্বর

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

১৮২৩ সালের মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন

মুদ্রিত যে-সকল পুস্তক, পুস্তিকা বা সাময়িক পত্রে সংবাদ, সরকারী আইন ও বিচারপদ্ধতির এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সমালোচনা থাকিত, কেবল তাহাদের জন্য নূতন আইন সৃষ্টি হইল। এই আইন অনুসারে কোন সাময়িক পত্র বাহির করিবার পূর্ব্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশ করা ছিল। কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হলফ করিয়া, সেই হলফনামা গবর্ন্মেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইলে তবে লাইসেন্স বা অনুমতি মিলিত, সে জন্য কোনও ফি দিতে বা খরচ করিতে হইত না। কি কি বিষয়ের আলোচনা সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ, তাহার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেক সম্পাদককে দেওয়া থাকিত; তাহা সত্ত্বেও আইন-নিষিদ্ধ কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে, কাগজের লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়া হইত। বে-আইনিভাবে কাগজ চালাইলে চারি শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

১৮৩৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর স্যর চার্লস মেটকাফ সাময়িক পত্রের স্বাধীনতা-বিরোধী সকল বিধি তুলিয়া দেন। সুতরাং ১৮২৩ সনের এপ্রিল হইতে ১৮৩৫ সনের মাঝামাঝি—এই বারো বৎসরের মধ্যে যে-সকল সাময়িক পত্রের উদ্ভব হয়, তাহাদের নামধাম সরকারী দপ্তর হইতে সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য যে-সব কাগজে সংবাদ বা রাষ্ট্রিক আলোচনা থাকিত না, তাহাদের লাইসেন্স লইতে হইত না, সুতরাং তাহাদের নামধাম সরকারী দপ্তরে পাইবার কথা নয়।

ভারত-গবর্ন্মেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে রক্ষিত লাইসেন্সের মূল আবেদনপত্রগুলি ও প্রদত্ত লাইসেন্সের নকলগুলি আমার দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। এই-সকল লাইসেন্স হইতে কাগজগুলির সঠিক প্রচারকাল জানা যায় না বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লাইসেন্স পাইবার মাস-খানেকের মধ্যেই কাগজ প্রচারিত হইয়াছিল। আবার দু-একটি ক্ষেত্রে এমনও ঘটিয়াছে যে, লাইসেন্স লওয়া সত্ত্বেও কাগজ প্রকাশিত হয় নাই।

১। সম্বাদ তিমিরনাশক

কলিকাতার ৪০ নং মীর্জ্জাপুর হইতে এই বাংলা সংবাদপত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্ণমোহন দাসকে সরকার ১৮২৩ সনের ২১এ আগষ্ট লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে (কার্ত্তিক ১২৩০) কাগজখানি প্রকাশিত হয়। ১৮২৩, ২৯এ নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি,—

"সুসম্বাদ ॥—একনবতি সংখ্যক চন্দ্রিকালোকে আলোকিত হইল যে সম্বাদ তিমিরনাশক নামে এক অভিনব সম্বাদপত্র প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে আমরা অতিহৃষ্ট হইলাম যেহেতুক তৎপ্রকাশক ব্যক্তি তিমির নাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে ফল সিদ্ধির সম্ভাবনাও বটে সে যে হউক সৎকর্ম্মের উদ্যোগও শুভসূচক। ইতর লোকেও কহে যে খোষ খবরের ঝুটও ভাল অতএব তাহার দোষ গুণ বিবেচনার আবশ্যকতা বড় নাই যেহেতুক সকল লোক স্ব স্ব বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহার দোষাদোষ বিবিচ্য নহে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিই প্রশংসনীয়া।"

কলিকাতা হইতে যে-সব বাংলা সংবাদপত্র ১৮৩১ সনের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্বাদ তিমিরনাশক পত্রে তাহার ইতিহাস বাহির হয়। ১৮৩২, ২১এ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই ইতিহাস পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"...সন ১২৩০ সালের কার্ত্তিক মাসে তিমিরনাশক নামক এ অকিঞ্চনদ্বারা সৃষ্টি হয় ৭ বৎসর প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে দুইবার প্রকাশ করিতেছি...,"

'সম্বাদ তিমিরনাশক' রক্ষণশীল দলকে সর্ব্বদাই তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত, এবং যখন-তখন উদারপন্থীদের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে ত্রুটি করিত না। ১৮৩৭ সনের পূর্ব্বেই কাগজখানির মৃত্যু হয়।*

২। বঙ্গদূত

চারিটি ভাষায় (ইংরেজী, বাংলা, ফার্সী ও নাগরী)† 'বেঙ্গল হেরল্ড' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য ৭ নং বাঁশতলা গলির সার্জন্ আর. মণ্টগোমারি মার্টিনকে ১৮২৯, ৫ই মে তারিখে লাইসেন্স দেওয়া হয়। এই 'বেঙ্গল হেরল্ড'-এর বাংলা-বিভাগের নাম 'বঙ্গদূত'। বঙ্গদূতের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮২৯ সনের ১০ই মে তারিখে।‡ পরবর্ত্তী ২৩এ মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি,—

"নূতন সমাচার প্রকাশ। মোং বাঁশতলার গলির মধ্যে হিন্দু হরল্ড অর্থাৎ বঙ্গদূত প্রেষ নামক এক নূতন ইংরেজী বাঙ্গলা ও পারসী এবং নাগরী সমাচার গত রবিবারাবধি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহার সম্পাদক শ্রীযুত আর এম মার্টিন সাহেব ও শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় ও শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু রাধানাথ

* "The Koumudee, established by Ram Mohun Roy, which had long been in a very precarious state, has ceased to exist. The *Timir-nasuk*, or 'Destroyer of darkness'....has also become defunct...*Friend of India*, Jan. 5." (Cited by *Asiatic Journal* for June 1837, Asiatic Intelligence---Calcutta, p. 98.)

† R. Montgomery Martin's *Hist. of the British Colonies*, i. 253 দ্রষ্টব্য। বঙ্গদূতের "সহচর" ছিল *Bengal Herald* নামক ইংরেজী সমাচারপত্র।

‡ ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে এই সমাচারপত্রের সঠিক প্রকাশকাল উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুমান ইহা "১৮৩০, ৪ এপ্রিল (?)" তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। (*Calcutta Review*, Aug. 1922, p. 283.)

মিত্র এই কএকজনে একত্র হইয়াছেন এই কাগজ প্রতিরবিবারে প্রকাশ হইতেছে··· ।”

বঙ্গদূতের প্রত্যেক সংখ্যার দুই-তিন পৃষ্ঠা ফার্সীতে লিখিত। কাগজের শেষ পৃষ্ঠার সর্ব্বশেষে লেখা থাকিত,—

“এই বঙ্গদূত প্রতি শনিবার রাত্রে মুদ্রিত থাকিবেন রবিবার প্রভাতে রবিপ্রকাশের সহিত প্রকাশ পাইবেন ইহার মাসিক বেতন ১ তঙ্কা মাত্র। যে কেহ এই সমাচার পত্র গ্রহণেচ্ছুক হইবেন তিনি গবরণমেণ্ট হৌসের পূর্ব্ব বাঁশতলার গলিতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি ॥”

বঙ্গদূতের সম্পাদক ছিলেন—সুপণ্ডিত নীলরত্ন হালদার। ১৮২৯ সনের ১৯এ ডিসেম্বর তারিখের কাগজে (পৃ. ৩৪৬-৪৭) প্রচলিত সমাচার পত্রের একটি তালিকা মুদ্রিত হয়; তাহা হইতে কেবল দেশীয় ভাষার সমাচার পত্রগুলির নামধাম উদ্ধৃত করিতেছি,—

শ্রীরামপুরে ইংরাজী বাঙ্গালা প্রকাশ হয়।

১	সমাচার দর্পণ	মেং জান মার্শমন

কলিকাতাতে পারস্যভাষায় সাপ্তাহিক সম্বাদ।

১	জামিজাহাঁনুমা	শ্রীযুত হরিহর দত্ত

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হয়।

১	বঙ্গদূত Editor	শ্রীযুত নীলরত্ন হালদার
২	সমাচার চন্দ্রিকা	,, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩	সম্বাদ কৌমুদী	,, হলধর বসু
৪	সম্বাদ তিমিরনাশক	,, কৃষ্ণমোহন দাস

অবকাশের অভাবে নীলরত্ন হালদার কিছুদিন পরে বঙ্গদূতের সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইলে, ভোলানাথ সেন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার জন্য তাঁহাকে ১৮৩০, ১৩ই এপ্রিল তারিখে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইয়াছিল। ১৮৩১, ১৬ই মে (৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৩৮) তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন,—

“এতন্নগরের বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসি শ্রীযুত রাধামোহন সেনের পুত্র শ্রীযুত ভোলানাথ সেন যিনি শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কর্ম্ম করেন ঐ সেনজ বঙ্গদূত নামক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক হইবেক এবং তিনি রিফার্ম্মর নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় মাস ত্রয়াধিক হইবেক··· ।”

ভোলানাথ সেনের মৃত্যু হইলে, মহেশচন্দ্র রায় অল্পদিন কাগজখানি চালাইয়া বন্ধ করিয়া দেন।

'বঙ্গদূত'-এর ফাইল।—

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :—প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা (১৮২৯, ২৩এ মে) হইতে ১৮২৯ ২৬এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।
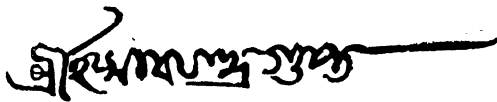
৩। শাস্ত্রপ্রকাশ

১৮৩০ সনের জুন মাসের মাঝামাঝি এই সাপ্তাহিক পত্রখানির আবির্ভাব হয়; ইহা প্রতি বুধবারে প্রকাশিত হইত। 'শাস্ত্রপ্রকাশে' কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় আলোচনাই স্থান পাইত। ১৮৩০ সনের ২৬এ জুন তারিখের সমাচার দর্পণে দেখিতেছি,—

"নূতন সম্বাদপত্র। কলিকাতা নগরস্থ শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের আফিসে শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়া আমারদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেননা সামান্যতঃ সম্বাদপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে ইহাতে সেরূপ সমাচার প্রচার না হইয়া বেদবেদাঙ্গ পুরাণোপপুরাণাদি শ্লোকের প্রকৃতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির ইতিকর্ত্তব্যতা নানাশাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া সকল লোকের সহজে বোধার্থে চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবে...এই শাস্ত্রপ্রকাশে প্রকাশিত শাস্ত্রঘটিত বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং তাহা সপ্তাহে২ প্রকাশ হইবে ও তাহার মূল্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক।"

কাগজখানি কিন্তু বেশী দিন চলে নাই। বৎসরকালের মধ্যেই ইহার প্রচার রহিত হয়।

৪। সংবাদ প্রভাকর

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এর নাম অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। সংবাদ প্রভাকর প্রেস (৩২ নং সিমলা) হইতে প্রতি শুক্রবার এই বাংলা সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য পাথুরিয়াঘাটা হইতে গুপ্ত-কবি সরকারের নিকট আবেদন করেন। আবেদনপত্রখানি ইংরেজীতে লেখা, গুপ্ত-কবি তাহাতে বাংলায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্বাক্ষরের প্রতিলিপি

১৮৩১ সনের ১১ই জানুয়ারি তারিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। পরবর্ত্তী ২৮এ জানুয়ারি (১৬ মাঘ, ১২৩৭) সাপ্তাহিক সমাচারপত্ররূপে সংবাদ প্রভাকরের প্রথম উদয় হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে ১৮৩১, ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখের নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

"পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকরনামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে যে তৎপ্রকাশক হিন্দু ধর্ম্ম নাশেচ্ছুকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন যেহেতুক প্রভাকরপ্রকাশকের যুক্তি উক্তিদ্বারা শক্তি ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে সাধু মহাশয়েরা এ সম্বাদপত্রের সম্বাদ শুনিলে ঔদাস্য না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন।"

'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশে পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গুপ্ত-কবি ১৮৫৬, ১২ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ, ১২৬৩) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়, অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

৺বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না, চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। [১২]৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে [১২]৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।"*

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে "প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছুদিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।" এই প্রসঙ্গে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন,—

"প্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবলম্বন। আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে সম্বাদ প্রভাকরনামক এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রখরতর কর প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রকাশক ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাসপর্য্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ম্মদ্বেষী হন নাই কেননা ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার।…"†

দেখা যাইতেছে, প্রায় দেড় বৎসর চলিবার পর ১৮৩২ সনের ২৫এ মে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

চারি বৎসর পরে, ১৮৩৬ সনের ১০ই আগষ্ট (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) সংবাদ প্রভাকর পুনঃপ্রকাশিত হইল ; তবে এবার আর সাপ্তাহিকরূপে নহে,—বারত্রয়িক রূপে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন :—

"১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন

* মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির "বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস' প্রবন্ধে উদ্ধৃত। (জন্মভূমি, শ্রাবণ ১৩০৪)।

† ১৮৩২, ২ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও তদনুজ বাবু গোপালচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটি করেন না।"*

এইভাবে তিন বৎসর চলিবার পর ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। বাংলা ভাষায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। ১৮৫১ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখের সংবাদ প্রভাকরে দেখিতেছি,—

"প্রভাকর পত্রের সংক্ষেপ বিবরণ।...১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ শুক্রবাসরে ইহার জন্ম হয়, তৎকালীন সপ্তাহে শুদ্ধ একবার করিয়া প্রকাশ হইত। ১২৪৩ সালের ২৭ শ্রাবণ বুধবারাবধি ৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠপর্য্যন্ত সপ্তাহে বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ হইয়া তৎপরদিবসেই অর্থাৎ ঐ সালের ১ আষাঢ় অবধি অদ্য দিবসপর্য্যন্ত যথানিয়মে ক্রমশঃ দৈনিক-রূপে প্রকটিত হইতেছে।"

দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া, 'সংবাদ প্রভাকরে' ধর্ম্ম সমাজ সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা থাকিত। সেকালের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই সংবাদ প্রভাকরের লেখক ছিলেন, যেমন—রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি অনেকের বাল্যরচনা সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে ইহার লেখক ও অনুগ্রাহক সম্বন্ধে গুপ্ত-কবি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম,—

১। শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। ২। শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিরোমণি। ৩। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। ৪। বাবু নীলরতন হালদার। ৫। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। ৬। ব্রজমোহন সিংহ। ৭। গোপালকৃষ্ণ মিত্র। ৮। বিশ্বম্ভর পাইন। ৯। গোবিন্দচন্দ্র সেন। ১০। ধর্ম্মদাস পালিত। ১১। বাবু কানাইলাল ঠাকুর। ১২। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৩। বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৪। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত। ১৫। শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬। প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ। ১৭। রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর। ১৮। হরিমোহন সেন। ১৯। জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক। ২০। সীতানাথ ঘোষ। ২১। গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২। যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ২৩। হরনাথ মিত্র। ২৪। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। ২৫। গোপালচন্দ্র দত্ত। ২৬। শ্যামাচরণ বসু। ২৭। উমানাথ চট্টোপাধ্যায়। ২৮। শ্রীশ্রীনাথ শীল। ২৯। শম্ভুনাথ পণ্ডিত।

"সীতানাথ ঘোষ হইতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত পর্য্যন্ত কয়েক জন তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের লেখক-বন্ধুর শ্রেণীমধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।

* সংবাদ প্রভাকর, ১২৫৩ সাল ১লা বৈশাখ (জন্মভূমি, শ্রাবণ ১৩০৪ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। অতএব ইহাঁদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু। ইহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃতবন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃপুনঃ শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা, নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য, কি পদ্য—উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।

"ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র; যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর, ৺চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইহাঁদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন।

"প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।"*

১২৬০ সালের বৈশাখ (১৮৫৩) হইতে প্রভাকরের একটি মাসিক সংস্করণ বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই মাস-পয়লার কাগজগুলিতে "সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্ব্বশেষ—মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম্ম প্রকটিত হইবেক।"

সংবাদ প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক ছিলেন—শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুপ্ত-কবির

* জন্মভূমি, শ্রাবণ ১৩০৪, পৃ. ২৪৩-৪৪।

অনুপস্থিতিতে তিনিই সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। ১৮৫০ সনের ২১এ ডিসেম্বর (৭ পৌষ ১২৫৭) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে দেখিতেছি,—

"প্রভাকর সম্পাদকের নিবেদন।—এক বৎসর অতীত হইল আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম, সংপ্রতি দুই দিবস হইল শ্রীশ্রী৺বারাণস্যাদি ধাম দর্শন করণানন্তর কলিকাতা মহানগরে প্রত্যাগত হইয়াছি, আমার অনবস্থান সময়ে সহকারি সম্পাদক শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের গুরুতর কর্ম্ম যে প্রকারে নিষ্পাদিত করিয়াছেন বোধ করি তাহাতে আপনারদিগের সংপূর্ণ সন্তোষ জন্মিয়া থাকিবেক, যেহেতু তিনি অতি সুরীতিক্রমে যথা নিয়মে কার্য্য সম্পাদনে ত্রুটি করেন নাই,...।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কলিকাতা।

প্রভাকর সম্পাদক।"

৮ অগ্রহায়ণ ১২৫৭।

১৮৫৯, ২২এ জানুয়ারি (১০ মাঘ ১২৬৫) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোকগমন করিলে তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক হন। কাগজখানি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

'সংবাদ প্রভাকর'-এর ফাইল।—

কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :— ১২৫৩-৫৫ ও ১২৫৭-৬২। (অসম্পূর্ণ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :— ১২৫৮-৬১। ১২৮৫, ২ পৌষ—৩০ ফাল্গুন। (অসম্পূর্ণ)

শ্রীযুত রামকমল সিংহ :— ১ বৈশাখ ১২৬২; ১ বৈশাখ ১২৬৩; ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৩; ১ বৈশাখ ১২৬৬।

শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় :— ৩০ অক্টোবর ১৮৬৩ (১৪ কার্ত্তিক ১২৭০) হইতে ২৩ মার্চ্চ ১৮৬৪ (১১ চৈত্র ১২৭০)।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য :— ১২৬২-৬৫ সালের কয়েকখানি সংখ্যা; অধিকাংশই মাস-পয়লার কাগজ।

শ্রীযুত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :— ২ বৈশাখ ১২৬৪। ১ ভাদ্র ১২৬৩—১ আশ্বিন ১২৬৪ (কেবলমাত্র মাস পয়লার কাগজ)।

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :— ১২৬১-৬৩ (অসম্পূর্ণ)।

বহরমপুর ডাঃ রামদাস সেনের লাইব্রেরি :—১২৬৪-৬৮ (অসম্পূর্ণ)। এগুলি কেবল মাস-পয়লার কাগজ।

রতন লাইব্রেরি, বীরভূম :— ১৮৩৯, ২২এ জুন তারিখের সংখ্যা।

বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষৎ :— ১২৬৪-৬৫ সালের কতিপয় সংখ্যা। ইহা হইতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া হরিহর শাস্ত্রী 'বঙ্গসাহিত্যে' (১ম সংখ্যা ১৩২৯) প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লণ্ডন :— ১২৭২ সালের (১৮৬৫-৬৬) সম্পূর্ণ ফাইল। ইহা হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে "Some old Bengali Books and Periodicals in the British Museum" প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন (*Indian Historical Quarterly*, vol. II, 1926 দ্রষ্টব্য)। ইহা ছাড়া ব্রিটিশ মিউজিয়মে ১৩ই এপ্রিল ১৮৪৮ তারিখের সংখ্যাখানিও আছে।

৫। সম্বাদ সুধাকর

কলিকাতার ১১ নং ষোড়াবাগান হইতে এই বাংলা সাপ্তাহিকখানি প্রকাশ করিবার জন্য পাথুরিয়াঘাটা হইতে "কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব" প্রেমচাঁদ রায় লাইসেন্সের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। ১৮৩১, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লাইসেন্স দেওয়া হয়।

১৮৩১, ২৩এ ফেব্রুয়ারি (১৩ ফাল্গুন ১২৩৭) তারিখে 'সম্বাদ সুধাকর' এর প্রথম আবির্ভাব। পরবর্ত্তী ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় দেখিতেছি:—

"আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতেছি গত ১৩ ফাল্গুন বুধবার প্রাতে সম্বাদ সুধাকর নামক সমাচার পত্র এতন্নগরের যোড়াবাগান ষ্ট্রীটে শ্রীযুত দেবীচরণ প্রামাণিকের আলয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে।"*

'সম্বাদ সুধাকর' অনেকটা মধ্যপন্থী ছিল,—গোঁড়া ও উদার এই উভয়ের মাঝামাঝি একটা মতের পোষকতা করিত। এই পত্রিকার জন্য কানাইলাল ঠাকুর একটি প্রেস করিয়া দিয়াছিলেন।

'সম্বাদ সুধাকর' চারি বৎসর চলিয়াছিল।

সমাচার পত্রের সংখ্যা

১৮৩১, ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সম্বাদ সুধাকর' প্রকাশিত হইলে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন,—

"এইক্ষণে বাঙ্গলা ভাষায় ৬ সম্বাদপত্র ও ইঙ্গরেজী বাঙ্গলায় ১ এবং ফারসী ভাষায় ১ ও এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককর্ত্তৃক রচিত ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোরঞ্জন ও বহুদর্শনার্থ সর্ব্বসুদ্ধ এইক্ষণে ৯ সম্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে।"

৬। সমাচার সভা রাজেন্দ্র

ইহাই মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। বাংলা ও ফার্সীতে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য কলিঙ্গার শেখ আলীমুল্লাকে ১৮৩০, ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লাইসেন্স দেওয়া হয়। সমাচার সভা রাজেন্দ্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সনের ৭ই মার্চ (২৫ ফাল্গুন ১২৩৭) তারিখে। পরবর্ত্তী ১০ মার্চ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় আছে,—

"সমাচার সভা রাজেন্দ্রনামক বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় এক সমাচারপত্র সৃজন হইবার কল্প ছিল তাহা গত ২৫ ফাল্‌গুণ সোমবার প্রকাশ হইয়াছে প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করিয়াছি তাহাতে তৎপ্রকাশকের প্রতিজ্ঞা বা অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত হয় নাই কেবল কএকটি সম্বাদ এবং তাহারি অবিকল অনুবাদ পারস্য ভাষায় হইয়া চারিতা কাগজ মুদ্রিত হইয়াছে বোধ হয় আগামিতে তৎপ্রকাশক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন যাহা

* *The Calcutta Review*, August 1922, p. 282.

৺উক সকলপ্রকার কাগজ প্রকাশ হইল পূর্ব্বে কেবল ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র ছিল ইহাতে লোকেরদিগের বাঞ্ছা হইত বাঙ্গালা হইলে ভাল হয় তাহা হইলে পারস্য ভাষায় কাগজ প্রকাশ হইল সে অভিলাষ পূর্ণহওনান্তে ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় একত্রে দেখিবার সাধ ছিল তাহাও হইয়াছে পারস্য বাঙ্গালা উভয় ভাষায় কোন গ্রন্থাদি দেখা যায় নাই ঈশ্বরেচ্ছায় সে খেদও রহিল না এক্ষণে শুনিতেছি পারস্য বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা ভাষায় কটক অঞ্চলে হইবেক ইহা হইলে অধিকতর মঙ্গল জ্ঞান করিব।"

'সমাচার সভা রাজেন্দ্র' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

৭। জ্ঞানান্বেষণ

কলিকাতার চোরবাগান হইতে এই সাপ্তাহিকখানি প্রকাশ করিবার জন্য সরকার ১৮৩১ সনের ৩১এ মে তারিখে দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়কে (পরে 'দক্ষিণারঞ্জন' নামে খ্যাত) লাইসেন্স দেন। পরবর্ত্তী জুন মাসের ১৮ই তারিখে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্র থাকা সত্ত্বেও 'জ্ঞানান্বেষণ' কেন প্রচারিত হয় সে-সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যার 'অনুষ্ঠানে' এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—

জ্ঞানান্বেষণ

শনিবার ইং ১৮ জুন।

সংপ্রতি এতন্মহানগরে নানাবিধ সমাচারপত্রদ্বারা নানা দেশীয় সমাচার প্রচার হইতেছে তাহাতে এই পত্র প্রস্তুতকরা কেবল নানা দেশীয় গুহ্যাগুহ্য বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এমত নহে পরন্তু অন্য২ প্রয়োজন অনেক আছে।

এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনুমিতাক্ষরাপ্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনাদ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন২ জাতিবিহিত ধর্ম্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমত কর্ম্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্টলোকেরই কর্ত্তব্য নহে ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ এই যে ভূগোলপ্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতিবিস্তারিতরূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে২ প্রকাশ করিব। এবং অন্য২ বিষয় যাহা প্রকাশকরা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না ইতি।"*

* ১৮৩১, ২রা জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়ের পর 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালন করেন,—রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক। ১৪১ নং চোরবাগান হইতে ইংরেজী ভাষাতেও এই সাপ্তাহিকখানি প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে আবেদন করিলে সরকার ১৮৩৩, ১৫ই জানুয়ারি তারিখে তাঁহাদের লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছিলেন। লাইসেন্স পাইবার কয়েক দিন পর হইতেই 'জ্ঞানান্বেষণ' যে ইংরেজী ও বাংলা—উভয় ভাষাতেই বাহির হইতে থাকে, নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তি হইতে তাহা জানা যাইবে,—

"আমরা জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আপনকারদিগের আনুকূল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরম্ভাবধি এ পর্য্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া আগামি সপ্তাহাবধি গৌড়ীয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব…।" (১৮৩৩, ১৯এ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

১৮৩৯ সনের মার্চ মাসে 'সম্বাদ ভাস্কর' সংবাদপত্র বাহির করিবার পূর্ব্বে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ আছে; তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের শিরোভূষণ কবিতাও তর্কবাগীশের রচিত। তিনি উদারমতাবলম্বী পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৪৯ সনের ২৬এ মে তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে তিনি বীটন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে যে-সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ্য যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই 'এহি জ্ঞান মনুষ্যাণা মজ্ঞান তিমিরংহর। দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপিসংহর' গৌড়ীয় ভাষায় পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি 'বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন॥ লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার। একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥ এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এই-

ক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র২ কি লক্ষ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব,... ।"

স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অনেক রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছিল।* গোবিন্দচন্দ্র বসাককে লিখিত রামগোপাল ঘোষের কয়েকখানি পত্র† হইতে জ্ঞানান্বেষণের আরও কয়েক জন পরিচালকের নাম পাওয়া যায়। এই পত্রগুলির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"*Calcutta, 21st September 1835.*—...Taruck Chundra Bose, the principal editor of the *Gyananneshun*, has been lucky enough to get a Deputy Collectorship at Hooghly. I wonder who will carry on the paper.

Calcutta, 9th July, 1837.—I have a great deal to tell you about the *Gyananneshun* which after this week will go into the hands of Babu Dukshina [Ranjan Mookerjee] ..

Calcutta, 24th November 1839.—I should mention to you before I conclude that at a meeting of a few select friends lately held in my house at the request of Babu Ram Chandra Mitter and Horomohun Chatterjee, the present conductors of the Gyananneshun,..."

প্রায় দশ বৎসর চলিবার পর, ১৮৪০ সনের নভেম্বর মাসে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের প্রচার রহিত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৮৪০, ২৬এ নভেম্বর তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়র" লিখিয়াছিলেন,—

"The *Gyannaneshun* Native Newspaper has, we regret to hear, been given up for want of public support. It existed about the years and was for some time ably conducted by a number of College students. In its palmy days it was a legitimate organ of the educated Hindoos, but since the retirement of Baboo Russickrishna Mullick, and Duckinanunden Mookerjie, who originally established the paper, merely with the view of keeping alive a spirit of liberal enquiry amongst the Hindoos and combating the prejudices of the orthodox party, it exhibited many symptoms of dotage and decay, till in the course of the present week it died a natural death."

কয়েক বৎসর পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র পুনঃপ্রকাশের আয়োজন হয়। ১৮৫০ সনের ২৪এ এপ্রিল তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে দেখিতেছি,—

'জ্ঞানান্বেষণ পত্র পুনঃপ্রকাশ। গত রবিবাসরীয় জ্ঞান সঞ্চারিণী পত্রে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইল জ্ঞানান্বেষণ পত্র আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসাবধি শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ

* "Farewell Addresses to Sir Charles Trevelyan.— On Saturday last at 3 P.M. the Members of the British Indian Association waited in deputation on Sir Charles Trevelyan...Baboo Ramgopaul Ghose observed that he seconded Sir Charles in a small way by writing editorials in the *Guyananashun* newspaper on the subject [abolition of the Town duties]."—The *Hindoo Patriot* for April 10, 1865, p. 118.

† "বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস," মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—জন্মভূমি, কার্ত্তিক ১৩০৪, পৃ. ৩২৬-২৭। "History of the Press in India," S. C. Sanial—*Calcutta Review*, Jany. 1911, p. 31*n*.

বসু * কর্তৃক পুনঃ প্রকাশিত হইবেক, কিন্তু তাহা পূর্ব্বের ন্যায় ইংরাজী বাঙ্গলা উভয় কিম্বা কেবল শেষোক্ত ভাষায় হইবেক তাহা বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত হয় নাই।"

ইহা শেষ-পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

৮। অনুবাদিকা

১৮৩১, ১০ই আগষ্ট তারিখে, ভোলানাথ সেন এই মর্ম্মে সরকারের নিকট আবেদন করেন :—"রিফর্ম্মার (*Reformer*) পত্রের ২৩শ সংখ্যায় (১০ জুলাই ১৮৩১) সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রচার করা হইয়াছে, এই মাসের গোড়া হইতেই রিফর্ম্মার পত্র হইতে—মাঝে মাঝে অন্যান্য ইংরেজী কাগজ হইতেও—ভাল ভাল প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া একখানি ক্রোড়পত্রে মুদ্রিত হইয়া রিফর্ম্মারের সহিত প্রসারিত হইবে। আশা করি, ইহার জন্য সরকারের নিকট হইতে স্বতন্ত্র লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন হইবে না।"

১২ই আগষ্ট তারিখে সরকার উত্তরে জানাইয়াছিলেন,—"কেবল মাত্র রিফর্ম্মার পত্রে প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রস্তাবিত বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলে স্বতন্ত্র লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন হইবে না।"

'অনুবাদিকা' ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসেই প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সম্বাদ কৌমুদী' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ ১৮৩১, ২৭এ আগষ্ট তারিখের সমাচার দর্পণে পুনর্মুদ্রিত হয়,—

"শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশকেষু। এ সপ্তাহে আমরা দুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম প্রথমতঃ অনুবাদিকা এই পত্র বঙ্গ ভাষায় শব্দবিন্যাসপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে অনুবাদিকা স্বতন্ত্র পত্র নহে রিফার্ম্মরহইতেই অনুবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ পত্রহইতেও কোন উপকারি বিষয় অনুবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফার্ম্মর পত্র প্রকাশে লোকের যেরূপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অনুবাদিকাদ্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা বটে কিন্তু অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইংলণ্ডীয় ভাষা অবগত নহেন সুতরাং রিফার্ম্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্য তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাঁহারা রিফার্ম্মরের অনুবাদ করিতেছেন অনুবাদিকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকেরা কোন বেতন গ্রহণ করিবেন না বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন সুতরাং অত্রবিষয়ে তাঁহারদের সর্ব্বাংশেই অনুরাগ করা উচিত হয়।"

'রিফর্ম্মার' ও 'অনুবাদিকা'—উভয় কাগজেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এক বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই 'অনুবাদিকা'র প্রচার বন্ধ হয়। ১৮৩২ সনের ১৬ই এপ্রিল তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে দেখিতেছি,—

'We regret that the *Unoo Badika* or the Bengallee version of the *Reformer* which had been circulated *gratis* in the Hindoo Community since a few months after the commencement of the *Reformer* has been suspended from the last week, owing to the want of leisure on the part of its managers.—*Sumbad Cowmoody*."

* ইনি 'সত্যসঞ্চারিণী'-সম্পাদক শ্যামাচরণ বসু হইতে পারেন না, কারণ ১৮৪৭, ১৪ই নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

৯। সম্বাদ রত্নাকর

কলিকাতা নগরীর উন্নতিবিধানকল্পে এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি ৭১ নং পাথুরিয়া-ঘাটা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশ করিবার জন্য সিমলার মধুসূদন দাস সরকারের নিকট আবেদন করেন। ১৮৩১, ১২ই আগষ্ট তাঁহাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী ২২এ আগষ্ট (৭ ভাদ্র ১২৩৮) তারিখে কাগজখানি প্রকাশিত হয়। ১৮৩১, ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন,—

"রত্নাকর। গত ৭ ভাদ্র অবধি রত্নাকর নামক সমাচার পত্রপ্রচার হইতেছে এ সংবাদ গত ১০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি সংপ্রতি গত ২১ ভাদ্রের রত্নাকরপত্রের লিখিত বিবরণ রত্নজ্ঞানে সকলেই যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন যেহেতু তৎপত্রসর্জনকর্ত্তা নাস্তিকহর্ত্তা হইয়া বিধাতার বাক্য পালনে অবোধদিগের বিলক্ষণ প্রবোধ প্রদানে বিচক্ষণতাপূর্ব্বক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন…।"

সম্বাদ রত্নাকর অল্পায়ু ছিল। ১৮৩২ সনের জানুয়ারি মাসেই ইহার প্রচার রহিত হয়। ১৮৩২, ২৮এ জানুয়ারি (১৬ মাঘ ১২৩৮) তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি,—

"বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম। ··
সম্বাদ রত্নাকরের গো লোকপ্রাপ্তি।— ··সম্বাদ রত্নাকরনামক যে এক কটুকাটব্য রচিত পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংপ্রতি গত সোমবাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ রহিত অর্থাৎ কোন অধর্ম্ম রোগে প্রলাপ দেখিয়া তাহার গো লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে…।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা হইতে জানা যায়, এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন,— রামচন্দ্র পাল।

১০। সম্বাদ সারসংগ্রহ

১৮৩১ সনের আগষ্ট মাসে কলুটোলা নিবাসী শ্রীসরূপচাঁদ দাস গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' একখানি পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে 'সম্বাদ সারসংগ্রহ' প্রচারের সঙ্কল্পের কথা আছে।—

"এতদ্দেশে নানাপ্রকার সমাচার পত্রের প্রচার হইয়া অনেকের উপকার হইতেছে তাহাতে বর্দ্ধিষ্ণু সন্তানেরা অনায়াসে অনেক মুদ্রা ব্যয় করিয়া সকল পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সকল সমাচার ও প্রেরিত পত্রাদি অবলোকন করেন কিন্তু যাঁহারা অনেক মুদ্রা বিতরণে সক্ষম নহেন তাঁহারদের সকল বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব আমার এই মানস যে সাধারণের উপকারার্থ সারসংগ্রহনামক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করি ঐ পত্রে সমুদায় বাঙ্গলা পত্রস্থ সমাচারের মর্ম্ম ও অবিকল প্রেরিত পত্র মুদ্রিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ পাইবেক ইহার মাসিক মূল্য ২ মুদ্রামাত্র।"*

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় এই সংবাদপত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য ইহার স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক—সিমলার বেণীমাধব দে সরকারের নিকট আবেদন করেন। ১৮৩১ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী ২৯এ সেপ্টেম্বর তারিখে (১৪ই আশ্বিন ১২৩৮) 'সম্বাদ সারসংগ্রহ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন,—

* ১৮৩১, ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে উদ্ধৃত।

"সম্বাদ সারসংগ্রহ।—গত ১৪ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারসংগ্রহনামক এক নূতন সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমরা তুষ্ট হইয়াছি ·····।"*

'সম্বাদ সারসংগ্রহ' কিছুদিন প্রকাশিত হইয়া লুপ্ত হয়।

১১। সংবাদ রত্নাবলী

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হইতে 'সংবাদ রত্নাবলী' সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায়:—

"প্রভাকর-সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে† [২৪ জুলাই ১৮৩২] 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।

"১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে, এই রত্নাবলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে সংবাদ রত্নাবলী আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ-সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হন।" ‡

সংবাদ রত্নাবলী প্রায় দুই বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৪৫ সনের ১৫ই নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৫২) তারিখে ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর সম্পাদকত্বে ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়। ১৮৪৫, ২৫এ নভেম্বর তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে দেখিতেছি:—

"আমরা দর্শনে হর্ষপ্রাপ্ত হইলাম সংবাদ রত্নাবলী নামক সমাচার পত্রিকার পুনরুদয় হইয়াছে, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন শনিবারে ঐ পত্রিকার নূতন দেহের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয়।···এই রত্নাবলী ১২৩৯ সালের শ্রাবণ মাসে চন্দ্রিকাভাসে প্রকাশ হইয়াছিল আমারদিগের পরম বন্ধুগুণাসিন্ধু আন্দুলীয় জমীদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় প্রভাকর সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে লিপিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া

* ১৮৩১, ২২এ অক্টোবর (৭ কার্ত্তিক ১২৩৮) তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

† ইহার প্রকাশকাল শ্রাবণ মাসের "১০ই" কি না সন্দেহ আছে। কারণ ঠিক এই তারিখেই, "সংবাদ রত্নাবলী নামে বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র মেছুয়াবাজার বড়তলা লেনে অবস্থিত রত্নাবলী প্রেস হইতে" প্রকাশ করিবার জন্য সরকার মহেশচন্দ্র পালকে লাইসেন্স মঞ্জুর করেন।

‡ "কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব"—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী।

তৎসময়ে প্রকাশ করেন, সম্পাদক মহাশয়দিগের নিতান্ত বাসনা ছিল রত্নাবলী দ্বারা ধর্ম্মসভাকে সদৃশ্যা করিয়া ধর্ম্মচক্রে বসাইয়া দিবেন, কিন্তু চন্দ্রিকা নির্ব্বাহক ধর্ম্মসভা সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু বিবেচনা করিলেন রত্নাবলী দেখিয়া ধর্ম্মসভা যদি রত্নাবলী সম্পাদককে মাল্য প্রদান করেন তবে রাজাদিগের সহিত মাল্য বিনিময়ের ঘটকতাকার্য্যে যত যত্ন করিয়াছিলেন সকলি বিফল হইবে, রত্নাবলী সম্পাদক ঘটক বিদায় দিবেন না, অতএব ধর্ম্মসভাকে আপনি আগ্‌লিয়া রাখিয়া যেমন প্রভাকর সুধাকরকে সভার নিকট প্রবেশ করিতে দেন নাই রত্নাবলীকেও সেইরূপ করিলেন, কিন্তু তাহাতে রত্নাবলী সম্পাদক মহাশয় ক্ষুব্ধ হইলেন না, ধর্ম্মসভার মায়া পরিত্যাগ করিয়া রত্নাবলীর স্বর্বর্ণাবলী সাধারণকে দিলেন, তাহাতে এক বৎসর আটমাস তিন দিবস গ্রাহক মহাশয়েরা রত্নাবলী ধারণে পুলকিত ছিলেন, তৎপরে কোন আশ্চর্য্য কারণে যত্নাবলী বিরহে রত্নাবলীর লীলা সম্বরণ হয়, তদবধি আমারদিগের কি দুঃখ মনে রহিয়াছিল তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না, এইক্ষণে বাবু ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তি সেই দুঃখ নিবারণ করিলেন, চক্রবর্ত্তিবাবু সম্পাদক হইয়া রত্নাবলী দেখাইলেন এবং অনুভব হইতেছে মহাপ্রসাদ [জগন্নাথপ্রসাদ] মহাশয়ও চক্রবর্ত্তি বাবুর পশ্চাৎবর্ত্তি আছেন।···দর্পণ সম্পাদক মহাশয় দেশ পরীক্ষা করিয়া দর্পণকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কৌমুদী বঙ্গদূত প্রভৃতি সমাচারপত্র সকলও দেশের দোষে গিয়াছে, তবে যে চন্দ্রিকা প্রভাকর পূর্ণচন্দ্রোদয় জীবিত আছে তাহার কারণ এদেশের অনুগ্রহ নয়, সম্পাদকেরা বিদেশীয় মনুষ্যদিগের কৃপাতে নির্ভর করিয়াছেন, ভাস্কর ও রসরাজের বিষয়ে অন্য সাহায্য অধিক নাই, বান্ধবেরা রক্ষা করেন অতএব এসময়ে যে রত্নাবলী সম্পাদক মহাশয় পুনরুত্থান-করিলেন ইহাতেই আমরা ভয় করি, যাহা হউক ফলে রত্নাবলী, ভাস্করাকারে দুই তক্তা কাগজে স্বর্বর্ণাবলী ধারণ করিয়া বাহির হইয়াছে।”

সমাচার-পত্রের সংখ্যা-হ্রাস

বাংলা সাময়িক পত্রের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু অল্পদিন যাইতে-না-যাইতেই অনেকগুলি কাগজের অকালমৃত্যু ঘটিল। ১৮৩২ সনের ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' অন্য একখানি বাংলা কাগজ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল,—

“সমাচারপত্র রহিত।—কলিকাতা নগরে সংপ্রতি যেরূপ সমাচারপত্রের বৃদ্ধি হইয়াছিল তেমনি হ্রাসতা হইতেছে প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রকাশনামক এক পত্র বন্ধ হইল দ্বিতীয় সারসংগ্রহ কিছু দিন প্রকাশ হইয়া স্থগিত হয় তৃতীয় রত্নাকর পত্র বর্ত্তমান মাসঅবধি রহিত হইয়াছে সম্বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিন কাগজ বন্ধ হইল ইহাতে মনে করি যে ক্রমে২ নূতন কাগজ সকলেরই ঐ দশা প্রাপ্তি হইবেক ইতি।”

পুনরায়, ১৮৩৫ সনের ৯ই মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত একখানি প্রেরিত পত্রে দেখিতেছি,—

"সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক নূতন সম্বাদপত্র।...কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এতন্নগরে বঙ্গভাষায় প্রভাকর সুধাকর রত্নাকর সারসংগ্রহ কৌমুদী সভারাজেন্দ্র ইত্যাদি যে কএক খান সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছিল তাহা ক্রমে২ লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু কথিত পত্রসকল প্রচলিত থাকাতে বঙ্গভাষার যদ্রূপ আলোচনা হইতেছিল এইক্ষণে তাহার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে তদবলোকনে শ্রীযুত হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক কোন এক বিচক্ষণ সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক এক মাসিক সমাচার পত্র গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতি পূর্ণিমায় চারি আনা মূল্যে প্রকাশে প্রয়াসযুক্ত হইয়াছেন।"

১২। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রথমাবস্থায় মাসিক আকারে প্রতি পূর্ণিমায় বাহির হইত। প্রথম সংখ্যা 'চান্দ্রজ্যৈষ্ঠমাসীয় সমাচার'রূপে ১৮৩৫ সনের ১০ই জুন (২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, বুধবার) প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য লিখিত হইয়াছিল,—

"বিজ্ঞাপন।...এই সংবাদপত্র প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশ হইবেক ইহাতে বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধি বিষয়ক হিতোপদেশ আছে যাহাতে মনোহস্মুপ্রবেশ করিলেই বিশেষ উপকার দর্শাইবেক তথা * * * বিষয় ঘটিত রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল বিবরণ যাহা শ্রীল শ্রীযুক্ত দেশাধিপতির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই * * গণের মহোপকার দর্শাইবেক এবং ধর্ম্মবিষয় যাহা সর্ব্বসাধারণের আবশ্যক ও এতদ্দেশীয় বা ইউরোপীয়াদি দেশের নূতন সম্বাদ যদ্দর্শনে পাঠকগণেরা পরমোল্লাসিত হইবেন এবং তাঁহাদিগের ও প্রেরিত যথা রীত্যানুসারে প্রকাশ হইবে এক্ষণে এক বিষয়ে অধিক কালক্ষেপন করা কর্ত্তব্য নহে তজ্জন্য অন্যান্য বিষয় লেখনে প্রবর্ত্ত হইলাম।"

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রথম সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—

"এই সংবাদপত্র প্রতি পূর্ণিমায় যোড়শ পৃষ্ঠায় প্রকাশ হইবেক। মূল্য সংখ্যা প্রতি ।০ আনা মাত্র। যে কোন মহাশয় ইহা গ্রহণেচ্ছুক হইবেন তিনি মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার কালেজ ইষ্ট্রীটে ৫৮ সংখ্যক বাটীতে সম্পাদকের নিকট এক স্বনামাঙ্কিত লিপী প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন...। সম্পাদক শ্রীহরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

তিন বৎসরের উপর হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তৎপরে ১৮৩৯ সনের প্রারম্ভ (?) হইতে কলিকাতা আমড়াতলার আঢ্য-পরিবারের উদয়চন্দ্র আঢ্য সম্পাদক হন। ১৮৩৯, ২৭এ এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি,—

"১২৪৫ সাল পৌষ।—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎসম্পাদন কার্য্যে শ্রীউদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম প্রকাশ হয়।"

১৮৪১ সনে উদয়চন্দ্রের জ্যৈষ্ঠভ্রাতা অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে অদ্বৈতচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ১৮৮৬ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার পঞ্চম সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ আঢ্য। ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়; তাহার পর আরও এগার মাস 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' চলিয়াছিল।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় মাসিক আকারে সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৫ সনে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পর বৎসর ৯ই এপ্রিল তারিখ হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৩৬ সালের 'দি ক্যালকাটা মন্থলী জর্ণালে' (পৃ. ২০১) দেখিতেছি,—

"*The Sungbad Purno Chundrodoy.*—The Monthly Magazine of this name, has since the 19th April, been changed to a weekly Literary and Political Journal."

১২৪৮ সালে (১৮৪১ ?) ইহা বারত্রয়িক আকার ধারণ করে। ১৮৪৪ সনের নভেম্বর মাসে (১২৫১ বঙ্গাব্দ) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যে দৈনিকের কলেবর ধারণ করে, ১৮৪৮ সনের ১৯এ নভেম্বর তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্করে' (পৃ. ১০৮৯) তাহার প্রমাণ পাইতেছি :—

"আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় * * * দৈনিক হই * * * সম্পাদক মহাশয় প্রতি দিবসীয় পূর্ণচন্দ্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাকার সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছে * * *।"

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় এইরূপে দৈনিক আকারে ১৯০৮, ১৩ এপ্রিল (৩১ চৈত্র ১৩১৪) পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৭৩ বৎসর চলিয়া প্রচার-রহিত হয়।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এর ফাইল।—

কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা :— প্রথম বর্ষের প্রথম সাত সংখ্যা, ১২৭২, ১২৮৫, ১২৮৮-৮৯, ১২৯২-৯৮, ১৩০০, ১৩১৪। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের ইতিহাস ও কয়েক বৎসরের কাগজ হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া লাহা-মহাশয় 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার' পত্রে (ভাদ্র-কার্ত্তিক ১৩২৩; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮; শ্রাবণ ১৩২৪-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭) প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি :—১৮৫০-৫২ (১২৫৭-৫৯ সাল) অসম্পূর্ণ।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—২ এপ্রিল ১৮৬৭।

১৩। ভক্তিসূচক

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি ১৮৩৫ সনের ২রা সেপ্টেম্বর (?) বুধবার প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৩৫, ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা কুরিয়র' নামক সংবাদপত্রে দেখিতেছি,—

"The first number of a Bengali weekly paper, issued on Wednesdays under the name of *Bhuchtee Shuchuck*, has also been sent us"...

অপ্রকাশিত সাময়িক পত্র

ছয়খানি সাময়িক পত্রের নাম পাওয়া যাইতেছে; তন্মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ খানির অনুষ্ঠানপত্র (prospectus) তৎকালীন সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাগজগুলি প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

১। ভাগবত সমাচার

ভক্তিশাস্ত্রের অনুশীলনের উদ্দেশ্যে ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তী আট পৃষ্ঠা পরিমাণের একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। ১৮৩১, ২৫এ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণে' কাগজখানির অনুষ্ঠানপত্র মুদ্রিত হইয়াছে।*

* "সেকালের কথা"—পঞ্চপুষ্প, বৈশাখ ১৩৩৮, পৃ. ৯২-৯৩ দ্রষ্টব্য।

২। নিত্যপ্রকাশ

সরকারী দপ্তরে দেখিতেছি 'নিত্যপ্রকাশ' নামে একখানা বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য জানবাজারের দুর্ল্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ১৮৩১, ৫ই আগষ্ট তারিখে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর করেন।* ১৮৩১ সনের ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় দেখিতেছি :—

"অপর লোকপরম্পরা জ্ঞাত হইয়া গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশনামক এক সমাচারপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক তৎপ্রকাশকের অভিপ্রায় আমরা পত্রদ্বারা অবগত হইয়াছি তিনি ঐ পত্র ১ টাকা মূল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্ছিত হইয়াছেন। তাহার কারণ কেবল নাস্তিককুল সমূল নির্ম্মূল করিবেন যেপ্রকারে রক্তবীজবধ হইয়াছিল নিত্যপ্রকাশ পত্রও তাদৃশ নাস্তিকঘাতুক হইবে অর্থাৎ নাস্তিক হইয়া মস্তকোত্তলন করিবামাত্র বজ্রতুল্য লেখনীর আঘাত করিবেন…।"

৩। সম্বাদ ময়ূখ

কলিকাতা হইতে এই বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য ১৮৩১, ১৯এ আগষ্ট তারিখে সরকার ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাইসেন্স মঞ্জুর করেন।†

৪। সম্বাদ সৌদামিনী

৯ নং সেকেণ্ড লেন নেবুতলা হইতে এই নামের একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবার জন্য নেবুতলার ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত সরকারের নিকট আবেদন করেন। ১৮৩১ সনের ২০এ সেপ্টেম্বর তাঁহাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়।‡

'সম্বাদ রত্নাকর' পত্রে ইহার অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশিত হয়। তাহা ১৮৩১, ১২ই নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান-পত্রে আছে,—"সম্বাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা…প্রতি গুরুবাসরে স্বনাম ধামাঙ্ককারিরদিগের সন্নিধানে সমর্পণ করা যাইবেক…। সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত।"

৫। দলবৃত্তান্ত

'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ ১৮৩১, ২৪এ ডিসেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে দেখিতেছি,—

"শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়। আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচারপত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল ঐ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাপত্রে প্রকাশ পাইবেক…।"

৬। বৃত্তান্তবাহক

১৮৩৪ সনের ২২এ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে দেখিতেছি—

"রিফার্ম্মর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে

* *Home Dept. Procdgs. 9th August 1831*, No. 51.
† *Home Dept. Procdgs.* 23 *August 1831*, No. 55.
‡ *Home Dept. Procdgs.* 20 Sep. 1831, No. 79

বৃত্তান্তবাহকনামক এক সম্বাদপত্র সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ পাইবে। সমাচার দর্পণের ন্যায় ঐ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুই শ্রেণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে। তাহার মূল্য অত্যল্প মাসে ১ টাকা স্থির হইয়াছে।"

বাংলা পাক্ষিক ও মাসিক পত্র

১। জ্ঞানোদয়

ইহা ১৮৩১ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৩১, ৩১এ ডিসেম্বরের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি :—

"নূতন গ্রন্থোদয়। আমরা শুনিতেছি যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়সংজ্ঞক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম এবং কএক পত্রসম্পাদক মহাশয়েরা উক্ত গ্রন্থের যে সাধুবাদ করিয়াছেন তাহাতে সম্যক্‌প্রকারে বোধ হইতেছে যে ঐ জ্ঞানোদয় জ্ঞানোদয় করিবার যোগ্য হইতে পারিবে…।"

১৮৩২, ১০ই মার্চ্চ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' পুনরায় লিখিত হইল :—

"শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুত কৃষ্ণধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঙ্গালি মাগজিনের প্রথম সংখ্যাক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অত্যুপকারক বটে এবং ঐ মহাশয়েরদের এ অতিপ্রশংসনীয় কর্ম্ম অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমারদের অত্যন্তাহ্লাদ।"

আমি এই মাসিক-পুস্তকের প্রথম সংখ্যা দেখিয়াছি। ইহা ২৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। শেষ পৃষ্ঠায় আছে :—

"এই পুস্তক প্রতি মাসে মুদ্রাঙ্কিত হইবে ইহা গ্রহণে যে যে মহাশয়ের বাঞ্ছা হয়, তাঁহারা স্বীয় অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সিমলার নীলমনি মিত্রের ষ্ট্রীটের ২০ সংখ্যার বাটিতে এক পত্র প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইহার প্রতিসংখ্যার মূল্য ।।০ মুদ্রামাত্র…।"

কিন্তু কাগজখানি নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে বাহির হইত না। ৮ম সংখ্যার শেষে আছে :—

"এই পুস্তক জ্ঞানোদয় প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল ইং তারিখ ৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ শাল।"

৯ম ও ১০ম সংখ্যার শেষে যথাক্রমে "জানেওয়ারি ১৮৩৩ সাল" ও "মার্চ্চ ১৮৩৩ শাল" দেখিতেছি।

'জ্ঞানোদয়'-এর ফাইল।—

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—প্রথম বারো সংখ্যা।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি :—এক হইতে দশ খণ্ড।

২। বিজ্ঞান সেবধি

ইহা ১৮৩২ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হয়। ১৮৩২, ৫ই মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি :—

"ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারি সোসৈটি ইতিসংজ্ঞক এক সমাজের দ্বারা বঙ্গভাষায় অতিপরোপকারক বিজ্ঞান শেবধিনামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং ঐ গ্রন্থের ১ সংখ্যা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুত লার্ড ক্রম সাহেবের বিদ্যার অভিপ্রায় ও উপকার ও আহ্লাদজ্ঞাপক গ্রন্থের একাংশ শ্রীযুত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কাশীপ্রসাদ ঘোষজকর্তৃক ভাষান্তরিত হইয়া ঐ সমাজের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে…।"

'সম্বাদ সুধাকর' হইতে ১৮৩৩ সনের ১লা জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে এই অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছিল:—

"বিজ্ঞান সেবধি।—কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইতেছিল তাহা ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় ভাষায় ভাষিত হইয়া উদিত হইবেক কিন্তু ইহার সাফল্য বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিত্তে হইতেছে তাহার বিশেষাবগত নহি…।"

৩। জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ

পাদরি লঙের তালিকা হইতে ১৮৩২ সনে প্রকাশিত আর একখানি সাময়িক পত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা রসিককৃষ্ণ মল্লিকের 'জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ'। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ-পত্রের ইতিহাসেও ইহার নাম পাওয়া যায়। কাগজখানি বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন,—"১২৪৭ সালে অর্থাৎ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার উৎপত্তি। জন্ম-বর্ষেই 'জ্ঞান-সিন্ধু-তরঙ্গ' কাল-সমুদ্রের উর্ম্মিমালার সঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছিল।"* এই মত ঠিক নহে, কারণ ১৮৪০ সনের পূর্ব্বেই যে কাগজখানি লোপ পাইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। ১৮৪০ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 'দি ক্যালকাটা খ্রীষ্টান অবজার্ভার' পত্রে প্রকাশিত এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক [পাদরি মর্টন-লিখিত] একটি প্রবন্ধে গতায় সাময়িক পত্রগুলির তালিকায় "জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ—বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক" পাইতেছি।

৪। বিজ্ঞান সারসংগ্রহ

ইহা একখানি পাক্ষিক পুস্তক। ১৮৩৩ সনের আগষ্ট (?) মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩, ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি:—

"ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে ভাষিত বিজ্ঞান সারসংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার প্রথম সংখ্যক এক গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ শ্রীযুত উলষ্টন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তিকর্তৃক সংগৃহীত হইয়া মাসে দুইবার প্রকাশ পাইবে। প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবো ষষ্ঠদশ পৃষ্ঠাত্মক হইবে। ইহার মূল্য মাসে ৳০ অথবা অগ্রে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে।"

পাদরি লং ভ্রমক্রমে ইহার নাম 'বিদ্যাসারসংগ্রহ," এবং প্রকাশকাল "১৮৩৪" লিখিয়াছেন।

* জন্মভূমি, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩০৪, পৃ. ৪১।

৫। চার আনা পত্রিকা

ইহা ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া পাদরি লং উল্লেখ করিয়াছেন,—

Char Anna Patrika—1833—On Ethical Essays and Historical Anecdotes. *

৬। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়

ইহা প্রথমে মাসিকপত্ররূপে ১৮৩৫ সনের ১০ই জুন প্রকাশিত হয়। এই কাগজখানির বিস্তৃত ইতিহাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দী সংবাদপত্র

কয়েকখানি বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের বিবরণ দেওয়া হইল; যে-যুগে তাহাদের আবির্ভাব সেই যুগের হিসাবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; কিন্তু এ-যাবৎ আর এক শ্রেণীর পাঠকের জন্য কোনে সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় নাই, অর্থাৎ হিন্দী ভাষাভাষীদের। তাহাদের জন্য সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, এইবার সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

'ভারতমিত্র'-সম্পাদক বালমুকুন্দ গুপ্তের 'গুপ্ত নিবন্ধাবলী'র ৫৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, কাশী হইতে ১৮৪৫ সনে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত 'বনারস আখবার'ই প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র। এই কাগজখানি রাজা শিবপ্রসাদের আনুকূল্যে, এবং গোবিন্দ রঘুনাথ থাট্টে নামক একজন মারাঠার সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত।†

দুঃখের বিষয়, হিন্দীভাষাভাষীরা তাঁহাদের মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের আদি ইতিহাস জানেন না। প্রকৃত কথা এই যে 'বনারস আখ্‌বার' প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বেই একাধিক হিন্দী সংবাদপত্র ছাপার হরফে কলিকাতা হইতে বাহির হইয়াছিল।

* Long's *Returns relating to Publications in the Bengali Language, in 1857.* (*Selections from the Records of the Bengal Govt.* No. xxxii), 1859, p. xlv.

† গুপ্তে মহাশয় 'বনারস আখবার'-এর প্রকাশকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেও অনেক ভুল আছে। ১৮৪৪ সনের ২৫এ জুলাই (১১ শ্রাবণ ১২৫১) তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রে পাইতেছি :—

'বনারস অখবার।—বনারস অখবার নামক নূতন এক সমাচার পত্রের অষ্টম সংখ্যক পত্র আমারদিগের হস্তাগত হইয়াছে ঐ পত্রবর কাশীধামে উর্দ্দু ভাষায় নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হয় তাহার সম্পাদক শ্রীযুত বাবু তারামোহন মিত্র ইহা শিবপ্রসাদ বাবুর প্রযত্নে মুদ্রিত হইতেছে ঐ পত্রে তদ্দেশীয় হিতাহিত অনেক বিষয় প্রকাশ হইয়া থাকে...।

১৮৪৪ সনের ২৩এ জুলাই (৯ শ্রাবণ ১২৫১) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রেও দেখিতেছি :—

'উর্দ্দু ভাষায় নূতন সমাচার পত্র।—কাশীতে বানারস আখবার নামে নূতন এক সমাচার পত্র হইয়াছে, সম্পাদক শ্রীযুত শিবপ্রসাদ বাবু তাহার অষ্টম সংখ্যক পত্র আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, পাঠদ্বারা অনুভূত হইল উক্ত পত্র তারামোহন মিত্র কর্তৃক প্রতি শনিবারে প্রকাশ পায়, ইহার অগ্রিম মূল্য দ্বাদশ মুদ্রা, বার্ষিক পঞ্চদশ টাকা নিশ্চিত হইয়াছে,...।"

১। উদন্ত মার্ত্তণ্ড

কলিকাতার কলুটোলার ৩৭ নং আমড়াতলা গলি হইতে শ্রীযুত যুগলকিশোর সুকুল 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক-পত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভারত-গভর্ন্মেণ্টের নিকট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেন। সরকার ১৮২৬ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহাকে লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছিলেন।*

যুগলকিশোর সুকুলের আদি নিবাস কানপুরে; তিনি তখন সদর দেওয়ানী আদালতে 'প্রোসিডিংস্ রীডার'-এর কাজ করিতেন। সরকারের নিকট হইতে 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' প্রকাশের অনুমতি পাইয়া সুকুল মহাশয় প্রথমে একখানি অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করেন। এই অনুষ্ঠানপত্র সম্বন্ধে সমসাময়িক বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়:—

"নাগরীর নূতন সংবাদ পত্র।—ইদানীং পাশ্চিমাত্য লোকেরদের মধ্যে গুণ প্রচার ও জ্ঞানের সঞ্চার হইবার কারণ যাহা অদ্যপর্য্যন্ত উক্ত দেশস্থ ব্যক্তিরদের মধ্যে এ বিষয়ে চর্চামাত্র ছিল না সংপ্রতি অন্তর্বেদ [দোয়াব] দেশান্তর্গত কাহ্নপুর গ্রামনিবাসি স্বদেশজন-সুখাভিলাষি কান্যকুব্জ জাতীয় শ্রীযুত যুগলকিশোর সুকুল হিন্দুস্থানি ব্যক্তিরদিগের বিদ্যারূপ মণি এতাবতা যাহা জাড্যতারূপ তিমিরপ্রযুক্ত বর্ণের প্রকাশ পায় নাই এতদর্থে উদন্ত মার্ত্তণ্ডের উদয়ে গুণ ও জ্ঞানের উদয় করণ অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল কৌন্সেলের সভায় তদ্বিষয়ে বিবরিয়া এক বিজ্ঞপ্তি পত্র উপস্থিত করাতে শ্রীশ্রীযুতের অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া এক অনুষ্ঠানপত্র দেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় এনগরে পূর্ব্বোক্ত সুকুলের কর্তৃত্বে এখানকার এবং অন্যান্য হিন্দুস্থান ও নেপালপ্রভৃতি দেশের সজ্জন মহাজন এবং ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের মধ্যে প্রচার হইয়াছে এবং হইতেছে। ঐ উদন্ত মার্ত্তণ্ড নির্ব্বাহানুকুল্য জন্য দ্বিমুদ্রা মাসিক স্থির পাইয়াছে যেং মহাশয়ের ঐ সমাচার পত্র লইবার বাঞ্ছা হয় তাঁহারা মোং আমাড়াতলা গলির ৩৭ নং বাটীতে লোক পাঠাইলে জানিতে পারিবেন।"†

১৮২৬ সনের ৩০এ মে 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি মঙ্গলবারে বাহির হইত; মাসিক চাঁদা ছিল দুই টাকা। উদন্ত মার্ত্তণ্ডের আবির্ভাবে একখানি সমকালিক বাংলা সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক তাঁহার ১৮২৬, ১৭ই জুন তারিখের কাগজে সেই অংশটি 'বাঙ্গলা সমাচারপত্র হইতে নীত' বিভাগে উদ্ধৃত করেন। অংশটি এইরূপ:—

"নাগরির সমাচারপত্র।—সংপ্রতি এই কলিকাতা নগরের মধ্যে উদন্তমার্ত্তণ্ডনামক এক নাগরির নূতন সমাচার পত্র প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে আমারদিগের আহ্লাদের সীমা নাই যেহেতুক সমাচারপত্রদ্বারা বিষয়সংক্রান্ত ও নানাদিগ্দেশীয় রাজসম্পর্কীয় বৃত্তান্ত

* *Home Dept. Procdgs. 16 Feby. 1826*, Nos. 57-59.

† এই অংশটি শ্রীরামপুর মিশনরীদের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে ১৮২৬ সনের ১১ই মার্চ তারিখে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা জ্ঞাত হওয়াতে অবশ্য উপকার আছে ইউরোপদেশে প্রায় দুই শত বৎসরের অধিক কালাবধি সমাচারপত্র প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা সামান্য [বিবিধ] সমাচার ও নানা বিষয়ের দোষগুণ প্রভৃতি প্রেরিত পত্রে উত্তর প্রত্যুত্তরদ্বারা প্রকাশিত হওয়াতে অনেক বিষয়ের নির্য্যাস ও সংশোধন হইয়াছে এবং ইংরাজীপ্রভৃতি সমাচারপত্র দৃষ্টান্তে এতদ্দেশে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় সমাচারপত্র প্রকাশ হয় পরে পারসী ভাষায় হয় এবং মধ্যে কিয়দ্দিবস গত হইল উরদু ভাষায় হইয়াছিল কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাভিন্ন প্রেরিত পত্র প্রকাশ হয় না যাহা হউক এক্ষণে নাগরী ভাষায় এক সমাচারপত্র হওয়াতে কাশীপ্রভৃতি স্থানস্থ লোক যাহারা ঐ ইংরাজীপ্রভৃতি ভাষা অজ্ঞাতপ্রযুক্ত কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া প্রগল্ভতা পূর্ব্বক কালক্ষেপণ করেন তাঁহারা যদ্যপি অভিনব রীতি বলিয়া তুচ্ছ না করিয়া আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন তবে তাঁহারদিগের পক্ষে যে ফলোদয় হইবে তাহা ক্রমে জানিতে পারিবেন।"

উপযুক্ত গ্রাহকের অভাবে 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' বেশীদিন চলিল না। ১৮২৭, ৪ঠা ডিসেম্বর ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক লিখিলেন,—

"আজ দিবস লৌঁ উগ্ চুক্যো মার্ত্তণ্ড্ উদন্ত্
অস্তাচলকো জাত হ্যায় দিন্‌কারদিন্ অব্ অন্ত্।"

—আজ পর্য্যন্ত উদন্ত মার্ত্তণ্ড উদিত ছিল; সে অস্তাচলে যাইতেছে—মার্ত্তণ্ডের আয়ু শেষ হইল।

শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' (১৫ই ডিসেম্বর ১৮২৭) দুঃখ করিয়া লিখিলেন,—

"উদন্ত মার্ত্তণ্ড।—আমরা অবগত হইলাম যে এই অত্যুত্তম সমাচারপত্র গ্রাহকের অপ্রতুলেতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

'উদন্ত মার্ত্তণ্ড'-এর ফাইল।—

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—আমি এইখানে উদন্ত মার্ত্তণ্ডের সম্পূর্ণ ফাইল (২য় সংখ্যা ছাড়া) আবিষ্কার করি। ইহা হইতে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধার করিয়া ১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারি—মে মাসের 'বিশাল ভারত' নামক সচিত্র হিন্দী মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছি।

২। বঙ্গদূত

উদন্ত মার্ত্তণ্ডের প্রচার রহিত হইবার দুই বৎসর পরে ১৮২৯ সনের ১০ই মে তারিখে কলিকাতা হইতে হিন্দী ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার নাম—'বঙ্গদূত'। রাজা রামমোহন রায় এই কাগজের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

৩। প্রজামিত্র

এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাগজখানি বাহির হইয়াছিল কি-না জানি না। ১৮৩৪ সনের ২১এ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে দেখিতেছি,—

"নূতন সম্বাদ পত্র।—অন্যান্য সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে প্রজামিত্র এই নামধারি এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গরেজী ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অতিশীঘ্র প্রকাশ পাইবে। তাহার মূল্য মাসে ২ টাকা অথবা বার্ষিক ২০ টাকা এবং সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হইবে। এই নূতন পত্র সম্পাদক অনুষ্ঠান পত্রে লেখেন সে আশ্চর্য্য বিষয় এই যে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে কোন সম্বাদ পত্র অদ্যাপর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই অতএব লিখন ও মুদ্রাঙ্কনের দ্বারা ঐ ভাষার সৌষ্ঠবকরণের এই মাত্রই প্রথমোদ্যোগ হইতেছে।..."

ফার্সী সংবাদপত্র

১। সমসূল আখ্‌বার

১৮২৩ সনের ৬ই মে তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্সের নকল হইতে জানা যায়, ফার্সী ও হিন্দুস্থানী ভাষার এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন—মণিরাম ঠাকুর; স্বত্বাধিকারী—মথুরামোহন মিত্র। কলিকাতার ২৬ নং চোরবাগান ষ্ট্রীট হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। ১৮২৩ সনের ৩০এ মে (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০) ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮২৩, ১৪ই জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণে' দেখিতেছি,—

"নবীন সম্বাদপত্র॥ শুনা গেল যে কলিকাতার চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্র পার্শী ও উর্দু ভাষাতে এক সম্বাদের পত্র সৃষ্টি করিয়াছেন সে পত্রের নাম সমস্থল আখবার ঐ পত্র প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হইবেক। তাহার ১ প্রথম সংখ্যা ১৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে অধিক সন্তোষ জন্মিয়াছে যেহেতুক মনুষ্যেরদের জ্ঞানবর্দ্ধক বিষয়ের যত বৃদ্ধি হয় তত উত্তম।"

২। আখবারে শ্রীরামপুর

১৮২২ সনের শেষাশেষি শ্রীরামপুর মিশন 'পৈকনামাবর' নামে একখানি ফার্সী সংবাদপত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প করেন। ১৮২২ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রস্তাবিত ফার্সী সংবাদপত্রের 'ইশ্তাহার' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"... ঐ সম্বাদ পত্রের নাম পৈকনামাবর স্থির করা যাইবে তাহার প্রত্যেক কাগজের মূল্য চারি আনা অর্থাৎ এক মাসে এক টাকা তাহা চারি পৃষ্ঠেতে ছাপাইবেক।.. যে কোন মহাশয়ের লইবার বাসনা হয় তাঁহারা আপনারদের নাম ও নিবাস লিখিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইয়া দেন ·। ইহার ব্যয়োপযুক্ত সংস্থান হইলে অর্থাৎ স্বাক্ষরকারিরদের নাম পাওয়া গেলে ছাপা আরম্ভ হইবেক।"

এই ইস্তাহারটি পরবর্ত্তী তিন সংখ্যা 'সমাচার দর্পণে' বাংলা ছাড়া ফার্সীতেও প্রকাশিত হয়। তাহার পর 'পৈকনামাবর'-এর আর কোন উল্লেখ দেখি নাই। "ব্যয়োপযুক্ত সংস্থান" হইয়াছিল কি না জানি না, তবে কাগজখানি না-বাহির হইবার আরও একটা কারণ অনুমিত হইতে পারে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণের জন্য তখন বিরাট আয়োজন

চলিতেছিল। ১৮২৩ সনের মার্চ মাসে কড়া প্রেস আইন জারি হয়। এই আইনের ফলে রামমোহন রায়ের ফার্সী সংবাদপত্র—'মীরাৎ-উল-আখবার' বন্ধ হইয়া যায়।* এই সকল কারণে বোধ হয় শ্রীরামপুর মিশন তখন ফার্সী সংবাদপত্র বাহির করা সময়োপযোগী মনে করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এ সংকল্প একেবারে বর্জ্জন করেন নাই, কারণ দেশে তখনও ফার্সী সংবাদপত্রের আদর ছিল। ১৮২৬ সনের গোড়ায় তাঁহারা সমাচার দর্পণের ফার্সী সংস্করণ প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৮২৬, ২৫এ মার্চ্চ তারিখের সমাচার দর্পণে বাহির হইল,—

"ইশ্‌তেহার। এই সমাচার দর্পণ এক্ষণে বঙ্গদেশের তাবৎ জিলাতে ও অন্য২ স্থানে প্রেরিত হইতেছে তাহাতে দর্পণ পাঠক সকল লোক অনায়াসে নানাদেশীয় সমাচার অবগত হইতেছেন এবং নূতন২ আইনও জ্ঞাত হইতে পারিবেন কিন্তু ঐ সকল জিলাতে এবং পশ্চিমদেশে এমত অনেক লোক আছেন যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা জ্ঞাত নহেন তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনায়াসে দর্পণে আলোকন করিতে সমর্থ হন না এবং দর্পণদ্বারা যে সকল নূতন আইন প্রকাশিত হইবেক তাহাও অবগত হইতে পারিবেন না অতএব সকল লোক যে অনায়াসে নানাদেশীয় সত্য সমাচার জানিতে পারেন এবং শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নূতন২ আইন যে অনায়াসে জ্ঞাত হইতে পারেন এই নিমিত্ত পরহিতাভিলাষি পরমকারুণিক শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সর্ব্বলোক হিতার্থে পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জ্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এবং আমরা আগামি এপ্রিল মাসের প্রথম বুধবার অবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিব। যদি কোন মহাশয় ঐ পারস্য সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আপন নাম ও নিবাস পাঠাইলে সপ্তাহে২ ডাকদ্বারা কাগজ পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য দর্পণের মূল্যানুসারে মাসে এক টাকা ও ডাকমাসুলের চতুর্থাংশ লওয়া হইবেক। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গলার বাহিরে কাগজ লইবেন তাঁহারদিগকে কলিকাতার কোন স্থানে টাকার বরাত দিতে হইবেক যেহেতুক ছয়২ মাস অন্তর ছয় টাকার করিয়া বিল ডাকদ্বারা পাঠাইতে হইলে কোন স্থানে দেড় টাকা কোথাও বা এক টাকা ডাক মাসুল লাগিবেক এবং পরে যদি কোন কারণে পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ে পত্র লিখিতে হয় তবে পুনর্ব্বার তদ্রূপ ব্যয় হইবেক ইহা হইলে ছয় টাকা আদায় করিতে দুই কিম্বা তিন টাকা ডাক মাসুল দিতে হইবেক কিন্তু কলিকাতায় কোন স্থানে বরাত থাকিলে এত ব্যয় ও বিলম্ব ও ক্লেশ হইবেক না।"

* মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার' কিছুদিন পরে পুনঃপ্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। বিলাত হইতে প্রকাশিত 'এশিয়াটিক জর্ণাল' পত্রের ১৮২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত অংশ দেখিতেছি :—

"*Hindoo Newspaper Reporting.* The following ludicrous description of a *fracas* is translated from the *Mirat-ool-Ukhbar*, or 'Mirror of Intelligence', a native newspaper published in Calcutta,.. (Asiatic Intelligence—Calcutta, pp. 323-24.)

কিন্তু 'আখবারে 'শ্রীরামপুর' ১৮২৬ সনের এপ্রিল মাসে বাহির হয় নাই। ৬ই মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাকাশিত হয়। ১৮২৬, ৬ই মে (২৫ বৈশাখ ১২৩৩) তারিখে প্রকাশিত উপরিউদ্ধৃত 'ইশ্‌তেহার'-এর মধ্যে এই কথাগুলি দেখিতেছি,—

"...এবং আমরা অদ্যাবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।"

পরবর্ত্তী সংখ্যায়, অর্থাৎ ১৮২৬, ১৩ই মে (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩) তারিখের কাগজে বাহির হইল,—

"গত শনিবার অবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসিয়ান সমাচারপত্র শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে অতএব যদি কোন মহাশয় ঐ পারসিয়ান সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরে আপন নাম ও নিবাস পাঠাইলে সপ্তাহেং কাগজ পাইতে পারিবেন তাহার মূল্য মাসে এক টাকা।"

আখবারে শ্রীরামপুর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। ইহার কোন ফাইলও আমি দেখি নাই।

৩। বঙ্গদূত

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা ইংরেজী বাংলা নাগরী ও ফার্সী—এই চারি ভাষায় প্রকাশিত হইত। সুতরাং ফার্সী সাময়িক পত্রের কথায় ইহার নাম বাদ দিলে চলিবে না। প্রথম সংখ্যার তারিখ — ১৮২৯, ১০ই মে। বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

৪। সমাচার সভা রাজেন্দ্র

মুসলমান-পরিচালিত ফার্সী ও বাংলা ভাষার এই সংবাদপত্রখানি ১৮৩১ সনের ৭ই মার্চ্চ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

৫। আইনা-ই-সিকন্দর

১৫৭ কলান্‌বা (কলিঙ্গাবাজার বা বর্ত্তমান কলিন ষ্ট্রীট ?) আইনা-ই-সিকন্দর প্রেস হইতে এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি প্রকাশিত হইত। ইহার ৯৯ সংখ্যার তারিখ দেখিতেছি—১৮৩৩, ২১এ জানুয়ারি।

'আইনা-ই-সিকন্দর'এর ফাইল।—

কলিকাতা ইম্পিরিয়াল রেকর্ড আপিস, ফার্সী-বিভাগ:—১৮৩৩ হইতে ১৮৪০।

৬। মাহ্‌-ই-আলাম্ আফ্রোজ

কলিকাতার ৫৩ নং তালতলা হইতে এই ফার্সী সংবাদপত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য ওয়াহাজ-উদ্দীনকে ১৮৩৩ সনের ২২এ মার্চ্চ লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। কাগজখানি কিছুদিন পরে বাহির হইয়াছিল।

'মাহ্‌-ই-আলম্-আফ্রোজ'-এর ফাইল।—

কলিকাতা ইম্পিরিয়াল রেকর্ড আপিস, ফার্সী-বিভাগ:—১৮৩৬ হইতে ১৮৪১।

৭। সুলতান-উল্-আখ্বার

এই ফার্সী সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি কলন্বা (মুনশী গোলাম রহমানের মসজিদের নিকট) হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ—১৮৩১, ২রা আগষ্ট।

'সুলতান-উল্-আখবার'-এর ফাইল।—

কলিকাতা ইম্পিরিয়াল রেকর্ড আপিস, ফার্সী-বিভাগ :—১৮৩৫ হইতে ১৮৩১।

উর্দ্দু সংবাদপত্র

১। সমসুল আখ্বার

১৮২৩ সনের ৩০এ মে এই ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষার সংবাদপত্রখানি প্রথম প্রকাশিত হয়,—বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহাই উর্দ্দু ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের শৃঙ্খলমোচন

১৮২৩ হইতে ১৮৩৫ সন পর্য্যন্ত মুদ্রাযন্ত্র শৃঙ্খলিত থাকিবার কালে যে-সকল সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের কথা বিবৃত করিয়াছি। মুদ্রাযন্ত্র-বিধি সরকারকে যথেচ্ছ ক্ষমতা দান করিলেও কার্য্যতঃ সংবাদপত্রগুলি অনেক দিন যাবৎ—বিশেষ করিয়া লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে (জুলাই ১৮২৮—মার্চ ১৮৩৫), স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল। সংবাদপত্রের অবাধ আলোচনা হইতে রাষ্ট্রের আশঙ্কার কারণ নাই—এই বোধে স্যর চার্লস্ মেটকাফ ১৮৩৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন। তখন হইতে সংবাদপত্রের উপর সরকারের বিশেষ ও যথেচ্ছ ক্ষমতা লোপ পাইল এবং কেবলমাত্র প্রকাশক ও মুদ্রাকরগণ প্রচলিত সাধারণ আইনের অধীন হইলেন। মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খলমোচন ব্যাপার স্মরণীয় করিবার জন্য কলিকাতার অধিবাসিগণ স্যর চার্লস্ মেটকাফের নামে মেটকাফ হল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়